সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড



মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র ১৩৫৭

সম্পাদক

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

সুমথনাথ ঘোষ

সবিতেন্দ্রনাথ রায়

মণীশ চক্রবর্তী

প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা

শ্রীচুনী বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ-মুদ্রণ

সিল্ক স্ক্রীন ও

চয়নিকা প্রেস

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ হইতে
এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও নিউ শশী প্রেস, ১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট,
কলিকাতা ৬ হইতে অশোককুমার ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

ভূমিকা

কোনও কোনও জ্ঞানীগুণীর সৈয়দ মুজতবা আলী সম্পর্কে অনুযোগ, তাঁর পাণ্ডিত্য যত ছিল, তাঁর রচনায় তিনি তার পরিচয় রেখে যেতে পারেননি। নিজে জ্ঞানী বা গুণী কোনটাই নই, তাই ও-কথার সত্য মিথ্যা যাচাই করতে পারব না। তবে লোককে জ্ঞান দেবার জন্য কোনও আগ্রহ এই মজলিশী মানুষটি কখনও দেখিয়েছেন বলে মনে পড়ে না। তাঁর চরিত্র বরং ছিল ঠিক উলটো। পণ্ডিতিয়ানা কি গুরুমশাইগিরি মুজতবার ধাতে সইত না।

পঞ্চতন্ত্রে মুজতবা এক জায়গায় লিখেছেন, "বেহেশ্‌তের বর্ণনাতে ইলিশের উল্লেখ নেই বলে পাঁচ-বখৎ নামাজ পড়ে সেথায় যাবার বাসনা আমার নেই।" এই মন্তব্যটা থেকেই তাঁর চরিত্র বোঝা যায়। তত্ত্বজ্ঞানী হবার বাসনা তাঁর ছিল না। তিনি ছিলেন রসালাপী। একেবারে নৈকুষ্যি আড্ডাবাজ। আর এই কথাটা মুজতবা কি লেখায় আর কি জীবনচর্যায় কোথাও লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেননি। "আম্মো যে আড্ডাবাজ সে তত্ত্বটা ওদেরও মনে ঝিলিক দিয়ে গেল একই ব্রাহ্ম মুহূর্তে।" কায়রোর আড্ডাধারীরাই যে প্রথম দর্শনে আড্ডাবাজ মুজতবাকে চিনে নিতে পেরেছিল তাই নয়, তাঁর অগণিত পাঠকবর্গও তাঁকে চিনে নিতে ভুল করেননি। আড্ডাপ্রিয় বাঙালীর জন্য যে রস তিনি সাহিত্যের ভিয়েনে সৃষ্টি করে গিয়েছেন তা আদ্যন্ত আড্ডারই রস।

আর এই আড্ডার চক্রবর্তী বলুন, কুতব মিনার বলুন, অশোক স্তম্ভ বলুন, স্বয়ং সৈয়দ মুজতবা আলী। চাচা কাহিনীর অবিস্মরণীয় চাচার কথা স্মরণ হলেই আমার আলী সাহেবের কথা মনে পড়ে যায়। পার্ক সার্কাসে ৫নং পার্ল রোডে এবং নাসিরউদ্দীন রোডের আস্তানায়, দিল্লীতে কনসটিটিউশন ক্লাবে, বোলপুরের উকিলপাড়ার বাসাবাড়িতে, শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলায় চায়ের দোকানে, কি কলকাতার বিভিন্ন পানশালায় যখনই সৈয়দ মুজতবা আলীর সঙ্গে দেখা হয়েছে, তিনি বারলিন শহরের কুরফুরসটেন-ডাম সড়কে অবস্থিত 'হিন্দুস্থান হৌসে'র আড্ডার চক্রবর্তী চাচার মত, যার অনবদ্য বিবরণ তাঁর রচিত 'চাচা কাহিনী'র পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে, আড্ডা জমিয়ে বসে আছেন। তিনিই সে আড্ডার মধ্যমণি এবং বখতিয়ার খিলজী। কথা বলতে এতও ভালবাসতেন! আর কত বিষয়ই না জানতেন!

ওঁর কথা আমরা এমন গোগ্রাসে গিলতাম যে তিনি বিদগ্ধ না অর্ধদগ্ধ তা

বিচার করে দেখবার ফুরসতই পাইনি। তবে আড্ডাবাজ মুজতবা আলীর যে পরিচয় আমীনুর রশীদ চৌধুরী সাহেব সজনীকান্ত দাস মহাশয়ের জবানীতে (দেশ, ৪১ বর্ষ, ৪৫ সংখ্যা, পৃ ৪১৬) দিয়েছেন তার খানিকটা উদ্ধৃত করছি। পাঠক মহাশয়েরা এর থেকেই কিছুটা আন্দাজ নিশ্চয়ই পাবেন।

"দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কথা শুনিতে শুনিতে পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরিয়া গিয়াছিল। পাশে একটি কফির দোকান ছিল, প্রস্তাব করিলাম সেখানে একটু গিয়া বসি, এক কাপ কফি খাই। তারপর সেখানে বসিয়া কফির অর্ডার দিয়া পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদের কথা দুই পক্ষেরই জিজ্ঞাসাবাদ চলিল। একজনের কথা উঠিতে আমি বলিলাম যে সর্বনাশের পথ ধরিয়া সারাদিন মদ খাইয়া চুর হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য—আমি মদ খাই না এবং সাহচর্যগুণে ঐ জিনিসটির প্রতি আমার বিতৃষ্ণা আছে। মুজতবা আলী কিন্তু সেই মদের উপর কথা পাড়িয়া বসিলেন। পৃথিবীতে কত রকম মদ আছে এবং ঐগুলা কিভাবে তৈরি হয়, কিভাবে খাওয়া হয়, কোন্ মদের স্বাদ কি রকম—এই সবের আলোচনা—বিশদ আলোচনা আরম্ভ করিলেন। আমরা তন্ময় হইয়া শুনিতে লাগিলাম। উনি যখন তাঁহার কথা শেষ কবিলেন তখন আবিষ্কার করিলাম সন্ধ্যার বাতি জ্বলিয়া গিয়াছে। আমাদের দুপুরেব খাওয়াও হয় নাই।

"আগে মুজতবা আলীর কথাবার্তা শুনিয়া মনে করিতাম যে তাঁহাব মধ্যে গভীরতা নাই। কিন্তু আমাদের মতো তিনটি প্রাণীকে প্রায় ঘণ্টা দশেক যাবৎ যে তন্ময় করিয়া রাখিতে পাবেন তাঁহার মধ্যে গভীরতা নাই একথা কি করিয়া বলি।"

লোককে নাওয়া খাওয়া ভুলিয়ে কথা শোনাবার যে এলেম মুজতবা আলীর ছিল তা তাঁর লেখাতেও বর্তেছে। তাঁর অননুকরণীয় বাগ্‌ভঙ্গীই যে তাঁর রচনা-রীতিকে গড়ে তুলেছিল সে বিষয়ে বিতর্কের সুযোগ নেই। মুজতবা আলীর যে-কোনও রচনা পড়লেই মনে হয়, তিনি কলমের মুখে কথা বলছেন। একটা উদাহরণ দিই। মদের প্রতি সজনীবাবুর বিতৃষ্ণা থাকা সত্ত্বেও মুজতবা আলীর সামনে ঘণ্টা দশেক ঠাঁই বসে থেকে তাঁকে মদের নানা ব্যাখ্যান শুনতে হয়েছিল। তেমনি তামাকের নামে মূর্ছা যান এমন লোকও এই বিবরণটির শেষ না পড়ে পারবেন না, একথা আমি হলফ করে বলতে পারি।

"বলে কি? কাইরোতে তামাক? স্বপ্ন নু মায়া নু মতিভ্রম নু?

"দিব্যি ফর্শী হুঁকো এল। তবে হনুমানের ন্যাজের মত সাড়ে তিনগজী দরবারি নল নয় আর সমস্ত জিনিসটার গঠন কেমন যেন ভোঁতা ভোঁতা।

জরির কাজ করা আমাদের কর্শী কেমন যেন একটু 'নাজুক', মোলায়েম হয়—এদের যেন একটু গাঁইয়া। তবে হ্যাঁ, চিলিমটা দেখে ভক্তি হল—ইয়া ডাবর পরিমাণ। একপো তামাকে হেসেখেলে তার ভিতর থানা গাড়তে পারে—তাওয়াও আছে। আগুনের বেলা অবিশ্যি আমি টিকের ধিকিধিকি গোলাপী গরম প্রত্যাশা করিনি, কারণ কাবুলেও দেখেছি টিকে বানাবার গুহ্যতথ্য সেখানকার রসিকরাও জানেন না।

"আর যা খুশবাই বেরল তার রেশ দীর্ঘ চৌদ্দ বছর পরও যেন আমার নাকে লেগে আছে।

"পাঠক, তুমি নিশ্চয়ই জানো সুগন্ধী ইজিপশিয়ন সিগারেট ভুবনবিখ্যাত। কিন্তু কখনো কি ভেবে দেখেছ বিশেষ করে মিশরই সুগন্ধী সিগারেট তরিবৎ করে বানাতে শিখল কি করে? আইস, সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ গবেষণা করা যাক। এই সিগারেট বানাবার পিছনে বিস্তর ইতিহাস, এন্তার রাজনীতি এবং দেদার রসায়ন শাস্ত্র লুক্কায়িত আছে।

"সিগারেটের জন্য ভালো তামাক জন্মায় তিন দেশে। আমেরিকার ভার্জিনিয়াতে, গ্রীসের মেসেডোন অঞ্চলে এবং রুশের কৃষ্ণসাগরের পারে পারে। ভারতবর্ষ প্রধানত ভার্জিনিয়া খায়, কিছুটা গ্রীক কিন্তু এই গ্রীক তামাক এদেশে টার্কিশ এবং ইজিপশিয়ন নামে প্রচলিত। তার কারণ একদা গ্রীসের উপর আধিপত্য করতো তুর্কী এবং তুর্কী গ্রীসের বেবাক তামাক ইস্তাম্বুলে নিয়ে এসে কাগজ পেঁচিয়ে সিগারেট বানাত। মিশরও তখন তুর্কীর কব্জাতে, তাই তুর্কীর কর্তারা কিছুটা তামাক মিশরে পাঠাতেন। মিশরের কারিগররা সেই গ্রীক তামাকের সঙ্গে খাঁটি মিশরের খুশবাই মিশিয়ে দিয়ে যে অনবদ্য রসনলী নির্মাণ করলেন তারই নাম ইজিপশিয়ন সিগারেট।"—(আড্ডা, পঞ্চতন্ত্র)

সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রতিভার সম্যক পরিচয়টা তুলে ধরবার জন্যই এই নাতিদীর্ঘ উদ্ধৃতিটি তুলে ধরা হল। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, শুধুমাত্র বাগ্‌-বিভূতি নয়, মুজতবা আলী কথার পরতে পরতে হরেক রকম তথ্য ও সমাচার এমন সুন্দর আন্দাজে পরিবেশন করতে পারতেন বলেই তাঁর শ্রোতা বা পাঠক মুগ্ধ হয়ে পড়তেন। আর তাঁর পরিবেশিত তথ্যসম্ভার ছিল যত ব্যাপক তত বিচিত্র। দেশভ্রমণের অভিজ্ঞতা এবং অক্লান্ত অধ্যয়নই তাঁকে এই সুবিপুল রত্ন-ভাণ্ডারের ভাণ্ডারী করে তুলেছিল। আর এর জন্য তাঁকে কত না পরিশ্রম করতে হয়েছিল। এই পরিশ্রমের ব্যাপারটা তিনি তাঁর পাঠকদের কাছে সম্পূর্ণ লুকিয়ে রাখতেন, যে তথ্য তিনি অনায়াসে সরসভাবে পরিবেশন করে গেলেন তা সংগ্রহ

করার পিছনে যে কত ঘাম ঝরেছে (আরবী, ফার্সী, উর্দু, হিন্দী, সংস্কৃত, মারাঠী, গুজরাতী, ইংরেজী, ফরাসী, জর্মান সহ পনেরটি ভাষা তাঁর অধিগত ছিল) তা আদৌ বোঝা যেত না, সম্ভবত সেই কারণেই জ্ঞানীগুণী মহল থেকে এই মন্তব্য শোনা যেত, জনপ্রিয়তার সুযোগ নিয়ে ইংরেজিতে যাকে বলে playing to the gallery তিনি তাই করে গিয়েছেন, আর তাই করতে গিয়ে শক্তির অপচয় করেছেন। আমি মনে করি, সৈয়দ মুজতবা আলীকে আমরা তত্ত্বজ্ঞানী অধ্যাপকরূপে না পেয়ে যে রসালাপী আড্ডাধারীরূপে পেয়েছি, এটা আমাদের পক্ষে শাপে বর হয়েছে।

॥ দুই ॥

সৈয়দ মুজতবা আলীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় ১৯৪৮ সালে, একটা অদ্ভুত ঘটনার মধ্য দিয়ে। তখন দেশ পত্রিকায় তাঁর "দেশে-বিদেশে" ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে আমাদের একেবারে চমকে দিচ্ছে। ঐ বছরই সত্যযুগ পত্রিকায় ফা হিয়েন ছদ্মনামে লিখিত আমার একটা রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। প্রথম কিস্তি পড়েই উনি আমাকে তলব করেন। ৫নং পার্ল রোডের বাড়ির একতলায় একটা ঘরে তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ এবং ঐ বাড়িরই তিন-তলার ঘরে তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগে শেষ সাক্ষাৎ।

প্রথম সাক্ষাতে তাঁকে আমার নদে-শান্তিপুরের গোসাঁই বলেই মনে হয়েছিল। মাথাভর্তি টাক, সহাস্য, প্রাণোচ্ছল, দীপ্যমান সে চেহারা ভোলবার নয়। তাঁর অগ্রজ সৈয়দ মুর্তাজা আলী লিখেছেন, "বাল্যকালে মুজতবা আলীর চেহারা অত্যন্ত সুন্দর ছিল। তার বর্ণ গৌর ছিল। মুখের রেখা ধারালো।...বাস্তবিকই সে যৌবনে ছিল কাঞ্চনকান্তি সুপুরুষ। তার ডাকনাম ছিল সিতারা বা নক্ষত্র।"

তার দাদার এই বিবরণ থেকেই জানা যায়, ১৯১৯ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন সিলেটে আসেন তখন তিনি ছাত্রদের কাছে 'আকাঙ্ক্ষা' সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। মুজতবা আলীর বয়স তখন চৌদ্দ বছর। বক্তৃতা শুনে কারো সঙ্গে পরামর্শ না করেই মুজতবা রবীন্দ্রনাথকে চিঠিতে জিজ্ঞাসা করেন, "আকাঙ্ক্ষা উচ্চ করতে হলে কি করা প্রয়োজন?" রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "আকাঙ্ক্ষা উচ্চ করিতে হইবে—এই কথাটার মোটামুটি অর্থ এই—স্বার্থই যেন মানুষের কাম্য না হয়। দেশের মঙ্গলের জন্য ও জনসেবার জন্য স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগ কামনাই মানুষকে কল্যাণের পথে

নিয়ে যায়। তোমার পক্ষে কি করা উচিত তা এতদূর থেকে বলে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে তোমার অন্তরের শুভেচ্ছাই তোমাকে কল্যাণের পথে নিয়ে যাবে।"

রবীন্দ্রনাথের এই চিঠিখানাই তরুণ মুজতবাকে রবীন্দ্রনাথের কাছে এনে দেবার যোগসূত্রের কাজ করে। ১৯২১ সালে দেশে অসহযোগ আন্দোলনের বন্যা আসে। মুজতবা আলী তখন সিলেটে সরকারী হাই স্কুলে ক্লাস নাইনের ছাত্র ও ক্লাসের ফার্স্ট বয়। সরস্বতী পূজার সময়ে কয়েকটি হিন্দু ছাত্র ডেপুটি কমিশনারের বাংলো থেকে কুল চুরি করে। পরের দিন ডেপুটি কমিশনার ডসন সাহেব চুরির খবর পেয়ে দোষী ছেলেদের ডেকে পাঠান। ছেলেরা উপস্থিত হলে ডেপুটি কমিশনারের হুকুমে চাপরাসীরা ছেলেদের দু-এক ঘা বেত মারে। ছেলেরা ধর্মঘট করল। তখন যে সব সরকারী কর্মচাবীর পুত্রেরা ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিল তাদের অভিভাবকদের উপর কর্তৃপক্ষ চাপ দিলেন। মুজতবা আলীর পিতা সৈয়দ সিকান্দব আলী তখন সিলেটে জেলা সাবরেজিস্ট্রারের পদে বহাল। ১৯০৪ সালে তিনি যখন করিমগঞ্জ শহবে রেজিস্ট্রেশন বিভাগে চাকবি করতেন তখন তাঁব কনিষ্ঠ পুত্র মুজতবা জন্মগ্রহণ করেন।

ডেপুটি কমিশনার সাহেব মুজতবা আলীর বাবাকে ডেকে নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। বাবা মুজতবাকে স্কুলে ফিরে যেতে বললেন। কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মুজতবা কিছুতেই স্কুলে ফিরে যেতে বাজী হলেন না। বাবা তাঁকে সবকারী স্কুলে ফিরে যেতে বললে তিনি শান্তিনিকেতনে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন সবেমাত্র বিশ্বভারতী স্থাপিত হয়েছে। তখন রবীন্দ্রনাথ নিজেই বিশ্বভারতীতে পড়াতেন। মুজতবা আলী তাঁর কাছে বলাকা, শেলী ও কীটসের কাব্য অধ্যয়ন করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তখন বেনোয়া, বগদানফ, সিলভা লেভি, ভিনটারনিৎস, তুচ্চি প্রভৃতি দিকপাল অধ্যাপকগণ বিশ্বভারতী আলো করে ছিলেন। এঁদের সান্নিধ্যে আসার ফলেই মুজতবার নানা ভাষা শিক্ষাব বুনিয়াদ তৈবি হয়ে যায়। তাঁর জ্ঞানতৃষ্ণাও বেড়ে ওঠে।

শান্তিনিকেতনের পড়া শেষ করে মুজতবা আলী কিছুকাল আলীগড়ে পড়াশুনা করেন। তারপর তাঁর কাবুলে অধ্যাপনা করতে যাওয়ার সুযোগ হয়। সেখানে দু বছর থাকবার পর ১৯২৯ সালে দেশে ফিরে আসেন। এই সময়ের অভিজ্ঞতাই তাঁর অবিস্মরণীয় রচনা 'দেশে-বিদেশে'র উৎস।

এরপর মুজতবা জার্মান বৃত্তি নিয়ে প্রথমে বার্লিন এবং পরে বন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। আমীনুর রশীদ চৌধুরী সাহেব লিখেছেন, ব্রাসেলসে পাকিস্তান দূতাবাসের প্রথম সেক্রেটারী ডঃ হাসান ইমাম, আদি নিবাস বিহারে, তাঁকে

সিলেটের লোক জেনে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলীকে চেনেন কি না? "আমি উত্তর দিলাম, চিনিব না কেন, উনি তো আমার আত্মীয়ও হন। এরপর ভদ্রলোকের উৎসাহ আরও বাড়িয়া গেল। আমাকে বলিলেন, দেখুন, আমি বন বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন ভরতি হই তখন অধ্যাপকমণ্ডলীর মুখে প্রাচ্যের একজন ছাত্রেরই নাম শুনিতাম। তিনি হইলেন ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলী।" বন থেকে তিনি ডক্টর ডিগ্রি পান। বন বিশ্ববিদ্যালয় পায় তাঁর গবেষণা 'খোজা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও তাদের বর্তমান ধর্মজীবন'। আর আমরা, বাঙালী পাঠকেরা, পেয়েছি মুজতবার কান্না-হাসির মালায় গাঁথা অভিজ্ঞতার অপূর্ব ফসল, আমার মতে তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'চাচা কাহিনী'।

১৯৩২ সালে তিনি জার্মানী থেকে দেশে ফিরে আসেন। তারপর আবার ইওরোপ যাত্রা এবং ইওরোপ থেকে কায়রো। সেখানে আল-আজহার বিশ্ব-বিদ্যালয়ে কিছুদিন পড়াশুনা করেন। বরোদার মহারাজা সয়াজীরাও গাই-কোয়াড়ের সঙ্গে কায়রোতেই তাঁর আলাপ হয়। কায়রোর কথা 'পঞ্চতন্ত্রে'র এখানে-ওখানে ছড়ানো। আর তাঁর 'কোদণ্ড মুখহানা'র কাহিনী তো বাঙালী পাঠকের কাছে কায়রোকে দৃঢ় বন্ধনে বেঁধে রেখে দেবে চিরকাল।

১৯৩৪ সালে দেশে ফিরে মুজতবা বরোদা যান। বরোদা কলেজে তিনি তুলনাত্মক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। মহারাজার মৃত্যুর পর তিনি কলকাতায় ফিরে এসে ৫নং পার্ল রোডে তাঁর বন্ধু আবু সয়ীদ আইয়ুবের সাহচর্যে বাস করতে থাকেন। অসুস্থ আইয়ুব চিকিৎসার জন্য মদনাপল্লী গেলে মুজতবাও তাঁর অনুগমন করেন এবং এই সময় কিছুদিন বাঙ্গালোরে বাস করেন। তিনি রমন মহর্ষির প্রতিও আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এবং আশ্রমবাসীও হয়েছিলেন।

বাঙ্গালোরে বসেই তিনি 'দেশে-বিদেশে' রচনা শুরু করেন। তবে আনন্দ-বাজার পত্রিকায় সত্যপীর এবং টেকচাঁদ ছদ্মনামে তাঁর রচনা তার আগেই প্রকাশিত হয়েছে। 'দেশে-বিদেশে'র প্রকাশ যেন তাঁর দিগ্বিজয়ের সমান।

১৯৪৯ সালে সৈয়দ মুজতবা আলী বগুড়া কলেজে অধ্যক্ষরূপে যোগ দেন। কিন্তু তাঁর পরিশীলিত এবং পরিচ্ছন্ন চিন্তাধারা তাঁর পাকিস্তান বাসে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করে তিনি আবার কলকাতায় চলে আসেন এবং ভারতের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। এরপর আকাশবাণীতে যোগ দিয়ে তিনি কটকের স্টেশন ডিরেক্টার হন। তার আগে তিনি কিছুদিন ভারত সরকারের কালচারাল রিলেশন্‌স সংস্থার সেক্রেটারীর পদেও কাজ করেন। আকাশবাণীর চাকরি ছেড়ে তিনি বিশ্বভারতীতে যোগ দেন। সেখানে প্রথমে

জার্মান ভাষা পড়াতেন পরে তিনি ইসলামিক কালচার বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বিশ্বভারতীর অধ্যাপনা ছাড়বার পর সাহিত্যচর্চা ছাড়া আর কিছু করেননি।

১৯৩১ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষাব্রতী শ্রীমতী রাবেয়া খাতুনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। মুজতবা আলীর দুই পুত্র সৈয়দ মশররফ্ আলী এবং সৈয়দ জগলুল আলী বাংলাদেশেই বাস করেন।

॥ তিন ॥

সৈয়দ মুজতবা আলীর মধ্যে একটা ভাবুক, সদা ছটফটে রসিক শিশু পুরুষ লুকানো ছিল। পরিহাসের তলায় অনেক গ্লানি লুকিয়ে রাখার ক্ষমতা তাঁর ছিল অসাধারণ। 'দেশে-বিদেশে' কি 'চাচা-কাহিনী'র পাতায় পাতায় যার অজস্র নিদর্শন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। গভীর মর্মান্তিক সব দুঃখের কাহিনী কত অনায়াসেই না বলে যেতে পারতেন! হাসতে গিয়ে মনে হত কি বোকাই না বনে গিয়েছি।

৫নং পার্ল রোডের বাড়িতেই তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা। বেশ কিছুদিন ধরে রোগে ভুগছিলেন। কোথায় সেই উজ্জ্বলকান্তি! অবসন্ন পাণ্ডুর চেহারাটি নিয়ে তিনি "আস্তাজ্ঞা‚হোক" বলে চৌকির উপর উঠে বসলেন। চারদিকে বই ছড়ানো। এলোমেলো ঘর। গায়ে একটা নকশী-কাঁথা জড়ানো।

এই এলোমেলো বেশবাসের মধ্যেও যেটা হারায়নি তা হল তাঁর অনর্গল কথার স্রোত। তাঁর রচনায় যা বয়েই চলেছে।

গৌরকিশোর ঘোষ

ধূপছায়া

উৎসর্গ

অগ্রজ সৈয়দ মরতুজা আলী সাহেবের করকমলে



দেশভ্রমণ

ছেলেবেলায় মাস্টারমশাই গোরু সম্বন্ধে রচনা লিখতে হুকুম দিতেন। এখনও মনে পড়ছে, তালুর ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে যেত কিন্তু কিছুতেই ভেবে পেতুম না, গোরু সম্বন্ধে লিখব কী ? শেষটায় মনে হত, আমি একটা আস্ত গোরু, না হলে গোরু সম্বন্ধে কিছুই লিখতে পারছি নে কেন—যে গোরু ইস্কুল আসতে-যেতে নিত্যি নিত্যি দেখতে পাই। সে-কথা একদিন এক বন্ধুকে বলতে সে বাঁকা হাসি হেসে বলেছিল, আত্মজীবনী লেখা তো কঠিন নয়।

শেষটায় অনেক ভেবে-চিন্তে লিখতুম, গোরুর চারখানা পা, দুটো শিঙ আর একটা ন্যাজ আছে। গুরুমশাই তারই উপর চোখ বুলিয়ে যেতেন, পেটের অসুখ থাকলে দিতেন ছ নম্বর, মর্জি ভাল থাকলে দিতেন আট। আমিও খুশী হয়ে ভাবতুম, এই গোরুর ন্যাজ ধরে পরীক্ষা-বৈতরণী ঠিক ঠিক পেরিয়ে যাব।

কিন্তু মাঝে মাঝে ভাবতুম, দুটো শিঙ বলার অর্থ হয়, কারণ গণ্ডারের নাকি একটা শিঙ। চার পা বলাও অবাস্তর নয়, কারণ চার না হয়ে গোরুর দু পাও হতে পারত কিন্তু একটা ন্যাজ বলার ত কোন মানে হয় না—আজ পর্যন্ত ত কোন জানোয়ারের দুটো ন্যাজের কথা শুনি নি। একদিন মাস্টারমশাইকে প্রশ্নটা শুধালে তিনি বললেন, ইংরেজী ভাষার আইন অনুসারে বলতে হয়, দি কাউ হ্যাজ এ টেল। 'এ'টা না দিলে ব্যাকরণের গলতি হয়। তখন বুঝলুম 'এ টেল'টা গোরুর ন্যাজ নয়, ইংরেজী ব্যাকরণের ন্যাজ। কিন্তু তবু প্রশ্ন রয়ে গেল, বাংলাতে যখন 'একটা' ব্যবহার না করে দিব্য বলতে পারি 'গোরুর ন্যাজ আছে' তখন ইংরেজের মত সুসভ্য জাত সৃষ্টির প্রথম পূর্বাহ্ণে বৃক্ষাবতরণকালে তার মর্কট রূপটি ত্যাগ করার সময় এই বৈয়াকরণিক কিংবা আলঙ্কারিক পুচ্ছটিও বর্জন করল না কেন ?

আমি ইংরেজী লিখতে পারি নে। যাঁরা ওই ভাষাতে নাম করেছেন, তাঁদের মুখে শুনেছি, ওই 'এ'র ন্যাজ নাকি এখনও তাঁদের মুখের উপর মাঝে মাঝে ঝাপটা মারে। তাই শুনে বিঘ্নসন্তোষী মন বিমলানন্দ লাভ করে।

সে-কথা থাক্।

কিন্তু যখন মাস্টারমশাই হুকুম দিতেন, 'দেশভ্রমণের উপকারিতা সম্বন্ধে প্রাঞ্জল ভাষায় কিঞ্চিৎ বর্ণনা কর', তখন সে-বৈতরণীর ও-পার আর চোখে দেখতে পেতুম না। গোরু জানোয়ারটা উৎকৃষ্ট হোক নিকৃষ্ট হোক সেটাকে তবু চিনি, না-হক্ক এ-কথা কখনই বলে ফেলব না, 'গোরু বড় প্রভুভক্ত জীব, সে রাত জেগে

চোর-ডাকু খেদায় কিংবা পাড়ার মোদ্দারমশাই গোরু চড়ে আদালতে পেশকারি করতে যান।' কিন্তু দেশভ্রমণ বলতে ত বুঝি দাদীর বাড়ি যাবার সময় নৌকোর ছৈয়ের ভিতরের দিকটা—ছৈয়ের বাইরে যেতে চাইলেই বাবা রাশভারী গলায় বলতেন, 'থাক্ থাক্, আর বিলে ডুবে মরতে হবে না।' বাংলা ভাষাটা নিতান্ত পশ্চিম-বাঙলার ভাষা। না হলে 'ডানপিটের মরণ গাছের ডগায়' না বলে বলত, 'ডানপিটের মরণ বিলের তলায়'। সেই ছৈয়ের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ত আর দেশভ্রমণের উপকারিতা সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান জন্মায় না। কাজেই তখন বাধ্য হয়ে সন্ধান নিতে হত, কোন্ 'এসে বুক' মুখস্থ করে বীরভূমের হেতমপুর ইস্কুলের বিশ্বম্ভর ভড় গেল-বার ম্যাট্রিকে ফার্স্ট হয়েছে। 'চিত্তের প্রসার', 'অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য', 'কষ্টসহিষ্ণুতার পরিপূর্ণতা' ইত্যাদি যাবতীয় উত্তম উত্তম গুণরাজিতে প্রবন্ধটি ভরে দিতে তাই আমাদের তখন আর কণামাত্র অসুবিধে হত না— ইস্কুল-ঘরের চারিটি বেড়ার ভিতর বসে বসে। মাস্টারমশাইও কোন আপত্তি জানাতেন না, কারণ আমরা বিলক্ষণ জানতুম, তাঁর দৌড়, 'মোল্লার দৌড় মসজিদ তক'—অর্থাৎ, তাঁর এক ভাগ্নে ম্যাট্রিক ফেল মেরে আগরতলায় পালিয়ে যাওয়াতে তিনি ভয়ে ভয়ে 'দুর্গা দুর্গা, দুর্গতিনাশিনী' জপ করতে করতে অতি অনিচ্ছায় আগরতলা অবধি একবার 'দেশভ্রমণ' করেছিলেন। জাত যাবার ভয়ে তিনি সেই যাওয়া-আসাটা সেরেছিলেন নিরম্বু, অপর্ণব্রতে। ফিরে এসে তিনি প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন, কারণ ভিড়ে মেলা জাত-বেজাতের লোক হয়ত তাঁর গাত্রস্পর্শ করে ফেলেছে। এবং সবচেয়ে মারাত্মক অগ্নিপরীক্ষা তাঁকে তখন পেরতে হয়েছিল, তার সঙ্গে অন্য কোন পরীক্ষার তুলনা হয় না, সেই একমেবা-দ্বিতীয়ম্ দেশভ্রমণের ঝাড়া বারোটি ঘণ্টা তিনি তাঁর নর্মসখী কৃশানুদীপ্ত তাম্রকূটশীর্ষ ডাবাসুন্দরীর সুচিক্কণ কৃষ্ণগণ্ডে একটি মাত্র নিবিড় চুম্বন দিতে পারেন নি। তিনি 'পথি নারী বিবর্জিতা' এই আপ্তবাক্যটির স্মরণে শুচিস্মিতাকে সজল নয়নে তাঁর সপত্নীর হাতে সমর্পণ করে দৃঢ়পদে পশ্চিমাভিযান করেছিলেন।

এ-জাতীয় গুরু পৃথিবী থেকে লোপ পেয়েছেন। টোলো-পণ্ডিত, আপন চেষ্টায় ইংরেজী শিখেছিলেন, কিন্তু কোনও ডিগ্রী ছিল না বলে ক্লাস সিক্সের উপরে যাবার তাঁর হক্ক ছিল না।

কিন্তু সেইটে আসল কথা নয়। আসল কথা এই, তিনি যখন দেশভ্রমণের উপকারিতা সম্বন্ধে 'পয়েন্ট' দেবার সময় উচ্চাঙ্গের বক্তৃতা ঝাড়তেন তখন, কেন জানি নে, একমাত্র আমারই মনে সন্দেহ হত যে, তাঁর ভ্রমণ-প্রশস্তি হিন্দু গৃহিণীর ভিন্ন হেঁশেলে মুর্গী রান্না করার মত। ছেলে-ছোকরারা খাবে, তিনি রান্নার পর

গঙ্গাস্নান করে বুনেদী হেঁশেলে পুঁই-চচ্চড়ি চড়াবেন।

আমি তাই একদিন সাহস করে বলেছিলুম, ঘোরাঘুরি করলেই যদি এত বিদ্যে হয় তবে ত গার্ডসাহেব আজমল আলী আমাদের শহরের সবচেয়ে জ্ঞানী পুরুষ। আশ্চর্য, পণ্ডিতমশাই রাগ করলেন না। সন্দিগ্ধ নয়নে, অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন শুধু ; আমি তাঁর চোখের ভাষাতে পড়লুম, 'তবে কি রাস্কেলটা আমার মনের গোপন খবর পেয়ে গিয়েছে ?'

তা সে যাই হোক, পণ্ডিতমশাই কিন্তু তখন একটা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, তার অর্থ, আর পাঁচটা জিনিসের মত দেশভ্রমণও খুদাতালা আপন হাতে কব্জা করে রেখেছেন। পাঁচটা জিনিসের মত দেশভ্রমণের উপকারিতা সম্বন্ধে স্থির-নিশ্চয় হওয়ার পরই মানুষ দেশভ্রমণে বেরয় না ; যার কপালে ওটা লেখা আছে, কিংবা বলুন কপালে নয়, যার পায়ে চক্কর আছে, সে-ই বেরয় দেশভ্রমণে। কেউ বেরয় পণ্ডিতমশায়ের মত গজরাতে গজরাতে, কেউ বেরয় চেন-ছাড়া পাখির মত তিড়িং তিড়িং করে, তিন লম্ফে গেট-পেরিয়ে।

দেশভ্রমণ করেছি, এ-রকম একটা খ্যাতি আমার আছে। এ-সম্বন্ধে কোন প্রকারের উচ্চবাচ্য আমি করি নে। অর্থাৎ আমি যে-সব ভূমি দেখেছি, শুধুমাত্র সেগুলোর সাদামাটা বর্ণনা দিয়েই ক্ষান্ত থাকি। দেশভ্রমণ ভাল কি মন্দ, কোন কোন দেশে গিয়েছিলাম এ-সম্বন্ধে কোন প্রকারের ইঙ্গিত দেবার প্রয়োজন মনে করি নে। অথচ, আমার বহু সহৃদয় পাঠক ধরে নিয়েছেন যে, আমি দেশভ্রমণের নাম শুনলেই মুক্তকচ্ছ হয়ে তদ্দণ্ডেই বন্দর পানে ধাওয়া করি।

এ-ধারণাটা সত্য নয়। কিন্তু তবু এটার প্রতিবাদ আমি করতুম না, যদি না এ-ধারণা আমার প্রতি কিঞ্চিৎ অবিচার করত। কিংবা এটা যদি নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার হত তা হলেও চুপ করে থাকলে কোন ক্ষতি হত না। কিন্তু এ-ব্যাপারে আমিই সবেধন উজ্জ্বল নীলমণি নই, আমার চেয়েও হতভাগা গুটি কয়েক আছেন। তাই ব্যক্তিগত কাহিনী বলার সঙ্কোচ অনিচ্ছায় কাটাতে হল।

কেউ যখন বলে 'ফলনা দেশভ্রমণ করতে ভালবাসে' তখন সে-বাক্যে আমি প্রশংসার চেয়ে নিন্দাই দেখতে পাই বেশী। এ যেন অনেকটা 'ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে, গামছা পর গিয়ে'। তার অর্থ মেয়েটা এমনি মারাত্মক রকমের হন্যে হয়ে উঠেছে বিয়ে করবার জন্য যে, বাপ-মার স্নেহ-ভালবাসার তোয়াক্কা সে আর করে না, আপন বাড়ি-ঘর ছেড়ে যেতে তার আর কোন ক্ষোভ নেই, বিয়ের অপরিহার্য আনুষঙ্গিক শাড়ি-গয়না, বাজনাবাদ্যিরও তার প্রয়োজন নেই, আপন গামছা পরেই পড়ি-মরি হয়ে সে সাতপাক ঘুরবে।

পাড় দেশভ্রমণকারীর-অর্থও তা-ই। যে মাটিতে তার নাড়ি পোঁতা আছে, যে-নদীর জল খেয়ে সে আজ চলতে শিখেছে, যে আমজামকাঁঠাল তাকে ছায়া দিয়ে শ্যামল শীতল করে রেখেছে, যার প্রতিটি দুর্বাদল তার পদ-তাড়না কামনা করে—তারা যেন কিছুই নয়, তারা যেন বানের জলে ভেসে-আসা, ফেল্‌না। গুরুদের আশীর্বাদ, বাপ-মায়ের স্নেহ, ভাইবোনের ভালবাসা, বন্ধুজনের সদান্তরিকতা, এসব কথা আর তুললুম না, সেগুলো এতই শুচিশুদ্ধ পবিত্র যে, ওদের স্মরণকে কলঙ্কিত করে মহাপাতকী হতে চাই নে।

অসহিষ্ণু হয়ে শান্ত পাঠক বললেন, 'কী জ্বালা, লোকটা ত আর চিরকালের তরে দেশত্যাগী হয়ে চলে যাচ্ছে না। দুদিন কিংবা দুবছর পরে আবার তো ফিরে আসবে। ইতিমধ্যে তোমার গাছগুলো ত আর রবি ঠাকুরের "হংস-বলাকা"র মত ডানা মেলে আকাশের কিনারা খুঁজতে বেরিয়ে যাবে না, কিংবা নদীটি জনকতনয়ার অভিসম্পাতে অন্তঃসলিলা হয়ে যাবেন না, কিংবা—"

বেশ কথা। তা হলে কিছু বলার নেই। এবং সত্যি বলতে কী, সেইটেই কাম্য। আমাদের মুনিঋষিরা সেই নির্দেশই দিয়ে গিয়েছেন; আমাদের বাপ-পিতেমো তাই করেছেন। মুসলমান মৌলানা-দরবেশরা তাই বলেছেন। তাদের ব্যাটা-বাচ্চারা তাই করেছে।

তাই শাস্ত্রকার আদেশ দিয়েছেন, গুরুগৃহে বিদ্যাচর্চা সমাপ্ত হলে পর তীর্থ-ভ্রমণান্তে ('দেশভ্রমণ' কিংবা হালফিলের কথা 'টুরিজ্‌ম') স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করত গৃহস্থাশ্রম-প্রবেশ কর্তব্য। তারপর আর দেশভ্রমণ-টেশভ্রমণের রা-টি কেড়ো নি। নিতান্তই যদি বাউণ্ডুলেপনা করতে হয় তবে কর, প্রাণভরে কর, সন্ন্যাস নেবার পর। এমন কী, বাণপ্রস্থ যাবে জনপদভূমির প্রত্যন্ত প্রদেশে। সে-অবস্থায়ও যত্রতত্র পর্যটন গর্হিত।

কিন্তু সন্ন্যাসের বাউণ্ডুলেগিরির প্রতি কর্তারা এত সদয় কেন? তার এক কারণ:

ভোগে রোগভয়ং, কুলে চ্যুতিভয়ং, বিত্তে নৃপাদ্‌ ভয়ং,
মানে দৈন্যভয়ং, বলে রিপুভয়ং, রূপে তরুণ্যা ভয়ং,
শাস্ত্রে বাদীভয়ং, গুণে খলভয়ং, কায়ে কৃতান্তাদ্‌ ভয়ং,
সর্ববস্তু ভয়ান্বিতং, ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ং॥

শুধু বৈরাগ্যেই অভয়। তাই শাস্ত্রকার বলেছেন, যে মুহূর্তে মনে বৈরাগ্যের উদয় হবে সেই মুহূর্তেই সন্ন্যাস গ্রহণ করে গৃহত্যাগ করবে। ব্রহ্মচর্য সমাপ্ত না করে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করা যায় না, গার্হস্থ্য সমাপন না করে বাণপ্রস্থ গ্রহণ

গর্হিত; কিন্তু সন্ন্যাস নেওয়া যায় যে-কোনও সময়ে—ডবল, ট্রিপ্‌ল প্রমোশন নিয়ে।

কিন্তু সন্ন্যাস নেওয়ার পর আর গৃহে ফিরতে পারবে না। সেইটেই হল সবচেয়ে বড় কথা এবং সেই দিকেই বিশেষ করে আমি আমার পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সন্ন্যাস গ্রহণের পর কোন জায়গাতেই তিন দিনের বেশী থাকবার নিয়ম নেই, এক বর্ষাকাল ছাড়া। বৌদ্ধ শ্রমণদেরও এই 'বিনয়'।

এর সূক্ষ্ম উদ্দেশ্য কী? সন্ন্যাস গ্রহণ করলে আত্মার কি প্রসার হয় না-হয় সে-সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করবার অধিকার আমার নেই; কিন্তু তাতে করে সমাজ ও সংস্কারের কী ক্ষতিবৃদ্ধি হয় সে সম্বন্ধে বলার অধিকার আমাদের মত সংসারীদের নিশ্চয় আছে।

আমার মনে হয়, সন্ন্যাস নিয়ে পর্যটন করুন, আর সন্ন্যাস না নিয়ে টুরিস্টের মত বাউণ্ডুলেপনা করুন, ফল একই। নানা দেশ নানা লোক, বহু সমাজবন্ধন, বহু উচ্ছৃঙ্খলতা, বিস্তর ধর্মাচার এবং ততোধিক চার্বাকাচরণ দেখে দেখে মানুষের চিত্তের প্রসার হয় বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই 'প্রসার'ই তাকে দেশের রীতিনীতি সম্বন্ধে একদিক দিয়ে করে দেয় নির্বিকল্প উদাসীন, অন্যদিক দিয়ে আপন মাটি আপন গ্রামের কল্যাণকামনায় নিস্পৃহ। ইংরেজীতে একেই বলে 'জেডেড', ফরাসীতে 'ব্লাজে'। এই অবস্থার কল্পনা করেই জার নিকোলাস বলেছিলেন, 'পরের বেদনা বুঝিতে না পারে, না ভাবে আপন সুখ'। গ্রাম্য ভাষায় একেই বলে 'দড়কচ্চা হয়ে "ল্যাদা" মেরে যাওয়া।'

এইসব 'ভবঘুরে'রা তখন আর সমাজের ভিতর আপন আসন গ্রহণ করে কর্তব্যাচরণে আত্মনিয়োগ করতে পারে না। প্রত্যেক সমাজেরই কতকগুলি অন্যায় বন্ধন থাকে, এককালে হয়ত সেগুলোর কোন অর্থ ছিল, এখন লোকে ভুলে গিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে আবার মুক্তির রন্ধ্রও থাকে। এ-দুয়ের টানাটানির মাঝখানের উত্তম পন্থাটি বের করার নামই সমাজ। আমাদের বাউণ্ডুলেটির কাছে দুটোই অর্থহীন। সে ঘোরাঘুরির ফলে দেখেছে বহু সমাজ, যেখানে অন্য বন্ধন, অন্য মুক্তি। দেশের সমাজের মূঢ়তা যেমন তাকে বিচলিত করতে পারে না, তার আদর্শবাদও তাকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে না। তাই পূর্বেই নিবেদন করেছি, সন্ন্যাসগ্রহণের পর স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন নিষিদ্ধ।

আর যদি ধ্যান-ধারণা সাধনা-তপস্যার কথা তোলেন, তবে তার পরম শত্রু দেশভ্রমণ। গ্যোটে বলেছেন, 'চরিত্রবল সৃষ্টি করতে হলে জনসমাজে মেশো, কিন্তু যদি প্রতিভার সম্যক প্রস্ফুরণ তোমার কামনা হয়, তবে সাধনা কর নির্জনে।'

আর আমাদের অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'ছবি দেখে যদি আমোদ পেতে চাও তবে আকাশে জলে-স্থলে প্রতি মুহূর্তে এত ছবি আঁকা হচ্ছে যে, তার হিসেব নিলেই সুখে চলে যাবে দিনগুলো—'

'আর যদি ছবি লিখে আনন্দ পেতে চাও তবে আসন গ্রহণ কর এক জায়গায়, দিতে থাক তুলির টানে রঙের পোঁচ। এ দর্শকের আমোদ নয়, স্রষ্টার আনন্দ।'

চতুর্দিকে নিজেকে বিক্ষিপ্ত বিকীর্ণ করে দিলে এ-আনন্দ পাওয়া যায় না॥

রসগোল্লা

'চুঙ্গিঘর' কথাটা বাংলা ভাষাতে কখনও খুব বেশী চালু ছিল না বলে আজকের দিনে অধিকাংশ বাঙালী যদি সেটা ভুলে গিয়ে থাকে, তবে তাই নিয়ে মর্মাহত হবার কোন কারণ নেই। ইংরেজীতে একে বলে 'কাস্টম্ হাউস', ফরাসীতে 'দুয়ান্', জর্মনে 'ৎসল্-আম্ট্', ফার্সীতে 'গুম্রুক' ইত্যাদি ইত্যাদি। এতগুলো ভাষাতে যে এই লক্ষ্মীছাড়া প্রতিষ্ঠানটার প্রতিশব্দ দিলুম তার কারণ আজকের দিনে আমার ইয়ার, পাড়ার পাঁচু, ভূতো সবাই সরকারী, নিম-সরকারী, মিন-সরকারী পয়সায় নিত্যি নিত্যি কাইরো-কান্দাহার প্যারিস-ভেনিস সর্বত্র নানাবিধ কনফারেন্স করতে যায় বলে, আর পাকিস্তান হিন্দুস্থান গমনাগমন ত আছেই। ওই শব্দটি জানা থাকলে তড়িঘড়ি তার সন্ধান নিয়ে আর পাঁচজনের আগে সেখানে পৌঁছতে পারলে তাড়াতাড়ি নিষ্কৃতি পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী। ওটাকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা কস্মিনকালেও করবেন না। বরঞ্চ রহমত কাবুলীকে তার হক্কের কড়ি থেকে বঞ্চিত করলে করতেও পারেন কিন্তু তার দেশের 'গুম্রুক্'টিকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করবেন না। 'কাবুলি-ওয়ালা' ফিল্ম আমি দেখি নি। রহমতও বোধ করি সেটাতে তার 'গুম্রুক্'কে এড়াবার চেষ্টা করে নি।

কেন ? ক্রমশ প্রকাশ্য।

ডাক্তার, উকিল, কসাই, ডাকাত, সম্পাদক (এবং সম্পাদকরা বলবেন, লেখক) এঁদের মধ্যে সক্কলের প্রথম কার জন্মগ্রহণ হয় সেকথা বলা শক্ত। যারই হোক, তিনি যে চুঙ্গিঘরের চেয়ে প্রাচীন নন সে-বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। মানুষে মানুষে লেনদেন নিশ্চয়ই সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়েছিল এবং সেই মুহূর্তেই তৃতীয় ব্যক্তি বলে উঠল, 'আমার ট্যাক্সোটা ভুলো না কিন্তু'—তা সে তৃতীয় ব্যক্তি গাঁয়ের মোড়লই হন, পঞ্চাশখানা গাঁয়ের দলপতিই হন, কিংবা রাজা অথবা

তাঁর কর্মচারীই হন। তা তিনি নিন, আমার তাতে কোন আপত্তি নেই, কারণ এযাবৎ আমি পুরনো খবরের কাগজ ছাড়া অন্য কোনও বস্তু বিক্রি করি নি। কিন্তু যেখানে দু পয়সা লাভের কোন প্রশ্নই ওঠে না, সেখানে যখন চুঙ্গিঘর তার না-হক্কের কড়ি না-হক চাইতে যায়, তখনই আমাদের মনে সুবুদ্ধি জাগে, ওদের ফাঁকি দেওয়া যায় কী প্রকারে ?

এই মনে করুন, আপনি যাচ্ছিলেন ঢাকা। প্যাক করতে গিয়ে দেখেন, মাত্র দুটি শার্ট ধোপার মারপিট থেকে গা বাঁচিয়ে কোন গতিকে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে। ইষ্টিশানে যাবার সময় কিনলেন একটি নয়া শার্ট। বাস্, আপনার হয়ে গেল। দর্শনা পৌঁছতেই পাকিস্তানী চুঙ্গিঘর হুলুধ্বনি দিয়ে দর্শনী চেয়ে উঠবে। তারপর আপনার শার্টটির গায়ে হাত বুলবে, মস্তক আঘ্রাণ করবে এবং শেষটায় ধৃতরাষ্ট্র যে-রকম ভীমসেনকে আলিঙ্গন করেছিলেন ঠিক সেই রকম বুকে জড়িয়ে ধরবে।

আপনার পাঁজর কখানা পটপট করতে আরম্ভ করেছে, তবু শুকনো মুখে চিঁচিঁ করে বলবেন, 'ওটা ত আমি নিজের ব্যবহারের জন্য সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। ওতে ত ট্যাক্স লাগবার কথা নয়।'

আইন তাই বলে।

হায় রে আইন! চুঙ্গিওলা বলবে, 'নিশ্চয় নিশ্চয়। কিন্তু ওটা যদি আপনি ঢাকাতে বিক্রি করেন ?'

তর্কস্থলে ধরে নিলুম, আপনার পিতামহ তর্কবাগীশ ছিলেন তাই আপনি মূর্খের ন্যায় তর্ক তুললেন, 'পুরনো শার্টও ত ঢাকাতে বিক্রি করা যায়।'

এই করলেন ভুল। তর্কে জিতলেই যদি সংসারে জিত হত তবে সক্রাতেসকে বিষ খেতে হত না, যীশুকে ক্রুশের উপর শিব হতে হত না।

চুঙ্গিওলা জানে, জীবনের প্রধান আইন, চুপ করে থাকা, তর্ক করার বদভ্যাসটি ভাল নয়। একেবারেই হয় না ওতে বুদ্ধিশক্তির চালনা।

কী যেন এক অজানার ধেয়ানে, দীর্ঘ অ্যারষ্ট্রিপের পশ্চাতের সুদূর দিকচক্রবালের দিকে তাকিয়ে বলবে, 'তা পারেন।'

তারপর কাগজ পেনসিল নিয়ে কী সব টরে-টক্কা করবে। তারপর বলবে, 'পনের টাকা।'

আপনার মনের অবস্থা আপনিই তখন জানেন—আমি আর তার কী বয়ান দেব। ব্যাপারটা যখন আপনার সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হল, তখন আপনি ক্ষীণতম কণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু ওই শার্টটার দামই ত মাত্র চার টাকা।'

চুঙ্গিওলা একখানা হলদে কাগজে চোখ বুলিয়ে নেবে। আপনি এটাতে দরখাস্ত করেছিলেন এবং নূতন শার্টটার উল্লেখ করেন নি। চুঙ্গিওলার কাছে তার সরল অর্থ, আপনি এটা স্মাগ্‌ল করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, পাচার করতে চেয়েছিলেন, হাতে-নাতে বেআইনী কর্ম করতে গিয়ে ধরা পড়লে তার জরিমানা দশ টাকা, জেলও হতে পারত, আফিং কিংবা ককেইন হলে—এ যাত্রা বেঁচে গেছেন।

সেই হলদে কাগজখানা অধ্যয়ন করে কোন লাভ নেই। কারণ তার প্রথম প্রশ্ন ছিল,

১। আপনার জন্মের সময় যে কাঁচি দিয়ে নাড়ি কাটা হয়েছিল, তার সাইজ কত ?

এবং শেষ প্রশ্ন,

২। আপনার মৃত্যুর সন ও তারিখ কী ?

আপনি তখন শার্টটির মায়া ত্যাগ করে ঈষৎ অভিমানভরে বললেন, 'তা হলে ওটা আপনারা রেখে দিন।'

কিন্তু ওইটি হবার জো নেই। আপনি ঘড়ি চুরি করে পেয়েছিলেন তিন মাসের জেল। ঘড়ি ফেরত দিলেই ত আর হাকিম আপনাকে ছেড়ে দেবে না। শার্ট ফেরত দিতে চাইলেও রেহাই নেই।

তখন শার্টটা চড়বে নিলামে। এক টাকা পেলে আপনি মহা ভাগ্যবান। জরিমানাটার অবশ্য নড়নচড়ন হল না।

ঢাকা থেকে ফিরে আসবার সময় ভারতীয় চুঙ্গিওলা দেখে ফেললে আপনার নূতন পেলিকান ফাউন্টেন পেনটি। কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করে লাভ নেই। আপনি ভাবলেন, ভারত এবং পাকিস্তান উভয়েই এ-কর্মে নূতন, তাই প্যাসেঞ্জারকে খামকা হয়রান করে। বিলেত-ফিলেতে বোধ হয় চুঙ্গিঘর টুরিস্টদের নিছক মনোরঞ্জনার্থে। তবে শুনুন।

আমার এক বন্ধু প্রায়ই ইউরোপ-আমেরিকা যান। এতই বেশী যাওয়া-আসা করেন যে, তাঁর সঙ্গে কোথাও দেখা হলে বলবার উপায় নেই, তিনি বিদেশ যাচ্ছেন না ফিরে আসছেন। ওই যে রকম ঢাকার কুট্টি গাড়ওয়ান এক ভদ্র-লোককে ভি-শেপের গেঞ্জি উল্টো পরে যেতে দেখে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কর্তা আইতেছেন, না যাইতেছেন ?'

তিনি নেমেছেন ইটালির ভেনিস বন্দরে জাহাজ থেকে। ঝাণ্ডু ব্যবসায়ী লোক। তাই চুঙ্গিঘরের সেই হলদে কাগজখানায় যাবতীয় প্রশ্নের সদুত্তর দিয়ে

শেষটায় লিখেছেন, 'এক টিন ভ্যাকুয়াম প্যাক্‌ড্ ভারতীয় মিষ্টান্ন। মূল্য দশ টাকা।' অস্কার ওয়াইল্ড যখন মার্কিন মুল্লুকে বেড়াতে গিয়েছিলেন, তখন চুঙ্গিঘর পাঁচজনের মত তাঁকেও শুধিয়েছিল, 'এনিথিং টু ডিক্লেয়ার ?' তিনি আঙুল দিয়ে তাঁর মগজের বাক্সটি বার কয়েক ট্যাপ করে উত্তর দিয়েছিলেন, 'মাই জিনিয়াস।' আমার পরিচিতদের ভিতর ওই ঝাণ্ডুদাই একমাত্র লোক, যিনি মাথা ত ট্যাপ করতে পারতেনই, সঙ্গে সঙ্গে হার্টটা ট্যাপ করলেও কেউ কোন আপত্তি করতে পারত না।

জাহাজখানা ছিল বিরাট সাইজের—ঝাণ্ডুদার বপুটি স্বচক্ষে দেখেছেন যাঁরা, তাঁরাই আমার কথায় সায় দেবেন যে, তাঁকে ভাসিয়ে রাখা যে-সে জাহাজের কর্ম নয়—তাই সেদিন চুঙ্গিঘরে লেগে গিয়েছিল মোহনবাগান ভর্সস ফিল্ম-স্টার-টীম ম্যাচের ভিড়। ঝাণ্ডুদা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। হঠাৎ মনে পড়ল ইতালির 'কিয়ান্তি' জিনিসটি বড়ই সরেস এবং সরস। চুঙ্গিঘরের কাঠের খোঁয়াড়ের মুখে দাঁড়িয়েছিল এক পাহারাওলা। তাকে হাজার লিরার একখানা নোট দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন কয়েক বোতল 'কিয়ান্তি' রাস্তার ওধারের দোকান থেকে নিয়ে আসতে। পাহারাওলা খাঁটি খানদানী লোকের সংস্পর্শে এসেছে ঠাহর করতে পেরে খাঁটি নিয়ে এল তিন মিনিটেই। পূর্বেই বলেছি ঝাণ্ডুদা জন্মেছিলেন তাগড়াই হার্ট নিয়ে—জাহাজের পরিচিত অপরিচিত তথা চুঙ্গিঘরের পাহারাওলা, সেপাই, চাপরাসী, কুলী সবাইকে 'কিয়ান্তি' বিলোতে লাগলেন দরাজ দিলে। 'স্বাস্থ্যপান' আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই ঝাণ্ডুদার ডাক পড়ে গেল চুঙ্গির কাউণ্টারে। মাল খালাসিতে তাঁর পালা এসে গেছে। নিমন্ত্রিত রবাহূত সব্বাইকে দরাজ হাত দুখানা পাখির মত মেলে দিয়ে বললেন, 'আপনারা ততক্ষণে ইচ্ছে করুন; আমি এই এলুম বলে।' 'কিয়ান্তি' রানীকে বসিয়ে রাখা মহাপাপ।

ঝাণ্ডুদার বাক্স-পেঁটরায় এত সব জাত-বেজাত হোটেলের লেবেল লাগানো থাকত যে, অগা চুঙ্গিওলাও বুঝতে পারত এগুলোর মালিক বাস্তুভিটার তোয়াক্কা করে না—তাই জীবন কাটে হোটেলে হোটেলে। আজকের চুঙ্গিওলা কিন্তু সেগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে আরম্ভ করলে, প্রথম ভাগের ছেলে যে-রকম বানান ভুল করে করে বই পড়ে। লোকটার চেহারা বদখত। টিঙটিঙে রোগা, গাল দুটো ভাঙা, সে-গালের হাড় দুটো জোয়ালের মত বেরিয়ে পড়েছে, চোখ দুটো গভীর গর্তের ভিতর থেকে নাকটাকে প্যাঁসনের মত চেপে ধরেছে, নাকের তলায় টুথব্রাশের মত হিটলারী গোঁপ। পূর্বেই নিবেদন করেছি, ঝাণ্ডুদা ঝাণ্ডু লোক, তাই তিনি মানুষকে তার চেহারা থেকে যাচাই করেন না। এবারে কিন্তু তাঁকেও

সেই নিয়মের ব্যভিচার করতে হল। লোকটাকে আড়চোখে দেখলেন, সন্দেহের নয়নে আমার কানে কানে বললেন, 'শেক্স্‌পিয়ার নাকি বলেছেন, রোগা লোককে সমঝে চলবে।' আমার বিশ্বাস, আজ যে শেকস্‌পিয়ারের এত নাম-ডাক সেটা ওই দিন থেকেই শুরু হয়—কারণ ঝাণ্ডুদা আত্মনির্ভরশীল মহাজন, কারও কাছ থেকে কখনও কানাকড়ি ধার নেন নি। তিনি ঋণ স্বীকার করাতে ওই দিন থেকে শেকস্‌পিয়ারের যশ-পত্তন হয়।

চুঙ্গিওলা শুধালে, 'ওই টিনটার ভিতর আছে কী?'

'ইণ্ডিয়ান সুইট্‌স।'

'ওটা খুলুন।'

'সে কী করে হয়? ওটা আমি নিয়ে যাব লণ্ডনে। খুললে বরবাদ হয়ে যাবে যে?'

চুঙ্গিওলা যে-ভাবে ঝাণ্ডুদার দিকে তাকালে তাতে যা টিন খোলার হুকুম হল, পাঁচশো ঢ্যাঁঢরা পিটিয়ে কোন বাদশাও ও-রকম হুকুম-জারি করতে পারতেন না।

ঝাণ্ডুদা মরীয়া হয়ে কাতর নয়নে বললেন, 'ব্রাদার, এ-টিনটা আমি নিয়ে যাচ্ছি আমার এক বন্ধু মেয়ের জন্য লণ্ডনে—নেহাতই চিংড়ি মেয়ে। এটা খুললে সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

এবারে চুঙ্গিওলা যে-ভাবে তাকালে, তাতে আমি হাজার ঢ্যাঁঢরার শব্দ শুনতে পেলুম।

বিরাট-লাশ ঝাণ্ডুদা পিঁপড়ের মত নয়ন করে সকাতরে বললেন, 'তাহলে ওটা ডাকে করে লণ্ডন পাঠিয়ে দাও, আমি ওটাকে সেখানেই খালাস করব।'

আমরা একবাক্যে বললুম, 'কিন্তু তাতে ত বড্ড খরচা পড়বে। পাউণ্ড পাঁচেক —নিদেন।'

হ্রস্বশ্বাস ফেলেই বললেন, 'তা আর কী করা যায়।'

কিন্তু আশ্চর্য, চুঙ্গিওলা তাতেও রাজী হয় না। আমরাও অবাক। কারণ এ-আইন ত সকলেরই জানা।

ঝাণ্ডুদা একটুখানি দাঁত কিড়মিড় খেয়ে লোকটাকে আইনটার মর্ম প্রাঞ্জল ভাষায় বোঝালেন। তার অর্থ টিনের ভিতরে বাঘ-ভাল্লুক ককেইন-হেরয়িন যা-ই থাক্, ও-মাল যখন সোজা লণ্ডন চলে যাচ্ছে তখন তার পুণ্যভূমি ইতালি ত আর কলঙ্কিত হবে না।

আমরা সবাই কসাইটাকে বোঝাবার চেষ্টা করলুম, ঝাণ্ডুদার প্রস্তাবটি অতিশয় সমীচীন এবং আইনসঙ্গতও বটে। আমাদের দল তখন বেশ বিরাট আকার ধারণ

করেছে। 'কিয়াস্তি'-রানীর সেবকের অভাব ইতালিতে কখনও হয় নি—প্রাচুর্য থাকলে পৃথিবীতেও হত না। এক ফরাসী উকিল কাইরো থেকে পোর্ট সঈদে জাহাজ ধরে—সে পর্যন্ত বিন্ ফীজে লেকচার ঝাড়লে। চুঙ্গিওলার ভাবখানা সে পৃথিবীর কোন ভাষাই বোঝে না।

ঝাণ্ডুদা তখন চটেছেন। বিড়বিড় করে বললেন, 'শালা, তবে খুলছি। কিন্তু ব্যাটা তোমাকে না খাইয়ে ছাড়ছি নে।' তারপর ইংরেজীতে বললেন, 'কিন্তু তোমাকে ওটা নিজে খেয়ে পরখ করে দেখতে হবে ওটা সত্যি ইণ্ডিয়ান সুঈট্‌স কিনা।'

শয়তানটা চট করে কাউন্টারের নীচে থেকে টিন-কাটার বের করে দিলে। ফরাসী বিদ্রোহের সময় গিলোটিনের অভাব হয় নি।

ঝাণ্ডুদা টিন-কাটার হাতে নিয়ে ফের চুঙ্গিওলাকে বললেন, 'তোমাকে কিন্তু ওই মিষ্টি পরখ করতে হবে নিজে, আবার বলছি।'

চুঙ্গিওলা একটু শুকনো হাসি হাসলে। শীতে বেজায় ঠোঁট ফাটলে আমরা যে-রকম হেসে থাকি।

ঝাণ্ডুদা টিন কাটলেন।

কী আর বেরবে? বেরল রসগোল্লা। বিয়ে-শাদিতে ঝাণ্ডুদা ভুরি ভুরি রসগোল্লা স্বহস্তে বিতরণ করেছেন—ব্রাহ্মণ-সন্তানও বটেন। কাঁটা-চামচের তোয়াক্কা না করে রসগোল্লা হাত দিয়ে তুলে প্রথমে বিতরণ করলেন বাঙালীদের, তারপর যাবতীয় ভারতীয়দের, তার পর আর সবাইকে অর্থাৎ ফরাসী, জর্মন, ইতালীয় এবং স্প্যানিয়ার্ডদের।

মাতৃভাষা বাংলাটাই বহুত তকলিফ বরদাস্ত করেও কাবুতে আনতে পারি নি, কাজেই গণ্ডা তিনেক ভাষায় তখন বাঙালীর বহু যুগের সাধনার ধন রসগোল্লার যে বৈতালিক গীতি উঠেছিল তার ফটোগ্রাফ দি কী প্রকারে?

ফরাসীরা বলেছিল, 'এপাতাঁ!'

জর্মনরা, 'ক্লর্কে!'

ইতালিয়ানরা, 'ব্রাভো!'

স্প্যানিশরা, 'দেলিচজো, দেলিচজো।'

আরবরা, 'ইয়া সালাম, ইয়া সালাম।'

তামাম চুঙ্গিঘর তখন রসগোল্লা গিলছে। আকাশে বাতাসে রসগোল্লা। কিউবিজ্‌ম বা দাদাইজ্‌মের টেক্‌নিক দিয়েই শুধু এর ছবি আঁকা যায়। চুঙ্গি-ঘরের পুলিস-বরকন্দাজ, চাপরাসী-স্পাই সক্কলেরই হাতে রসগোল্লা। প্রথমে ছিল

ওদের হাতে 'কিয়ান্তি', আমাদের হাতে রসগোল্লা। এক লহমায় বদলাবদলি হয়ে গেল।

আফ্রিকার এক ক্রিশ্চান নিগ্রো আমাকে দুঃখ করে বলেছিলেন, 'ক্রিশ্চান মিশনারিরা যখন আমাদের দেশে এসেছিলেন তখন তাঁদের হাতে ছিল বাইবেল, আমাদের ছিল জমিজমা। কিছুদিন বাদেই দেখি, ওঁদের হাতে জমিজমা, আমাদের হাতে বাইবেল।'

আমাদের হাতে 'কিয়ান্তি'।

ওদিকে দেখি, ঝাণ্ডুদা আপন ভুঁড়িটি কাউন্টারের উপর চেপে ধরে চুঙ্গিওলার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলছেন বাংলাতে—'একটা খেয়ে দেখ।' হাতে তাঁর একটি সরেস রসগোল্লা।

চুঙ্গিওলা ঘাড়টা একটু পিছনের দিকে হটিয়ে গম্ভীররূপ ধারণ করেছে।

ঝাণ্ডুদা নাছোড়বান্দা। সামনের দিকে আরেকটু এগিয়ে বললেন, 'দেখছ তো, সবাই খাচ্ছে। ককেইন নয়, আফিঙ নয়। তবু নিজেই চেখে দেখ, এ বস্তু কী।'

চুঙ্গিওলা ঘাড়টা আরও পিছিয়ে নিলে। লোকটা অতি পাষণ্ড। একবারের তরে 'সরি-টরি' ও বললে না।

হঠাৎ বলা-নেই-কওয়া-নেই, ঝাণ্ডুদা তামাম ভুঁড়িখানা কাউন্টারের উপর চেপে ধরে কঁ্যাক করে পাকড়ালেন চুঙ্গিওলার কলার বাঁ হাতে আর ডান হাতে থেবড়ে দিলেন একটা রসগোল্লা ওর নাকের উপর। ঝাণ্ডুদার তাগ সব সময়েই অতিশয় খারাপ।

আর সঙ্গে সঙ্গে মোটা গলায়, 'শালা, তুমি খাবে না। তোমার গুষ্টি খাবে। ব্যাটা, তুমি মস্করা পেয়েছ। পই পই করে বললুম, রসগোল্লাগুলো নষ্ট হয়ে যাবে, চিংড়িটা বড্ড নিরাশ হবে, তা তুমি শুনবে না'—আরও কত কী!

ততক্ষণে কিন্তু তাবৎ চুঙ্গিঘরে লেগে গিয়েছে ধুন্দুমার! চুঙ্গিওলার গলা থেকে যেটুকু মিহি আওয়াজ বেরুচ্ছে তার থেকে বোঝা যাচ্ছে সে পরিত্রাণের জন্য চাপরাসী থেকে আরম্ভ করে ইল্‌দুচে মুসোলিনী—মাঝখানে যত সব কনসাল, লিগেশন মিনিসটার, অ্যাম্বসেডর প্লেনিপটিনশিয়ারি—কারুরই দোহাই কাড়তে কসুর করছে না। মেরি মাতা, হোলি যিসস, পোপঠাকুর ত বটেনই।

আর চিৎকার-চেঁচামেচি হবেই না কেন? এ যে রীতিমত বে-আইনী কর্ম। সরকারী চাকুরেকে তার কর্তব্যকর্ম সমাধানে বিঘ্ন উৎপাদন করে তাকে সাড়ে তিনমণী লাশ দিয়ে চেপে ধরে রসগোল্লা খাওয়াবার চেষ্টা করুন আর সৈকো

খাওয়াবারই চেষ্টা করুন, কর্মটির জন্য আকছারই জেলে যেতে হয়। ইতালিতে এর চেয়ে বহুত অল্পেই ফাঁসি হয়।

ঝাণ্ডুদার কোমর জাবড়ে ধরে আমরা জনাপাঁচেক তাঁকে কাউন্টার থেকে টেনে নামাবার চেষ্টা করছি। তিনি পর্দার পর পর্দা চড়াচ্ছেন, 'খাবি নি, ও পরান আমার, খাবি নি, ব্যাটা—' চুঙ্গিওলা ক্ষীণকণ্ঠে পুলিসকে ডাকছে। আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে আমার মাতৃভূমি সোনার দেশ ভারতবর্ষের ট্রাঙ্ককলে যেন কথা শুনছি। কিন্তু কোথায় পুলিস? চুঙ্গিঘরের পাইক বরকন্দাজ ডাণ্ডা-বরদার, আস-সরদার বেবাক চাকর-নফর বিলকুল বেমালুম গায়েব! এ কি ভানুমতী, এ কি ইন্দ্রজাল!

দেখি, ফরাসী উকিল আকাশের দিকে দু হাত তুলে অর্ধনিমীলিত চক্ষে, গদ্-গদ কণ্ঠে বলছে, 'ধন্য পুণ্যভূমি ইতালি, ধন্য পুণ্যনগর ভেনিস্! এ-ভূমির এমনই পুণ্য যে হিদেন রসগোল্লা পর্যন্ত এখানে মিরাক্‌ল্ দেখাতে পারে। কোথায় লাগে 'মিরাক্‌ল্ অব মিলান,' এর কাছে—এ যে সাক্ষাৎ জাগ্রত দেবতা, পুলিস-মুলিস সবাইকে ঝেঁটিয়ে বার করে দিলেন এখান থেকে! ওহোহো, এর নাম হবে "মিরাক্‌ল্ দ্য রসগোল্লা।" '

উকিল মানুষ, সোজা কথা প্যাঁচ না মেরে বলতে পারে না। তার উচ্ছ্বাসের মূল বক্তব্য, রসগোল্লার নেমকহারামি করতে চায় না ইতালীয় পুলিস-বরকন্দাজরা। তাই তারা গা-ঢাকা দিয়েছে।

আমরা সবাই একবাক্যে সায় দিলুম। কিন্তু কে এক কাষ্ঠরসিক বলে উঠল, 'রসগোল্লা নয়, কিয়ান্তি।' আরও দু'চার পাষণ্ড তায় সায় দিলে।

ইতিমধ্যে ঝাণ্ডুদাকে বহু কষ্টে কাউন্টারের এদিকে নামানো হয়েছে। চুঙ্গিওলা রুমাল দিয়ে রসগোল্লার থ্যাবড়া মুছতে যাচ্ছে দেখে তিনি চেঁচিয়ে বললেন, 'ওটা পুছিস নি; আদালতে সাক্ষী দেবে—ইগজিবিট্ নাম্বার ওয়ান।'

ওদিকে তখন বেটিং লেগে গিয়েছে, ইতালিয়ানরা 'কিয়ান্তি' পান করে, না রসগোল্লা খেয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে? কিন্তু ফৈসালা করবে কে? তাই এ-বেটিঙে রিস্‌ক্ নেই। সবাই লেগে গিয়েছে।

কে একজন ঝাণ্ডুদাকে সদুপদেশ দিলে, 'পুলিস টুলিস ফের এসে যাবে। ততক্ষণে আপনি কেটে পড়ুন।'

তিনি বললেন, 'না, ওই যে লোকটা ফোন করছে। আসুক না ওদের বড় কর্তা।'

তিন মিনিটের ভিতর বড় কর্তা ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন। ফরাসী

উকিলের বোধ হয় সবচেয়ে বড় যুক্তি ঘুষ। এক বোতল 'কিয়াস্তি' নিয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। ঝাণ্ডুদা বাধা দিয়ে বললেন, 'নো।'

তারপর বড় সাহেবের সামনে গিয়ে বললেন, 'সিন্নোর, বিস্কো ইউ প্রসীড, অর্থাৎ কিনা ময়না তদন্ত আরম্ভ হওয়ার পূর্বে আপনি একটি ইণ্ডিয়ান সুঈট্‌স্ চেখে দেখুন।' বলে নিজে মুখে তুললেন একটি। আমাদের সবাইকে আরেক প্রস্থ বিতরণ করলেন।

বড় কর্তা হয়ত অনেক রকমের ঘুষ খেয়ে ওকিবহাল এবং তালেবর। কিংবা হয়ত কখনও ঘুষ খাননি। 'না বিইয়ে কানাইয়ের মা' যখন হওয়া যায় এবং স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র যখন এ-প্রবাদটি ব্যবহার করে গেছেন তখন 'ঘুষ না-খেয়েও দারোগা' ত হওয়া যেতে পারে।

বড় কর্তা একটি মুখে তুলেই চোখ বন্ধ করে রইলেন আড়াই মিনিট। চোখ বন্ধ অবস্থায়ই আবার হাত বাড়িয়ে দিলেন। ফের। আবার।

এবারে ঝাণ্ডুদা বললেন, 'এক ফোঁটা কিয়াস্তি ?'

কাদম্বিনীর ন্যায় গম্ভীর নিনাদে উত্তর এল, 'না। রসগোল্লা।'

টিন তখন ভোঁ-ভোঁ।

চুঙ্গিওলা তার ফরিয়াদ জানালে।

কর্তা বললেন, 'টিন খুলেছ ত বেশ করেছ, না হলে খাওয়া যেত কী করে ?' আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কী করতে ? আরও রসগোল্লা নিয়ে আসুন।' আমরা সুড় সুড় করে বেরিয়ে যাবার সময় শুনতে পেলুম, বড় কর্তা চুঙ্গিওলাকে বলছেন, 'তুমিও ত একটা আস্ত গাড়ল। টিন খুললে আর ওই সরেস মাল চেখে দেখলে না ?'

'কিয়াস্তি না রসগোল্লা' সে-বেটের সমাধান হল।

ইতালির প্রখ্যাতা মহিলা-কবি ফিলিকাজা গেয়েছেন,

> 'ইতালি, ইতালি, এত রূপ তুমি কেন ধরেছিলে, হায়।
> অনন্ত ক্লেশ লেখা ও-ললাটে নিরাশার কালিমায়।'

আমিও তাঁর স্মরণে গাইলুম,

> রসের গোলক, এত রস তুমি কেন ধরেছিলে, হায়।
> ইতালির দেশ ধর্ম ভুলিয়া লুটাইল তব পায় !!

চাপরাসী ও কেরানী

কিছুদিন পূর্বে বক্তৃতা দেবার সময় পণ্ডিতজী বলেন, চাপরাসীদের মাইনে মাস্টারদের চেয়ে বেশী কিংবা ওই ধরনের কিছু একটা। আমার ঠিক মনে নেই। তার জন্য পণ্ডিত সম্প্রদায় আমার অপরাধ নেবেন না। বিবেচনা করে দেখলে তাঁরা বুঝতে পারবেন, আমি তাঁদের উপকারই করেছি। কারণ পণ্ডিতজীর সব কথা বিশেষ করে তাঁর সব শপথ এবং প্রতিজ্ঞা সর্বসাধারণ স্মরণ রাখলে বড় বিপদ হত। আমার মত কোন কোন আহাম্মুক এখনও ভুলতে পারে নি, পণ্ডিতজী স্বরাজলাভের উষাকালে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তিনি কালোবাজারীদের ল্যাম্পপোস্টে ঝোলাবেন। কেউ যদি কাউকে ওই ভাবে ঝুলে থাকতে দেখে থাকেন, তবে দয়া করে জানাবেন। দৃশ্যটি নয়নাভিরাম না হলেও প্রাণাভিরাম। একটু তাড়াতাড়ি জানাবেন। কারণ আমার জীবন-সায়াহ্ন আসন্ন।

অতএব, পণ্ডিতজী প্রাতঃস্মরণীয় বটেন, কিন্তু তাঁর বচনামৃত প্রাতঃস্মরণীয় নয়।

খয়ের। বাংলা 'খয়ের' নয়, উর্দু 'খয়ের'। তার অর্থ 'তা সে যাকগে'। এই উর্দু 'খয়ের'টি এই বেলাই একটু ভাল করে শিখে নিন। বিস্তর 'ফায়দা ওঠাতে' পারবেন। বুঝিয়ে বলি।

উর্দুওয়ালারা দেশ সম্বন্ধে বক্তৃতার আরম্ভেই শুরু করেন তার দুঃখ-কাহিনীর বর্ণনা দিয়ে। আমরা খেতে পাই নে, পরবার কিছু নেই, আশ্রয় জোটে না, শিক্ষার ব্যবস্থা হয় নি, মেয়েরা গর্ভযন্ত্রণায় মারা যায়, ডাক্তারবদ্যির ব্যবস্থা হল না, ইত্যাদি ইত্যাদি।' আমরা তখন উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করি, এইবারে বুঝি দেশের কর্ণধাররা বাতলে দেবেন, তাঁরা এ সব বালাই-আপদ দূর করবার জন্য কী সব পরিপাটী ব্যবস্থা করেছেন, দেশের কোন্ কোন্ জায়গায় এ সব অভাব-অনটন তাঁদের সম্মার্জনী-সঞ্চালনে দূরীভূত হয়েছে, এইবারে আমাদের সবুরের মেওয়া ফলবে কবে, এই ধরনের কোন কিছু।

বারমাস্যা শেষ হওয়ার পর বক্তা দম নেবেন। চতুর্দিকে সূচীভেদ্য নৈঃস্তব্ধ্য। আমরা কান পেতে আছি, এইবার শুনতে পাব, 'চাপানে'র 'ওতর', এইবারে শুরু হবে উল্টো 'বারমাস্যা', এইবারে আরম্ভ হবে আমাদের আশার বাণী, ভবিষ্যতের সুখস্বপ্ন।

ও হরি। কোথায় কী ?

শুনতে পাবেন, বক্তা গুরুগম্ভীর নিনাদে একটি কথা বললেন, সেটি 'খ য়ে র'। মানে ? এর অর্থটা ত তাহলে বুঝতে হয়। কারণ ইতিমধ্যে বক্তা 'চাপানের

ড্রাই ফার্মিং' কিংবা 'জান্‌জিবারের কো-অপারেটিভ সিস্টেমে' চলে গিয়েছেন। তা হলে নিশ্চয়ই ও 'খয়ের' শব্দে তাবৎ সমস্যার সমাধান ঘাপটি মেরে বসে আছে। ওঁ-তে যে রকম হিন্দুর ব্রহ্ম লাভ, ক্রুশে যে রকম খ্রীশ্চানের গড লাভ। 'সকলং হস্ততলং শব্দমাত্রেণ যদি অর্থধনং কোঽপি লভেৎ।'

এইবারে 'খয়ের'-কলমার গুহ্য অর্থ শোনার পূর্বে ভাল ডাক্তারকে দিয়ে হার্টটি দেখিয়ে নিন। শক্‌-টি মারাত্মক রকমের হবে ; ছাপাখানায় সদ্‌ব্রাহ্মণও আছেন। আর কেউ না পড়লেও তাঁরা বাধ্য হয়ে আমার লেখা কম্পোজ করেন, প্রুফ দেখেন। অকালে ব্রহ্মহত্যা করলে লোক-সভায়ও আমার ঠাঁই হবে না।

'খয়ের' কথার সাদামাটা প্লেন 'নির্ভেজাল' অর্থ, 'তা সে যাক্‌গে—অন্য কথা পাড়ি'। অর্থাৎ এতক্ষণ আপনি যে সব দুঃখ-কাহিনীর ফরিয়াদ-প্রতিবাদ আগড়ম্‌-বাগড়ম্‌ যা কিছু বলেছেন, তার উত্তর দেবার দায় আর আপনার রইল না। আপনি এখন কালীঘাট, মৌলা আলী সর্বত্রই লম্ফ ঝম্প দিতে পারেন। কারণ 'খয়ের' শব্দের প্রসাদাৎ আপনি আপনার পুচ্ছটি ইতিমধ্যে কপাত করে কর্তন করে ফেলেছেন।

'খয়ের' বাক্যের শব্দার্থ আরবী ডিক্‌শনারি ঘেঁটে বের করেও পুলি-পিঠের ন্যাজ গজাবে না। ওতে পাবেন 'খয়ের' অর্থ 'উত্তম', 'শিব', 'মঙ্গল'। তবে কি বক্তা যে গোড়ার দিকে ফুল্লরার বারমাস্যা গেয়েছিলেন সেটা 'ভাল' ?

না। আমরা অর্থাৎ বাঙালীরাও এ-রকম জায়গায় 'উত্তম' বলে থাকি, কিন্তু বিপরীত অর্থে। আমাদের পণ্ডিতগণ কোনও কিছুর সুদীর্ঘ অবতারণা করার পর সর্বশেষে বলেন, 'উত্তম প্রস্তাব'। তার অর্থ এই নয়, 'এতক্ষণ যা বললুম সে সব খুব ভাল জিনিস'—তার সরল অর্থ, 'এ-দিককার কথা বলা হল, এবার অন্য পক্ষের বক্তব্য নিবেদন করছি এবং সেইটেই আমার বক্তব্য এবং তাতেই পাবেন প্রশ্নের সমাধান, রহস্যের মীমাংসা।'

'খয়ের'-এর এরূপ ব্যবহারকে ফার্সীতে বলা হয়, 'তাকিয়া-ই-কালাম'—'কথার' (কালামের) 'বালিশ' (তাকিয়া)। অর্থাৎ যে কথার উপর ভর করে নিশ্চিন্ত মনে গা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়তে পারেন ! বিপক্ষ রা'টি কাড়তে পারবে না, আপনি কেল্লা ফতেহ করে দিয়েছেন, ভাগ্যিস, আপনি, মোকামাফিক 'খয়ের' শব্দটি প্রয়োগ করতে জানতেন, 'রাখে খয়ের মারে কে ?'

মুসলমানরা নাকি এদেশের মন্দির ভেঙেছে, পার্ক সার্কাসে শিককাবাব চালিয়েছে, ইদানীং নূতন শুনছি, খামখেয়ালিতে খেয়াল আমদানি করে ধ্রুপদ-ধামার বরবাদ করেছে। করেছে ত করেছে, তাই বলে কি উম্মাভরে গোস্‌সা-

ঘরে এখনও খিল দিয়ে বসে রইবেন ? গড়ের মাঠে গিয়ে রাষ্ট্রভাষায় (কটকে আমার বৃদ্ধ বাঙালী কেরানী সরকারী ইশ্‌তিহার পড়ে ভীত কণ্ঠে আমাকে শুধিয়েছিল 'আমাকেও লোষ্ট্রভাষা শিখতে হবে নাকি, স্যার ?') কী ভাবে 'খয়ের' শব্দের সুষ্ঠু প্রয়োগ করতে হয়, সেটি শিখবেন না ? ওইটে ঠিকমত, তাগমাফিক, বাংলায় 'এস্‌তেমাল' করতে পারলে পাড়ার তর্কবাগীশ, তাকিয়া (-ই-কালামের)-র কল্যাণে তর্কবালিশ হতে কতক্ষণ ?

চিন্তা করে দেখুন, 'খয়ের' শব্দের কত গুণ ! রাষ্ট্রভাষা হিন্দী তাঁর শব্দভাণ্ডার থেকে লাথি ঝাঁটা মেরে তাবৎ আরবী-ফার্সী শব্দ বের করে দিচ্ছেন—কারণ হিন্দী বাংলার তুলনায় অনেক ধনী (!) কিনা—কিন্তু কই, 'খয়ের' শব্দটি তাড়াবার প্রস্তাব ত কেউ করে না। কট্টর কান-কাটা হিন্দীতে 'ভারতওয়ার্ষকী উন্নতি ঔর সোওয়াধীন্তা, গড়তন্তর ঔর সামওয়াদ' ইত্যাদি 'কঠন্ কঠন্' (কঠিন কঠিন) সমস্যায়েঁ নির্মাণ করার পর সে-ইন্দ্রজাল তাঁরা ছিন্নভিন্ন করেন কোন মোহমুদ্গরে ? সেই সনাতন—রাম ! রাম !—সেই যাবনিক, ম্লেচ্ছ খ-য়ের দ্বারা। এবং সেই 'খয়ের'-এর 'খ'ও উচ্চারণ করেন অ্যাসন্ ঘর্ষণ দ্বারা যে শুনে মনে হয় বড়ী মসজিদের সামনে জাকারিয়া স্ট্রীটে কাবলীওলা 'খ' উচ্চারণ করার ছলে গলা সাফ করছে। কোথায় লাগে তার কাছে স্কচ 'লখ্' শব্দের 'খ', জর্মন 'বাখ' শব্দের ওই একই ব্যঞ্জন ?

মুসলমানরা মন্দির ভেঙে অতিশয় অপকর্ম করেছে, কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই রাগে 'খয়ের' শব্দের যে বিরাট বালাখানা তৈরি করে দিলে তার উপরে বসে হাওয়া খাবেন না ?

শুধু মন্দ দিকটাই দেখবেন, ভাল দিকটা দেখবেন না ?

তবে একটা গল্প শুনুন।

হয়ত অনেকেই শুনেছেন, তাঁরা অপরাধ নেবেন না। কারণ, বিবেচনা করে দেখুন, পুরনো গল্পের পুনরাবৃত্তি না করলে সেটি বেঁচে থাকবে কী করে ? মহাভারতের গল্প সবাই জানে, তাই বলে কি আমরা মহাভারতের চর্চা বন্ধ করে দিয়েছি ?

খয়ের।

গল্পটা কমিয়ে-সমিয়ে বলছি।

কালীঘাটের মন্দিরের সামনে দিয়ে যেতে গিয়ে এক ভদ্রসন্তানের হৃদয়ে ধর্ম-ভাবের উদয় হল। মন্দিরে ঢুকে পাণ্ডাকে ডেকে যথারীতি যাবতীয় পূজো-পাটা করালে এবং শেষটায় উত্তম দক্ষিণা পেয়ে পাণ্ডা ভদ্রসন্তানের কপালে ইয়া

একখানা খাসা তিলক কেটে দিল। বহর আর চেহারা দেখে মনে হয় ওই দিয়ে লাইটনিং কণ্ডক্টরের কাজ অনায়াসে চালানো যায়। দেখলেই ভক্তি হয়। গড় হয়ে পেন্নাম করতে ইচ্ছে যায়। ভক্তিতে গদগদ হয়ে 'তারা ব্রহ্মময়ী মা, বজ্র-যোগিনী মা' ইত্যাদি জপ করতে করতে ভদ্রসন্তান বাড়িমুখো হল।

কিন্তু হায়, সংসারে কত না সর্বজনীন অনাচার, রঙিন প্রলোভন। হবি ত হ, কিছুদূর যেতে না যেতে পথে পড়ল বাহারে একখানা 'বার'। সেদিন ছিল মঙ্গলবার, ড্রাই ডে, শরাব বারণ, তাই ভদ্রসন্তান প্রলোভনের ভয় নেই জেনে সে-পথ নিয়েছিল, কিন্তু বিধি বাম, বড়দিন না কিসের যেন জব্বর পরব ছিল বলে 'ইস্পিশেল' কেস হিসাবে 'বার' খোলা।

এখন এগোই কী প্রকারে? ভদ্রসন্তানের রাস্তায় এগোবার কথা হচ্ছে না। আমি গল্পটা নিয়ে এগোই কী প্রকারে? পাঠকরা জীবনে একটিমাত্র অপকর্ম করে থাকেন, সেটি আমার রচনাপঠন। তাঁদের আমি অধর্মের কাহিনী শোনাই কী করে? কিন্তু তাঁরা যখন এতাবৎ এতখানি দয়া করেছেন তখন গোপাল-ভাঁড়ের মা-কালীর মত জোড়া মোষ থেকে নেমে নেমে শেষ পর্যন্ত দুটো বুনো ফড়িং নিজেই ধরে খেতে রাজী হবেন—এই আমার ভরসা।

পাঁট। ইংরেজীবাগীশ ছোঁড়ারা বলে 'পাইণ্ট'। তিন কোয়াটার খেতে না খেতেই হয়ে গেল। রঙিন পাখনায় ভর করে সে পুনরায় নামল রাস্তায়। কোয়াটারটুকু ফেলা যাবে বলে বোতলটা পকেটে—বোতলবা সিনীর সেবকেরা বরঞ্চ জীবনের বেটার-হাফকে বিসর্জন দিতে রাজী আছে, ওই 'ব্যাড' কোয়াটারকে নয়।

যেতে যেতে পথে পূর্ণিমা রাতে চাঁদ উদয় হয়েছিলেন কি না বলতে পারব না, কারণ আমি জ্যোতির্বিদ নই। তবে উদয় হলেন পাড়ার মৈত্রমশাই, নিষ্ঠাবান সদাচারী ব্রাহ্মণ, কালেভদ্রে বাড়ি থেকে বেরন। এক মৈত্র মিনার্ভা থিয়েটার কোথায় জেনেও বলেন নি। ইনি কিন্তু বোতল দেখে বললেন, 'পাষণ্ড মাতাল।'

পকেটে বোতল থাকলেই, এমন কী সঙ্গে সঙ্গে টলটলায়মান হলেই মানুষ মাতাল হয় না। কিন্তু মৈত্রমশাই ন্যায়শাস্ত্রের চর্চা করতেন। তাতে আছে,—

১। দেবদত্ত বিরাট লাশ।

২। দেবদত্তকে দিনের বেলায় কেউ কখনও ভোজন করতে দেখে নি।

অতএব, দেবদত্ত রাত্রে খায়।

এটাকে বলে নলেজ বাই ইনফারেন্স্।

আমাদের ভদ্রসন্তান সচরাচর কথা কাটাকাটি করে না। কিন্তু দ্রব্যগুণ

অনস্বীকার্য। বেদনাভরা কণ্ঠে, গদগদ ভাষে করুণ নয়নে শুধু বললে, 'মৈত্র মশাই, বোতলটাই শুধু দেখলেন, তিলকটা দেখলেন না।'

মন্দির ভাঙাটাই শুধু দেখলেন, 'খয়ের'টা শুনলেন না।

আমার অনেক পাঠক আমাকে বাচনিক এবং পত্র দ্বারা মাঝে মাঝে জানান যে, আমার কোন কোন গল্প তাঁরা বন্ধু-মিলনে ব্যবহার করে থাকেন। আমি শুনে বড় উল্লাস বোধ করি। কারণ পাণ্ডিত্য বিতরণ করার শক্তি মুর্শিদ আমাকে দেন নি। আমি বিদুর, যা পারি তাই দি। তাঁরা হয়ত বলবেন, এ-গল্পটা সর্বত্র বলা যাবে না। তাই তাদের জন্য একটা গার্হস্থ্য সংস্করণ নিবেদন করছি। ইটি অনায়াসে পুত্র-কন্যার হাতে দিতে পারবেন।

ঢাকার কুট্টি গাড়োয়ানের গল্প। কুট্টি বসে আছে ছ্যাকরা গাড়ির কোচবাক্সে। বাবু জামাজোড়া পরে উপর থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামছেন। পা গেল হড়কে। বহুতর ধাক্কা আর গোত্তা খেয়ে খেয়ে বাবু গড়িয়ে পৌঁছলেন নীচে। তিন লম্ফে কুট্টি কোচবাক্স থেকে নেমে কর্তাকে কোলে তুলে নিলে। সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দরদ ভরা কণ্ঠে কয়, 'অহো-হো, কত্তার বড় লাগছে। আহা-হা-হা, এইহানে লাগছে, এ হে-হে-হে, ওইহানে লাগছে।' গা বুলোয় আর আদর করে, আদর করে আর গা বুলোয়। শেষটায় কিন্তু সান্ত্বনা দিয়ে বললে, 'কিন্তু কত্তা আইছেন জল্‌দি।'

জখম-চোটের কথাই শুধু ভাবছ, তাড়াতাড়ি যে এসেছে সেটা দেখছ না।

কিন্তু কেরানী আর চাপরাসীদের কী হল?

খয়ের।

•

চাপরাসীদের মাইনে কোতওয়ালের মত হোক সেই আমার প্রার্থনা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চাপরাসীদের কাছে নিবেদন, কোতওয়ালের মাইনে যেন কমে গিয়ে চাপরাসীদের আজকের মাইনেতে না দাঁড়ায়। আমার বাসনা, সকলেরই যেন কোটালের মাইনে হয়—অর্থাৎ আই-জি-র মাইনে হয়। আমি ধনী হব, তুমি ধনী হবে, সবাই ধনী হবে—এই হল সত্যকার প্রার্থনা। ঋষি যখন বিশ্বজনকে আহ্বান করে জানিয়েছেন সকলেই অমৃতের পুত্র তখন ওই সত্যই ঘোষণা করেছেন। পাঁড় কমিউনিস্টও ওই আদর্শের জন্য লড়ে। পৈতিরা বলে, 'মজদুর ভাইরা শুধু সোনার খাটে বসে রুপোর শানকি থেকে দু হাত ভরে গুড় খাবে এবং

আর সবাই রাস্তায় পাথর ভাঙবে।' এটা কোন কাজের কথা নয়। আমাদের পণ, আমরা সবাই রাজা হব।

কিন্তু বেদান্তের এই অতি প্রাচীন সত্যটি পুনরায় জানাবার জন্য আমি এ-প্রবন্ধের অবতারণা করি নি। মূল কথায় ফিরে যাই।

মনে করুন, আপনি দিল্লির কোনও সরকারী দফতরে কাজ করেন। সেখানে গেলে না করেও উপায় নেই। কেন নেই; সে কথা পরে হবে। বিশ্বাস না হয়, ১৯৪৭ সনের একখানি টেলিফোন ডাইরেক্টরির সঙ্গে ১৯৫৭ সনের খানার তুলনা করে দেখুন, চাকুরের সংখ্যা কত গুণ বেড়েছে। ওখানে একদিন রুটিওলা আণ্ডাওলা আর থাকবে না—এই আমার বিশ্বাস।

আপনার চাপরাসী চৈতরাম কিংবা ব্রিজমোহন ৯৫৲ মাইনে পায়। কেরানী বোধ হয় ১১৫৲ পায়। আমি লেটেস্ট খবর দিতে পারব না—তবে অনুপাতটা মোটামুটি এই। অঙ্কশাস্ত্র এস্থলে বলবে, 'অতএব চাপরাসী কেরানীর চেয়ে বিশ টাকা কম পায়।' ওই করলেন ভুল। শুনুন।

আপনি চৈতরামকে ঘন্টি বাজিয়ে বললেন, 'যাও ত চৈতরাম, এক পাকিট গোল্ডফ্লেক নিয়ে এস।'

সরকারী আইন অনুসারে চৈতরাম অনায়াসে বলতে পারে, 'আমি যাব না। আমি মাইনে পাই সরকারী কাজের জন্য। আপনার জন্য সিগরেট আনা সরকারী কাজ নয়।' আপনি কিচ্ছু বলতে পারবেন না। বলা উচিতও নয়।

কিন্তু চৈতরাম তা বলবে না। সে ভদ্রলোক। তদ্দণ্ডেই বলবে, 'বৃহৎ (উচ্চারণ 'বোহৎ') আচ্ছা, হুজুর।' এবং লম্ফ দিয়ে এমন তীরবেগে বেরিয়ে যাবে যে, আপনি মনে মনে শাবাশি দিয়ে বলবেন, 'সোনার চাঁদ ছেলে, কী স্মার্ট!'

এক মিনিটের ভিতর চৈতরাম আপনার টেবিলের উপর প্যাকেটটা রাখবে। সিগরেটের দোকানে আসতে-যেতে পনের মিনিট লাগার কথা। কী করে হল?

চৈতরাম ডাইনের বুক পকেটে রাখে গোল্ডফ্লেক, বাঁয়ের পকেটে ক্যাপস্টান, পাতলুনের পকেটে রেড অ্যাণ্ড হোয়াইট, মেপোল ইত্যাদি। নিতান্ত কর্কশ ব্যবসায়ী হিসাবে সে পরিচয় দিতে চায় না বলে, বারান্দায় গিয়ে পকেট থেকে প্যাকেটটি বের করে এনেছে। আসলে সিগরেট বিক্রয় চৈতরামের উটকো ব্যবসা। ঠিকমত নোটিস দিলে সে আপনাকে বলকান্ সবরনী সিগরেটও এনে দিতে পারে। ও-মাল সুদ্ধমাত্র এম্বেসিগুলোর ক্যান্টিনে পাওয়া যায়।

আইন বলে, সরকারী চাকুরির সঙ্গে সঙ্গে অন্য ব্যবসা করতে পারবে না।

কিন্তু আপনি যখন পুরনো খবরের কাগজ বিক্রি করলে সরকার আপনাকে ছুড়ো দেয় না, তখন চৈতরামের সিগরেট বিক্রিতে দোষ কী? কিছু না। আমি তাকে আশীর্বাদ জানাচ্ছি, তার ব্যবসা বাড়ুক।

কিন্তু কেরানী এ-ব্যবসা করতে পারে না। কে কত মাইনে পায়, এ-কথা এখন আর তুলবেন না। সিগরেট বিক্রি করে এখন চৈতরাম কেরানীর মাইনে ছাড়িয়ে গিয়েছে। এই হল আরম্ভ।

প্রায়ই আপনি লক্ষ্য করেন, দশটা থেকেই চৈতরাম টুলের উপর ঢোলে। তার মানে অবশ্য এ নয় যে, ডাকলে তার সাড়া পাবেন না। বরঞ্চ ঘন্টি বাজার সঙ্গে সঙ্গেই সে দর্শন দেওয়াতে কখনও গাফিলতি করে নি। একদিন আমি তাকে শুধালুম তার ইন্‌সম্‌নিয়া আছে কি না। সে মাথা নিচু করে ঘাড় নেড়ে শুধু জানালে, 'না।' হেড ক্লার্ক ওই সময় আমার ঘরে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর ঠোঁটের কোণে একটুখানি মৃদু হাস্যের রেখা দেখতে পেলুম। পরে তাঁকে শুধালুম, 'ব্যাপারটা কী?'

নাঃ! চৈতরাম প্রতি রাত্রে অভিসারে বেরয় না—যদিও তার যমুনা-পারে বাস এবং পিতৃপিতামহের সাবেক মোকাম বৃন্দাবন এবং মথুরার মাঝখানে। নাঃ! 'বৃন্দাবনকে কুন্‌জ্‌-গলিয়ে শ্যামরিয়া কা দরসন' ইত্যাদি যাবতীয় সমুদায় ব্যাপার সে মায়ের গব্ব থেকেই শুনে আসছে, ও-সব রোমান্‌সে তার কোনও চিত্তদৌর্বল্য নেই।

সে করে অতিশয় গন্ধময়ী ব্যবসা। খবরের কাগজ বেচে। সাতটার ভিতর ওই কর্ম শেষ হয়ে যায় বলে সরকারী চাকরির সঙ্গে এতে ওতে কোনও দ্বন্দ্ব বাধে না। দুধের ব্যবসাও আটটার ভিতর শেষ হয়ে যায় বলে এককালে তাও করেছে। এখন নাকি ভাবছে, দুটোই কম্বাইন করা যায় কি না। চোর পালিয়ে যাওয়াতে বাবু তম্বি করে দরওয়ানকে পুছেছিলেন, 'চোর ভাগা কিওঁ?' দরওয়ান বললে, 'মেরা এক হাথ মে তলওয়ার, দুস্‌রেমে ঢাল; পক্‌ড়ে কৈসে?' চৈতরাম তাকে ছাড়িয়ে যাবে। তার এক হাথমে দুধ, দুস্‌রেমে পাইপর (পেপার) এবং সঙ্গে সঙ্গে সে নৌকরিকেও পাকড়ে ধরে থাকবে।

এইবারে চিন্তা করুন, চৈতরামের আয় কতখানি বেড়ে গেল। কেরানী বেচারি ত আর সকালবেলা দুধ কিংবা খবরের কাগজ বিক্রি করতে পারে না। সমাজে মুখ দেখাবে কী করে? পারে টুইশানি করতে। কিন্তু সেখানকার কম্পিটিশন কী রকম মারাত্মক, সে-কথা আপনারা না জানতে পারেন, আমি বিলক্ষণ জানি—বেকার হওয়ার পরের থেকে এই আট মাস ঘুরে ঘুরে একটাও

যোগাড় করতে পারি নি। অধম কুলীন সন্তান—এর চেয়ে অনেক অল্লায়াসে পাঁচটি বিয়ে করতে পারতুম। চারটি আইনত—'হিন্দু কোড-বিল' আমার উপর অর্সায় না।

হেড ক্লার্ক আপনাকে বলবেন, 'স্যর, আপনি যে চাপরাসীদের য়ুনিফর্মের জন্য দরদ দিয়ে পার্সনাল ইন্‌ট্রেস্ট নেন, সে বড় ভাল কথা। কিন্তু স্যর, এদের য়ুনিফর্ম ছেঁড়ে সরকারী ফাইল এ-ঘর থেকে ও-ঘর নিয়ে যাবার সময় নয়, ছেঁড়ে বাইসিকলের সেডলে বসে দুধ বিক্রি করার ফলে। চাপরাসীদের পাতলুন দেখে বলে দেওয়া যায়, সকাল বেলা কে কোন্ ব্যবসা করে।'

ভুলে গিয়েছিলুম, য়ুনিফর্মের সাফসুতরায়ের জন্য চৈতরাম সরকারের কাছ থেকে 'ওয়াশিং অ্যালাওয়েন্‌স্' পায়। অবশ্য একদিন ক্যাসওয়েল লীভ নিলে সেদিনের জন্য অ্যালাওয়েন্‌স্‌টি কাটা যায়। অ্যাকাউন্টেন্টের অর্ধেক সময় যায় পাঁচ টাকাকে একত্রিশ ভাগ করে দুই কিংবা তিন দিয়ে গুণ করার খেজালতী কর্মে—আপনাদের মোটা মাইনের হিসেব রাখতে নয়। এই 'ওয়াশিং অ্যালাওয়েন্‌স্ শীট'খানা ঠিকমত টানতে পারেন ক'টি ঝানু অ্যাকাউন্টেন্ট, তাই নিয়ে বিরাট বিরাট আলোচনা হয়ে গিয়েছে। একবার এক আনা, তিন কড়া, দুই ক্রান্তির গোলমালে আপিসসুদ্ধ সবাই অডিটার-জেনারেলের কাছে কী হুড়োটাই না খেয়েছিলুম। শনিবার হাফ ডে—অ্যাকাউন্টেন্ট হাফ ওয়াশিং চার্জ কেটেছিলেন বলে। কাগজের সম্পাদক যখন তাঁর স্তম্ভে বলেন, সরকারী পয়সার প্রতি আমাদের দরদ নেই তখন আমাদের প্রতি বড় অবিচার করেন। অবশ্য 'দামোদরে' কত লক্ষ টাকা কোন্ দিকে ভেসে যায়, সে-কথা আমি বলতে পারব না, তবে এ-কথা আল্লার কসম খেয়ে বলব, বেহেস্তের দোহাই দিয়ে বলব, 'তাঁবা-তুলসী-গঙ্গাজল' স্পর্শ করে বলব, সরকারী নোকরি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার পরও এই 'ওয়াশিং শীটে'র দুঃস্বপ্ন দেখে এখনও মাঝে মাঝে ঘুম থেকে এক গা ঘেমে জেগে উঠি। গিন্নি জানেন। বুকে হাত বোলান আর গুরুদত্ত 'ওয়াশিং-ওচাটন' আওড়ান।

কেরানী ওয়াশিং অ্যালাওয়েন্‌স্ পায় না। য়ুনিফর্ম যখন নেই তখন ওয়াশিং অ্যালাওয়েন্‌স্ হয় কী প্রকারে? শিশুবোধ ব্যাকরণ। অথচ তাকে ঠাট বজায় রেখে দফতরে আসতে হয়। বুশ শার্ট ইস্ত্রি না করা থাকলে বছরের শেষে তার কনফিডেনশিয়েল রিপোর্ট লিখি, 'শ্যাবি।' আপনি হয়ত বলবেন, 'ওই ওয়াশিং অ্যালাওয়েন্‌স্ আর ক'পয়সা?' বটে! ছ পয়সা হোক আর ছ গণ্ডাই হোক —দেখুন না একবার রাস্তায় নেমে, ছ পয়সা কামাতে কতক্ষণ লাগে।

ওই যা-বা। ভুলে গিয়েছিলুম, বর্ষাকাল এসেছে—চৈতরাম বর্ষায় ছাতা আর বর্ষাতি পায়। মহামূল্যবান সরকারী সব ফাইল এ-দফতর থেকে ও-দফতরে নিয়ে যাবার সময় যদি ভিজে যায় তবেই ত চিত্তির—একদম অক্ষরার্থে।

কিন্তু কেরানী পায় না। যদিও সরকারী কাজেই তাকে এ-দফতর ও-দফতর করতে হয়—বগলে ফাইলও থাকে। কেরানীরা সচরাচর চাপরাসীর ছাতা ধার চায়।

একবার এক কেরানী ছাতাখানা হারিয়ে ফেলে। চাপরাসী বলে, 'ছাতা কিনে দাও।' সরকারী ফাইল বাঁচাবার প্রেমে নয়, দুধ বাঁচাবার জন্য। কেরানী বলে, 'সরকারী কাজে খোওয়া গিয়েছে, ওটা "রাইট অফ্" হবে।' দুধের স্মরণে নাকি উপদেশ দিয়েছিল, 'তা বেরবার সময় দুধে জল দিস্ নি, বৃষ্টির জলে ওটা পুষিয়ে নিস।' শেষটায় কী হয়েছিল, জানি নে। সি. সি. বিশ্বাস বলতে পারবেন। তখন আইন-মন্ত্রী ছিলেন তিনি।

চৈতরাম শীতকালে কম্বল পায়। কেরানী পায় না। তার চামড়া বোধ করি গণ্ডার ব্র্যাণ্ড। সদাশয় সরকার বলতে পারবেন।

চৈতরাম কোয়ার্টারও পায়। একখানা ঘর। এক ফালি বারান্দা। এক ডুমো উঠোন। ঘরখানা সে একজন রেফুজীকে পঁচিশ টাকায় ভাড়া দিয়ে তার প্রাণ বাঁচিয়েছে। সে চৈতরামের কাছে চিরকৃতজ্ঞ ও তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। চৈতরাম বারান্দায় শোয়, মাঝে-মধ্যে ওদের সঙ্গে নাশ্তা বখরায় খায়-টায়। চৈতরাম দুখানা ঘর পেলে বড় ভাল হত। একখানাতে সে মাথা গুঁজতে পারত বলে? উহুঁ। দুখানাই ভাড়া দিতে পারত বলে। তাই চণ্ডীগড়ের নূতন ক্যাপিট্যালে তারা দুখানা ঘরের জন্য আবেদন-আন্দোলন চালিয়েছে। আমি সেই আবেদনে সানন্দে স্বাক্ষর নিয়েছি।

কোয়ার্টার কেরানীও পায়—যাদের সত্যকার মুরুব্বীর জোর আছে। কিন্তু সেটা ভাড়া দিয়ে থাকবে কোথায়? বারান্দায়? মুশকিল।

এই তো গেল মোটামুটি জরিপ। তার ওপর পুজো-আর্চায় বখশিশটা-আসটা। কোন জিনিস বড় সাহেবের জন্য কিনে আনলে তিনি কি আর চেঞ্জটা সব সময় ফেরত চান? কেরানী এসব রসে বঞ্চিত।

এই কাঁড়া কাঁড়া টাকা নিয়ে চৈতরাম করে কী?

ওই জানলেই ত পাগল সারে।

কেরানীদের সঙ্গে লগ্নির ব্যবসা করে। এটা সবিস্তার বর্ণনা করতে আমার বাধো-বাধো ঠেকছে। তবে এইটুকু বলতে পারি, কেরানীরা অসন্তুষ্ট নয়। এবং

আপনি খুশী, মাসের পয়লা তারিখে কাবুলীওয়ালাদের দফতরের আনাচে-কানাচে ঘোরার কটু দৃশ্য দেখতে হয় না বলে। চাপরাসী ওদের ঠেকিয়ে রেখেছে!

জনৈক বন্ধু গল্পটি বলেছেন—

আহাম্মুক জামাই শ্বশুরকে শোধাচ্ছে, 'সম্বুরমশাই, সম্বুরমশাই, আপনার বিয়ে হয়েছে?'

'হ্যাঁ।' (মনে মনে, 'ব্যাটা না হলে তুই বউ পেলি কোত্থেকে?')

'কার সঙ্গে, সম্বুরমশাই?'

রাগত কণ্ঠে, 'তোমার শাশুড়ীর সঙ্গে।'

জামাই, গদগদ কণ্ঠে, 'আহাহা, ভালই হয়েছে, ভালই হয়েছে, ঘরে ঘরে বিয়ে হয়েছে।'

দফতরের ভিতর আপোসে এই ব্যবস্থা আপনারও পছন্দসই হওয়ার কথা। চিন্তা করে দেখুন।

* * *

শুনেছি, একদম টপে উঠলে, অর্থাৎ মন্ত্রী-টন্ত্রী হয়ে গেলে নাকি অনেক রকম সুখ-সুবিধা আছে। অবশ্য চাপরাসীদের মত টায় টায় এ রকম নয়! তবে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। কোনও বিশেষজ্ঞ যদি সেটা বাতলে দেন তবে ঠিক আন্দাজ করতে পারব, দশ পার্সেণ্ট উচ্ছুগ গো করাতে তাঁরা কী পরিমাণ আত্মোৎসর্গ করেছেন।

চিল্কা

সন্ধ্যাবেলা গোলাপের কুঁড়িটির দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইলুম। প্রকৃতি যেন যুগ যুগ ধরে কোটি কোটি কুঁড়ি তৈরী করার পর আজ এ-কুঁড়িতে তার পরিপূর্ণতা পেয়েছে।

সকালবেলা বাগানে গিয়ে দেখি, সে-কুঁড়িটি ফুটেছে। কুঁড়ির ভিতরে প্রকৃতি গোপনে গোপনে পাপড়ির যে নিখুঁত সামঞ্জস্য সাজিয়ে রেখেছিল সেই সামঞ্জস্য নিয়েই পাপড়িগুলো বাতাসের গায়ে শরীর মেলে দিয়েছে। রেণু যেন রাজকুমারী, আর চতুর্দিকে সার বেঁধে তাঁর সখীরা এক নিস্তব্ধ নৃত্য আরম্ভ করে দিয়েছেন।

চুপ করে দেখতে দেখতে আমার মনে হল, সন্ধ্যেবেলার কুঁড়িতে দেখেছিলুম এক সৌন্দর্য আর সকালবেলাকার ফোটা-ফুলে দেখছি আরেক সৌন্দর্য। এই পরিবর্তনটি যদি আমার চোখের সামনে ঘটত তবে এই দুই সৌন্দর্যের ভিতর

আরও সৌন্দর্য দেখতে পেতুম। কিন্তু সে ত হবার নয়; ফুল ফোটে এত ধীরে ধীরে যে তার বিকাশ আর পরিবর্তন ত চোখে পড়ে না। সমস্ত রাত কুঁড়ির কাছে জেগে রইলেও সৌন্দর্যের ক্রমবিকাশে তার ভিন্ন ভিন্ন রূপ আমার চোখ এড়িয়ে যাবে।

ভগবান আমার সে-ক্ষোভ চিল্কার পারে ঘুচিয়ে দিলেন।

অতি ভোরে চিল্কার সার্কিট হাউসে ঘুম ভাঙল, বারান্দায় কাচ্চাবাচ্চাদের কিচির কিচির শুনে। আঙ্গুল-আশ্রমের ছেলেমেগুলো তা হলে নিশ্চয়ই দুপুর-রাতে এসে পৌঁছেছে।

দরজা খুলে পুব আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি, আমার বাগানের সেই গোলাপ-কুঁড়ি। শুধু এ-কুঁড়ির রঙ একটু বেশী লালচে। আমার আর পুর্ব আকাশের মাঝখানে বিস্তীর্ণ জলরাশির উপর এক ফালি সিঁথির সিঁদুর। কিংবা যেন কোন রক্তাম্বরধারিণী গরবিনী চিল্কার উপর দিয়ে পুর সাগরের পানে যেতে যেতে রক্তাম্বরী নিংড়ে নিংড়ে জল ফেলে ফেলে আমার ওই কুঁড়ির পিছনে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন।

সুন্দরীর কথা ভুলে গিয়ে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলুম কুঁড়ির দিকে। সে কুঁড়ি ফুটতে আরম্ভ করেছে। শুধু এর পাপড়ির আকার অন্য রকমের। সোজা, ধারালো তলোয়ারের মত এক একটি সূর্যরশ্মি দিগ্বলয়ের অন্তরাল থেকে হঠাৎ পূর্ব গগন পানে ধেয়ে ওঠে। অসংখ্য রশ্মি অর্ধচক্রাকারে আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। তাদের কেন্দ্র—ঘুমন্ত রাজকুমারীর এখনও দেখা নেই। আকাশের লাল ক্রমেই কমে আসতে লাগল। চিল্কার রাঙা জলের ফালি গোলাপী হয়ে হয়ে শেষটায় নীলাম্বরী পরতে আরম্ভ করেছে।

চতুর্দিকে আর সব কিছু পাণ্ডু, যেন হিমানীর গ্লানি-মাখা।

সবিতা স্বপ্রকাশ হলেন। আলোতে আলোতে হিমানীর সর্ব-গ্লানি ঘুচে যাচ্ছে। পুব আকাশের দিকে ধেয়ে-ওঠা সূর্য-অসিরাজি সবিতা সংহরণ করে নিয়েছেন। জাদুকর তার ভানুমতীর ইন্দ্রজাল অদৃশ্য করে পূর্ণ মহিমায় রঙ্গমঞ্চে একা দাঁড়িয়ে রইলেন।

আমারই চোখের সামনে আমার বাগানের গোলাপের কুঁড়িটি ফুটে উঠল। এর সম্পূর্ণ ফোটাটি আমি প্রাণভরে দেখলুম। এর কিছুই ফাঁকি গেল না। কিন্তু এ-ফোটা গোলাপের ফোটার চেয়ে কত লক্ষ গুণে গম্ভীর। এর ব্যাপ্তি বিশ্ব-চরাচর ছড়িয়ে এবং হয়ত ছাড়িয়ে।

আমার মনে আর কোন ক্ষোভ রইল না।

আলো ফুটেছে, কিন্তু জলে বাতাসে, ডাঙায় আকাশে এখনও যেন কী এক আবেশ জড়ানো। চিল্কার জল কেমন যেন একটা নীলুফরি রঙ মেখে নিয়েছে। এ-রঙ সমুদ্রের জল চেনে না, দেশের বিলে, বিদেশের ব্লু ডানয়ুবেও নীলের এ-আভাস আমি কখনও দেখি নি। তবে কি চিল্কা একদিকে যেমন হ্রদ, অন্যদিকে তেমনি সমুদ্রের সঙ্গে জোড়া বলে সাদায় আর নীলে মিশে গিয়ে নীলুফরি রঙ ধরেছে? তাই হবে। বর্ষায় নাকি নদীর অপর্যাপ্ত জল হ্রদে নেমে এসে তার লোনা জলকে মিঠা করে দেয়। শীতে নাকি সমুদ্রের জোয়ারের মারে জল ফের লোনা হয়ে যায়।

নীলুফরির মাঝখানে ওই বিরাট কালো পোঁচ কিসের? মন্দমধুর ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে বলে সে-পোঁচ আবার অল্প অল্প ভুলছে। স্টীমলঞ্চ ক্রমেই কালো পোঁচের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ দেখি সেই কালো ফালিটা জল ছেড়ে আকাশের দিকে হাওয়ায় ভর করে উড়ে চলল—লক্ষ লক্ষ পাখি। এরা নাকি এসেছে সাইবেরিয়া থেকে, হিমালয় থেকে। ঠিকই ত; এদেরই ত আমি দেখেছি খাসিয়া পাহাড়ের পায়ের কাছে, ডাউকির হাওরে হাওরে, চেরাপুঞ্জির জলে ভর্তি বিলে বিলে।

চিল্কার সমস্ত সৌন্দর্য এক মুহূর্তে অন্ধকার হয়ে গেল। হৃৎপিণ্ডটা কে যেন শক্ত হাতে মুচড়ে দিল, বুক থেকে কী যেন একটা উঠে এসে গলাটাকে বন্ধ করে দিল। আর যেন ঢোক গিলতে পারছি নে।

মাথার উপরকার সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলে শুভ্র মল্লিকার পাপড়ি ছড়ালে কে? পাপড়িগুলো অতি ধীরে ধীরে কেঁপে কেঁপে, এদিক ওদিক হয়ে হয়ে জলের দিকে নেমে আসছে। বিলেতের বরফ-বর্ষণ এর কাছে হার মানে।

এ ত সেই পাখিগুলোর বুক। এদের পিঠের রঙ কালো। তাই তারা যখন জলে বসে থাকে তখন মনে হয়, এরা হ্রদের নীল চোখের কৃষ্ণাঞ্জন, আর আকাশ থেকে যখন নেমে আসে তখন উপরের দিকে তাকিয়ে দেখি সিত-মল্লিকা-বর্ষণ।

পাশে ভাগ্নী কৃষ্ণা বসে ছিল। বললে, 'মামা, ওই দেখ, চিল্কার দেবী কালী-মার দ্বীপ। ওখানে জল নেই, ঘাস নেই, তোমার টাকের মত সব কিছু খা-খা করছে।

টাকের কথা ওঠাতে বিরক্ত হয়ে দ্বীপের দিকে না তাকিয়ে তাকালুম রোষ-কষায়িত লোচনে, কৃষ্ণার চোখের দিকে। সেখানে দেখি চিল্কার মাধুরী। কৃষ্ণার

চোখের সাদা যেন সাদা হতে হতে নীলুফরি হয়ে গিয়েছে আর তার গায়ের কালো রঙ দিয়ে চোখের চতুর্দিকে স্বয়ং বিশ্বকর্মা এঁকে দিয়েছেন কৃষ্ণাঞ্জন।

ভগবান একই সৌন্দর্য কত না ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখান! শিশুর খলখলে হাসি আমি শুনেছি নির্ঝরিণীর কলকল রোলে, বিগলিত মাতৃস্তন্য দেখেছি আরবের মরুভূমির বুক ফেটে বেরিয়ে আসা সুধারসে, নবজাত শিশুর গাত্রগন্ধে পেয়েছি প্রথম আষাঢ়ের ভিজে মাটির গন্ধ।

রসময় পাঠক, এইবারে আমি তোমার একটু করুণা ভিক্ষা করি। আমি কাব্যরস ভিন্ন অন্য আরও দু-একটি রসের সন্ধান করি। তারই একটি খাদ্যরস। চিল্কার এ-পাখির রস আমি চেখেছি দেশে। আবার লোভ হল। সঙ্গে ছিল স-বন্দুক পারিকুদের রাজা। তার এবং তার বন্দুকের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালুম। সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে চিল্কার কালীকে স্মরণ করে বললুম, 'গোটা পাঁচেক পাখি দাও না, মা!' তারপর ভাবলুম, না, অত বেশী চাওয়া-চাওয়ি ভাল নয়, দেবীকে দেখাতে হবে, আমি কত অল্পেতেই সন্তুষ্ট হই। মনে মনে বললুম, 'আচ্ছা, না হয়, পাঁচটা না-ই বা দিলে। গোটা দুত্তিন দিলেই হবে। আমার খাঁই মাইজী বড্ডই কম।'

বলেই একটা ইরানী গল্প মনে পড়ে যাওয়াতে হাসি পেল। এক ইরানী দরবেশ ভগবানকে উদ্দেশ করে বললে, 'হে আল্লাতালা, আমাকে হাজার পঁচিশেক তুমান দাও। আমি তোমার কিরে কেটে বলছি, তার থেকে পাঁচ হাজার তুমান গরিব-দুঃখীদের ভিতর দান-খয়রাত করে বিলোব। আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না? আচ্ছা, তা হলে তোমার পাঁচ হাজার তুমান কেটে নিয়ে আমাকে বিশ হাজারই দাও।'

চিল্কা হ্রদ বিস্তর ছোট ছোট দ্বীপে ভর্তি। মাত্র একটি ছাড়া নাকি সব কটাতেই মিষ্টি জল পাওয়া যায়। এসব দ্বীপে থাকে গরিব জেলেরা। ডাঙার সঙ্গে এদের কোন যোগসূত্র নেই। এদের পোস্ট-অফিস নেই, টেলিগ্রাফের তার ডাঙার সঙ্গে দ্বীপের মানুষকে কাছাকাছি এনে দেয় নি। আর আপন দ্বীপের বাইরে বিশ্বসংসারের কাকেই বা এরা চেনে যে ওরা এদের টেলিগ্রাম পাঠাবে, ওরা এদের কুশল সংবাদ জানতে চাইবে।

আমি ভাবলুম, আমার দেশে নাগা-গারোরা পর্যন্ত মাঝে মাঝে পাহাড় থেকে নেমে, পায়ে হেঁটে কিংবা বাসে করে শহরে যায়। এটা সেটা দেখে,র ফুটপাতে

দোকানে বসে চা খায়, সিনেমা যায়, কেনাকাটাও করে। এই উড়িষ্যারই আদি-বাসীরা মাঝে মাঝে বন থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের বাড়িঘরদোর দেখে, হয়ত মনে মনে সংকল্প করে, বনের ভিতরই ওদের জীবনকে আরও সমৃদ্ধ করবে। কিন্তু চিল্কার দ্বীপবাসীরা সৃষ্টির সেই আদিমকাল থেকেই দ্বীপবাসী। আজ যে-সব জিনিসপত্র দিয়ে তারা মাছ ধরে, দু-হাজার বৎসর পূর্বেও তাই দিয়ে তারা মাছ ধরেছে। সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি, বিজ্ঞানের প্রসার এদের কোনও কাজে লাগে নি।

হয়ত ভালই আছে। ফার্সীতে বলে, 'দূর বাশ্, খুশ বাশ্।' দূরে আছে; ভালই আছে। টমাস কেম্পিসও বলেছেন, 'যতবার আমি মানবসমাজে গিয়েছি ততবারই আমি খানিকটে মনুষ্যত্ব হারিয়ে বাড়ি ফিরেছি।' হয়ত 'সভ্যতা'র আওতায় না এসে এরা সত্যিই সভ্যতর।

চিল্কার বড় দ্বীপ পারিকুদ। ডাঙা থেকে মাইল আষ্টেক দূরে হবে। দ্বীপে নেমে খানিকক্ষণ চলার পর মনে হল, কোথায় চিল্কা, কোথায় তার নীলুফরি জল, কোথায় দূর-দূরান্তের সিন্ধুরেখা আর কোথায়ই বা কৃষ্ণপক্ষ পক্ষীর শুভ্র বক্ষের মল্লিকা বর্ষণ। এ ত দেখছি, পুব-বাংলার পাড়া-গাঁ। রাস্তার উপর সাদা ধুলো। দু দিকে রাস্তার জন্য মাটি তোলার ফলে লাইন বেঁধে ডোবার সারি। তাতে ফুটেছে ছোট ছোট শ্বেতপদ্ম রক্তপদ্ম। মাছরাঙা ওড়াওড়ি করছে আর মাঝে মাঝে এক পায়ে দাঁড়িয়ে ধ্যানমগ্ন বক। মোষগুলো গলা অবধি ডুবিয়ে চোখ বন্ধ করে ধীরে গম্ভীরে মাথা নাড়ছে। শুধু পুব-বাংলার জমির মত এ-জমি উর্বরা নয়; তাই ক্ষেত-খামারের চিহ্ন কম।

রোদ চড়ছে। দূর গ্রামের শ্যামশ্রীর দিকে তাকিয়ে চোখ জুড়য়। ওইখানে পৌঁছতে পারলে হয়। শহরের লোক; এতখানি হেঁটে অভ্যেস নেই। ক্লান্তি বোধ হচ্ছে।

সঙ্গে পারিকুদের রাজা। রাজবাড়িতে পৌঁছে দু দণ্ড জিরিয়ে নিলুম। সেখানে বিরাট বিরাট কৌচ সোফা, দশ-হাতী খাড়া আয়না, জগদ্দল কাবার্ড আলমারি, সোনার সিংহাসন, মার্বেল-টপ টেবিল, বাথ-টাব, ঝাড়-ফানুস, আরও কত কী! এসব ওই গরিব জেলেদের পয়সায়? অবিশ্বাস্য।

কলকাতা থেকে ট্রেনে এসেছে চিল্কার পার অবধি। তারপর কত চেল্লাচেল্লি হৈ-হল্লোড়ের ভিতর এগুলোকে নৌকায় চাপানো হয়েছে, নাবাতে হয়েছে, কত লোক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এগুলোকে রাজবাড়ি পর্যন্ত কাঁধে করে বয়ে

এনেছে, পড়ি-মরি হয়ে উপরের তলায় তুলেছে।

শুধু রাজপরিবার এগুলো ব্যবহার করেন। রাজপরিবার বলতে উপস্থিত রাজা আর রাণী। আর আজ সকালের মত আমরা।

সূর্য মধ্যগগনে। লঞ্চ পুবদিকে সমুদ্রের পানে ধাওয়া করেছে, যেখানে হ্রদের সঙ্গে সমুদ্রের সঙ্গম।

পূর্বদিগন্তে যেখানে সমুদ্র আর হ্রদ আকাশের সঙ্গে মিশেছে সে-জায়গা ঝাপসা হয়ে আছে। মনে হয়, হ্রদ দূরে যেতে যেতে হঠাৎ যেন কোথাও অসীম শূন্যে লীন হয়ে গিয়েছে। গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে গরমের দেশের দগ্ধতাম্র দিগন্তে যে আস্বচ্ছ ছায়ানৃত্য আরম্ভ হয়, এখানে যেন তারই এক অন্যরূপ। এখানে যেন অশরীরী বাষ্প-নৃত্য আরম্ভ হয়েছে আর তারই আড়ালে হ্রদের শেষ, সমুদ্রের আরম্ভ, সমুদ্রবক্ষে আকাশের চুম্বনে সব কিছু ঢাকা পড়ে গিয়েছে।

তাই পশ্চিমমুখো হয়ে বসলুম ডাঙার দিকে তাকিয়ে।

পাখিরা সব গেল কোথায়? শুধু দু-একটি ঝাঁক হেথা হোথায়। বোধ হয় ঠাণ্ডা দেশের প্রাণী বলে দ্বীপের গাছতলার ঠাণ্ডাতে আশ্রয় নিয়েছে।

কত রকমের নীল রঙ দেখছি।

হ্রদের জল দুপুর-রোদে অতি হাল্কা ফিকে নীল হয়ে গিয়েছে। হ্রদের পরে পাড়ের গ্রামের রঙ এমনিতে ঘন সবুজ কিন্তু এখন দেখাচ্ছে হ্রদের জলের চেয়ে একটুখানি ঘনতর নীল। গ্রামের পিছনে পাহাড়, তার রঙ আরও একটু বেশী ঘন নীল। এবং সর্বশেষে পাহাড়ের পিছনের আকাশ ঘোর নীল।

এ কী করে সম্ভব হয় জানি নে। গ্রামের গাছপালা, পাহাড়ের ঝোপ-ঝাড় হয় সবুজ রঙের কিন্তু আজ এরা নীলের ছোপ মেখে নিল কী করে? তবে কি আমার আর পাড়ের মাঝখানে দীর্ঘ নীল বিস্তৃতি,আমার চোখ দুটিকে নীলাঞ্জন— কিংবা নীল চশমা পরিয়ে দিয়েছে যে আমি সব কিছুই নীল দেখছি?

মেজিশিয়ানরা দেখেছি মাথার উপরে হাত তুলে এক প্যাক তাস ছেড়ে দেয় আর আলগা আলগা তাসগুলো জুড়ে গিয়ে ভাঁজে ভাঁজে নেমে আসে। এখানে যেন আকাশের অন্তরাল থেকে কোন এক জাদুকর আকাশ, পাহাড়, বন, জল এই হরতন, চিরতন, রুহিতন, ইশকাপনের চারখানা তাস জুড়ে দিয়ে ভাঁজে ভাঁজে লটকে দিয়েছেন। কিন্তু এ-ওস্তাদ লাল-কালোর দু রঙ না নিয়ে, মেলাই তসবির না এঁকে, এক নীলের ভিন্ন ভিন্ন আভাস দিয়ে অপূর্ব এক ভেল্‌কি-বাজি দেখাচ্ছেন।

হ্রদের বুকে হাওয়া এতটুকু আঁচড় কাটে নি—একেবারে সম্পূর্ণ নিথিরকিচ। শুধু আমাদের লঞ্চ যেন চিরুনির মত ইন্দ্রপুরীর কোন এক রমণীর দীর্ঘ বিস্তৃত নীলকুন্তলে সিঁথি কেটে কেটে সমুদ্র-সীমন্তের দিকে এগিয়ে চলেছে। সিঁথির দু দিকে চূর্ণ কুন্তলের ফেনা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে কিন্তু এ গরবিনীর কুন্তলদাম এমনই বিপুল যে চিরুনি বেশীদূর এগতে-না-এগতেই দেখতে পাই, দু দিকের ঘন কুন্তল সিঁথিকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে।

চতুর্দিকে অসীম শান্তি পরিব্যাপ্ত। শুধু লঞ্চের মোটরটার একটানা শব্দ কর্ণে পীড়া দেয়। সান্ত্বনা শুধু এইটুকু, এই নীলিমার সৌন্দর্য-মাধুরীতে ডুব দিলে কানে এসে মোটরের শব্দ পৌঁছয় না।

যোগশাস্ত্রে পতঞ্জলি চিত্তবৃত্তি-নিরোধের অনেক পন্থার নির্দেশ দিয়েছেন। এটা দিলেন না কেন?

এবারে সূর্যাস্ত। পশ্চিমের আকাশ হয়ে গিয়েছে টুকটুকে লাল। আকাশ যেন প্রথমটায় তাঁর নীল কপালের সিঁথিতে এক ফালি সিঁদুর মেখেছিলেন, তারপর তাঁর খোকা কচি হাতের এলোপাতাড়ি থাবড়া দিয়ে এখানে-ওখানে থাবলা থাবলা সিঁদুর লাগিয়ে দিয়েছে! মা শেষটায় সমস্ত মাথায় সিঁদুর মেখে নিয়েছেন।

নীলে লালে মিশে গিয়ে বেগুনী হয়? তাই বোধ হয়। হ্রদের জল বেগুনী হয়ে গিয়েছে।

আজকের সূর্যাস্ত বড় অল্প সময়েই শেষ হয়ে গেল। আকাশে মেঘ থাকলে তারা সূর্যাস্তের লালিমা খানিকটে শুষে নেয় এবং সূর্য পাহাড়ের আড়ালে চলে যাওয়ার পরও মহফিল-শেষের তানপুরোর রেশের মত খানিকক্ষণ আকাশ-বাতাস জলস্থল রাঙিয়ে রাখে।

দিল্লির কবি গালিব সাহেব এই 'শেষ রেশটুকু'র উপর হাড়ে হাড়ে চটা ছিলেন। তাঁর দুরবস্থা তখন চরমে। বাড়িখানা ঝুরঝুরে। এক বন্ধুকে চিঠি লিখেছিলেন, 'অগর পানী বরস্‌তা এক ঘণ্টা, তো ছৎ বরসতী দো ঘণ্টে'—'জল যদি বর্ষে এক ঘণ্টা ত ছাত বর্ষে দু ঘণ্টা!'

দু-এক ঝাঁক পাখি এখানে ওখানে। পারিকুদের রাজাকে বললুম, 'দু-একটা মার না।'

রাজার রাজকীয় চাল। পাখি দেখলে চাকরকে ধীরে সুস্থে বলেন, 'বন্দুকো।' চাকর রাজার রাজা! তার চাল আরও ভারিক্কি। আরও ধীরে সুস্থে কেস

খুলে বন্দুক এগিয়ে দেয়। রাজা গদাইলস্করী চালে 'বন্দুকো' জোড়া লাগিয়ে বলেন, 'কার্তুজো'। ক-রে, ক-রে সব যখন তৈরী তখন পাখিরা সাইবেরিয়ায় চলে গিয়েছে। তবে কি রাজার তাগ খারাপ?

তবু ভদ্রতার খাতিরে দু-একটা গুলি ছুঁড়লেন। ফলং শূন্যং।

আমার একটা গল্প মনে পড়ে গেল।

বড়লাট গেছেন বরোদায় পাখি শিকারে। আমাদের ওস্তাদ শিকারী রহমৎ মিয়া গেছেন সঙ্গে। সন্ধ্যায় যখন ওস্তাদ বাড়ি ফিরলেন তখন বাচ্চা শিকারীরা উদ্‌গ্রীব হয়ে শুধালে, বড়লাট সায়েবের তাগ কী রকম? ওস্তাদ প্রথমটায় রা কাড়েন না। শেষটায় চাপে পড়ে বললেন, 'বড়লাটের মত শিকারী হয় না, আশ্চর্য তাঁর তাগ। কিন্তু আজ খুদাতালা পাখিদের প্রতি সদয় (মেহেরবান) ছিলেন।'

পূর্ব পশ্চিমে যেন দেখন-হাসি, ইলেকটিরিতে খবর পাঠাল, না বয়স্কাউটের নিশানে নিশানে কথাবার্তা। পশ্চিমের লালের ইশারায় পুব লাল হয়। সেই লাল ফিকে হচ্ছে—কী গোপন কায়দায় তার খবর পূর্বে পৌছচ্চে? মাঝের বিস্তীর্ণ আকাশ ত ফিকে, কোনও রঙ নেই, ফেরফার নেই। কী করে এর হাসি ওর গায়ে গিয়ে লাগে, এর বেদনা ওর বুকের সাড়ায় প্রকাশ পায়?

আধা আলো-অন্ধকারে সাতপাড়া দ্বীপে নামলুম। আম-বাগানের ভিতর ছোট একটি ডাক-বাংলো। লাঙ্গুল-আশ্রমের কাচ্চাবাচ্চারা কিচিরমিচির করছে। খানিক পরে চিল্কা হ্রদের তাজা মাছ-ভাজার গন্ধ নাকে এল। সর্বাঙ্গে ক্লান্তি, কখন খেলুম, কখন ঘুমিয়ে পড়লুম, কিচ্ছু মনে নেই।

শেষ রাত্রে ঘুম ভাঙল। দেখি আমার অজানতে বাতিওলারা এসে আসমানের ফরাশে এখানে ওখানে তারার মোমবাতি জ্বালিয়ে রেখে গিয়েছে। এবারে শেষ রাত্রের মুশায়েরা বসবে। আম গাছ মাথা দোলাবে, ঝিঁঝি নূপুর বাজাবে, পুবের বাতাস মজলিসের সর্বাঙ্গে গোলাপ-জল ছিটিয়ে ঠাণ্ডা করে যাবে।

তারপর দেখি দূর সাগরের ওপারে লাল মদের ভাঁড় থেকে চাঁদ উঠলেন ধীরে ধীরে, গা টেনে টেনে। সকলের মুখে হাসি ফুটল। অন্ধকার আকাশে যে সব মোসাহেবরা গা-ঢাকা দিয়েছিলেন তাঁদেরও চেনা গেল। ছোট বাচ্চা যেমন মুশায়েরার মাঝখানে ঘুমিয়ে পড়ে, আমি আবার তেমন ঘুমিয়ে পড়লুম।

ভোর হল। আজ আমার ছুটি শেষ। আপিসের কথা মনে পড়তেই সর্বাঙ্গ হিম হয়ে গেল। লঞ্চে উঠে পাড়ের পানে রওয়ানা দিলুম। সে সকালেও অনেক নবীন সৌন্দর্য দেখা দিয়েছিল কিন্তু আপিসের জুজু আমার পঞ্চেন্দ্রিয় অসাড় করে দিয়েছে। যেন ডুব-সাঁতার দিয়ে ডাঙায় পৌঁছে, আপিস আর অদৃষ্টকে অভিসম্পাত দিতে দিতে কটক এলুম।

বাঙালী

এই যে কলকাতা। জয় মা গঙ্গা!

আর যেন মা তোমায় কুলত্যাগ করে ভিন-দেশে যেতে না হয়।

আহা, মাইকেল কি কবিতাই না রচেছিলেন—

'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়।
তাই ভাবি মনে—'

কিন্তু আশাকে আমি দোষ দিই নে। আশাকে তখনই দোষ দেওয়া যায়, যখন মানুষ হেথাকার শান্তি-সুখ বর্জন করে হোথাকার খ্যাতি-প্রতিপত্তির জন্য ছোটে। কিন্তু বঙ্গসন্তান মাত্রই কলকাতা ছাড়ে পেটের দায়ে। হেথায় অন্ন জুটছে না বলেই সে হোথাপানে ধেয়ে যায়—হায়, তার জীবনে স্বাধীনতা কোথায়? 'তার জীবন' কথাটিই ভুল। তা না হলে আজ ঢাকার পয়সাওলা ছেলে কলকাতার রাস্তায় ফ্যা ফ্যা করছে কেন, কলকাতার বাচ্চাই বা দিল্লির এর দোরে ওর দোরে হানা দিচ্ছে কেন? তার জীবন ত এখন দৈন্যের জীবন, দু মুঠো অন্নের কাছে গচ্ছিত, এক টুকরো কাপড়ের কাছে বেচে দেওয়া।

কিন্তু থাক্ এসব অপ্রিয় আলোচনা। আপনাদের ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে, আপনারা শাঁক বাজান আর না-ই বাজান 'মম চিত্ত মাঝে' ঘন ঘন শাঁক বাজছে।'

বড্ড ব্যক্তিগত হয়ে যাচ্ছে—না? তবে কিনা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, যার জন্মদিন, তা সে পাঁচ বছরের ছেলেই হোক সেদিন সে রাজা। তার চতুর্দিকে সেদিন পরব জমে ওঠে, তাকেই সবাই কথা কইতে দেয়। আজ কলকাতায় আমার পুনরায় নবজন্মদিনে আমার সহৃদয় পাঠকরা আমার ভ্যাচর ভ্যাচর কিঞ্চিৎ বরদাস্ত করে নেবেন বইকি। শাস্ত্রেও তার ব্যবস্থা আছে। আমি স্মার্ত নই, তাই আবছা-আবছা মনে পড়ছে, কেউ যদি চৌদ্দ বৎসর (কিংবা সাতও হতে পারে) নিরুদ্দেশ থাকে, তবে তার শ্রাদ্ধ করতে হয়, কিন্তু তারপর

যদি হঠাৎ সে ফিরে আসে, তবে তার জন্ম নূতন করে জন্মোৎসব ইত্যাদি যাবতীয় ক্রিয়া-কর্ম করতে হয়। তাকেও মাতৃগর্ভস্থ ছোট বাচ্চাটির মত দু' মুঠো বন্ধ করে আস্তে আস্তে ভূমিষ্ঠ হওয়ার ভান করতে হয়। তার নামকরণ, চূড়াকরণ, এমন কী নূতন করে উপনয়নও হয়। মনে পড়ছে না, তবে বিবেচনা করি, ব্রহ্মচর্যের পর তাকে পুনরায় তার স্ত্রীকে বিয়েও করতে হয়—বিলিতি ধরনের সিলভার, গোল্ডেন ওয়েডিংয়ের মত। তাতেই বা কী কম আনন্দোল্লাস, অবশ্য সব কিছুই হয় ঘণ্টাখানেকের ভিতর। এ সব ক'টা ব্যবস্থাই আমার বড়ই মনঃপূত, ভাবতে গেলেই হৃদয় প্রসন্ন হয়ে ওঠে। বিশেষ করে যখন বাচ্চাটির অর্থাৎ লোকটাব মায়ের ছবি মনের ওপব ভেসে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের ভাষা একটু পরিবর্তন করে বলি, তিনিও কি সেদিন বধূবেশ পরে সীমন্তের উপর অর্ধাবগুণ্ঠন টেনে নিয়ে অন্যান্য অন্তঃপুরিকা কুললক্ষ্মীদের ন্যায় প্রসন্নকল্যাণ মুখে মাঙ্গল্য রচনায় নিরতিশয় ব্যস্ত হন না ?

কিন্তু হায় যার মা নেই ?

দিল্লি ভাল জায়গা ; ভালবাসি কিন্তু কলকাতাকে।

আসানসোল কিংবা বর্ধমানের কাছে রেলগাড়িতে ঘুম ভাঙল। আগের রাত্রে যুক্তপ্রদেশেব কোন নাম-না-জানা জায়গায় ঘুমিয়ে পড়েছিলুম মনে গভীর প্রশান্তি নিয়ে যে, পরদিন সকালবেলাই চোখ মেলব বাঙলা দেশে ; তাই না জাগলে আমি হাওড়া পেরিয়ে, শেয়ালদা ছাড়িয়ে যে কহাঁ কহাঁ মুল্লুকে চলে যেতুম, তার খবর কি আই বি পর্যন্ত রাখতে পারত ? ডাক্তাররা বলেন, মনের শান্তি সর্বোত্তম নিদ্রাদায়িনী—ওনারা তত্ত্বটা লাতিনে বলেন বলে আমি অনুবাদটি ঈষৎ সংস্কৃত-ঘেঁষা করে দিলুম। ঘুম কেন বর্ধমানের কাছাকাছি ভাঙল সে-কথাও নিবেদন করছি। চায়ের গন্ধ পেয়ে। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, আসাম-বাঙলার বাইরে কেউ চা তৈরি করতে জানে না—বাঙলা প্ল্যাটফর্মের রদ্দি চা-ও দিল্লী-লাহোরেব উত্তম উত্তম খানদানী পরিবারের চা-কে খুশবাইতে হার মানাতে পারে। বাঙলার চায়ের খুশবাই ঘুম ভাঙাল।

চোখ খুলে দেখি সমুখে বাঙলা।

অবশ্য মানতে হবে যুক্তপ্রদেশ-বিহাব ডুম করে বাঙলা দেশে পরিবর্তিত হয় না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যদি 'আলোক-মাতাল স্বর্গসভার মহাঙ্গন থেকে' 'কালের সাগর' পাড়ি দিয়ে এক মুহূর্তেই 'শ্যামল মাটির ধরাতলে' চলে আসতে পারেন তবে আপনিই বা কেন এক ঘুমের ডুব-সাঁতার কেটে এলাহাবাদ থেকে বর্ধমান পৌঁছতে পারবেন না ? এমন কী, গেল রাত্রিতে যে-লোকটা আপনার কামরায় ঢুকে

উপরের বার্থে শুয়েছিল, যাকে আপনি 'ছাতু' ভেবে অবহেলা করেছিলেন, সে-ব্যক্তি বর্ধমান পৌঁছে দেখবেন দিব্যি বাংলা বলতে আরম্ভ করেছে। আপনার জানটা অকারণে খুশ হয়ে যাবে, গায়ে পড়ে বলবেন, 'এক কাপ চা হবে স্যার।'

পাঞ্জাবীদের তুলনায় এরা কালো, বেঁটে, রোগা, অনেকেই হাড্ডিসার, এদের স্যুট কেনার পয়সা নেই, যদি বা থাকে তবু মাসে দুবার করে প্রেস করিয়ে' ব-তরিবত পরতে জানে না, এদের রমণীরা এখনও সেই মান্ধাতার আমলের শাড়ি ব্লাউজ পরে, পেট-কাটা একবিঘতী কাঁচুলির উপর অবহেলার দোপাট্টা ফেলে এরা গ্যাট-ম্যাট করে হাঁটতে শিখলে না, এদের বাচ্চারা ট্যাঁশ উচ্চারণে 'ড্যাডি' 'মাম্মি' 'ও কে' 'নো কে' বলতে শিখলে না—এরাই বাঙালী।

দিল্লির লোক একদা মাংস রুটি খেত; এখনও তারা রুটি মাংসই খায়। শুনেছি বাঙালীরা নাকি এককালে মাছ-ভাত খেত। ঠিক বলতে পারব না, এখনও খায় কি না। রেশনে যে-বস্তু পাওয়া যায়, তাকে চাল বলে তারা তাদের বাপ-পিতেমোর খাদ্য চালকে অসম্মান করতে চায় না। এই কিছুদিন পূর্বে হঠাৎ কিছু মাছ ধরা পড়াতে বাঙালী উদ্বাহু হয়ে যে-নৃত্যটা দেখালে, তাতে মনে হল—আমি দিল্লিতে বসে 'আনন্দবাজারে' পড়েছিলুম—যেন স্বয়ং উর্বশী স্বর্গ থেকে সুধাভাণ্ড নিয়ে বাংলা দেশে অবতীর্ণা হয়েছেন। ছেলেবেলায় দেখেছি, উদ্‌বৃত্ত মাছ পচিয়ে পোড়াবার জন্য তেল আর ক্ষেতে দেবার জন্য সার তৈরি করা হয়েছে। যাঁরা এসব করেছেন, তাঁরাও বাঙালী, এরাও বাঙালী।

এককালে এ-দেশের শিক্ষিত লোক মাত্রই সংস্কৃত জানতেন কিংবা আরবী-ফার্সী জানতেন। উনবিংশ শতকে বাঙলা দেশে যে সাহিত্য গড়ে উঠল, যার তুলনা ভারতের অন্য কোনও প্রদেশে নেই—সে এমারত গড়াতে চুনসুর্কি যোগালে সংস্কৃত এবং কিছুটা আরবী-ফার্সী, আজ সে-সৌধের স্তম্ভ তোরণ দেখে বাঙালী মুগ্ধ, কিন্তু শুনতে পাই দু'মুঠো অন্নের জন্য সে আজ এতই কাতর যে, জোর করেও তাকে আজ আর সংস্কৃত পড়ানো যাচ্ছে না। তবে এ-কথা ঠিক, তাই নিয়ে সে লজ্জা অনুভব করে, খবরের কাগজে প্রকাশিত চিঠিতে তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। (রাষ্ট্রভাষার পীঠভূমিতে সংস্কৃতচর্চার জন্য চেল্লাচেল্লি হয়, কিন্তু কেউ গা করে না।)

এই লজ্জাটুকু নিয়েই বাঙালী।

তবুও এই বাঙলা দেশ।

এখনও ধুলো কমে নি, সে-ধুলো এখনও লাল, পুরোপুরি বাঙলা দেশ এখনও আরম্ভ হয় নি।

হঠাৎ দেখি লাইনের পাশে পুকুর ভরে রক্তপদ্ম ফুটেছে। সবুজ বাঁশবনের মাঝখানে ছোট্ট পুকুরটি—কৃষ্ণনীরে রক্ত-সরোজিনী! দিল্লির নিজাম-প্রাসাদের লাল গোলাপের কথাও সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, ক্ষণেকের তরে বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল, কিন্তু পরমুহূর্তে মনে পড়ল, তরুণ বয়সে যখন এই অঞ্চলে বসবাস করতে এসেছিলুম, তখন প্রথম দর্শনেই এরা আমার হৃদয়ের কতখানি জুড়ে নিয়ে বসেছিল। শরৎ হেমন্ত, এমন কী, বেশ শীত পড়ার পরও কত দূর পুকুরে পদ্মের সন্ধানে গিয়েছি, কখনও ফিরেছি একটি মাত্র পদ্ম নিয়ে, হাতে ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে, কখনও বা এক আঁটি বগলে করে। প্রিয়জনকে বিলিয়েছি হাসিমুখে, লোভীজন জোর করে কিছুটা কেড়ে নিয়ে গিয়েছে, ক্ষণেকের তরে ক্ষুণ্ণ হয়েছি, কিন্তু বিরক্ত হই নি। ঘরে এসে কলসীতে তাদের জিইয়ে রাখবার চেষ্টা করেছি যতদিন পারা যায়। তারপর তারা একে একে শুকনো মুখে বিদায় নিয়েছে—আজ সকালে একজন, কাল সকালে দুজন। বুকে লেগেছে, মনে ভেবেছি, আর পদ্ম আনতে যাব না, আনলেও সব-কটি বিলিয়ে দেব, ঘরে রেখে বিদায়-বেদনার ব্যবস্থা করব না।

কিন্তু প্রতিজ্ঞা কি মনে রাখা সোজা? একেই তো জ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন শ্মশান-বৈরাগ্য।

শ্মশান থেকে ফিরে এসে মানুষ আবার কিছুদিন পরে বিয়ে করে সংসার পাতে, আবার বিরহ-বেদনা, মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করে। আমিও শ্মশান-বৈরাগ্য ভুলে গিয়ে নূতন করে সংসার পেতেছি, আবার তাদের বিদায়-বেলার ম্লান মৃদু গন্ধে বিধুর হয়েছি।

কিন্তু ওই যে লোকে বলে, মার খেতে খেতে মানুষ শক্ত হয়, কই, আমি তো হতে পারলুম না।

তারপর কত দেশ-বিদেশে ঘুরেছি। নরগিস দেখেছি, দায়ুদী কিনেছি, লিলি শুঁকেছি, বসরার গোলাপ বুকে গুঁজেছি, বড় বড় ফুলের বাজারে পুষ্প-প্রদর্শনীতে অবাক হয়ে বিদেশী ফুলের জলুস দেখেছি, কিন্তু কখনও বেশীক্ষণের জন্য ভুলে থাকতে পারি নি আমার রক্তপদ্মকে।

বিদেশী বন্ধুরা জিজ্ঞেস করেছেন মতামত। আমি তাদের ফুলের অকুণ্ঠ প্রশংসা গেয়ে শেষটায় বলেছি, কিন্তু আমাদের পদ্ম ভারি চমৎকার ফুল। এক বন্ধু তখন মৃদু হেসে বলেছিলেন, 'এ-লোকটা বিদেশে ঘোরে স্বদেশ আপন পকেটে রেখে রেখে।'

এইবার দেশে ফিরেছি। স্বদেশ আর পকেটে পুরে রাখতে হবে না।

জয় মা, গঙ্গে,
ত্রিভুবনতারিণী তরল তরঙ্গে।

সুকুমার রায়

গাছে না উঠতেই এক কাঁদি।

আঙিনা পেরুতে-না-পেরুতেই একখানা খাসা নেমন্তন্ন পেয়ে গেলুম।

এলগিন রোড অঞ্চলের কয়েকটি ছেলেমেয়ে 'হরবোলা' নাম দিয়ে একটি দল গড়েছে। এদের উদ্দেশ্য হাস্যরসের উত্তম উত্তম পালার অভিনয় করে বাঙালীর হৃদয়ে তার লুপ্তপ্রায় হাস্যরসকে আবার বইয়ে দেওয়া। হরবোলার প্রযোজকদের ভাষায় বলি, 'হাসতে ভুলে গেছি বলে দুর্নাম আছে আমাদের (বাঙালীর)। সুকুমার রায়কে কেন্দ্র করে সেই দুর্নাম কিছুটা যদি আমরা দূর করতে পারি, তাহলেই এই উদ্যোগ সার্থক হবে।' হরবোলা নেমন্তন্ন করেছেন, তাঁদের প্রথম পালা দেখতে।

সুকুমার রায় যে বাঙলা দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক সে-বিষয়ে কারও মনে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। তাঁরই রচিত 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' বেছে নিয়ে হরবোলা আপন রুচি ও বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন।

'সকের থিয়েডার', তার উপর হরবোলার অধিকাংশ সদস্য অভিনয় করতে নেমেছেন, গান ধরতে শুরু করেছেন জীবনে এই প্রথম, কাজেই পালা এবং তার বন্দোবস্তে যে দোষত্রুটি থাকবে সেটা আগের থেকেই বলা যেতে পারে, কিন্তু দোষত্রুটি সত্ত্বেও তাঁরা যে রসসৃষ্টি করতে পেরেছেন, সেইটেই সব চেয়ে আনন্দের কথা।

আমি কিন্তু একটা ধোঁকা নিয়ে বাড়ি ফিরলুম।

সিরিয়স নাট্য কী-ভাবে অভিনয় করতে হয়, সে সম্বন্ধে আমাদের মোটামুটি একটা ধারণা আছে, কিন্তু যে নাট্য মূলে হাস্যরসে টইটম্বুর তার অভিনয় হবে কী প্রকারে? বিশেষ করে সুকুমার রায়ের পালা, যেখানে প্রতি ছত্রে, না, প্রতি শব্দে রস আর রস। নট যদি সেখানে তার অভিনয় নিয়ে সে-রস শুধু প্রকাশই করেন, তবে ত আর কোন হাঙ্গামা থাকে না, কিন্তু যদি সে রস প্রকাশ করতে গিয়ে নট সেখানে 'থিয়েটারি' (অর্থাৎ করুণকে করুণতর, বীরকে বীরতর, হাস্যরসঘনকে ঘনতর) করে ফেলেন, তা হলে সেটা চপলতায় পরিণত হয়। সুকুমার রায়ের রচনা হাস্যরসে এতই কানায় কানায় ভরা যে, তাতে কোনও

কিছুই যোগ দিতে গেলেই, তা সে আঙ্গিকের যাত্রাধিক্যেই হোক অথবা অন্য যে-কোন বস্তুই হোক, রস নষ্ট হয়ে যায় এবং রসিকতা তখন প্রগলভতা হয়ে যায়।

এই বিপদে না পড়ার জন্যই বাস্টার কীটন হামেশাই প্যাঁচার মত মুখ করে হাস্যরসের অভিনয় করতেন, কিন্তু চার্লি চেপলেন তাঁর অভিনয়ে যৎকিঞ্চিৎ 'থিয়েতারি' এনে হাস্যরসকে আরও জম-জমাট ভর-ভরাট করে তোলেন, কিন্তু এ দুজনেরই সমস্যা হরবোলা সম্প্রদায়ের চেয়ে অনেক সহজ। এঁদের রসিকতা ঘটনা কিংবা অ্যাক্‌শান নিয়ে—কেউ কলার খোসায় পা দিয়ে পিছলে পড়লেন, কেউ 'পিয়া মিলন কো' গিয়ে খাণ্ডার স্ত্রীর সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে পড়লেন, কাজেই তাঁর অভিনয় অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু সুকুমার রায়ের রসিকতা সূক্ষ্মতর, হাস্যরসের জগতে সূক্ষ্মতম বললেই ঠিক বলা হয়, সে-রসিকতা প্রধানত ভাষায় এবং ভাষা ছাড়িয়ে ব্যঞ্জনায়। অভিনয়ের ভিতর দিকে তাকে বাহ্য রূপ দেওয়া, চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলা (একসটেরিয়োরাইজ করা) ত সহজ কর্ম নয়। করিই বা কি প্রকারে? বাস্টার কীটনের মত প্যাঁচা-ঢঙে, না চার্লির মত একটুখানি রসিয়ে?

এই হল আমার ধোঁকা।

'হরবোলা' সম্প্রদায়ের মস্ত একটা সুবিধে, তাঁরা 'সকের দল' গড়েছেন। কাজেই তাঁরা একসপেরিমেণ্ট করতে ভয় পাবেন না জানি, সেই আমার ভরসা। আঙ্গিক নিয়ে ধোঁকা থাকলেও এ-বিষয়ে আমার মনে কণামাত্র সন্দেহ নেই যে, তাঁরা সে-আঙ্গিক ব্যবহারে অভিনয়ের দিক দিয়ে প্রচুর সফলতা অর্জন করেছেন। সুতরাং তাঁরা যদি সুকুমার রায়ের আসছে পালা কীর্তন-আঙ্গিকে করে দেখেন তবে মন্দ হয় না। এই ধরনের এক্সপেরিমেণ্ট করে করেই শেষটায় পরিষ্কার হয়ে যাবে ঠিক কোন্ আঙ্গিক সুকুমার রায়ের হাস্যরসকে রঙ্গমঞ্চে রূপায়িত করার উপযুক্ত।

'শক্তিশেল'-এর সঙ্গীতের পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন আমার জনৈক বন্ধু, ওস্তাদ ফৈয়জ খানের শিষ্য। আমি তাঁর অন্ধ ভক্ত, কাজেই এস্থলে তাঁর সঙ্গীত-পরিচালনার গুণাগুণ যদি আমি বিচার না করি, তবে আশা করি তিনি অপরাধ নেবেন না।

শেষ কথা, কর্মকর্তাগণ অভ্যাগত-অতিথিদের প্রচুর খাতির-যত্ন করেন। শুধু লৌকিকতা বা মুখের কথা নয়, আমি সর্বান্তঃকরণে 'হরবোলা'র হরবকৎ হরেক-রকমের উন্নতি কামনা করি।

সুকুমার রায়ের মত হাস্যরসিক বাঙলা সাহিত্যে আর নেই সে-কথা রসিকজন মাত্রেই স্বীকার করে নিয়েছে, কিন্তু এ-কথা অল্প লোকেই জানেন যে, তাঁর জুড়ি ফরাসী, ইংরেজী, জর্মন সাহিত্যেও নেই, রাশানে আছে বলে শুনি নি। এ-কথাটা আমাকে বিশেষ জোর দিয়ে বলতে হল, কারণ আমি বহু অনুসন্ধান করার পর এই সিদ্ধান্তে এসেছি।

একমাত্র জর্মন সাহিত্যের ভিলহেল্‌ম্‌ বুশ সুকুমারের সমগোত্রীয়—স্ব-শ্রেণী না হলেও। ঠিক সুকুমারের মত তিনিও অল্প কয়েকটি আঁচড় কেটে খাসা ছবি ওতরাতে পারতেন। তাই তিনিও সুকুমারের মত আপন লেখার ইলাসট্রেশন নিজেই করেছেন। বুশের লেখা ও ছবি যে ইয়োরোপে অভূতপূর্ব সে-কথা 'চক্ষুয়া' ইংরেজ ছাড়া আর সবাই জানে।

বুশ এবং সুকুমার রায়ে প্রধান তফাত এই যে, বুশ বেশীর ভাগই ঘটনা-বহুল গল্প ছড়ায় বলে গিয়েছেন এবং সে-কর্ম অপেক্ষাকৃত সরল, কিন্তু সুকুমার রায়ের বহু ছড়া নিছক 'আবোল-তাবোল' , তাতে গল্প নেই, ঘটনা নেই, কিছুই নেই—আছে শুধু মজা আর হাসি। বিশুদ্ধ উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত যে-বকম শুধুমাত্র ধ্বনির উপর নির্ভর করে, তার সঙ্গে কথা জুড়ে দিয়ে গীত বানাতে হয় না, ঠিক তেমনি সুকুমার রায়ের বহু বহু ছড়া শ্রেফ হাস্যরস, তাতে অ্যাকশান নেই, গল্প নেই অর্থাৎ আর-কোন দ্বিতীয় বস্তুর সেখানে স্থান নেই, প্রয়োজনও নেই। এ বড় কঠিন কর্ম। এ-কর্ম তিনিই করতে পারেন, যাঁর বিধিদত্ত ক্ষমতা আছে। এ-জিনিস অভ্যাসের জিনিস নয়, ঘষে মেজে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এ-বস্তু হয় না।

বুশ আর সুকুমারের শেষ মিল, এদের অনুকরণ করাব ব্যর্থ চেষ্টা জর্মন কিংবা বাংলায় কেউ কখনও করেন নি, এঁদের ছাড়িয়ে যাবার ত কথাই ওঠে না।

একদা প্যারিস শহরে আমি, কয়েকজন হাস্যরসিকের কাছে 'বোম্বাগড়ের রাজা'র অনুবাদ করে শোনাই—অবশ্য আমসত্ত্বভাজা কী তা আমাকে বুঝিয়ে বলতে হয়েছিল (তাতে করে কিঞ্চিৎ রসভঙ্গ হয়েছিল অস্বীকার করি নে) এবং 'আলতা'র বদলে আমি লিপস্টিক ব্যবহার করেছিলুম (আমার ঠোঁটে কিংবা চোখে নয়—অনুবাদে)।

ফরাসী কাফেতে লোকে হো-হো করে হাসে না, এটিকেটে বারণ, কিন্তু আমার সঙ্গীগণের হাসির হর্রাতে আমি পর্যন্ত বিচলিত হয়ে তাঁদের হাসি বন্ধ করতে বার বার অনুরোধ করেছিলুম। কিছুতেই থামেন না। শেষটায় বললুম,

তোমরা যেভাবে হাসছ, তাতে লোকে ভাববে, আমি বিদেশী গাড়ল, বেফাঁস কিছু একটা বলে ফেলেছি আর তোমরা আমাকে নিয়ে হাসছ—আমার বড় লজ্জা করছে।' তখন তাঁরা দয়া করে থামলেন, ওদিকে আর পাঁচজন আমার দিকে আড়নয়নে তাকাচ্ছিল বলে আমি ত ঘেমে কাঁই।

তারপর একজন বললেন, 'এরকম weird, ছন্নছাড়া, ছিষ্টিছাড়া কর্মের ফিরিস্তি আমি জীবনে কখনও শুনি নি।'

আরেকজন বললেন, 'ঠিক। এবার একটা চেষ্টা দেওয়া যাক, এ লিস্টে আর কিছু জুতসই বাড়ানো যায় কি না।'

সবাই মিলে অনেকক্ষণ ধবে আকাশপাতাল হাতড়ালুম, দু-একজন একটা দুটো অদ্ভুত কর্মের নামও করলেন, কিন্তু আব সবাই সেগুলো পত্রপাঠ ডিসমিস করে দিলেন। আমরা জন পাঁচ প্রাণী প্রায় আধ ঘণ্টা ধ্বস্তাধ্বস্তি করেও একটা মাত্র জুৎসই এপেন্‌ডিক্‌স্‌ পেলুম না। গোটা কবিতার ত প্রশ্নই ওঠে না।

আগেব থেকেই জানতুম, কিন্তু সেদিন আবাব নূতন করে উপলব্ধি করলুম, যদিও সুকুমার রায় স্বয়ং বলেছেন, 'উৎসাহে কি না হয়, কি না হয় চেষ্টায়', যে-জগতে সুকুমার বিচরণ করতেন, সেখানে তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্‌।

সিগনেট প্রেস সুকুমাব রায়কে পুনরায় বাঙালী পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন বলে বাংলার ভিতরে বাইরে বহু লোক ওই প্রতিষ্ঠানের প্রশংসা করছেন। আমিও তাঁদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছি। আমাব বাসনা, সিগনেট যত শীঘ্র পারেন সুকুমার রায়ের অন্যান্য গদ্য পদ্য লেখা যেন পুনরায় প্রকাশ করেন। বহু অতুলনীয় অনবদ্য অভূতপূর্ব লেখা 'সন্দেশ'-এর ফাইলে চাপা পড়ে আছে। 'পাগলা দাশু'কে পেয়ে যেন লঙ লস্ট ব্রাদাবকে পাওয়াব আনন্দে তাকে জড়িয়ে ধরেছি, কিন্তু তার আর সব ভাই-বেরাদররা কোথায়? তারা যেন আর বেশীদিন আত্মগোপন না করে।

দু-একটি অসাবধানতা লক্ষ্য করেছি, তারই একটা এ-স্থলে নিবেদন করি।

'খাই-খাই' কাব্যের 'পরিবেশন' কবিতায় আপ্তবাক্য দেখছি—

'কোনো চাচা অন্ধপ্রায় ('মাইনাস' কুড়ি)
ছড়ায় ছোলার ডাল পথঘাট জুড়ি।
মাতব্বর যায় দেখ মুদি চক্ষু দুটি
"কারো কিছু চাই" বলি তড়বড় ছুটি
বীরোচিত ধীর পদে এসে দেখি ত্রস্তে
ওই দিকে খালি পাত, চল হাঁড়ি হস্তে'

অথচ আমার অর্ধবিস্মৃত স্মরণশক্তি বলেছে :—

'কোনো চাচা অন্ধপ্রায় (মাইনাস কুড়ি)
ছড়ায় ছোলার ডাল পথঘাট জুড়ি।
মাতব্বর যায় দেখ মুদি চক্ষু দুটি
"কারো কিছু চাই" বলে' তড়বড় ছুটি।
হঠাৎ ডালের পাঁকে পদার্পণ মাত্রে
হুড়মুড়ি পড়ে কারো নিরামিষ পাত্রে।
বীরোচিত ধীরপদে'
—ইত্যাদি ইত্যাদি

'হঠাৎ ডালের পাঁকে' ইত্যাদি লাইন দুটো বাদ পড়াতে অর্থ অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছে।

কিন্তু থাক্, আর না। সুকুমার রায় বলেছেন :

'বেশ বলেছ, ঢের বলেছ
ঐখেনে দাও দাঁড়ি,
হাটেব মাঝে ভাঙবে কেন
বিদ্যে বোঝাই হাঁড়ি ॥'

ভাষার জমা-খরচ

পুব-বাংলার বিস্তর নরনারী চিরকালই কলকাতায় ছিলেন ; কিন্তু এবারে কলকাতায় এসে দেখি তাঁদেব সংখ্যা এক লপ্‌তে গুয়া গাছের ডগায় উঠে গিয়েছে। কিছুদিন পূর্বেও পুব-বাংলার উপভাষা দক্ষিণ কলকাতাতেই শোনা যেত, এখন দেখি তামাম কলকাতাময় বাঙাল ভাষার (আমি কোন কটু অর্থে শব্দটি ব্যবহার করছি নে—শব্দটি সংক্ষিপ্ত এবং মধুর) ছয়লাপ।

বাঙাল ভাষা মিষ্ট এবং তার এমন সব গুণ আছে যার পুরো ফায়দা এখনও কোন লেখক ওঠান নি। পুব-বাংলার লেখকেরা ভাবেন, 'ক'রে' শব্দকে 'কইরা' এবং অন্যান্য ক্রিয়াকে সম্প্রসারিত করলেই বুঝি বাঙাল ভাষার প্রতি সুবিচার করা হয়ে গেল। বাঙাল ভাষার আসল জোর তার নিজস্ব বাক্যভঙ্গীতে বা ইডিয়মে—অবশ্য সেগুলো ভেবেচিন্তে ব্যবহার করতে হয় যাতে করে সে-ইডিয়ম পশ্চিমবঙ্গ তথা পুব-বাংলার সাধারণ পাঠক পড়ে বুঝতে পারে। যেমন মনে করুন, বড়লোকের সঙ্গে টক্কর দিতে গিয়ে যদি গরিব-বাপ [illegible]

অঞ্চলে বলে, 'হাত্তির লগে পাত্তি খেলতায় গেছলায় কেন ?' অর্থাৎ 'হাতির সঙ্গে পাতি খেলতে গিয়েছিলে কেন ?' কিন্তু পাত্তিখেলা যে Polo খেলা সে-কথা বাংলা দেশের কম লোকই জানেন, (চলন্তিকা এবং জ্ঞানেন্দ্রমোহনে শব্দটি নেই) কাজেই এ-ইডিয়ম ব্যবহার করলে রস ঠিক ওতরাবে না। আবার,

'দুষ্টুলোকের মিষ্ট কথা,
দিঘল-ঘোমটা নারী
পানার তলার শীতল জল।
তিনই মন্দকারী।'

'কামুফ্লাজ' বোঝাবার উত্তম ইডিয়ম। পুব, পশ্চিম কোন বাংলার লোকের বুঝতে কিছুমাত্র অসুবিধে হবে না।

ইডিয়ম, প্রবাদ, নিজস্ব শব্দ ছাড়া বাঙাল সভ্যতায় আরেকটি মহদ্‌গুণ আছে এবং এ-গুণটি ঢাকা শহরের 'কুট্টি' সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ—যদিও তার রস তাবৎ পুব-বাংলা এবং পশ্চিম-বাংলারও কেউ কেউ চেখেছেন। কুট্টির রস-পটুতা বা wit সম্পূর্ণ শহুরে বা 'নাগরিক'—এস্থলে আমি নাগরিক শব্দটি প্রাচীন সংস্কৃত অর্থে ব্যবহার করলুম, অর্থাৎ চটুল, শৌখিন, হয়ত বা কিঞ্চিৎ ডেকাডেন্ট।

কলকাতা, লখনউ, দিল্লি, আগ্রা, বহু শহরে আমি বহু বৎসর কাটিয়েছি এবং স্বীকার করি লখনউ, দিল্লিতে (ভারত বিভাগের পূর্বে) গাড়োয়ান সম্প্রদায় বেশ সুরসিক। কিন্তু এদের সব্বাইকে হার মানতে হয় ঢাকার কুট্টির আছে। তার উইট, তার রিপার্টি (মুখে মুখে উত্তর দিয়ে বিপক্ষকে বাক্‌শূন্য করা, ফার্সী এবং উর্দুতে যাকে বলে 'হাজির-জবাব') এমনই তীক্ষ্ণ এবং ক্ষুরস্ত ধারার ন্যায় নির্মম যে আমার সলা যদি নেন তবে বলব, কুট্টির সঙ্গে ফস করে মস্করা না করতে যাওয়াটাই বিবেচকের কর্ম।

• • •

প্রথম তা হলে একটি সর্বজন-পরিচিত রসিকতা দিয়েই আরম্ভ করি। শাস্ত্রও বলেন, অরুন্ধতী-ন্যায় সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায় অর্থাৎ পাঠকের চেনা জিনিস থেকে ধীরে ধীরে অচেনা জিনিসে গেলেই পাঠক অনায়াসে নূতন বস্তুটি চিনতে পারে—ইংরেজীতে এই পন্থাতেই 'ফ্রম স্কুলরুম টু দি ওয়াইড ওয়ার্লড' বলে)

আমি কুট্টি ভাষা বুঝি কিন্তু বলতে পারি নে। তাই পশ্চিমবাংলার ভাষাতেই নিবেদন করি।

যাত্রী, 'রমনা যেতে কত নেবে ?'

কুট্টি গাড়োয়ান, 'এমনিতে ত দেড় টাকা, কিন্তু কর্তার জন্য এক টাকাতেই হবে।'

যাত্রী, 'বল কী হে? ছ আনায় হবে না?'

কুট্টি, 'আস্তে কন, কর্তা, ঘোড়ায় শুনলে হাসবে।'

এর জুতসই উত্তর আমি এখনও খুঁজে পাই নি।

মোটেই ভাববেন না যে, এ-জাতীয় রসিকতা মান্ধাতার আমলে একসঙ্গে নির্মিত হয়েছিল এবং আজও কুট্টিরা সেগুলো ভাঙিয়ে খাচ্ছে।

'ঘোড়ার হাসি'র মত কতকগুলো গল্প অবশ্য কালাতীত, অজবামর, কিন্তু কুট্টি হামেশাই চেষ্টা করে নূতন নূতন পবিবেশে নূতন নূতন রসিকতা তৈরি করার।

প্রথম যখন ঢাকাতে ঘোড়দৌড় চালু হল তখন এক কুট্টি গিয়ে যে-ঘোড়াটাকে ব্যাক করল সেটা এল সর্বশেষে। বাবু বললেন, 'এ কী ঘোড়াকে ব্যাক করলে হে? সক্কলের শেষে এল?'

কুট্টি হেসে বললে, 'কন্ কী কর্তা, দেখলেন না, ঘোড়া ত নয়, বাঘের বাচ্চা, বেবাকগুলোকে খেদিয়ে নিয়ে গেল।'

আমি যদি নীতি-কবি ঈসপ কিংবা সাদী হতুম, তবে নিশ্চয়ই এর থেকে 'মরাল' ড্র করে বলতুম, একেই বলে 'রিয়েল, হেলথী, অপটিমিজ্ম।'

কিংবা, আরেকটি গল্প নিন, এটা একেবারে নিতান্ত এ-যুগের।

পাকিস্তান হওয়ার পর বিদেশীদের পাল্লায় পড়ে ঢাকার লোকও মর্নিং স্যুট, ডিনার জ্যাকেট পরতে শিখেছেন। হাঙ্গামা বাঁচাবার জন্য এক ভদ্রলোক গেছেন একটি কালো লঙ কোট বা প্রিন্স-কোট বানাতে। ভদ্রলোকের রঙ মিশ্কালো, তদুপরি তিনি হাড়কিপটে। কালো বনাত দেখলেন, সার্জ দেখলেন, আলপাকা দেখলেন, কোনও কাপড়ই তাঁর পছন্দ হয় না, অর্থাৎ দাম পছন্দ হয় না। দোকানী শেষটায় বিরক্ত হয়ে ভদ্রলোককে সদুপদেশ দিল, 'কর্তা, আপনি কালো কোটের জন্য খামকা পয়সা খরচা করতে যাবেন কেন? খোলা গায়ে বুকের উপর ছটা বোতাম, আর দু হাতে কব্জির কাছে তিনটে তিনটে করে ছোট বোতাম লাগিয়ে নিন। খাসা প্রিন্স-কোট হয়ে যাবে।'

তিন বৎসর পূর্বেও কলকাতায় মেলা অনুসন্ধান না করে বাখরখানী (বাকির-খানি) রুটি পাওয়া যেত না; আজ এই আমীর আলী অ্যাভিন্যুতেই অন্তত আধাডজন দোকানে সাইনবোর্ডে বাখর-খানী লেখা রয়েছে। তাই বিবেচনা করি, কুট্টির সব গল্পই ক্রমে ক্রমে বাখরখানীর মতই পশ্চিম-বাংলায় ছড়িয়ে

পড়বে এবং তার নূতনত্বে মুগ্ধ হয়ে কোন কৃতি লেখক সেগুলোকে আপন লেখাতে মিশিয়ে নিয়ে সাহিত্যের পর্যায়ে তুলে দেবেন—পরশুরাম যে-রকম পশ্চিমবাংলার নানা হাল্কা রসিকতা ব্যবহার করে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, হুতোম যে-রকম একদা কলকাতার নিতান্ত ককনিকে সাহিত্যের সিংহাসনে বসাতে সমর্থ হয়েছিলেন।

এটা হল জমার দিকে, কিন্তু খরচের দিকে, একটা বড় লোকসান আমার কাছে ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে আসছে, নিবেদন করি।

ভদ্র এবং শিক্ষিত লোকেরই স্বভাব অপরিচিত, অর্ধপরিচিত কিংবা বিদেশীর সামনে এমন ভাষা ব্যবহার না করা, যে-ভাষা বিদেশী অনায়াসে বুঝতে না পারে। তাই খাস কলকাতার শিক্ষিত লোক পুব-বাঙালীর সঙ্গে কথা বলবার সময় খাস কলকাত্তাই শব্দ, মোটামুটি ভাবে যেগুলোকে ঘরোয়া অথবা 'স্ল্যাঙ' বলা যেতে পারে, ব্যবহার করেন না। তাই এস্তার, ইলাহি, বেলেল্লা, বেহেড, দো গেড়ের চ্যাং এ-সব শব্দ এবং বাক্য কলকাতার ভদ্রলোক পুব-বাঙালীর সামনে সচরাচর ব্যবহার করেন না। অবশ্য যদি বক্তা সুরসিক হন এবং আসরে মাত্র একটি কিংবা দুটি ভিন্ন প্রদেশের লোক থাকেন তবে তিনি অনেক সময় আপন অজানাতেই অনেক ঝাঁঝ-ওলা ঘরোয়া শব্দ ব্যবহার করে ফেলেন।

ত্রিশ বৎসর পূর্বে শ্যামবাজারের রক্-আড্ডাতে পুব-বাঙালীর সংখ্যা থাকত অতিশয় নগণ্য। তাই শ্যামবাজারী গল্প ছোটালে এমন সব ঘরোয়া শব্দ, বাক্য প্রবাদ ব্যবহার করতেন এবং নয়া নয়া বাক্য-ভঙ্গী বানাতেন যে, রসিকজনই বাহবা শাবাশ না বলে থাকতে পারত না।

আজ পুব-বাংলার বহু লোক কলকাতার আসর সরগরম করে বসেছেন বলে খাঁটি কলকাত্তাই আপন ভাষা সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন হয়ে গিয়েছেন এবং ঘরোয়া শব্দ-বিন্যাস-ব্যবহার ক্রমেই কমিয়ে দিচ্ছেন। হয়ত এঁরা বাড়িতে এসব শব্দ এখনও ব্যবহার করেন; কিন্তু আড্ডা তো বাড়ির লোকের সঙ্গে জম-জমাট হয় না—আড্ডা জমে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে এবং সেই আড্ডাতে পুব-বাংলার সদস্যসংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে বলে খাস কলকাত্তাই আপন ঘরোয়া শব্দগুলো ব্যবহার না করে করে ক্রমেই এগুলো ভুলে যাচ্ছেন। কোথায় না এসব শব্দ আস্তে আস্তে ভদ্র ভাষায় স্থান পেয়ে শেষটায় অভিধানে উঠবে, উল্টে এগুলো কলকাতা থেকে অন্তর্ধান করে যাবে।

আরেক শ্রেণীর খানদানী কলকাত্তাই চমৎকার বাংলা বলতেন। এঁরা ছেলেবেলায় সায়েবী ইস্কুলে পড়েছিলেন বলে বাংলা জানতেন অত্যন্ত কম এবং বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক ছিল ভাসুর ভাদ্রবধূর। তাই এঁরা বলতেন

ঠাকুরমা দিদিমার কাছে শেখা বাংলা এবং সে-বাংলা যে কত মধুর এবং ঝলমলে ছিল তা শুধু তাঁরাই বলতে পারবেন যাঁরা সে-বাংলা শুনেছেন। ক্রীক রোর মন্মথ দত্ত ছিলেন সোনার বেনে, আমার অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু, কলকাতার অতি খানদানী ঘরে জন্ম। মন্মথদা যে-বাংলা বলতেন তার উপর বাংলা সাহিত্যের বা পুব-বাংলার কথ্য ভাষার কোনও ছাপ কখনও পড়ে নি। তিনি যখনই কথা বলতে আরম্ভ করতেন, আমি মুগ্ধ হয়ে শুনতুম আর মন্মথদা উৎসাহ পেয়ে রেকাবের পর রেকাব চড়ে চড়ে একদম আসমানে উঠে যেতেন। কেউ অন্য-মনস্ক হলে বলতেন, 'ও পরান, ঘুমুলে ?' মন্মথদার কাছ থেকে এ-অধম এন্তার বাংলা শব্দ শিখেছে।

আরেকজনকে অনেক বাঙালীই চেনেন। এঁর নাম গাঙ্গুলী মশাই—ইনি ছিলেন শান্তিনিকেতন অতিথিশালার ম্যানেজার। ইনি পিরিলি ঘরের ছেলে এবং গল্প বলার অসাধারণ অলৌকিক ক্ষমতা এঁর ছিল। বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত হরিনাথ দে, সুসাহিত্যিক সুবেশ সমাজপতি ছিলেন এঁর বাল্যবন্ধু, এবং শুনেছি এঁরা এঁর গল্প মুগ্ধ হয়ে শুনতেন।

কলের এক দিক দিয়ে গোরু ঢোক'নো হচ্ছে, অন্য দিক দিয়ে জলতরঙ্গের মত ঢেউয়ে ঢেউয়ে মিলিটারি বুট বেরিয়ে আসছে, টারালাপ, টাবালাপ্ করে, গাঙ্গুলী মশাই আর অন্যান্য ক্যাডেটেরা বসে আছেন পা লম্বা করে, আর জুতো-গুলো ফটাফট করে ফিট হয়ে যাচ্ছে—এ-গল্প শুনে শান্তিনিকেতনের কোন্ ছেলে হেসে কুটিপাটি হয় নি ?

হায়, এ-শ্রেণীর লোক এখন আর দেখতে পাই নে। তবুও এখনও আমার শেষ ভরসা শ্যামবাজারের উপর।

দর্শনচর্চা

মাদ্রাজে দর্শনশাস্ত্রের ছাত্রগণের এক সভায় শ্রীযুত রাজাগোপালাচারী বলেন, 'প্রাচীনকালে চরম ও পরম সত্যের অন্বেষণার জন্য যাঁহারা দর্শনশাস্ত্রের অধ্যয়ন প্রবর্তন করেন, তাঁহারা ইহাকে কেবল বাস্তব ক্ষেত্রে সম্ভবপর বলিয়াই মনে করতেন না, তাঁহারা ইহাকে অতিশয় প্রয়োজনীয় বলিয়াও মনে করিতেন। ক্রমে ক্রমে পরবর্তী কালে দার্শনিকগণ যে-সমস্ত কথা লিখিলেন তাহা অর্থহীন হইয়া পড়িল এবং শেষ পর্যন্ত সে-সমস্ত কথা একত্র গ্রথিত কতকগুলি কথার মালা ব্যতীত আর কিছুই হইল না।'

ঠিক এই উক্তিটিই আজকাল নানা গুণী জ্ঞানীর মুখে শুনতে পাওয়া যায় বলে এ-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন।

এককালে দর্শনচর্চার প্র্যাকটিকাল মূল্য ছিল, এখন আর নেই; এখন দার্শনিক-দের কেতাবে শুধু শব্দ আর শব্দ, এই হল রাজাজীর মূল বক্তব্য।

এককালে 'ক' ছিল এখন 'খ' হয়ে গিয়েছে, সে-কথা কেউ বললেই দার্শনিকরা তার জবাবে বলেন, কারণ বিনা কার্য হয় না, অতএব দেখতে হবে দর্শনের বাস্তব মূল্য হঠাৎ উবে গেল কেন।

এ-কথা যদি প্রমাণ করা যায় যে, দার্শনিকেরা আস্তে আস্তে চরম ও পরম সত্যের সন্ধান ছেড়ে দিয়ে একদিন অসত্যের সন্ধানে লেগে গেলেন তা হলে অবশ্য এটা অসম্ভব নয় যে, সেই কারণেই তাদের পুস্তকারাজি আজ অবোধ্য হয়ে উঠেছে; কিন্তু এযাবৎ, কি এদেশে, কি বিদেশে, কেউ ত দার্শনিকদের এ-রকম সন্দেহের চোখে কখনও দেখে নি। বরঞ্চ বেশ জোর দিয়ে বলতে হবে, সত্য দার্শনিক চরম সত্য ছাড়া অন্য কোনও জিনিসের সন্ধান কখনও করে নি— ধাপ্পাবাজি জাল-জোচ্চুরি করার ক্ষমতা যার আছে, সে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নে মন দেবে কেন, এসব ত করে অন্য লোকেরা। এই দার্শনিকই তাই দুঃখ করে বলেছেন,

প্রতারণাসমর্থজনে বিদ্যয়া কিম্
প্রয়োজনম!

অর্থাৎ যে প্রতারণা করতে জানে তার বিদ্যার কি প্রয়োজন। তারপরই তিনি আবার বলেছেন ঠিক ওই একই বাক্য,

প্রতারণাসমর্থজনে বিদ্যয়া কিম্
প্রয়োজনম্!

কিন্তু এবারে প্রতারণাসমর্থ শব্দের সন্ধি ভাঙতে হবে প্রতারণা+অসমর্থ দিয়ে, অর্থাৎ তুমি যদি প্রতারণা না করতে জান তবে বিদ্যে নিয়ে তোমার কী কাজ হবে?

তাই বিদ্যা বিদ্যারই জন্য, দর্শন দর্শনেরই জন্য, অর্থাৎ সত্যানুসন্ধান সত্যানু-সন্ধানেরই জন্য। সত্য নিরূপিত হলে সেটা যদি তোমার আমার কাজে না লাগে তবে সত্যের সেটা দোষ নয়। শিবলিঙ্গ দিয়ে যদি মশারির পেরেক ঠোকা না যায় তবে সেটা শিবলিঙ্গের দোষ নয়।

মানুষ কোনও যুগেই সম্পূর্ণ সত্যের সন্ধান পায় নি—পেয়ে থাকলে তার আর অবনতি উন্নতি কিছুই হত না। সম্পূর্ণ সত্য ভগবানের হাতে, মানুষের কাজ,

হচ্ছে প্রাণপণ চেষ্টা করা সেই সত্যের যতদূর সম্ভব কাছে পৌঁছনোর। তাই করতে গিয়ে তার প্রচেষ্টার ফল যদি অবাস্তব (ইমপ্র্যাকটিকাল) হয় তবু তাকে সত্যেরই সন্ধান করতে হবে।

এ-স্থলে আর একটি কথা ওঠে। সত্য নিরূপিত হলে তাকে কাজে লাগাবার ভার কার হাতে? এখানে বিজ্ঞান থেকে একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। এটম বম বানাবার সূত্রটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করলেন তারপর এটম বম্ বানানো হবে কি না এবং হলে পর সেটা হিরোসিমার মাথায় ফাটানো হবে কিনা সেটা স্থির করেন রাজনৈতিকরা, সমাজপতিরা, জাঁদরেলরা। তাঁরা যদি না চান, তবে বৈজ্ঞানিকদের সাধ্য নেই যে, তাঁরা এটম বম্ হাতে নিয়ে ভুবনময় দাবড়ে বেড়াবেন। এবং শেষ পর্যন্ত এটা বানানো হোক আর নাই হোক, এটম বম ভাল কাজে লাগুক আর মন্দ কাজেই লাগুক, এটম বম তৈরি করার পিছনে যে বৈজ্ঞানিক সত্য সূত্র আবিষ্কৃত হল সেটা সত্যই থেকে যাবে।

কিন্তু এগুলো হল আংশিক সত্য—বৈজ্ঞানিকের সন্ধানের আদর্শ। দার্শনিক সন্ধান করেন চরম সত্যের। সে-সত্য কখনও কারও অমঙ্গল করতে পারে না। কারণ পৃথিবীর সর্বত্রই স্বীকৃত হয়েছে, যাহা সত্য তাহাই শিব এবং তাহাই সুন্দর। এই তিনের চরম রূপ কখনই একে অন্যকে আঘাত করতে পারে না।

বৈজ্ঞানিক তথ্যের বেলা যে-রকম, দার্শনিক-সত্যের বেলাও ঠিক তেমনি। রাজনৈতিক, সমাজবিদ্ এবং আর পাঁচজন স্থির করবেন দার্শনিক-সত্যের কতখানি মানব-সমাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। রাজাজী দার্শনিকদের প্রতি কটাক্ষ করে বলেছেন, 'আধুনিক যুগের দার্শনিকগণের আরম্ভ সংশয়ে, পরিসমাপ্তি সংশয়ে এবং তারা চিরসংশয়বাদী। এই সংশয় ধর্মবিশ্বাসের স্থান অধিকার করিয়াছে।' যদি বা এ-মন্তব্য স্বীকার করে নিই, তবু আবার বলতে হবে, সংশয়বাদ ধর্মের আসন কেড়ে নেবে কিনা সে-কথা স্থির করবেন সমাজপতিরা। দার্শনিকেরা সত্য নিরূপণ করাটাই তাঁদের চরম স্বধর্ম বলে বিশ্বাস করেন, সে-নিরূপণ সমাজে কী স্থান নেবে, সে সম্বন্ধে তাঁরা উদাসীন।

এককালে চিত্রকলা, সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদি সর্ব কলা-শিল্প ধর্মের সেবা করত। ছবি আঁকা হত দেবদেবীর, গান গাওয়া হত দেবদেবীর, নৃত্য করা হত দেবতার সামনে। আজ নন্দলাল দেবদেবীর ছবি আঁকেন, আবার খোয়াইডাঙারও ছবি আঁকেন (এবং নন্দলালও খাঁটি বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকের ন্যায় সম্পূর্ণ উদাসীন যে, লোকে তাঁর দেবদেবীর ছবিকে পূজো করছে কি না, তিনি সুন্দরের রূপ দিয়েই আনন্দিত), রবীন্দ্রনাথ রচেছেন শত শত বর্ষার গান, উদয়শঙ্করের আপন

রচা সার্থক নৃত্যের বেশীর ভাগ সামাজিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে। তাই বলে আজ কি কেউ এ-অপবাদ দেয় যে, এদের কলা-সৃষ্টি প্র্যাকটিকাল নয়, রবীন্দ্রনাথের গান 'একত্র গ্রথিত কতকগুলি কথার মালা ব্যতীত আর কিছুই নয়', উদয়শঙ্করের নৃত্যে আছে শুধু কতকগুলো অর্থহীন অঙ্গসঞ্চালন এবং পদবিন্যাস!

মোদ্দা কথা এই, যাঁরা 'ধর্মপ্রাণ' তাঁরা এঁদের সৃষ্টিকর্ম, বৈজ্ঞানিকের তথ্য, দার্শনিকের সত্য, ধর্মের সেবায় নিয়োজিত করতে পারছেন না বলে দোষ দিচ্ছেন বৈজ্ঞানিককে, কলাকারকে, দার্শনিককে।

কেন পারছেন না, এ-প্রশ্ন যদি কেউ শুধায় তবে অপ্রিয় সত্য বলতে হবে, এবং আজ যখন অপ্রিয় সত্য দিয়েই তত্ত্বালোচনা আরম্ভ করেছি তবে সেই আলাপই এখন তালে চলে আসুক। আসল কথা হচ্ছে এই, আজ যাঁরা 'হা ধর্ম হা ধর্ম' করেন, তাঁদের অধিকাংশই (রাজাজীর কথা বলছি নে, তিনি সত্যই ধর্মপ্রাণ কি না সে বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত কোন অভিজ্ঞতা নেই) ধর্মে একনিষ্ঠ নন। স্বধর্মে, সত্য ধর্মে, সনাতন ধর্মে যদি তাঁদের শ্রদ্ধা ঐকান্তিক এবং অবিচল হত তবে তাঁরা আজ দার্শনিককে, কাল বৈজ্ঞানিককে হিরণ্যকশিপু, হিরণাক্ষ্য নামে অভিহিত করতেন না।

কিন্তু আমি কে? আমার ছোট মুখে বড় কথা কেন?

অতএব সে আপ্ত-বাক্য সন্ধান করে, এক ঋষির বচন উদ্ধৃত করে তাঁরই পশ্চাতে আশ্রয় নিই

সে ঋষি প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবিগুরুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তাঁর মত ধর্মনিষ্ঠ ঋষি উনবিংশ শতাব্দীতে জন্মেছেন অতি কম। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি এরকম ভগবৎপ্রেমিক আমি আমার জীবনে অল্পই দেখেছি।

তিনি লিখেছেন,

'একটা ক্রন্দন এবং বিলাপের অভিনয় সম্প্রতি আমাদের দেশের একদল নিষ্কর্মা লোকের একটা বাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাঁদুনি গায়কদিগের ধুয়া এই যে, আমাদের দেশের এমন যে একটি সেকেলে পৈতৃক সম্পত্তি—বৈরাগ্য, একেলে সভ্যতার হস্তে পড়িয়া তাহার অন্তিম দশা ঘনাইয়া আসিয়াছে—তিনি আর বেশী দিন টেঁকেন না। এইরূপ ক্রন্দন শুনিলে আমাদের হাসি পায়, কান্না ও হাসি পায়। হাসি পায় তার কারণ এই যে, বৈরাগ্য যদি তোমার এতই প্রিয়বস্তু, তবে তার পথ অবলম্বন কর—ক্রন্দন কেন? একেলে সভ্যতা ত আর তোমার হাত পা বাঁধিয়া রাখে নাই; কোতোয়ালের প্রতি মহারাণীর

(ভিক্টোরিয়া) এমন কোনও শক্ত রাজাজ্ঞা নাই যে 'কাহাকেও বৈরাগ্যের পথে চলিতে দেখিয়াছ কি আর অমনি তাহার শির লইবে'। বৈরাগ্য ত আর বাজারের সামগ্রী নয় যে, সেকালের বাজারে তাহা সুলভ ছিল, একালের বাজারে তাহা দুর্মূল্য হইয়াছে। বাজারের সামগ্রী স্বতন্ত্র; আর অন্তঃকরণের সামগ্রী স্বতন্ত্র; বাজারের সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ের বস্তু—অন্তঃকরণের সামগ্রী সাধনের বস্তু। তুমি বলিবে যে কাল পড়িয়াছে শক্ত; চব্বিশ ঘণ্টা সংসারকার্যে ষোল আনা লিপ্ত থাকিলে যদি এক আনা কার্য হাসিল হয় তবে তাহাই গৃহী ব্যক্তির পরম সৌভাগ্য; দেখিতেছ না—একটা কেরানীগিরি খালি হইয়াছে কি আর অমনি দলকে দল বি এ, এম এ কাতারে কাতারে পিঁপড়ার পালের ন্যায় আপিস অঞ্চলে গতায়াত করিতে থাকে। ইহার উত্তরে আমি এই বলি যে, প্রকৃত বৈরাগ্য সংসারে কোন কর্তব্য সাধনেরই প্রতিবন্ধকতাচরণ করে না—তাহা দূরে থাকুক, সেরূপ বৈরাগ্য কর্তব্য সাধনের পথ আরও পরিষ্কার করিয়া দেয়। বৈরাগ্য অভ্যাস আর কিছু না—মনের সুর বাঁধা; সেতারের সুর বাঁধা থাকিলে যেমন তাহাতে যে রাগিণী ইচ্ছা, সেই রাগিণীই বাজানো যাইতে পারে, তেমনি অন্তঃকরণে বৈরাগ্যের সুর বাঁধা থাকিলে—যখন যাহা কর্তব্য তাহাই সুচারুরূপে নির্বাহ করা যাইতে পারে।' (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নানা চিন্তা, সাধনা—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য প্রবন্ধ, পৃ ১—২, বিশ্বভারতী)।

এই উদ্ধৃতিতে যেখানে যেখানে 'বৈরাগ্য' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, সেখানে 'ধর্ম' শব্দ ব্যবহার করলেই আমার বক্তব্য সুস্পষ্ট হবে ॥

লেসে ফ্যের

নৃতত্ত্ববিদের কৈলাস, কৈলাস পর্বতে নয়, তাঁদের স্বর্গ আসামের পর্বতে। এ-কথা ভূ-ভারতের তাবৎ নৃতত্ত্ববিদ্ উত্তমরূপে জানেন বলেই আসামে আসবার জন্য তাঁদের ছোঁকছোঁকের অন্ত ছিল না। কিন্তু ইংরেজ তখন আসামের ম্যানেজার, কাজেই ব্যাপারটা দাঁড়াল ইংরেজী প্রবাদে যাকে বলে 'ডগ্ ইন্ দি মেঞ্জার' নয় 'ডগ্ অ্যাণ্ড দি ম্যানেজার'। ইংরেজ নিজে অনুন্নত পার্বত্যজাতির ভিতর বসবাস করে তাদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধতর করত না, অন্য উৎসাহী পণ্ডিতকেও তাদের সঙ্গে মিশতে দিত না।

ইংরেজ কস্মিন্‌কালেও কোনও প্রকারের জ্ঞানচর্চা করে নি একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু ওই কর্ম সে করেছে রাজ্যবিস্তার এবং আনুষঙ্গিক ধনার্জনের

বহু পূর্বে। নৃতত্ত্ব এবং সমাজতত্ত্বের যখন প্রচার এবং প্রসার হল, টাকার গরমিতে ইংরেজ তখন 'কোনও প্রভু হস্তীদেহ ভুঁড়িখানা ভারী'গোছ হয়ে গিয়েছেন, মা-সরস্বতীর পিছনে আসামের বনে-বাদাড়ে ঘোরার মত গত্তি আর তাঁর গায়ে নেই। যে দু-চারখানা বই ইংরেজ আসামের অনুন্নত সম্প্রদায়গুলি সম্বন্ধে লিখেছে সেগুলো প্রাচীন পদ্ধতিতে লেখা—নৃতত্ত্বের নব নব তত্ত্বাবিষ্কারের দৃষ্টিবিন্দুর সন্ধান এ-কেতাবগুলোতে পাবেন না।

কিন্তু জানা-অজানায় ইংরেজ এদের অনেকের সর্বনাশ করে দিয়ে গিয়েছে, এদের ভিতর মিশনারিদের ঘোরাঘুরি এবং বসবাস করতে দিয়ে।

খ্রীষ্টধর্ম অতি উত্তম ধর্ম। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান কোনও ধর্ম থেকেই সে নিকৃষ্ট নয়। কোটি কোটি লোক শত শত বৎসর ধরে খ্রীষ্টের বাণী থেকে নব নব আদর্শের অনুপ্রেরণা পেয়েছে, খ্রীষ্টের অনুকরণ করে বহু সাধুসন্ত ভগবানের কাছে পৌঁছে গিয়েছেন, তাঁদের দেখে সংশয়বাদীরা বলেছেন, ভগবান আছেন কি না জানি নে কিন্তু যদি থাকেন তবে তাঁর স্বরূপ এঁদেরই মত।

কিন্তু সেই মহান ধর্ম প্রচারের ভার যদি অজ্ঞের হাতে পড়ে তবে তার ফল বিষময় হয়। কারণ সে তখন খ্রীষ্টের নামে যে-বাণী প্রচার করে সে উচাটন শয়তানের।

আসামের সব মিশনারি যে শয়তান ছিলেন, এ-কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু অজ্ঞের স্কন্ধে শয়তান ভর করে যে কী কুকর্ম করতে পারে সে-তত্ত্ব হজরৎ মুহম্মদ (দঃ) জানতেন বলেই বলেছেন,

মূর্খের উপাসনা অপেক্ষা জ্ঞানীর নিদ্রা শ্রেয়ঃ।

যে-মিশনারি এসে আসামের বনেব ভিতর বাসা বাঁধল তার বাংলো দেখে আমরা দূরের থেকে মুগ্ধ হই। অনেকটা যেন—

'ওই যেখানে দিঘির উঁচু পাড়ি,
সিসু গাছের তলাটিতে,
পাঁচিলঘেরা ছোট্ট বাড়ি
ওই যে রেলের কাছে,
ইষ্টেশনের বাবু থাকে,
আহা এরা কেমন সুখে আছে॥'

টিলার উপর ফুটফুটে বাংলো, চতুর্দিকে ফুলের কেয়ারি, ঝকঝকে তকতকে বারান্দায় বেতের চেয়ার-টেবিল সাজানো—মনে হয়, আহা, পাদরী কেমন সুখে আছে।

যাদের ভিতর পাদরী সাহেব খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করতে এসেছেন, তাদের তুলনায় তিনি আছেন অনেক সুখে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই কিন্তু বিলেতের যে-কোনও মজুরের বাড়ি পাদরীর বাসার চেয়ে অনেক বেশী আরামদায়ক, মজুর পাদরী সাহেবের চেয়ে খায় ভাল এবং পাদরীর সবচেয়ে বড় দুঃখ যে তাকে আত্মীয়স্বজন স্বদেশবাসী বর্জন করে আমরণ থাকতে হয় স্বদেশ থেকে বহু দূরে অনাত্মীয়ের মাঝখানে। তাই রবীন্দ্রনাথ এদেরই একজনকে দিয়ে বলিয়েছেন,

'আপনার জন আপনার দেশ
হয়েছি সর্বত্যাগী।
হৃদয়ের প্রেম সব ছেড়ে যায়
তোমার প্রেমের লাগি।
সুখসভ্যতা রমণীর প্রেম
বন্ধুর কোলাকুলি,
ফেলি দিয়া পথে তব মহাব্রত
মাথায় লয়েছি তুলি।
এখনো তাদের ভুলিতে পারি নে
মাঝে মাঝে জাগে প্রাণে,
চিরজীবনের সুখবন্ধন
সেই গৃহমাঝে টানে।'

কিন্তু এটা হল পাদরীর হৃদয়ের দিক। এবং বাইরের দিক দিয়ে দেখতে গেলে পাদরী আপন দেশের তুলনায় যত দৈন্যেই থাকুক না কেন, এদেশের মধ্যবিত্ত সন্তানের চেয়েও তাদের আর্থিক অবস্থা ঢের ঢের ভাল এবং চাষাভুষোদের সঙ্গে এদের কোন তুলনাই হয় না।

কিন্তু পার্থক্যটা সবচেয়ে মারাত্মক হয় যখন পাদরী পার্বত্য অনুন্নত জাতির ভিতর গিয়ে বাংলো বাঁধে।

অনুন্নত জাতি' বুঝতে পারে না যে, ক্রীশ্চান হয়ে গেলেই সে পাদরী সায়েবের বাংলো ভেট পেয়ে যাবে না। পাদরীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে সে পাদরীর বাড়ি ঘর-দোর, জামা কাপড়, বাসন-কোসন. টেবিল-চেয়ার দেখে মুগ্ধ হয় এবং এই সব জিনিস যোগাড় করার জন্য তার সরল মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কিন্তু নাগা কিংবা লুসাইয়ের যা আমদানি, তা দিয়ে এসব বস্তুর কল্পনাও সে করতে পারে না। ফ.ল তার জীবন বিষময় হয়ে ওঠে।

পাদরী সায়েবরা এই সর্বনাশটি করেছেন অনুন্নত জাতিদের। চোখের সামনে

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন যে ছিমছাম স্টাণ্ডার্ড অব্ লিভিংটি তুলে ধরেছেন, সে-স্টাণ্ডার্ডে পৌঁছনোর ক্ষমতা নাগা কিংবা লুসাইয়ের কস্মিনকালেও হবে না—দ্বন্দ্ব তার লেগেই থাকবে।

অন্য বাবদে এই সব অনুন্নত সম্প্রদায়গুলোর প্রতি ইংরেজের নীতি ছিল 'লেসে ফ্যের' অর্থাৎ তাদের জীবনধারণ-পদ্ধতিতে কোনপ্রকার পরিবর্তন না আনা, এবং আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, একমাত্র নাগাদের বাদ দিয়ে আর সব অনুন্নত সম্প্রদায়কে যত কম ঘাঁটানো যায় ততই মঙ্গল। তার কারণ এদের অনেকেই এমন শান্ত, সরল ও নির্দ্বন্দ্ব জীবন যাপন করে যে, আমাদের 'সভ্যতা' তাদের জীবনে নূতন কিছু ত আনবেই না, বরঞ্চ নানা প্রকারের দৈন্য দুর্দশা সৃষ্টি করবে। অন্তত একজন অতিশয় জ্ঞানবৃদ্ধ ঋষিতুল্য ভারতীয়কেও আমি এই মত পোষণ করতে দেখেছি। প্রাতঃস্মরণীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচয় হয় সাঁওতালদের সঙ্গে গত শতকের শেষের দিকে। তখনও বোলপুর অঞ্চলে ধান-কল হয় নি, সেখানকার কৃত্রিম জীবন তখনও সাঁওতালদের চরিত্র নষ্ট করে দিতে সক্ষম হয় নি। দ্বিজেন্দ্রনাথ সেই সকল অনাড়ম্বর সাঁওতালদের জীবনধারণ-পদ্ধতি খুব মনোযোগ দিয়ে দেখেছিলেন এবং আমাকে একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, এদের জীবনে আমরা যেন হস্তক্ষেপ না করি। তবে তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, সাঁওতালরা যে অহেতুক ভূতপ্রেতকে ডরায়, সেটা সারাবার জন্য সর্বশক্তিমান ভগবানের ধারণা এদের ভিতর প্রচার করলে ভাল হয়। সে-ধারণা প্রচার করার কতটুকু প্রয়োজন, গুণীরা তার বিচার করবেন কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রথম উপদেশ আমি সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করে নিয়েছি।

আমি জানি, এর বিরুদ্ধে আপত্তি উঠতে পারে। যারা শিক্ষাদীক্ষায় বিশ্বাস করেন, মড়ক এবং অন্যান্য ব্যাধি যাঁরা নির্মূল করতে চান, তাঁরা হয়ত সহজে আমাদের 'লেসে ফ্যের' পন্থা মেনে নেবেন না। উত্তরে আমার নিবেদন, এই সব অনুন্নত জাতির সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এখনও এত কম যে, বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করবেন যে, এদের সম্বন্ধে আরও অনেক অনুসন্ধান করার পর বিস্তর ভেবে-চিন্তে কাজ আরম্ভ করতে হবে—অবশ্য ততদিন বেঁচে থাকলে আমি তখনও আপত্তি জানাব। কারণ ধর্মের মিশনারি আর 'সভ্যতা'র মিশনারিদের ভিতর আমি পার্থক্য দেখতে পাই অতি কম॥

মার্কিনী ভাত

মার্কিনরা হন্যে হয়ে উঠেছে। বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়েছে। যেদিকে তাকায় সেদিকেই কমুনিস্ট-জুজু দেখে। দেশে যে-রকম ছেলে-ধরার জুজু দেখা দিলে মানুষ কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে যাকে-তাকে ধরে বেধড়ক মার লাগায়, অনেকটা সেই রকমই। তফাত এই যে, এদেশের কর্তাব্যক্তিরা এ-রকম মারধোর থেকে দূরে থাকেন, আর যতখানি পারেন জুজুর ভয়টা তাড়াবার চেষ্টা করেন। মার্কিন মুলুকে কিন্তু কমুনিস্ট-ডাইনী পোড়ানোর ভারটা আপন হাতে তুলে নিয়েছেন ওই দেশের কর্তাব্যক্তিরা।

তা তারা আপন দেশে যা খুশি করুন, আমরা রা-টি কাড়ব না। আমরা বলি—

'হরি হে রাজা কর রাজা কর
যার ধারি তারে মার
যার ধারি দুচারখানা
তারে কর দিন-কানা
যার ধারি দু শ চার শ
তারে কর নির্বংশ
যে আমার আধলা ধারে
ব্যাটা যেন দিয়ে মরে।'

কমুনিস্টরা আমাকে কিছুই ধারে না, তারা এখন মরুক তখন মরুক আমার কিছুটি যায় আসে না।

কিন্তু মার্কিনরা যখন এদেশে এসে দাবড়াতে থাকে, তখন আমি বিদ্রোহ করি। ভারতবর্ষের যত্রতত্র আজকাল দেখতে পাবেন মার্কিন অধ্যাপক অমুক তার তস্য়ক 'গণতন্ত্র' 'নবীন জীবনপদ্ধতি' 'দর্শনের নব সূত্রপাত' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিচ্ছেন। ওগুলো হচ্ছে মুখোশ—যে কোন বক্তৃতায় যান, দেখতে পাবেন তিন মিনিট যেতে-না-যেতেই, দর্শন, বিজ্ঞান, কলাশিল্পের বাহানা ধরে তাঁরা ঠিক পৌঁছে গেছেন আসল মোকামে, 'এস ভাই ভারতীয়, তোমরা আমরা সবাই মিলে রুশকে ঘায়েল করি।'

ইংরেজীতে একেই বলে 'ওয়ার-মঙ্গারিং', বাঙলায় বলে, 'তাতানো', 'ওসকানো', 'খ্যাপানো'।

ধর্মসাক্ষী, স্বেচ্ছায় যাই নি। অকালে বৃষ্টি নেমেছিল, আশ্রয়ের সন্ধানে

বারান্দায় উঠেছিলুম। যজ্ঞির যজমানরা আমার আসল মতলব ধরতে না পেরে সভাস্থলে বসিয়ে দিলেন। ভোজনের নিমন্ত্রণে নয়, পঞ্চাশী-আইনে পড়ে না। বক্তৃতার সারাংশ পূর্বেই নিবেদন করেছি। অবাক মানলুম দেশের লোক এই 'তাতানো'টা ধরতে পারল না। যে-রকমভাবে তাবৎ বক্তৃতাটা গলাধঃকরণ করে মিষ্টি মিষ্টি প্রশ্ন শুধাল, তার থেকে মনে হল তারা যেন আরও মণ্ডাটা মিঠাইটা চাইছে।

থাকতে না পেরে শুধালুম, 'সায়েব তোমার আসল মতলব, আমরা যেন তোমাদের সঙ্গে এক হয়ে বলশিদের সঙ্গে লড়ি—নয় কি? ঠিক বুঝেছি ত?'

সায়েব একগাল হেসে আমার বুদ্ধির তারিফ করলেন। আমি শুধালুম, 'বলশিদের সঙ্গে কোনও সমঝোতা হয় না? আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেন, "অসম্ভব নয়"। তাই তিনি কোন দলেই ভিড়ছেন না।'

সায়েব বললেন, 'রুশরা চলে যাক চেকোশ্লোভেকিয়া হাঙ্গেরি রুমানিয়া পোলাণ্ড ছেড়ে। তারা কী রকম সেখানে রাজত্ব চালাচ্ছে জান? সেখানে তারা সর্ব-প্রকার স্বাধীনতার টুঁটি চেপে তার দম বন্ধ করে মারছে, জান সে কথা?' এবার আমি পাল্টা একগাল হেসে বললুম, 'বিলক্ষণ জানি সায়েব। কিন্তু বল ত, তোমারই রুজভেল্ট আর চার্চিল যখন ইয়ালটা, তেহরান পৎসদামে এসব দেশ রুশের হাত তুলে দিয়েছিলেন, তখন কি তাঁরা এত গবেট ছিলেন যে জানতেন না, রুশ সেখানে কোন্ ধরণের বাজত্ব কায়েম করবে? তোমারই মার্কিন জাত, ইংরেজ আর ফরাসী বেরাদর পশ্চিম জার্মানিতে কি বলশি প্যাটার্ন বুনছে, না নিজেদের প্যাটার্ন? তা নয় সাহেব, রুজভেল্ট চার্চিল বিলক্ষণ জানতেন রুশ-নাগর বলকানসুন্দরীকে নিয়ে কোন্ রঙ্গরস করবেন। কিংবা বলতে পারি, শেয়ালকে যদি দাওয়াত করে' মুর্গীর খাঁচায় ঢোকাও, তবে সকালবেলাকার মমলেটের আশাটা সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগ করাই ভাল।'

সায়েবের মুখ সেদ্ধ হ্যামবর্ণ, সেটা লিপস্টিক হল কিনা বুঝতে পারলুম না—চোখে চশমা ছিল না—তবে কণ্ঠে উষ্মা প্রকাশ পেল। বললেন, 'তোমরা গণতন্ত্র মান। বিশ্বজোড়া গণতন্ত্রের বিপদে তোমরা হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবে?'

বললুম, 'তাতে করে ত আমরা মার্কিনেরই অনুসরণ করব। ভুলে গেছ, ১৯১৪ সালে লয়েড জর্জ যখন তোমাদের দরজায় ধন্না দিয়ে কান্নাকাটি করেছিলেন, পাশ্চাত্য গণতন্ত্র বাঁচাও, তখন তোমরা সাড়া দিয়েছিলে? না বলেছিলে, "ও ইয়োরোপের ঘরোয়া ব্যাপার।" শেষটায় ঢুকেও বেরিয়ে পড়লে। লীগ অব নেশন্‌সে যোগ ত দিলেই না উল্টে তার খয়েরখাঁ উইলসনকে তাড়ালে। তারপর

১৯৩৯ সালে যখন চেম্বারলেন চার্চিল একই কান্না কাঁদলেন, ফ্যাসিজমের হাত থেকে গণতন্ত্র বাঁচাও, তখনও কি পত্রপাঠ লম্ফিত হয়ে লড়াইয়ে যোগ দিয়েছিলে? না পার্লহারবারের আঁতে যখন ঘা পড়ল, তখন "গণতন্ত্র বাঁচাবার" টনক নড়ল? এখন দেখছ রুশ বড্ড বেশী তাগড়া হয়ে উঠেছে, তাইতে এত শিরঃপীড়া। সে-কথা থাক্। কিন্তু এ-কথাও মানবে যে, আজ যদি আমরা কোনও পক্ষে যোগ না দিই, তবে সে শুধু তোমাদের ইতিহাস থেকে হদিস নেওয়ার মত হবে। ইংরেজ, ফরাসী, জর্মন, জাপান লড়াই করে মরল, তাই আজ তোমরা পয়লা নম্বর। এবার তোমরা আর রুশরা মারামারি করে দুবলা হও, তখন আমরা পৃথিবীতে রাজত্ব করব।'

কথাটা সায়েবের বড্ড টক লাগল। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলল, 'কিন্তু এই যে লড়াইয়ের বিপদ ঘনিয়ে আসছে, তাব থেকে নিজেকে আলাদা করে রাখতে পারবে কি?'

আমি বললুম, 'সে হচ্ছে অন্য কাহিনী। দুর্ভিক্ষেব সময় বাঙালী ডাস্টবিন থেকে ভাত কুড়িয়ে খেয়েছে, তাই বলে ওটা তার কর্তব্য এ-কথা ত কেউ বলতে যাবে না। লড়াই এড়াতে পারব না, তাই তৈরী হয়ে জেতার পক্ষ নিই, সে হচ্ছে এক কথা; আর তোমাদের পক্ষে স্বেচ্ছায় খুশ এক্তেয়ারে, বহালতবিয়তে "কর্তব্যবোধে" "গণতন্ত্র বাঁচাতে" যোগ দি, সে হচ্ছে অন্য কথা। আমাদের সে বোধটা হচ্ছে না।'

ততক্ষণে বৃষ্টি থেমে গেছে! দেশ ত আমি চালাই নে। কেটে পড়লুম।

কিন্তু প্রশ্ন, এই যে হরেক রকম চিড়িয়া নানারকম মুখোস পরে এদেশে এসে 'ওয়ার-মঙ্গারিং' করে, তার কি কোন দাওয়াই নেই?

বাঙ্গালী মেনু

বয়স হয়েছে, যখন খুশি রেস্তরাঁয় ঢুকে মমলেট-কটলেট হুকুম দিতে লজ্জা করে। আর যখন বয়স হয় নি তখন জেবে সিঙ্গিল চায়েরও রেস্ত থাকত না বলে রেস্তরাঁয় ঢোকবার উপায় ছিল না।

ভগবান দয়াময়। তিনি সব কিছুই দেন; কিন্তু তাঁর 'টাইমিং'টা বড্ডই খারাপ। বৃদ্ধকে দেন তরুণী ভার্যা এবং হোটেলে যাবার পয়সা। উনিশ শতকের নাটক-নভেলে একেই বলা হত 'অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস'।

অসময়ে বৃষ্টি। ট্রাম থেকে নেমেই রেস্তরাঁতে ঢুকতে হল। বহুকাল পরে কলকাতা ফিরেছিও বটে—পুরনো যাবতীয় প্রতিষ্ঠান আগেরই মত চালু আছে কি না দেখার বাসনাটাও রয়েছে।

একখানা আলুর চপ আর এক কপ্ চা।

শুনেছি, সায়েবরা মাস্টার্ড খান শুধু শূকর এবং আরেকটা নিষিদ্ধ মাংসের সঙ্গে। মুর্গী, মটন, মাছের সঙ্গে তাঁরা রাই খান না। মুর্গী, মটনের সঙ্গে না ই বা খেলেন, কিন্তু মাছের সঙ্গে সরষে যেন রবীন্দ্রসঙ্গীতে কথার সঙ্গে সুরের মিল—এ-তত্ত্বটা সায়েবরা এদেশে দু'শ বছর থেকেও শিখল না দেখে তাজ্জব মানতে হয়।

তা সে যা-ই হোক, আমি সরষে খাই সব জিনিসের সঙ্গে—এই নিতান্ত সন্দেশ-রসগোল্লা ছাড়া। তাই আলুর চপের মটনকিমা সরষে সংযোগে খেতে খেতে ছোকরাকে বললুম, 'সরষেটা ভাল না।'

ম্যানেজার শুনতে পেয়ে বললে, 'হক্-কথা বলেছেন, স্যার, কিন্তু বিলিতী মাস্টার্ডের উপর সরকার ট্যাক্সো যা লাগিয়েছেন তার ঝাঁঝটা মাস্টার্ডের চেয়েও বেশী।'

আমি বললুম, 'তবে নাকচ করে দিন বিলিতী মাস্টার্ড; চালান দেশের তৈরী খাঁটি, প্লেন কাসুন্দি। খরচাও কম পড়বে।'

ম্যানেজার আমার দিকে হাবার মত তাকালে। বোধ হয় ভাবলে, আমি নিতান্তই গাঁইয়া। তা আমি বটিও।

দিশী বিলিতী কোন মাস্টার্ডই কাসুন্দির সামনে দাঁড়াতে পারে না। কাসুন্দিতে থাকে মিঠে-কড়া, মোলায়েম-মোলায়েম ঝাঁজ—আর বিলিতী মাস্টার্ডের ঝাঁজ চাষাড়ে, ফরাসী মাস্টার্ডে বদ্খদ্ মিষ্টি-মিষ্টি ভাব।

যবে থেকে আমার পাশের বাড়িতে এক দার্শনিক এসে উঠেছেন, পাড়ার আমাদের সক্কলের গায়ে দর্শনের হাওয়া লেগেছে। আমরা এখন আর তথ্য নিয়ে তর্ক করি নে, তত্ত্ব কারে কয় তার-ই চিন্তা করি। আমি তাই কাসুন্দির খেই ধরে তত্ত্বচিন্তায় মনোনিবেশ করলুম। আমরা আপন জিনিসের সম্মান দিতে জানি নে। হিন্দীতে যাকে বলে 'ঘরকী মুর্গী দাল বরাবর' অর্থাৎ 'গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না'।

তখন মনে পড়ে গেল, গেল লড়াইয়ের সময় আমাকে এক মার্কিন অফিসার আফ্সোস করে বলেছিল, কলকাতায় বাঙালী-রান্না খাবার রেস্তরাঁ নেই। তাকে এক বাঙালী নিমন্ত্রণ করে ডাল-চচ্চড়ি খাইয়েছিল, সেই থেকে বেচারী তামাম

কলকাতা চষে বেড়িয়েছে বাঙালী-রান্নার সন্ধানে, আর পেয়েছে শুধু মমলেট-কটলেট-ডেভিল কিংবা কোর্মা-পোলাও-কালিয়া। সে চেয়েছে এক ঘটি জল, পেয়েছে তিনখানা বেল।

দর্শনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে শোপেনহাওয়ার বলেছেন, 'অমা যামিনীর অন্ধকার অঙ্গনে অন্ধের অনুপস্থিত অসিত অশ্বডিম্বের অনুসন্ধান।' কলকাতায় বাঙালী-রান্নার রেস্তরাঁ অনুসন্ধান এই একই গোত্রীয়—কলকাতায় প্রথম আশ্চর্য!

অথচ দেখুন ইংরেজী (কিংবা ট্যাঁশ বলতে পারেন), মোগলাই, চীনা, মাদ্রাজী, গুজরাতী ('অন্নপূর্ণা' দ্রষ্টব্য—খাওয়া না-খাওয়ার জিম্মেদার আপনি) বহু রকমের রান্নাই এই কলকাতায় পাবেন। রোস্ট কবাব চপ্ সুয়েজ ইডলি-ডোসে করহী, ফরাসী এস্কেলোপ দ্য ভো ও শাতোব্রিয়া, এমন কি ভিয়েনার ভীনার শ্নিৎসেল পর্যন্ত পাবেন। পাবেন না শুধু ঘ্যাঁট, অম্বল।

তাই ভাবছি, আপনাতে আমাতে একটা বাঙালী-রেস্তরাঁ খুললে হয় না?

বাঙালী সর্বভুক। তাই বাঙালী প্রবাদ 'লোহা খাই নে শক্ত বলে, "—" খাই নে গন্ধ বলে।' তাই বলে কি আমাদের রেস্তরাঁয় সব কিছু থাকবে? উঁহু! আমাদেব মাপকাঠি হবে—বাড়িতে আমাদের মা-মাসীরা আটপৌরে এবং পোশাকী যে-সব রান্না করেন।

তা হলে এইবারে 'মেনু'টা তৈরি করা যাক।

কিন্তু তার পূর্বেই স্থির করতে হয়, খেতে দেবেন কিসে?

আমি মনস্থির করেছি—কাঁসা কিংবা পেতলের থালায়। সাদা কিংবা কালো পাথরেব থালারও ব্যবস্থা থাকবে, নিতান্ত সাত্ত্বিক জনের জন্য শালপাতা, কলা-পাতার ব্যবস্থাও থাকবে। সব কটা থাক্ আর নাই থাক্—চীনে বাসন ছুরি-কাঁটা বারণ।

এখন আহারাদি।

১। ভাত—আতপ এবং সেদ্ধ, লুচি, পরোটা, বাকর-খানী (বাদ দিলে চলবে না, পুব-বাঙলার বিস্তর লোক কলকাতায় আস্তানা গেড়েছেন), ঘি-ভাত, পোলাও। কিছু বাদ পড়ল না ত? ভেবে দেখুন। এ 'মেনু' তৈরী করা ত একজনের কর্ম নয়। আমি শুধু একটা পয়লা খসড়া করে দিচ্ছি।

এ-স্থলে আরেকটি তত্ত্ব খুলে কই। রেস্তরাঁ প্রতিষ্ঠানটি মোটামুটি ইয়োরোপীয়; তাই কোনও কোনও বাবদে আমাদের নকল করতে হবে ইয়োরোপকে—অর্থাৎ প্যারিসকে, কারণ রেস্তরাঁ-লোকের বৈকুণ্ঠ প্যারিসে। তাই 'মেনু' বানাবার পরিচ্ছেদ, অনুচ্ছেদ, পদ ফরাসী কায়দাতেই যুক্তিসম্মত এবং অভিজ্ঞতা-সম্পূর্ণ

ফরাসী 'মেন্থ আরম্ভ হয় হরেক রকম রুটির বর্ণনা দিয়ে (আমিও তাই ভাত-লুচি-পোলাও দিয়ে বিসমিল্লা পড়েছি), তারপর অর্ দ্য অভ্র, স্যুপ, ডিম, ফিশ ইত্যাদি ইত্যাদি। অতএব—

২। তেতো ;—

উচ্ছেভাজা, করেলাসেদ্ধ, নালতে শাক (ইন সীজন—মৌসুমী কালে)। এইবারে ভাবুন, কিংবা মা-মাসীকে জিজ্ঞেস করুন, আর কী কী তেতো আছে—আমার দুর্ভাগ্য, যে-অঞ্চলে জন্ম আমার, সেখানে তেতোটার খোলতাই নেই। পশ্চিমাঞ্চলে স্টাফ্‌ট—অর্থাৎ মাংসের পুর দেওয়া—করেলা খায়, কিন্তু বিবেচনা করি তার রেওয়াজ বাংলা দেশে নেই।

৩। ডাল ;—

মুগ, ছোলা, মসুর, কলাই ইত্যাদি। তারপর ডালের সঙ্গে সজনের ডাঁটা, কেউ বা দু-চারটে বড়ি দেয়। অতএব ডালের দুভাগ—প্লেন এবং মেশানো, যেমন পূর্বেই বলেছি ডাল আ লা ডাঁটা ; কিংবা আ লা নারকোল, অর্থাৎ ডালে নারকোলের টুকরো থাকবে।

৪। ভাজা ;—

নিয়ে কিন্তু বিপদ। কারণ এতক্ষণ দিব্য নিরামিষ চলছিল, এখন ভাজা নিরামিষ, আমিষ, ডিম তিন প্রকারই হতে পারে।

অতএব

(ক) আলু, পটল, বেগুন, কুমড়ো…

(খ) ডিমভাজা, মমলেট…

(গ) মাছভাজা (ইলিশ, রুই, পুঁটি, পোনা…)

কাজেই খ এবং গ-কে হয়তো 'ডিম' এবং 'মাছের' অনুচ্ছেদে পুনরাবৃত্তি করতে হবে। 'ক্রস রেফেরেন্স' দিতে পারেন, কিন্তু ভয়, তাহলে 'মেন্থ' হয়ত জর্মন ডক্‌টরেট্ থিসিসের প্রকাব এবং আকার নিয়ে নেবে। উপস্থিত অবশ্য আমি সেই নিষ্ঠা নিয়েই এই মহামূল্যবান নির্ঘণ্ট নির্মাণের প্রয়াসী হচ্ছি, কিন্তু তৈরী মালে ত ও জিনিস এতরালে চলবে না।

(৪) ছেঁচকি—ছোঁকা—ছক্কা—চচ্চড়ি—লাবড়া (লাফড়া)।

এইবারে আমার পেটের এলেম বেরিয়ে গেল। এগুলোর মধ্যে একটা আরেকটার সূক্ষ্ম পার্থক্য আমি জানি নে। যদিও খাবার সময় রাঁধুনীকে অপটু ঠাওরালে এ-বিষয়ে উচ্চাঙ্গের বক্তৃতা দিতে কসুর করি নে। আর-পাঁচজন কান

পেতে শোনে, কারণ তারা জানে আমার চেয়েও কম। দু-একবার যে কান-মলা খাই নি তাও নয়। সে কথা যাক। এখন প্রশ্ন, এ-অনুচ্ছেদের মূল হেডিং নেবেন কী এবং তার পদ বাতলাবেন কী কী?

করে করে আসবেন, মাছ মাংসে— তার কত অনুচ্ছেদ, তস্য ছেদ, পদ, পদ-ভেদ—ডালনা, ঝোল, কালিয়া, মালাই সহযোগে, ডাবের ভিতর, কলাপাতায় পেঁচিয়ে, দমে দিয়ে, সরষে মেখে—খোদায় মালুম, কোথায় গিয়ে পৌঁছব।

তাই আমার প্রস্তাব; একখানা ফুলস্ক্যাপ কাগজ নিন এবং রেস্তরাঁর মেনুর কায়দায় একখানা বাঙালী মেনু তৈরী করুন দু পাতা জুড়ে, অর্থাৎ ফুলস্ক্যাপ কাগজের ভাঁজ খুলে যতটা জায়গা পান। এর বেশী কাগজ নিতে পারবেন না কারণ পূর্বেই বলেছি মেনু থিসিস নয়। আবার শীটখানা যেন টায়-টায় ভর্তি হয়। ফাঁক থাকলে চলবে না। আমি যে পরিচ্ছেদ-অনুচ্ছেদ দিয়ে প্যাটার্ন বাতলালুম সেটা একদম অবজ্ঞা করে আপনি আপন মেনু বানাবেন। কোন্ জিনিসের কত দাম সেটা আপনি বলতে পারেন, না-ও পারেন। না-বলাই ভাল। কারণ 'কস্টিং' ব্যাপারটা বড়ই কঠিন। রেস্তরাঁ-ম্যানেজার অভিজ্ঞতা থেকে সেটা স্থির করবেন।

'এক্স্ট্রা' অনুচ্ছেদটি ভুলবেন না। তাতে থাকবে, কাঁচা লঙ্কা, চাটনি (ধনে, পুদিনা...), আচার (আম, জারক নেবু...) ইত্যাদি এবং কাসুন্দি।

যে-কাসুন্দি নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করেছিলুম।

এইবারে বিবেচনা করুন॥

রন্ধন-যজ্ঞ

খবর এসেছে লণ্ডনে এক বিরাট রন্ধনযজ্ঞ হবে। সে-যজ্ঞে পৃথিবীর আঠারোটি দেশ আপন আপন সুস্বাদু রান্না পেশ করবেন। অতি উত্তম প্রস্তাব, কিন্তু হায়, আমাকে বিচারকর্তা করে ডেকে পাঠাচ্ছে না কেন? রন্ধন-মার্গে সত্যের সন্ধানে আমি বিস্তর ইন্ধন পুড়িয়েছি, আকাশের অ্যারোপ্লেন, মাটির ট্রেন আর জলের জাহাজ এই তিন সচল বস্তু ভিন্ন আর সবই ত আমি খেয়ে দেখেছি। তাও আবার দেশী বিদেশী নানা কায়দায়। জর্মন কায়দায় রান্না ভারতীয় 'রাইস-কারী' (অতিশয় অখাদ্য) খেয়েছি, শিখের বানানো বাঙালী লেডিকেনি খেয়েছি (সেক পেল্লাদ-মারা গুলি—প্রহ্লাদকে খাইয়ে দিলে হিরণ্যকশিপুকে আর ভাবতে হত না), আরব বেদুইনের হাতে 'পাকানো' দিল্লীর বিরিয়ানি খেয়েছি, জাপানীর

স্বহস্তে তৈরী চেঙ্গিসখানী কাবাব ভী খেয়েছি (এর নির্মাণ-কৌশল একদিন সবিস্তর নিবেদন করব—আহা, অতি খাসা জিনিস), আর কত বলব।

তা সে-কথা যাক গে, সে নিয়ে দুঃখ করে কোন লাভ নেই, গুণীর আদর কি আর এ মূঢ় সংসার করেছে কিংবা করবে ?

লণ্ডন থেকে আরও খবর এসেছে, ভারতীয় 'টীম' চলবে শ্রীমতী ভট্টাচার্য, শ্রীমতী বসু এবং শ্রীমতী রায়ের কর্তৃত্বে। তিনজনই বাঙালী, কাজেই বাঙালী হিসেবে, হে পাঠক, তোমার আমার দুজনেরই মনে বিমল আনন্দ অনুভূত হল, এ-কথা অস্বীকার করে খামোখা মিথ্যেবাদী হতে যাব কেন ? কে না জানে, আজ বাঙ্গালী সর্বত্র অনাদৃত, কেন্দ্রীয় সরকার তাকে উপেক্ষা করে, বিদেশে তার খ্যাতি-প্রতিপত্তি শনৈঃ শনৈঃ কমে যাচ্ছে, বিশেষজ্ঞের পালা-পরবে শ্রাদ্ধ-নিমন্ত্রণে সে প্রায় ব্রাত্য—অপাঙ্‌ক্তেয় হতে চলল। এরই মধ্যিখানে যদি বিশ্ব-রন্ধনযজ্ঞে তিন বঙ্গরমণী ভারতের প্রতিভূ হিসেবে আমন্ত্রণ পান, তবে কোন্ বাঙালীর ছাতি তিন ফুট ফুলে উঠবে না ?

কিন্তু আমার নিবেদন, গর্ব অনুভব করেছি বটে কিন্তু আনন্দিত হই নি।

আমি বাঙালী, আমি এই 'দেহলিপ্রান্তে' বসেও বাঙালী-রান্না খাই। আমি আতপ চালের ভাত, কিঞ্চিৎ ঘৃত, সোনা মুগের ডাল (দিল্লিতে অতিশয় নিকৃষ্ট), সর্ষে বাটায় মাছের ঝোল ইত্যাদি খেয়ে থাকি। বাঙালীর অন্যান্য রান্না নিয়েও আবার দম্ভের অন্ত নেই, কিন্তু বিশ্বের দরবারে যদি আমাদের অর্থাৎ ভারতীয় রান্নার কেরদানি দেখাতে হয় তবে শুধু বাঙালী হেঁশেল দেখালেই চলবে না।

হাঁ, আলবত, অতি অবশ্য আমি স্বীকার করি, বাঙালীর সর্ষে-ইলিশ, মালাই-চিংড়ি, ডাব-চিংড়ি, বাঙালী বিধবার নিরামিষ (বিশেষ করে 'বোষ্টমের পাঁঠা' এঁচোড়), জলখাবারের লুচি, আলুর দম, সিঙাড়া, মাছের ডিমের বড়া, মোচার পুর দেওয়া সমোসা ইত্যাদি, তারপর ছানার মিষ্টি, রসগোল্লা, লেডিকেনি, সন্দেশ, চিনিপাতা দই, মিহিদানা সীতাভোগ আরও কত কী ! (মুদ্রাকর মহাশয়, আপনার জিভে জল আসছে, অথচ এ-লেখা কম্পোজ না করে আপনার বাইরে যাবার উপায় নেই, তদুপরি আজকের দিনে আপনি আমি কেউই এ-সব সুস্বাদু বস্তু চাখবার সামর্থ্য রাখি নে, অতএব অপরাধ নেবেন না।)

এমন কী, আমাদের উচ্ছেভাজা, আমের অম্বল, কিসমিস-টমাটোর টক (প্রধানত বীরভূম, মেদিনীপুর অঞ্চলের) নগণ্য জিনিস নয়, ভোজনরসিক মাত্রেই জানেন।

আর পিঠে—তার ফিরিস্তি আর দেব না।

কিংবা যাকে বলে 'ফেনসি-খানা' বিশেষ জেলা বা মহকুমার আপন বৈশিষ্ট্য। বাইরের—এমন কী, বাংলা দেশের ভেতরের লোকই যেগুলো জানে না, যেমন মনে করুন ব্যাঙের ছাতা, ইংরেজীতে যাকে বলে মাশরুম, মেদিনীপুর এ-বস্তুর পাক্কা কদরদার, ভোজনরাজ ফরাসীও এর নামে অজ্ঞান, কিংবা পুব-সিলেটের 'চোঙা-পিঠে' (এক রকম হাল্কা বাঁশের চোঙায় ভেজা চাল ভরে দিয়ে সে-চোঙা খোলা আগুনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঝলসানো হয়, তারপর চোঙা ভেঙে ফেললে একখানা আস্ত লম্বা টুকরো বেরিয়ে আসে—এক ফুট লম্বা; খেতে হয় শুকনো মালই কিংবা করকরে কই মাছ ভাজার সঙ্গে), কত বলব!

শুঁটকি? নাক সিঁটকাচ্ছেন ত? কিন্তু আমার বিশ্বাস শুঁটকির আপন মূল্য আছে। ইংরেজ, ফরাসী, জর্মন সব ভোজন-রসিকজনই 'স্মোকড্-ফিস' অর্থাৎ শুঁটকির কদর জানেন।

আরও কত কী!

কিন্তু ভুললে চলবে না যে, বাঙালী মাছ, নিরামিষ, পিঠে, সন্দেশ সুচারুরূপে তৈরি করতে জানলেও সে পারে না—এবং একদম পারে না মাংস রাঁধতে।

বাঙালী-বাড়িতে মাংস খেতে গেলে আমার চোখে জল আসে। মাংস আর ঝোল নন্-কো-অপারেশন করে বসে আছেন—এদিকে শক্ত মাংস ওদিকে টলটলে ঝোল। মাংসের নিতান্ত আপন 'সোওয়াদ' আছে বলেই খাওয়া যায়, কিন্তু আসলে অখাদ্য।

কিংবা মাংস-চালে মিশিয়ে বিরিয়ানি পোলাও বাঙালী রাঁধতে জানে না (বাঙালীর উপাদেয় ঘি-ভাত, মটরশুঁটি-ঘি-ভাত অন্য জিনিস) অথবা মাংসে তরকারিতে মিলিয়ে আলু-গোশৎ, মটর-গোশ্ৎ, গোবি-(কপি) গোশ্ৎ বাঙালী বিলকুল চেনে না।

একেবারে কেউই পারে না—একথা আমি বলব না। ঢাকার নবাব-বাড়ি, সিলেটের কাজীবাড়ি এবং মজুমদার-বাড়ি (শুনেছি—খাই নি), মুর্শিদাবাদের ও মাটিয়াবুরুজের নবাব-বাড়ি এসব বস্তু সত্যই ভালো রাঁধেন। আর পারে উত্তম মুর্গী-ঝোল বাঁধতে গোয়ালন্দ, নারায়ণগঞ্জ-চাঁদপুর জাহাজের খালাসীরা; যে একবার খেয়েছে, সে কখনও ভুলতে পারে না।

কিন্তু এসব মাংস রান্না বড়ই সীমাবদ্ধ, বাংলা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে নি। আমার আশ্চর্য বোধ হয়, বিক্রমপুরের মেয়ে প্রতি বৎসর গোয়ালন্দী জাহাজে করে কলকাতা-হস্টেলে যায়, যাবার সময় জাহাজে 'রাইস-কারি' খায়, সে

রাঁধতে-বাড়তেও জানে, কিন্তু জাহাজের ওই মুর্গী-ঝোল সে কখনও রাঁধতে পারল না!

মাত্র একটি বাঙালী কাপালিককে আমি চিনি, যিনি সত্যই মাংস রাঁধতে জানতেন। পাঁঠার মাংস কষে তিনি পেঁয়াজ-রশুন-লঙ্কা দিয়ে যে অপূর্ব, না অভূতপূর্ব 'মহাপ্রসাদ' রাঁধতেন তার সঙ্গে তুলনা দেবার মত সুখাদ্য আমি এ জীবনে কখনও খাই নি। কিন্তু তিনি ব্যত্যয়। তিনি এখন সেই লোকে, বিবেচনা করি, যেখানে আহারাদির কোন ঝামেলা নেই, তাই আমাদের শহরে এখন আর কেউ 'মহাপ্রসাদে'র সন্ধান পায় না। আমার মত দু-একজন এখনও তাঁর বাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময় তাঁর স্মরণে চোখের জল ফেলে।

অথচ দেখুন, পশ্চিম-ভারতে বহুতর তরো-বেতরো মাংস রান্না হয়। নানা রকমের সুরুয়া (সূপ), শিক-শামী-টিকিয়া-বুড়ী-আফগানী-মিশ্রী-নরগিস কত রকমের কাবাব, ছ-সাত রকমের পোলাও, বিরিয়ানি, কুর্মা, কালিয়া, পসিন্দা, গুর্দা, কলিজা, তন্দুরীমুর্গী, মুর্গীমুসল্লম, মুর্গীশাহী, রওগন যুষ, তারপর মাংসে তরকারিতে মেশানো আলু-গোশ্‌ৎ, গোবী-গোশ্‌ৎ, দইয়ে মাংস মাখানো রায়তা-গোশ্‌ৎ, মাংস কুচি কুচি করে কোফ্‌তা, কীমা এবং তার থেকে কোফ্‌তা-ঝোল, কীমা-ঝোল, বাহান্ন রকমের সমোসা, এবং আরও কত কী।

এক কথায় আমরা বাঙালী যে-রকম মাছ দিয়ে পঁয়ষট্টি রকমের ভেল্কিবাজি দেখাই, এরাও তেমনি মাংস দিয়ে নিপুণ বোল চিকন কাজ দেখাতে জানে।

আমার মনে সন্দেহ জাগছে বাঙালী রমণীরা লণ্ডনে এসব রান্না রাঁধবেন কী করে?

কিংবা পার্সীদের ধনে-শাক? উপাদেয় বস্তু।

মাছের রাজা আমরা, কিন্তু ভৃগুকচ্ছ নগরের পার্সীদের রান্না ইলিশ-মশালাও ত ফেলনা নয়। মাছটিকে ঠিক মধ্যিখানে লম্বালম্বি কেটে ফাঁকা জায়গাটা সবুজ পেশা মশলা দিয়ে ভরে গোটা মাছটাকে কলাপাতায় মুড়ে আগুনে সেঁকা হয়। তিনখানা আড়াই-সেরী আস্ত ইলিশ খেয়েও আপনার পেটের অসুখ করবে না, এর বাড়া কী প্রশংসা আছে বলুন?

গুজরাতীদের পতৌড়ি। ঘোলের ভিতর বেসন ভিজিয়ে রাখবেন রাত্রিবেলা। সকালে তাই দিয়ে চাপাটির মত পাতলা রুটি বানাবেন, তেলে ভেজে নিয়ে ফালি ফালি করে কেটে 'রোল অপ' করে নেবেন। মুখে দিলে মাখনের মত মিলিয়ে যাবে। নিরামিষের ভিতর এ-রকম মুখরোচক বস্তু এ-ভারতে কমই আছে।

মিষ্টির ভিতর শ্রীখণ্ড এবং দুধ-পাক।

মারাঠীদের দহি-ভাত। বেহারীদের আচার। তামিলদের মালে-গাটানি স্থপ, রসম, ইডলি-ডোসে। কাশ্মীরীদের বসন্ত ঋতুর বাচ্চা ভেড়ার কাবাব। পাঞ্জাবীদের হালুয়া, লস্সী; আরও কত প্রদেশের কত অনবদ্য 'অবদান'!

ক্রিকেট-টীমে আর রন্ধন-টীমে কোনও তফাত নেই। ক্রিকেটে এগার জন নাইডু পাঠানো হয় না—তা তিনি যত ভাল ব্যাট্স্ম্যানই হোন না কেন। ফাস্ট মিডিয়ম স্লো গুগলি বোলার, উত্তম উইকেট কীপার, এমন কী, না-ব্যাট্স্ম্যান না-বোলার শুদ্ধমাত্র ফীল্ডার (যথা ভাইয়া) দু-একজন রাখতে হয়।

অতএব এই রন্ধন-যজ্ঞে ভারতের সর্ব প্রদেশ থেকে বহুতর ভীমসেনকে পাঠাতে হবে॥

'বাঁশবনে—'

প্যারিসের এক সুবিখ্যাত 'গুর্মে' অর্থাৎ 'খুশখানেওলা' বা ভোজনরসিক একবার তুর্কীতে বেড়াতে যান। ইয়োরোপে উত্তম ভোজনের মক্কা-মদীনা যে রকম প্যারিস, এশিয়া-আফ্রিকায় সেই রকম তুর্কী। অন্তত ইয়োরোপীয়দের বিশ্বাস তাই—যদিও আমার ব্যক্তিগত ধারণা প্রাচ্যদেশীয় ভোজন-মক্কা তুর্কী নয় দিল্লি, লখনউ, আগ্রা। কিন্তু সে-কথা থাক্।

প্যারিস গুর্মের কন্স্তুন্তুনিয়া (কন্স্টানটিনোপোল) আগমন-বার্তা সেখানকার ভোজন রসিক-সমাজে ছড়িয়ে পড়তে বেশীদিন লাগল না। তাঁদের চক্রবর্তী যে পাশা ওই মার্গে বহুদিন ধরে সাধনার ফলে স্বর্গত মহামান্য আগা খানকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন, তিনি প্যারিসের গুর্মেকে আনুষ্ঠানিকভাবে নৈশভোজনে নিমন্ত্রণ জানালেন—গুর্মেও তারই প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছিলেন।

সে-ভোজনের বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। বরঞ্চ যে এখনও ইউরোপীয় সঙ্গীত শোনে নি, তাকে বেটোফেন সমঝাতে আমি রাজী আছি।

গুর্মে পরের দিনই প্যারিস রওয়ানা দিলেন। তাঁর তীর্থদর্শন সমাপন হয়েছে —তিনি ত আর সিন্সোফিয়া মসজিদ দেখতে কন্স্তুন্তুনিয়া আসেন নি।

প্যারিসে ফিরে যাওয়া মাত্রই সেখানকার গুর্মে-সমাজ তাঁকে শুধালে, 'কী রকম খেলে?'

তিনি বললেন, 'অপূর্ব, অপূর্ব! এ-রকম খানা এ-জন্মে কখনও খাই নি। তুর্কী গিয়ে আমার উদর ধন্য হয়েছে, আমার রসনা তার চরম মোক্ষলাভ করেছে।'

এবম্প্রকার বহুবিধ উচ্ছ্বসিত প্রশংসার পর তিনি কিঞ্চিৎ তুষ্ণীম্ভাব ধারণ করলেন। তার পর বললেন, 'কিন্তু…'

সবাই বললে, 'কিন্তু…?'

'পদ ছিল বড্ড বেশী।'

ভোজন-মার্গে যাঁরা মন্ত্রসিদ্ধ তাঁরাই শুধু এ-বাক্যের অর্থ বুঝতে পারবেন।

কেউ যখন বলে, 'ওঃ, যা খাইয়েছে! ডাল ছিল চার রকমের, পোলাও ছিল পাঁচ রকমের, অমুক ছিল তমুক রকমের—'

তখন আমার ভুরু ইঞ্চিখানেক উপরের দিকে ওঠে।

চার রকমের ডাল? লোকটা কি তবে জানে না তার বাড়িতে কোন্ ডাল সবচেয়ে ভাল রান্না হয়? আর চার রকমের ডাল এবং পাঁচ রকমের পোলাও-ই যদি আপনি খান তবে রসগোল্লা সন্দেশে পৌঁছবেন কী করে? যদি বলেন, 'রুচির পার্থক্য রয়েছে, তাই চার রকমের ডাল', তবে শুধাই সার্থক কবি সুন্দরীর বর্ণনাকালে কি পঁচিশটা বিশেষণ দিয়ে বলেন, 'রুচি-মাফিক তোমরা বিশেষণটা বেছে নাও' কিংবা চিত্রকর হনুমানের ছবি আঁকার সময় তাঁর পশ্চাদ্দেশে পাঁচটা পাঁচ রকমের ন্যাজ এঁকে দিয়ে বলেন, 'পছন্দ-সই তোমার ন্যাজটা বেছে নাও।'

কাগজে পড়েছি ডাচেস অব উইনজার কখনও সুপ খেতে দেন না। ডিনারের অবতরণিকায় গাদা-গুচ্ছের তরল বস্তু পেটে ঢুকিয়ে দিলে বাদ-বাকী পদ মানুষ ভাল করে খাবে কী করে? অতিশয় হক্ কথা। আমার ভাল পাচক নেই বলে আমি পারতপক্ষে কাউকে নিমন্ত্রণ করি নে। যদিস্যাৎ করি, তবে ছোট্ট একটি টমাটো ককটেল দিই (শেবির গেলাস-ভর্তি টমাটো রস এবং দশ ফোঁটা 'মাগ্গী' —তদভাবে উস্টাস সস্+চার ফোঁটা তাবাস্কো সস্—তদভাবে চীনা চিলি সস্—তদভাবে একটি চিমটি লাল লঙ্কাগুঁড়ো+প্রয়োজনীয় নুন। এসব ভাল করে মিশিয়ে খুশবায়ের জন্য উপরে অতি সামান্য গোল-মরিচের গুঁড়ো ভাসিয়ে দেবেন)। এটা খাদ্য নয়—ক্ষুধা-উত্তেজক মাত্র।'

তবে রেস্তরাঁর কথা আলাদা। কারণ রেস্তরাঁয় তাবৎ চৌষট্টি পদ খাবার জন্য কেউ পীড়াপীড়ি করে না। ভোজে আপনি পদের পর পদ স্কিপ্ করতে থাকলে গৃহস্বামী তথা অন্য নিমন্ত্রিতেরা সন্দ করবেন, আপনি একটা স্নব্। রেস্তরাঁয় সে-আশঙ্কা নেই।

এবং ভাল রেস্তরাঁতে আ লা কার্তের বাহান্ন পদ থাকার পরও গোটা তিনেক তাব্‌ল দোৎ (t b e d'l ite) বা ফিক্স্‌ড্ দামে ফিক্সড্ পদের ভোজন থাকে। যেমন মনে করুন দু টাকাতে আছে (১) সেলেরি সুপ, (২) রোস্ট মাটন,

(৩) পুডিং ; আড়াই টাকাতে (১) সেলেরি স্থপ, (২) বয়েলড্ ফিশ, (৩) রোস্ট মাটন, (৪) পুডিং ; এবং তিন টাকাতে আছে (১) সেলেরি স্থপ, (২) বয়েল্ড ফিশ্, (৩) রোস্ট চিকেন্, (৪) পুডিং কিংবা আইসক্রীম।

এই তাব্ল্ দোৎ বাতলে দেবার প্রধান উদ্দেশ্য ডোমকে বাঁশ-বাছতে সাহায্য করা। বিশেষ করে এই সাহায্যের প্রয়োজন মহিলাদেরই বেশী। ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন, মহিলারা মেনু কার্ড অর্থাৎ আ লা কার্ত হাতে নিলে পুরুষদের কী হয়। এই ফাঁকে মর্নিং ওয়াক সেরে এসে দেখবেন, ম্যাডাম তখনও মনস্থির করতে পারেন নি কোন্ স্থপ তার বিম্বাধর ছুঁয়ে কম্বু কণ্ঠ পেরিয়ে লম্বোদরে বিলম্বিত হবেন। ইতিমধ্যে ওয়েটারের দাড়ি গজিয়ে গিয়েছে—দাঁড়িয়ে দাড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘড়ির কাঁটা পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়েছে—অবশ্য আসলে তা নয়, ইতিমধ্যে পাকা চব্বিশ ঘণ্টা পেরিয়ে গিয়েছে।

দা-ঠাকুরের পাইস-হোটেলে মেনু বাছতে আমাদের কোনও অস্থবিধে হয় না। কখন তেতো খেতে হয় আর কখনই বা টক, সে-তত্ত্ব আমরা বিলক্ষণ অবগত আছি। আমাদের সময়ে পাইস হোটেলে তাব্ল্ দোৎও থাকত। ওই জিনিস সে-দিন রান্না হয়েছে লাটে ; কাজেই সেইটে সেদিন অর্ডার দিলে ভোজনপর্ব সমাধান হত সস্তায়।

সায়েবী হোটেলে গিয়ে আমরা পড়ি বিপদে। সে-রেস্তরাঁ যদি আবার উন্নাসিক হয়, তবে প্রায় সমস্ত মেনুখানাই লেখা থাকে ফরাসী ভাষায়। 'বাছুরের কাটলেট' নাম দেখে আপনি হিন্দুসন্তান আঁতকে উঠলেন, কিন্তু ওইটেই হয়ত খেতে দেখলেন আপনার মুসলমান বন্ধুকে। শুধালেন, 'কী বস্তু?' বললে, 'এস্কালপ দ্য ভো ভিয়েনোওয়াজ'—তাতে বাছুরের নাম-গন্ধ নেই, 'ভো' যে বাছুর আপনি জানবেন কী করে? আপনি তাই দিব্যি অর্ডার দিয়ে বসলেন। রেস্তরাঁ যদি আরেক কাঠি সরেস হয়, তবে ওই বস্তুরই নাম পাবেন জর্মনে—'ভিনার শ্নিৎসেল্'। 'শ্নিৎসেল্' অর্থ 'এস্কালপ', তার মানে ইংরেজীতে 'স্ক্যালপ', সোজা বাংলায়, 'মাংসের টুকরো'। ওটা কিসের মাংস তার কোনও হদিস ওতে নেই। শুয়োরেরও 'শ্নিৎসেল্' হয়, চীনদেশে হয়ত কুকুরেরও হয়। শুনেছি, আমাদের মুনিঋষিরা গণ্ডার খেতেন। অনুমান করি, তাঁরা তা হলে গণ্ডারের 'শ্নিৎসেল্' খেতেন।

আমি ইংরেজী জানি নে। মুসলমান মুরুব্বীদের কাছে শুনেছি, শুয়োরের মাংসের নাম ইংরেজীতে 'পর্ক' এবং ওটা খাওয়া মহাপাপ। তাই 'পর্কচপ্' না খেয়ে আশ্বস্ত হতুম, ধর্মরক্ষা করেছি। তার পর একদিন আবিষ্কার

করলুম, 'হ্যাম', 'বেকন' শুয়োরের মাংস, এমন কী ওই মাংসের কটলেট, সসেজও হয়—এবং মেন্থতে তার উল্লেখও থাকে না। আবিষ্কারের পর অহোরাত্র জলস্পর্শ করি নি এবং মোল্লাবাড়িতে গিয়ে 'তওবা' অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ত করেছিলুম। মোল্লা সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন 'অজান্তে খেলে পাপ হয় না'। কিন্তু আমার পাপিষ্ঠ মন চিন্তা করে দেখলে, অজান্তে খেলেও স্বাদে ভাল লাগতে পারে।

কিন্তু ইংরেজী রেস্তরা বাবদে আমার আপনার বিশেষ কোন দুশ্চিন্তা নেই। বন্ধুবান্ধবদের ভিতর আকছারই দু-একজন বিলেত-ফেরতা থাকেন। মেন্থ সম্বন্ধে তাঁদের সুগভীর জ্ঞান দেখাবার মোকা পেয়ে তাঁরা বিমলোল্লাস অনুভব করেন, আমরাও উপকৃত হই। তদুপরি 'বয়' যখন বিল হাজির করে, তখন আমি হঠাৎ জানলা দিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করতে থাকি—এটিকেট-দুরস্ত বিলেত-ফেরতাকেই এক্ষেত্রে বিল শোধ করতে হয়। উদাস, ভাবালু হওয়ার ভান করতে পারলে বিস্তর লাভ।

বাঙালীর দুর্বলতা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বা ইংলিশ্ রান্নার প্রতি নয়—তার প্রাণ ছোঁক ছোঁক করে মোগলাই রান্নার জন্য। কিন্তু মেন্থ পড়তে জানে না বলে যা-তা অর্ডার দিয়ে বসে এবং নিতান্ত পয়সা ঢেলে দিয়েছে বলে সেটা যখন অতি অনিচ্ছায় খায়, তখন দেখতে পায়, পাশের টেবিলে এক ভাগ্যবান ঠিক সেই সেই জিনিসই পরম পরিতোষ সহকারে খাচ্ছে, যে-সব খাবার সৎ-কামনা নিয়ে সে রেস্তরাঁয় এসেছিল।

একেই বলে অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস।

জীবনের মেজর ট্র্যাজেডি বা 'অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে'র নিঘণ্টু যদি দিতে হয়, তবে আমার প্রথম যৌবনের প্রথমা প্রিয়া যে আমাকে জিল্ট করেছিলেন সেটার উল্লেখ আমি করব না, কিন্তু এটার উল্লেখ অতি অবশ্য করব। সুখাদ্যের জিল্টিং ভোলার জন্য একটা জাবন যথেষ্ট দীর্ঘ নয়।

বাঙালী-রান্না বললে কী বোঝায় সেটা আমরা মোটামুটি জানি, কিন্তু সব বাঙালী-রান্না এক রকম নয়। পুব আর পশ্চিম বাংলার রান্নাতে এস্তার তফাত। পুবের রান্নাতে ঝালের প্রাচুর্য, পশ্চিমের রান্নাতে চিনি। কে যেন বলেছিল, 'মাই মোটর কার ইজ সাউণ্ড ইন্ এভ্রি পার্ট, এক্সেপ্ট্ ইন দি হর্ন—ঠিক সেই রকম পশ্চিম-বাংলার রান্নাতে 'সুগার ইন্ এভ্রিথিং এক্সেপ্ট্ ইন্ রসগোল্লা।'

সব মোগলাই রান্না এক রকমের নয়। কলকাতায় এই কয়েক বছর পূর্বেও প্রচলিত ছিল একমাত্র 'কলকাত্তাই মোগলাই' রান্না। হালে 'লাহোরী মোগলাই'ও

প্রচলিত হয়েছে। দেশ-বিভাগের পর লাহোর-পিণ্ডির 'শেফ'রা দিল্লির কনট সার্কাসে এসে 'পাঞ্জাবী মোগলা'ই রান্না প্রবর্তন করেন (দিল্লীর মোগলাই এখন চাঁদনী চৌকে আশ্রয় নিয়েছে) এবং তারই ব্রাঞ্চ এখন কলকাতা এসে পৌঁছেছে।

এ রান্নার বৈশিষ্ট্য তিনটি জিনিসে :—

(১) আফগানী নান্। কলকাতার আদিম ও অকৃত্রিম নান্-রুটির (ফার্সীতে 'নান' শব্দেরই অর্থ রুটি—'নান্-রুটি' তাই হুবহু পাঁউ-রুটির মত, কারণ পর্তুগীজ 'পাঁউ' শব্দের অর্থ রুটি) সঙ্গে এর অতি অল্প মিল। আফগানী নান্ দৈর্ঘ্যে প্রায় এক হাত এবং আকারে অনেকটা সিংহল দ্বীপের ন্যায়। রুটির পাশগুলো মোলায়েম, মধ্যিখানটা বিস্কুটের মত ক্রিসপ্ (ওই দিয়ে ভোজনের শেষ অঙ্কে দিব্য 'চীজ্ অ্যাণ্ড বিস্‌কিট্'ও খাওয়া যায়)। এই নান্ আপনি কতখানি মোলায়েম বা ক্রিস্‌প্ খেতে পছন্দ করেন সেটা দু-চার দিন খাওয়ার পরেই খানসামাকে বলে দিতে পারবেন।

(২) তন্দুরী মাছ। মাঝারি সাইজের একটা আস্ত মাছ সাফসুতরো করে, মসলাদি মাখিয়ে তন্দুর-(আভ্‌ন) এর ভিতর ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। যখন বেরিয়ে আসে তখন মনে হয়, বোধ হয় ভালমত রান্না হয় নি। কিন্তু খেয়ে দেখবেন, অপূর্ব স্বাদ। আমাদের বাড়িতে তন্দুর নেই বলে আমরা পাঞ্জাবীদের এই 'তন্দুরী ফিশ্' অবদানটি মুক্তকণ্ঠে এবং সরস জিহ্বায় মেনে নিয়েছি।

(৩) তন্দুরী চিকেন্। এতে প্রায় কোনও মসলাই ব্যবহার করা হয় না বলে এ-জিনিস যত খুশি খান অসুখ করবে না। অতি মোলায়েম এবং উপাদেয়। আস্ত মুর্গীটি হাত দিয়ে ভাঙবেন, এবং হাত দিয়েই নান্ সহযোগে খাবেন—ছুরি-কাঁটার পাশ মাড়াবেন না।

সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে শিক কাবাব, শামী কাবাব, বড়ী কাবাব, মিশ্‌রী (মিশরীয়) কাবাব অল্প অল্প খেতে পারেন। একটুখানি গ্রেভি-ওলা ভিজে বস্তুর প্রয়োজন হলে কোফ্‌তা-নরগিস্ (অনেকটা ডেভিলের মত) অর্ডার দিতে পারেন। আমি কিন্তু এ-পর্বে শুকনোই পছন্দ করি।

উপরোল্লিখিত এক, দুই, তিন নম্বরের জিনিস খাস কলকাত্তাই মোগলাই রেস্তরাঁয় পাবেন না। তবে শুনেছি, ইদানীং কোনও কোনও রেস্তরাঁ চাপে পড়ে রাখতে আরম্ভ করেছেন।

এবার ভেজার পালা।

মটন পোলাও, চিকেন পোলাও, আণ্ডা পোলাও এবং মটর পোলাও। ফিশ

পোলাও অল্প রেস্তরাঁয় পাওয়া যায়।

এর সঙ্গে দুনিয়ার জিনিস খেতে পারেন। কোর্মা, কালিয়া, দোলমা, রেজালা যা খুশি। যাঁরা ঝাল খেতে ভালবাসেন অথচ অসুখের ভয়ে খান না, তাঁরা 'দহী-ওলা-গোশ্‌ৎ—অর্থাৎ দই-মাংস (সাধারণত মটনের হয়) খাবেন। দিল্লি-ওলারা যে এত ঝাল খেয়েও কাল কাটাচ্ছে তার একমাত্র কারণ, হয় দহি-ওলা গোশ্‌ৎ খায়, নয় খাওয়ার পর এক ভাঁড় টক দই খায়।

পেটটাকে যদি আরও ধাতস্থ রাখতে চান তবে খাবেন 'শাকওলা-গোশ্‌ৎ'—অর্থাৎ শাকের সঙ্গে মাংস। এটা শিখদের প্রিয় খাদ্য—যে রকম ওরা করেলার ভিতর কিমা মাংস পুরে দোলমা খায়।

আর ঝাল-ফর্জী, রওগন যুস্‌, শাহী কুর্মা এবং লাটের মাল চিকেন কারি, মটন কারি ইত্যাদি ত রয়েছেই। ভেজিটেরিয়নদের জন্য মটর-পোলাও এবং চীজ-আলু, কিংবা চীজ-মটর কারি। তবে মাংসহীন সাদা পোলাওয়ের সঙ্গেই চীজ-মটর ঝোল মানায় বেশী।

আমি মটর-পোলাওয়ের সঙ্গে মটন কিংবা চিকেন কারি খাই; কারণ মটন-পোলাওয়ের সঙ্গে মটন-কারিতে মটনের বাড়াবাড়ি হয়, আবার চিকেন পোলাওয়ের সঙ্গে মটন-কারিতে দুটো মাংসের ককটেলকে আমার গুবলেট বলে মনে হয়। তবে এটা নিছকই রুচির কথা। আর ভুলবেন না গ্রেভির অপ্রাচুর্য হলে, সব সময়ই ওটা আলাদা করে অর্ডার দেওয়া যায়।

সর্বশেষ উপদেশ, বয়স্ক ওয়েটারকে মেনু বাছাই করার সময় ডেকে নিয়ে তার সদুপদেশ নেবেন। না নিলে কী হয় ?

এক ইংরেজ স্নব গেছেন প্যারিসের রেস্তরাঁয়। তিনি কারও উপদেশ নেবেন না। মেনুর প্রথম পদে আঙুল দিয়ে বোঝালেন কী চাই। নিশ্চয়ই সুপ। এল তাই। উত্তম প্রস্তাব।

তারপর আঙুল নামালেন অনেকখানি নীচে। ভাবলেন মাছ, মাংস আণ্ডা কিছু একটা আসবে। এল আবার সুপ। ইংরেজ জানতেন না, ফরাসীরা বাইশ রকমের সুপ রাখে।

খেয়েছে! এখন কী করা যায় ? আঙুল দিলেন সর্বশেষ পদে। পুডিঙ্‌, কিংবা আইসক্রীম হবে।

এল খড়কে—টুথ্‌-পেক্‌ !!

বাংলার গুণ না জর্মন গুণী

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের হল-করিডরে দু-পিরিয়ডের মাঝখানে লেগে যায় গোরু-হাটের ভিড়, কিংবা বলতে পারেন আমাদের সিনেমা-হলের সামনের জনারণ্য। তফাত শুধু এইটুকু যে, জর্মনরা আইনকানুন মেনে চলতে ভালবাসে বলে ধাক্কাধাক্কি চেঁচামেচি বড়-একটা হয় না, করিডরে ত রীতিমত উজোন-ভাটা দুটো স্রোতের মত ছেলেমেয়েরা চলে এক ক্লাস থেকে আরেক ক্লাসের দিকে, কিংবা ইউনিভার্সিটি-রেস্তরাঁর দিকে অথবা কমন-রুম পানে।

তার মাঝখানে মাঝে মাঝে হঠাৎ দেখতে পেতুম বুড়ো আইনস্টাইন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে চলেছেন ক্লাস নিতে। আলুথালু কেশ, লজ্ঝড় বেশ। কোন্ খেয়ালে মগ্ন ছিলেন খোদায় মালুম। শেষ মুহূর্তে টনক নড়েছে সেদিন তাঁর ক্লাস আছে—রুম নম্বর গিয়েছেন ভুলে, কী পড়াতে হবে তারও খেয়াল নাই। ছেলেরা সমীহভরে পথ করে দিত আর বুড়ো আইনস্টাইন ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেগে তাবৎ ইউনিভার্সিটি-বিল্ডিং চষে বেড়াতেন আপন রুমের সন্ধানে। মুখে শুধু 'পারদোঁ, পারদোঁ' (মাফ করুন, মাফ করুন), কারণ জানেন, কলিশন লাগলে দোষ তাঁরই।

অথবা দেখতে পেতুম, অর্থশাস্ত্রের বাঘা কৌটিল্য সমবার্ট চলেছেন হেলেদুলে। বগলে একগাদা কেতাব, তারই ধাক্কায় টাইটা একটু বেঁকে গিয়েছে, সঙ্গে গোটা দশেক শিষ্য-শিষ্যা। চলতে চলতেই পড়ানো চলছে। সমবার্ট আর কতদিন বাঁচবেন কে জানে, তাই—

ছেলেরা সব সমবার্টেরে ঘিরে
মাছি যেমন পাকা আমের চতুর্দিক ফিরে—

তাঁর শেষ জ্ঞানবিন্দুটুকু শুষে নিতে চায়।

কিংবা দেখতুম কাঁচাপাকা চুল, একচোখ কানা সংস্কৃতের অধ্যাপক ল্যুডার্স। তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য বেদে। মোন-জো-দড়ো সভ্যতা আর্য, অনার্য, না প্রাক-আর্য, তাই নিয়ে যখন ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা খুন-খারাপি করার মত অবস্থায় এসে পড়েছেন, তখন সবাই বললেন, 'মোন-জো-দড়ো বৈদিক, না প্রাক-বৈদিক, সেকথা ঠাহর করার মত এলেম মার্শালের পেটে নেই। সেখানে পাঠাও ল্যুডার্সকে। চতুর্বেদ আর সে-সময়কার আহার-বিহার, ক্ষেত-খামার, হাতিয়ার-তলোয়ার সর্ববিষয় তাঁর নখদর্পণে। মোন-জো-দড়ো সভ্যতার গোপনতম কোণেও যদি বৈদিক সভ্যতার কণামাত্র প্রভাব গা-ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে থাকে, তবু সে

ল্যুডার্সকে ফাঁকি দিতে পারবে না—

'করাচী বন্দরে নেমেই ল্যুডার্স তার গন্ধ পাবেন, ওই একটি চোখ দিয়েই তাকে খুঁজে নেবেন আর ক্যাঁক করে ধরে নিয়ে বিশ্বজনকে দেখিয়ে দেবেন, বেদের ইন্দ্রদেব কোন্ ময়ূরের প্যাখম পরে সেখানে ঘাপটি মেরে বসে আছেন।

'আর ল্যুডার্স যদি বলেন, "না, বৈদিক সভ্যতার সঙ্গে মোন-জো-দড়োর কোনও প্রকারের যোগসূত্র নেই," তাহলে নাককান বুজে সেই রায় মেনে নিয়ে তাবৎ ঝগড়া-কাজিয়ার উপর ধামাচাপা দিয়ে দাও।'

আইনস্টাইন, সমবার্ট, ল্যুডার্স এঁরা সব ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তম্ভ, তোরণ-শিখর-বিশেষ। তা ছাড়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো শুষে নেবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীরে কত যে নাম-না-জানা ঘুলঘুলি গবাক্ষ ছিলেন তার হিসেব রাখবে কে?

এঁরা যে বিশ্ববিদ্যালয়-যজ্ঞশালার প্রত্যন্ত প্রদেশে অনাবৃত উপেক্ষিত ছিলেন তা নয়, কিন্তু এঁদের সঙ্গে যোগাযোগ হতে সময় লাগত একটু বেশী। এঁদেরই একজন ছিলেন, অধ্যাপক ভাগনার, ইনি পড়াতেন বাংলা ভাষা।

জর্মন ভাষা বিশ্ববরেণ্য ভাষা। সে-ভাষা পড়াবার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবস্থা আছে কিনা জানি নে, কিন্তু বাংলার মত অর্বাচীন ভাষা পড়াবার ব্যবস্থা যে সুদূর বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে, এ-সংবাদ শুনে পুলকিত হয়েছিলুম।

ভাগনারের সঙ্গে আলাপ হতেই তিনি তাঁর বাড়িতে আমাকে নিমন্ত্রণ করলেন। যথেষ্ট বঙ্গভাষাভাষীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয় নি বলে তিনি কথা কইলেন জর্মন ভাষায়, মাঝে মাঝে বাংলা মসলার ফোড়ন দিয়ে। অদ্ভুত শোনাল, কিন্তু সেই নির্বান্ধব পাণ্ডববর্জিত দেশে বিদেশীর মুখে বাংলা শুনে জানটা যে তর্ হয়ে গেল, সে-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

ভাগনারের বাড়ি গিয়ে দেখি, ভদ্রলোক একখানা বাংলা বই নিয়ে ধস্তাধস্তি করছেন। ডাইনে বাঁয়ে বিস্তর বাংলা অভিধান, ব্যাকরণ—এক পাশে ব্যোট্‌লিঙ্ক-রোটের পর্বতপ্রমাণ সংস্কৃত-জর্মন অভিধান।

বাংলা অভিধানে হদিস না মিললে সংস্কৃত দিক-সুন্দরীর (ডিক্সনারি) নিকট দিগ্‌দর্শন যাচঞা করবেন বলে।

ভূমিকা না করেই বললেন, 'আমায় একটু সাহায্য করুন।'

এতদিন পর আজ আর ঠিক মনে নেই কিন্তু খুব সম্ভব গল্পটা ছিল শরৎ চাটুয্যের 'আঁধারে আলো'। 'হাবুবাবু ছোরা চালাতে শিখেছে' এইরকম ধারা কী জানি কী একটা ছিল। যোগরূঢ়ার্থে 'নীলকণ্ঠ' শিব এ-কথা ভাগনার জানতেন কিন্তু 'হাবুবাবু' যোগরূঢ়ার্থে যে শান্ত-শিষ্ট গোবেচারী—নিন্‌কমপুপ—সে কথাটার

সন্ধান ভাগনার কোথাও পান নি, অবশ্য আভাসে-আন্দাজে শব্দটার খানিকটে মানে আন্দাজ করে নিতে পেরেছিলেন।

কিন্তু ভাগনার দেখলুম তাঁর ওয়াটার্লুতে এসে ঠেকেছেন, সেই গল্পের মধ্যে বিদ্যাপতির এক উদ্ধৃতিতে :—

"আজু রজনী হম ভাগে পোহাইনু
পেখনু পিয়া-মুখ চন্দা
জীবনযৌবন সফল করি মাননু
দশদিশ ভেল নিরানন্দা—"

আজু-ফাজু, পেখনু-টেখনু খাঁটি বাংলা কথা নয়, কিন্তু হুঁশিয়ার ভাগনার কেঁদে-ককিয়ে এসব কথার মানে বেশ কিছুটা রপ্ত করে ফেলেছেন, কিন্তু 'নিরানন্দা' কথায় এসে যে মানে তিনি করেছেন, সেটা মন মেনে নিলেও হৃদয় 'নিরানন্দা'ই থেকে যায়।

ভাগনার বললেন, 'তবে কি এই বুঝতে হবে, প্রিয়মুখচন্দ্র দর্শন করাতে আমার এতই আনন্দ হল যে, মনে হচ্ছে দশদিশ নিরানন্দ হয়ে গিয়েছে, কারণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল আনন্দ আমাতে এসে ঠাঁই নেওয়ায় "দশদিশ নিরানন্দ" হয়ে গিয়েছে ?'

অভিনবগুপ্তের না হোক, অভিনব টীকা তো বটেই।

সবিনয়ে বললুম বিদ্যাপতি বিনা টীকায় পড়ার মত বিদ্যা আমার নেই তবে যতদূর মনে পড়ছে, কথাটা এখানে 'নিরানন্দ' নয়, আসলে আছে বোধ হয় 'নিরদ্বন্দ্বা'। আমাতে প্রিয়াতে মিলন হয়েছে ঐক্য হয়েছে, দশদিশে আমি আর কোনও দ্বন্দ্ব দেখতে পাচ্ছি নে। যেখানে যত দ্বন্দ্ব অর্থাৎ বিরহ ছিল সেখানেই মিলন এসে গিয়েছে—দশদিশে এখন শান্তি।

আর বেদেও ত ঋষি প্রার্থনা করেছেন, "সর্বপ্রকারের দ্বন্দ্বের সমাধান হোক।"

ভাগনার বললেন, উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু ছাপার ভুল হতে যাবে কেন ?

এর কোনও সদুত্তর আমি দিতে পারি নি। আপনারা যদি বাতলে দেন। ঘটনাটি যে এত সবিস্তর বয়ান করলুম তার 'মরাল' কী ?

সুকুমারী ভাষায় বলি :—

'হাসতে হাসতে যারা হচ্ছে কেবল সারা
রাম্‌গরুড়ের লাগছে ব্যথা
বুঝছে না কি তারা ?'

প্রকাশক আর ছাপাখানা যে 'নিরদ্বন্দ্ব' হয়ে ছাপার ভুল করেই যাচ্ছেন, 'ভাগনারেরই লাগছে ব্যথা, বুঝছে না কি তারা ??'

শিক্ষা প্রসঙ্গ

কিছুকাল আগে বোম্বায়ে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণণ বলেন, এদেশের সবচেয়ে বড় কর্তব্য আপামরজনসাধারণের ভিতর শিক্ষার প্রচার ও প্রসার করা এবং বেকার-সমস্যার নিরঙ্কুশ সমাধান করা।

এ অতি সত্য কথা—এমন কি পৃথিবীর বর্বরতম দেশও এ-তত্ত্ব মেনে নেবে। কিন্তু প্রশ্ন, শিক্ষার বিস্তার এবং প্রসার করা যায় কী প্রকারে? পূর্ববঙ্গে একটি প্রবাদ আছে:—

'যত টাকা জমাইছিলাম
শুঁটকি মাছ খাইয়া
সকল টাকা লইয়া গেল
গুলবদনীর মাইয়া।'

যত রকমের খাজনা হতে পারে, যত প্রকারের ন্যায্য অন্যায্য ট্যাক্স হতে পারে সবই ত চাঁদপানা মুখ করে দিচ্ছি। সরকারের হাতে সে-টাকা জমা হচ্ছে এবং তার বেবাক খরচ হয়ে যাচ্ছে এ-খাতে ও-খাতে সে-খাতে, অর্থাৎ গুলবদনীর মাইয়াই সব টাকা নিয়ে যাচ্ছে, শিক্ষা-বিস্তারের জন্য যে-অর্থের প্রয়োজন তার শতাংশের এক অংশও উদ্বৃত্ত থাকছে না।

কাজেই গ্রামে গ্রামে পাঠশালা খুলি কী করে, পুরনোগুলিই বা চালু রাখি কোন্ কৌশলে?

কিন্তু আমার মনে হয় পুরনো স্কুল চালু রাখা আর নূতন স্কুল খোলাই শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রধান কর্ম নয়।

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গিয়েছে, কোন বিশেষ গ্রামে গত পঞ্চাশ বৎসর ধরে একটি ভাল পাঠশালা উত্তমরূপে চালু আছে, প্রতি বৎসর দশ বারোটি ছেলে শেষ পরীক্ষা পাস করে বেরিয়ে যাচ্ছে, কেউ কেউ বৃত্তিও পাচ্ছে, কিন্তু তবু যে-কোনও সময় আপনি সে-গ্রামে গিয়ে যদি হিসেব নেন, কটি ছেলে লিখতে পড়তে পারে, তবে দেখবেন দশ-বারোটির বেশী না; বাদবাকী আর সবই লেখা-পড়া ভুলে গিয়েছে এবং যে দশ-বারোটি কেঁদে-ককিয়ে পড়তে পারে তারাও শীঘ্রই সম্পূর্ণ নিরক্ষর হয়ে যাবে। অবশ্য আমি এস্থলে সাধারণ চাষা-মজুরের

কথাই ভাবছি—মধ্যবিত্ত কিংবা বিত্তশালী পরিবারের কথা উঠছে না।

এর কারণ অনুসন্ধান করলে দেখতে পাবেন—আমরা চাষার ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে দিয়ে ভাবি, আমাদের কর্তব্য শেষ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এ-কথা ভাবি নে, তারা পরীক্ষায় পাস করার পর পড়বে কী! তারা যে পুনরায় নিরক্ষর হয়ে যায় তার একমাত্র কারণ তাদের কাছে পড়বার মত কিছু থাকে না।

ইয়োরোপের চাষা মজুর আমাদের মত গরিব নয়। তারা যে নিরক্ষর হয়ে যায় না, তার একমাত্র কারণ তারা খবরের কাগজ পড়ে এবং মেয়েরা ক্যাথলিক হলে প্রেয়ার বুক আর প্রটেস্টান্ট হলে বাইবেল পড়ে। অবসর-সময়ে হয়ত একখানা নভেল কিংবা ভ্রমণ-কাহিনী পড়ে, কাজ না থাকলে হয়ত তারা চিঠি-চাপাটিও লেখে, কিন্তু এগুলো আসল কারণ নয়—আসল কারণ খবরের কাগজ, প্রেয়ার বুক এবং বাইবেল।

স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আমাদের চাষা খেতে পায় না, সে খবরের কগজ কিনবার পয়সা পাবে কোথায়?

তাই দেখতে পাবেন, যে-চাষা কোন গতিকে তার ছেলেকে পাঠশালা পাসের সময় একখানা রামায়ণ কিংবা মহাভারত কিনে দিতে পেরেছিল তাব বাড়িতে তবু কিছুটা সাক্ষরতা বেঁচে থাকে। এই আংশিক বাঁচাওটাটা কিন্তু প্রধানত বাংলা দেশে। হিন্দীভাষীদের তুলসী রামায়ণ পড়ে সে-লাভ হয় না, কারণ তুলসীদাসের ভাষা আর আধুনিক হিন্দীতে প্রচুর তফাত। তুলসীদাসের ভাষা দিয়ে আজকের দিনে চিঠি লেখা যায় না—কাশীরাম কিংবা কৃত্তিবাসের ভাষার সঙ্গে কিন্তু আধুনিক বাংলার খুব বেশী পার্থক্য নেই।

তাই দেখতে পাবেন মুসলমান চাষা পাঠশালা পাসের পর খুব শিগগিরই নিরক্ষর হয়ে যায়, কারণ সে রামায়ণ-মহাভারত পড়ে না এবং বাংলা ভাষায় এ-রকম ধরণের সহজ সরল মুসলমানী ধর্মপুস্তক নেই। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে পরিস্থিতিটা কী রকম তার খবর আমার জানা নেই, তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এর পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করলে আমরা শিক্ষাবিস্তারের জন্য বিস্তর হদিস পাব।

তা হলে ওষুধ কী?

যে-উত্তর সকলের প্রথম মনে আসবে সে হচ্ছে, গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরি বসানো। কিন্তু অত টাকা যোগাবে কোন্ গৌরী সেন? সরকার ত দেউলে। তা হলে?

এইখানে এসে আমিও আটকা পড়ে যাই। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি নূতন ইস্কুল

খোলার চেয়েও বড় কাজ, পড়ার জিনিস সাক্ষর ছেলেমেয়েদের হাতে দেওয়া —বিনি পয়সায় কিংবা অতি অল্প দামে।

আমি বহু বৎসর ধরে এ-সমস্যা নিয়ে মনে তোলপাড় করেছি, বহু গুণীর সঙ্গে আলোচনা করেছি, দেশ-বিদেশে উন্নত অনুন্নত সমাজে অনুসন্ধান করেছি —তারা এ-সমস্যার সমাধান কী প্রকারে করে, কিন্তু কোন ভাল ওষুধ এখনও খুঁজে পাই নি। আমার পাঠকেরা যদি এ-সম্পর্কে তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত আমাকে জানান, তবে তার আলোচনা করলে আমরা লাভবান হব সন্দেহ নেই।

অন্য এক বক্তৃতায় শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণণ বলেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কর্তব্য ছাত্রদের 'স্পিরিচুয়াল' ডিরেক্‌শান্ দেওয়া।

আমার মনে হয়, এইমাত্র আমরা যে-সমস্যা নিয়ে বিব্রত হয়েছিলুম সেই সমস্যারই এ আরেকটা দিক।

'স্পিরিচুয়াল' বলতে শ্রীরাধাকৃষ্ণণ নিশ্চয়ই 'রিলিজিয়ান' বলতে চান নি— তাহলে হাঙ্গামা অনেকখানি কমে যেত—তাই মোটামুটি ধরা যেতে পারে, তিনি আমার প্রয়োজনের দিকটাতেই ইঙ্গিত করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান কর্ম ছাত্রকে তার দেশের বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করা এবং এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ভারতীয় বৈদগ্ধ্যে আত্মার ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য প্রয়োজনের অধিক সুস্বাদু আহার্য রয়েছে। কাজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে, অধ্যাপকেরা যদি ছাত্রকে ভারতীয় বৈদগ্ধ্যের প্রতি অনুসন্ধিৎসু করতে পারেন, সে-বৈদগ্ধ্যের উত্তম উত্তম বস্তুর রসাস্বাদ করাতে শেখান, তবে ছাত্র নিজের থেকেই তার প্রয়োজনীয় আধ্যাত্মিক ধন চিনে নিতে পারবে। সকলেরই কাজে লাগবে এমন মুষ্টিযোগ যখন মুষ্টিগত নয়, তখন ছাত্রের সামনে গন্ধমাদন রাখা ছাড়া উপায় নেই—যে যার বিশল্যকরণী বেছে নেবে।

কিন্তু সমস্যা তৎসত্ত্বেও গুরুতর। ছেলেদের পড়তে দেব কী? ভারতীয় বৈদগ্ধ্যের শতকরা পঁচানব্বই ভাগ সংস্কৃত-পালিতে, তিন ভাগ ইংরেজীতে, আর মেরে কেটে দুভাগ বাংলায়। অথচ আজকের দিনে সব ছেলেকে ত আর জোর করে বি. এ অনার্স অবধি সংস্কৃত পড়াতে পারি নে। এবং তাতেই বা কী লাভ? কজন সংস্কৃতে অনার্স গ্র্যাজুয়েটকে অবসরসময়ে সংস্কৃত বইয়ের পাতা ওল্টাতে আপনি আমি দেখেছি? সংস্কৃত গড় গড় করে পড়া শিখতে হলে টোল ছাড়া গত্যন্তর নেই।

অতএব মাতৃভাষাতেই আমাদের বৈদগ্ধ্যচর্চা করতে হবে।

এবং সেখানেই চিত্তির। আজ যদি আপনি বেদ, উপনিষদ, ষড়দর্শন, কাব্য,

অলঙ্কার, নৃত্যনাট্য-সঙ্গীতশাস্ত্র বাংলা অনুবাদে পড়তে চান তবে একবার ঘুরে আসুন কলেজ স্কোয়ারে বইয়ের দোকানগুলোতে। যে-সব বইয়ের বাংলা অনুবাদ হয়ে গিয়েছে সেগুলোই যোগাড় করতে গিয়ে আপনাকে চোখের জলে নাকের জলে হতে হবে।

আর কত শত সহস্র পুস্তক যে আপনার পড়তে ইচ্ছা হবে, অথচ অনুবাদ নেই তার হিসেব করবে কে ?

হিন্দীওয়ালাদের ত আরও বিপদ। আমাদের চেয়ে ওদের অনুবাদ-সাহিত্য অনেক বেশী কম-জোর। এই দিল্লির কনট সার্কাসে আমি হিন্দী বইয়ের দোকানে সার্কাসের ঘোড়ার মতই চক্কর লাগাই—আজ পর্যন্ত কোন সংস্কৃত বইয়ের উত্তম হিন্দী অনুবাদ চোখে পড়ল না, যেটি বাড়িতে এনে রসিয়ে রসিয়ে পড়ি।

মারাঠী ভাষায় তবু কিছু আছে, গুজরাতীতে তারও কম। আসামীতে প্রায় কিছুই নেই, ওড়িয়ার খবর জানি নে—তবে যেহেতু শিক্ষিত আসাম এবং উড়িষ্যা-সন্তান মাত্রই বাংলা পড়তে পারেন তাই তাঁদের জন্য বিশেষ দুশ্চিন্তা করতে হবে না।

মোদ্দা কথায় ফিরে যাই। রাধাকৃষ্ণণ ত দায় চাপিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর অর্থাৎ অধ্যাপকদের উপর। কিন্তু হায়, তাদের ত দরদ নেই এসব জিনিসের প্রতি। আর স্বয়ং রাধাকৃষ্ণণের যদি দরদ থাকত তবে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে উপরাষ্ট্রপতি হতে গেলেন কেন !?

পোলেমিক

কলকাতাতে বর্ষা বসন্ত আছে বটে, কিন্তু তাতে করে কলকাতাবাসীর জীবন-যাত্রায় কোনও প্রকারের ফেরফার হয় না। হৈ-হুল্লোড়, পার্টপরব, কেনাকাটা, মারামারি একই ওজনে চলে। দিল্লিতে কিন্তু ভিন্ন ব্যবস্থা। এখানে দুই ঋতু —গ্রীষ্ম আর শীত। শীতকালে এন্তার দাওয়াত-নেমন্তন্ন, দিনে দশটা করে মীটিং, হপ্তায় দুটো করে আর্ট প্রদর্শনী, আজ ভরতনাট্যম, কাল কথাকলি, পরশু য়েহুদী মেনুহিন, আর এক গাদা সঙ্গীত সম্মেলন, কবিসঙ্গম, মুশাইরা। গ্রীষ্মকালে এ-সব-কিছুতে মন্দা পড়ে যায়, শুধু যে সব দেশের বাৎসরিক পরব গরমে পড়েছে, সে সব দেশের রাজদূতেরা বাধ্য হয়ে "রিসেপশন" দেন, আর সবাই শার্ক স্কিন আর কালো বনাতের মধ্যিখানে প্রচুর পরিমাণে ঘামেন। পার্টিগুলোর জলুসেরও খোলতাই হয় না, কারণ ডাকসাইটে সুন্দরীরা পাহাড়-পর্বতে ঘুরতে গেছেন—

পার্টিতে যদি রঙবেরঙের শাড়ির ব্যবহারই না থাকল তবে সে-পার্টি অতি নিরামিষ (নিরম্বু ত বটেই ; এসব পার্টিতে জল মানা)। তাই পাঁচজন পার্টি থেকে ভদ্রতা রক্ষা করেই তাড়াতাড়ি কেটে পড়েন।

এসব হল নিউ দিল্লির কাহিনী। পুরানী দিল্লিতে কিন্তু একটা জিনিসের অভাব কখনও হয় না। প্রায় প্রতিদিনই কোন-না-কোন নাগরিককে অভিনন্দন করার জন্য কোন-না-কোন পার্কে তাঁবু আর শামিয়ানা খাটিয়ে, দিগধিড়িঙ্গে লাউডস্পীকার ঝুলিয়ে যা চেল্লাচেল্লি আরম্ভ হয় তাতে পাড়ার লোক ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ে—দরজা জানলা বন্ধ করে একে অন্যের সঙ্গে কথা পর্যন্ত কওয়া যায় না।

এ-রকম একটা অভিনন্দন-পার্টিতে আমি দিনকয়েক পূর্বে গিয়েছিলুম। যে দুজনকে অভিনন্দন করা হল, আমি তাঁদের নাম শুনি নি, দিল্লির কজন লোক তাঁদের নাম শুনেছে তাও বলতে পারব না।

দুজনারই যে প্রশস্তি গাওয়া হল, তা শুনে আমার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটি ছোট লেখার কথা মনে পড়ল। এ লেখাটি সচরাচর কেউ পড়েন না বলে উদ্ধৃতির প্রলোভন সম্বরণ করতে পারলুম না।

‘কবিকুলতিলকস্য কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য’ এই ছদ্মনামে বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখেছেন :—

‘আমি এ স্থলে—নাথ বিদ্যারত্নকে নদিয়ার চাঁদ বলিলাম। কিন্তু শ্রীমতী যশোহরহিন্দুধর্মরক্ষিণীসভাদেবী—মোহন বিদ্যারত্নকে নবদ্বীপচন্দ্র অর্থাৎ নদিয়ার চাঁদ বলিয়াছেন। উভয়েই বিদ্যারত্ন উপাধিধারী, উভয়েই স্ব স্ব বিষয়ে সর্বপ্রধান বলিয়া গণ্য, বিদ্যাবুদ্ধির দৌড়ও উভয়ের একই ধরনের। সুতরাং উভয়েই নবদ্বীপ-চন্দ্র অর্থাৎ নদীয়ার চাঁদ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হবার যোগ্য পাত্র, সে বিষয়ে সংশয় নাই কিন্তু এ পর্যন্ত এক সময়ে দুই চাঁদ দেখা যায় নাই। সুতরাং একজন বই, দুইজনে নদিয়ার চাঁদ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু উভয়ের মধ্যে একজন একবারেই বঞ্চিত হইবেন, সেটাও ভাল দেখায় না ; এবং ঐ উপলক্ষে দুজনে হুড়হুড়ি গুঁতাগুঁতি করিয়া মরিবেন সেটাও ভাল দেখায় না। এজন্য আমার বিবেচনায় সমাংশ করিয়া দুজনকেই এক এক অর্ধচন্দ্র দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করা উচিত। শ্রীমতী যশোহরহিন্দুধর্মরক্ষিণীসভাদেবী আমার এই পক্ষপাতবিহীন ফয়সালা ঘাড় পাতিয়া লইলে আর কোনও গোলযোগ বা বিবাদ বিসংবাদ থাকে না। এক্ষণে তাঁর যেরূপ মরজি হয়।’

নিত্যি নিত্যি কারণে-অকারণে হৈ হুল্লোড় করার অভ্যাস দিল্লিবাসী বাঙালীর

উপরও বেশ কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছে। আজ এখানে সাহিত্যসভা, কাল ওখানে বর্ষামঙ্গল প্রায়ই এসব 'পরব' হয়।

এবং অনেক সময় মনে হয়েছে, এ-সব পরবে সত্যকার কাজ যেন ঠিকমত হচ্ছে না।

তাই আমি চেষ্টা করেছি, ছোট গণ্ডির ভিতর অল্প সংখ্যক লোক নিয়ে প্রতি সপ্তাহে কিংবা প্রতি পক্ষে "স্টাডি সার্কাল" বসাবার, কিন্তু দুঃখের বিষয় এ-যাবৎ কৃতকার্য হতে পারি নি। আমার বয়স হয়েছে তদুপরি আমি খ্যাতনামা সাহিত্যিক নই, কাজেই আমার দ্বারা এ-জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পত্তন সম্ভবপর নয়, অথচ এর প্রয়োজন আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি।

কেন্দ্র হিসাবে দিল্লির মাহাত্ম্য ক্রমেই বাড়ছে। কেন্দ্রের হাতে অর্থ আছে এবং সে-অর্থের কিছুটা প্রাদেশিক সরকারও পান—সাহিত্য এবং সাহিত্যিকদের সেবার্থে। বাংলার প্রাদেশিক সরকার কেন্দ্রের কাছ থেকে বাংলা সাহিত্যের জন্য কত টাকা বাগাতে পারবেন, সে তাঁরা জানেন, কিন্তু আমরা যারা দিল্লিতে আছি, এ বাবদে আমাদেরও যথেষ্ট কর্তব্য আছে। আমরা যদি ছোট ছোট কর্মঠ সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারি, তবে শেষ পর্যন্ত আমাদের কর্মতৎপরতা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই। আজ যে বাংলা সাহিত্যের প্রতি আমাদের দরদের অভাব, তার প্রধান কারণ আমবা সাহিত্যেব সত্যকার চর্চা করি নে।

তার অন্যতম জাজ্বল্যমান উদাহরণ, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন আমরা বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের জন্য কিছুই করে উঠতে পারি নি, অথচ সেখানে রুশ ভাষা শেখাবার ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে।

এদিকে আবার দিল্লিতে ব্যাঙের ছাতার মত একটা জিনিস বড্ড বেশী গজাচ্ছে। এঁরা হচ্ছেন আর্ট ক্রিটিক সম্প্রদায়। এঁরা ছবি বোঝেন, মেনুহিন শোনেন, আবার আলাউদ্দীন সায়েবকেও হাততালি দেন; এঁরা ভরতনাট্যম আব মণিপুরী নিয়ে কাগজে কপচান, চীনা সেরামিক এবং দক্ষিণ-ভারতের ব্রোঞ্জ সম্বন্ধে এঁদের 'জ্ঞানে'র অন্ত নেই।

এঁদের একজন ত সবজান্তা হিসেবে এক বিশেষ গণ্ডিতে রাজপুত্রের আদর পান, বিলক্ষণ দু পয়সা তাঁর আয়ও হয়। তা হোক, আমার তাতে কণামাত্র আপত্তি নেই—পারলে আমিও ওঁর ব্যবসা ধরতুম।

কিন্তু আমার দুঃখ ভদ্রলোকটি বড্ডই বাংলা এবং বাঙালী-বিদ্বেষী। অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল এবং তাঁদের শিষ্য-উপশিষ্যেরা যে 'বেঙ্গল স্কুল' গড়ে তুলেছেন, সেটাকে যোকা পেলেই এবং মাঝে মাঝে না পেলেও বেশ কড়া

কড়া কথা শুনিয়ে দেন।

তাঁর মতে যামিনী রায়, যামিনী রায়, এবং আবার যামিনী রায়। বাংলা দেশের আর সব মাল বরবাদ, রদ্দী।

ইনি যে সব 'আর্ট সমালোচনা' প্রকাশ করেন, তার সুস্পষ্ট প্রতিবাদ হওয়া উচিত। যাঁরা এসব জিনিসের সত্য সমঝদার, তাঁদের উচিত বেরিয়ে এসে আপন দেশের সুসন্তানদের কীর্তি বার বার স্বীকার করা। 'ডেকাডেন্স' বা 'গোল্লায় যাওয়ার' অন্যতম লক্ষণ আপন দেশের মহাজনকে অস্বীকার করা বা খেলো করে দেখানো।

এ-জাতীয় লেখাকে 'পোলেমিক' বলে—বাংলায় 'মসীযুদ্ধ' বলতে পারি। এবং মসীযুদ্ধে বাঙালীব পর্বতপ্রমাণ ঐতিহ্যসম্পদ আছে। ভারতচন্দ্রের পদ্যময় পোলেমিক, আর বাঙলা গদ্য ত আরম্ভ হল খাঁটি মসীযুদ্ধ দিয়ে। রামমোহন ত কলমের লড়াই লড়লেন, হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের গোঁড়াদের সঙ্গে। তার পরের বাঘ বিদ্যাসাগব। তিনি যে পোলেমিক লিখেছেন, সে-লেখা লিখতে পারলে পৃথিবীব বড় আইনজীবী নিজেকে ধন্য মনে করবেন—অধমের মতে পোলেমিকে বিদ্যাসাগর মশাই মিলটনের বাড়া। আর মসীযুদ্ধে ব্যঙ্গ কী করে প্রয়োগ করতে হয় তাব উদাহরণ ত আপনারা একটু আগে 'অর্ধচন্দ্র' দানে স্পষ্ট দেখতে পেলেন। তারপর তিন নম্ববের মল্লবীর বঙ্কিম। তিনি হেস্টি সাহেবের (নাম ঠিক মনে নেই) বিরুদ্ধে সনাতন হিন্দুধর্মের হয়ে যে লড়াই লড়লেন সে ত অতুলনীয়। বরঞ্চ বলব, 'কৃষ্ণচরিত্র'-এর চেয়েও বড় ক্যানভাসে কাজ করেছেন বঙ্কিম এ-মসীযুদ্ধে এবং এ-সত্যও আজ স্বীকাব করব যে, আজ যদি কোন হেস্টি পুনরায় দেখা দেয় তবে তার সঙ্গে ও-রকম পাণ্ডিত্য আর ইংরেজী জ্ঞান নিয়ে (এখানে সাহিত্যিক বঙ্কিমের কথা হচ্ছে না—সে-সাহিত্যিক যে নেই সে-কথা ইস্কুলের ছোঁড়ারা পর্যন্ত জানে) লড়নেওলা আজ বাংলা দেশে নেই।

তারপর রবীন্দ্রনাথ, তিনিও কম লড়েন নি। তবে তাঁর রুচিবোধ বিংশ শতাব্দীর ছিল বলে তাঁর লেখাতে ঝাঁজ কম, কিন্তু ইংরেজের বিরুদ্ধে লেখা চিঠিতে কী তিক্ততা, কী ঘেন্না!

গল্প শুনেছি উর্দুর কবি-সম্রাট গালিব সাহেব তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী জওক্ সাহেবের একটি দোহা মুশাইরায় (কবি-সঙ্গমে) শুনে বার বার জওক্‌কে তসলীম করে বলেছিলেন, 'আপনি দয়া করে ওই দুটি ছত্র আমায় দিয়ে দিন, আর তার বদলে আমি আমার সম্পূর্ণ কাব্য আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি।'

রবীন্দ্রনাথের ওই শেষ চিঠির পরিবর্তে পৃথিবীর যে-কোন পোলেমিস্ট তাঁর সব পোলেমিক দিতে সোল্লাসে প্রস্তুত হবেন।

শরৎচন্দ্র যদি তাঁর মসীযুদ্ধ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে না করে সে-যুগের আর যে-কোন লোকের সঙ্গে করতেন, তবে তিনিও মসীযোদ্ধা হিসেবে নাম কিনে যেতে পারতেন।

তাঁর 'নারীর মূল্য' পোলেমিকের প্রথম চাল। বাংলা দেশ এ-পুস্তকের বিরুদ্ধে কলম ধরলে তিনি যে কী মাল ছাড়তেন, তার কল্পনা করতেও আমি ভয় পাই। ধর্মে বিবেকানন্দ পোলেমিস্ট, ব্যঙ্গকবিতায় দ্বিজেন্দ্রলাল।

এতখানি ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও কোনও বাঙালী এই সব ভুঁইফোড় 'আর্ট ক্রিটিক'দের জোরসে দু-কথা শুনিয়ে দেয় না কেন ??

চরিত্র-বিচার

অঙ্কশাস্ত্রে প্রশ্ন ওঠে না, এ-বাবদে আপনার কিংবা আমার অভিজ্ঞতা কী। রস-নির্মাণে ঠিক তার উল্টো। সেখানে লেখক আপন অভিজ্ঞতা থেকে চরিত্র নির্মাণ করেন, আর পাঠক আপন অভিজ্ঞতা দিয়ে সেটাকে অল্পবিস্তর যাচাই করে নেন। কিন্তু যখন কোনও জাতির চরিত্র নিয়ে আলোচনা হয় তখন সেটাকে একদিক দিয়ে যেমন অঙ্কশাস্ত্রের মত নৈর্ব্যক্তিক করা যায় না, ঠিক তেমনি সেটাকে সম্পূর্ণ নিজের অভিজ্ঞতার উপরও ছেড়ে দেওয়া যায় না। এবং তখন আবার এ-প্রশ্নও ওঠে যে-সব লোক এ-আলোচনায় যোগ দিলেন তাঁদের অভিজ্ঞতা এ-বাবদে কতখানি।

আমার অতি সামান্য আছে। তাই এই ভূমিকা দিয়ে আরম্ভ করতে হল। এবং অনুরোধ, নিজের অভিজ্ঞতার দোহাই যদি মাত্রা পেরিয়ে যায় তবে যেন পাঠক অপরাধ না নেন। সেটা সম্পূর্ণ অনিচ্ছায়। 'বাঙালীচরিত্র' সম্বন্ধে যদি প্রামাণিক পুঁথি-প্রবন্ধ থাকত, তবে তারই উপর নির্ভর করে আলোচনা অনেকখানি এগিয়ে যেতে পারত। তা নেই। বস্তুত আমাদের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয় অন্য প্রদেশের লোক দ্বারা বাঙালী সম্বন্ধে অকৃপণ, অকরুণ নিন্দাবাদ থেকে। যথা 'বাঙালী বড় দম্ভী', 'বাঙালী অন্য প্রদেশের সঙ্গে মিশতে চায় না'। সহৃদয় মন্তব্য যে একেবারেই শুনতে পাওয়া যায় না, তা নয়—যেমন শুনবেন, 'বাঙালী মেয়ে ভাল চুল বাঁধতে জানে,' কিংবা 'ব্যবসাতে বাঙালীকে ঘায়েল করা (অর্থাৎ ঠকানো) অতি সরল'।

আমি ভারতবর্ষের সব প্রদেশেই বাস করেছি। দিল্লিতেই প্রায় চার বৎসর ছিলুম। চোখ-কান খোলা-খাড়া না রাখলেও সেখানে আপনাকে অনেক খবর অনেক গুজব শুনতে হয়।

বাঙালীর প্রতি আপনার যদি কোনও দরদ থাকে তবে কিছুদিনের মধ্যেই আপনি কতকগুলি জিনিস বুঝে যাবেন।

(১) সিন্ধী পাঞ্জাবী দেশহারা হয়ে দিশেহারা হয় নি। সিন্ধীরা বোম্বাই অঞ্চলে, পাঞ্জাবীরা দিল্লী অঞ্চলে আপন ব্যবসা-বাণিজ্য দিব্য গোছগাছ ছিমছাম করে নিয়েছে। বরঞ্চ অনেক স্থলে এদের সুবিধেই হয়েছে বেশী। একটি উদাহরণ দিচ্ছি। দিল্লির কনট সার্কাস থেকে মুসলমান হোটেলওয়ালারা চলে যাওয়াতে সেখানে পাঞ্জাবীরা গাদা গাদা রেস্তরাঁ খুলেছে। ফলে খাস দিল্লির মোগলাই রান্না সেখান থেকে লোপ পেয়েছে—এখন যা পাবেন সে বস্তু পাঞ্জাবী রান্না, লাহোর অঞ্চলের। (দিল্লির রান্নার কাছে সে রান্না অজ পাড়াগেঁয়ে।) এই পাঞ্জাবীদের প্রতি আমার শ্রদ্ধার অন্ত নেই। এদের কেউ কেউ পারমিট-গিরমিট ব্যাপারে আমার কাছে দৈবেসৈবে সাহায্য নিতে এসেছে—কিন্তু কখনও হাত পাতে নি। এরা যা খাটছে এবং খেটেছে তা দেখে আমি সর্বান্তঃকরণে এদের কল্যাণ এবং শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেছি।

•

তাই অতিশয় সভয়ে শুধাই, পুব-বাংলার লোক পশ্চিম-বাংলায় এসে অনেক করেছে, কিন্তু পাঞ্জাবী-সিন্ধীরা যতখানি পেরেছে ততখানি কি তাদের দ্বারা হয়েছে? এ বড় বে-দরদ এবং বেয়াদব প্রশ্ন। পূর্ববঙ্গবাসীরা এ প্রশ্নে আমার উপর চটে গিয়ে অনেক কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দেবেন। আমি নতশিরে সব উত্তর মেনে নিচ্ছি এবং এ-স্থলে আগেভাগেই বলে রাখছি, আমি তাদের উকিল হয়েই এ-আলোচনা আরম্ভ করেছি, তাদেরই সাফাই গাইবার জন্য। একটু ধৈর্য ধরুন।

(২) চাকরি যেখানে ব্যক্তিবিশেষ কিংবা ব্যবসাবিশেষের চাকরি, সেখানে সে-চাকরির মূল্য চাকুরের পক্ষে যথেষ্ট কিন্তু দেশের পক্ষে তা যৎসামান্য। কিন্তু চাকরি যখন কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে হয়, তখন তার গুরুত্ব অসাধারণ। সকলেই জানেন, দেশের শ্রীবৃদ্ধি ও কল্যাণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মুখে অনেকগুলো বিরাট বিরাট পরিকল্পনা রয়েছে। এ-সব পরিকল্পনা ফলবতী করার দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত বর্তায় কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের উপর।

তাই প্রশ্ন, এই সব চাকরি পাচ্ছে কজন বাঙালী? পূর্বের তুলনায় এদের উপস্থিত রেশিয়ো কী? পূর্বের তুলনা বাদ দিলেও, প্রাদেশিক জনসংখ্যার হিসাবে তারা তাদের ন্যায্য হক্কগত রেশিয়ো পাচ্ছে কি?

দিল্লিবাসী বাঙালীমাত্রই একবাক্যে তারস্বরে বলবেন, 'না, না, না।' পরশ্রী-কাতর অবাঙালীও সে-ঐকতানে যোগ দেন। মনে মনে হয়ত বলেন, 'ভালই হয়েছে।' তা সে-কথা থাক্।

কেন পায় নি তার জন্য আমি কেন্দ্রীয় সরকারকে দোষ দেব না। দোষ বাঙালীর। কে কেন পারলে না, সে সাফাই গাইবার জন্যই এ-আলোচনা। একটু ধৈর্য ধরুন।

(৩) অথচ দ্রষ্টব্য, দিল্লির সাংস্কৃতিক মজলিসে বাঙালী এখনও তার আসন বজায় রাখতে পেরেছে। এই কিছুদিন পূর্বেই শম্ভু মিত্র দিল্লিতে যা ভেল্কিবাজি দেখালেন সে-কেরামতি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। অল্পের ভিতর লিট্‌ল থিয়েটার চালান চাটুর্য্যে। দিল্লিতে যাবতীয় চিত্র-ভাস্কর্য প্রদর্শনী হয় বাঙালী উকীলবাবুর তাঁবুতে। গাওনা-বাজনাতে বাঙাল আলাউদ্দীন সায়েব—রবিশঙ্করের কথা নাই বা তুললুম। শিক্ষাদীক্ষায় মৌলানা আজাদ সায়েব। সাহিত্যে হুমায়ুন কবীর।

ইতিমধ্যে সত্যজিৎ রায়ের তোলা 'পথের পাঁচালী' দিল্লি ছাড়িয়েও কঁহা কঁহা মুল্লুকে চলে গিয়েছে। নভেম্বরে বুদ্ধ-জয়ন্তী হওয়ার পূর্বেই হাঁকডাক পড়ে গিয়েছে, কে করে তবে 'নটীর পূজা', কাকে ডাকা যায় 'চণ্ডালিকা'র জন্য?

অর্থাৎ বাঙালীর রসবোধ আছে, অর্থাৎ স্পর্শকাতর। তাই সে সেনসিটিভ এবং অভিমানী।

আলিপুর বোমা মামলার সময় শমস্থল হক্ (কিংবা ইসলাম) নামক একজন ইন্সপেক্টর আসামীদের সঙ্গে পিরিত জমিয়ে ভিতরের কথা বের করে ফাঁস করে দেয়। বোমারুরা তাই তার উল্লেখ করে বলত, 'হে শমস্থল, তুমিই আমাদের শ্যাম, আর তুমিই আমাদের শূল।'

স্পর্শকাতরতাই বাঙালীর 'শ্যাম' এবং স্পর্শকাতরতাই তার 'শূল'। সুদ্ধমাত্র কিছু না দিয়ে স্টেজ সাজিয়ে নিয়ে দশটা বাঙালী তিন দিনের ভিতর যে-রকম একটা নাট্য খাড়া করে দিতে পারে অন্য প্রদেশের লোক সে-রকম পারে না। আবার যেখানে পাঁচটা সিন্ধী পারমিটের জন্য বড় সায়েবের দরজায় পঞ্চান্ন দিন ধন্না দেবে সেখানে বাঙালীর নাভিশ্বাস ওঠে পাঁচ মিনিটেই। সংসারে করে খেতে হলে ড্রিল-ডিসিপ্লিনের দরকার। আর ওসব জিনিস পারে বুদ্ধিতে যারা কিঞ্চিৎ

ভোঁতা, অনুভব-অনুভূতির বেলায় একটুখানি গণ্ডারের চামড়া-ধারী।

স্পর্শকাতরতা এবং ডিসিপ্লিন এ-দুটোর সমন্বয় হয় না? বোধ হয় না। লাতিন জাতটা স্পর্শকাতর, তাদের ভিতর ডিসিপ্লিনও কম। ইংরেজ সাহিত্য ছাড়া প্রায় আর সব রসের ক্ষেত্রে ভোঁতা—তাই তার ডিসিপ্লিনও ভাল।

এ-আইনের ব্যত্যয় জর্মনিতে। চরম স্পর্শকাতর জাত মোক্ষম ডিসিপ্লিন মেনে নিলে কী মারাত্মক অবস্থা হতে পারে হিটলার তার সর্বোত্তম উদাহরণ। হালের জর্মনরা তাই বলে, 'অতখানি ডিসিপ্লিন ভাল নয়।' কিন্তু এ-কথা কাউকে বলতে শুনি নি, 'অতখানি স্পর্শকাতরতা ভাল নয়।'

কোনও জিনিসেরই বাড়াবাড়ি ভাল নয়, সে ত আমরা জানি, কিন্তু আসল প্রশ্ন, লাইন টানব কোথায়? জাতীয় জীবনে স্পর্শকাতরতা থাকবে কতখানি আর ডিসিপ্লিন কতখানি? কিংবা শুধাই উপস্থিত যে মেকদার বা প্রোপর্শন আছে সেটাতে বাড়াই কোন্ বস্তু—স্পর্শকাতরতা, না ডিসিপ্লিন?

গুণীরা বিচার করে দেখবেন॥

দেয়ালি

ভারতবর্ষের সর্বত্রই দেয়ালি-উৎসব হয় এবং সর্বত্রই ওই দিন আলো জ্বালানো হয়। দিল্লিতেও বিস্তর আলো জ্বালানো হয়েছিল—বহু রঙের বহু ধরনের আলো জ্বালিয়ে দিল্লিবাসীরা তাদের ভিন্ন ভিন্ন রুচির প্রকাশ দিতে চেষ্টা করেছিলেন। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে কলকাতাতেও এই রকম রঙ-বেরঙা আলো জ্বালানো হয়।

আমার কিন্তু এখনও ভাল লাগে ছোট শহরের দেয়ালি দেখতে—যেখানে বিজলী বাতি নেই। বিজলীর প্রধান দোষ মানুষ নানা রঙের প্রদীপ জ্বালাবার জন্য সহজেই প্রলুব্ধ হয় এবং তাতে যেন রুচির অভাব লক্ষ্য হয়। দ্বিতীয়ত, পিদিমের শিখার কাঁপনে কেমন যেন একটা প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়, বিজলীর নিষ্কম্প আলো বড় ঠাণ্ডা বড় নির্জীব বলে মনে হয়। তৃতীয়ত, বিজলী বাতি একবার জ্বালিয়েই খালাস, তার জন্য কোন তদারকি করতে হয় না। তাতে করে কেমন যেন জীবনস্পন্দনের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না—মনে হয় সিনেমা-সাজানোর আলোই জ্বালানো হয়েছে, তবে সিনেমা-কোম্পানির অঢেল পয়সা নেই বলে রোশনাইটার খোলতাই হয় নি।

তার চেয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে যখন দেখি, একটি মেয়ে তার ছোট ভাইকে সঙ্গে

নিয়ে এ-পিদিমে তেল ঢালছে, ও-পিদিমের পলতে উস্কে দিচ্ছে, পিদিমের আলো তার মুখে এসে পড়েছে, ছোট ভাইকে হাতে ধরে এক পিদিম থেকে আর এক পিদিম জ্বালাতে শেখাচ্ছে, তখন মনের উপর যে-ছবিটি আঁকা হয় সে-ছবি বহু বৎসর পরে স্মরণ করেও প্রবাসীর মনে আনন্দ হয়, তার সঙ্গে খানিকটে মধুর বেদনাও এনে দেয়।

দিল্লি শহরও পিদিম জ্বালে। কিন্তু পাশের বাড়িতে বিজলী বাতির রোশনাই থাকলে পিদিমের আলো কেমন যেন ম্লান আর বে-জলুস মনে হয়। তদুপরি দিল্লির যে-সব জায়গায় পিদিম জ্বালানো হয় সে-সব জায়গার সঙ্গে আমার ত কোনও হার্দিক সম্পর্ক নেই, তাই, 'অতীত প্রাণ যেন মন্ত্রবলে নিমেষে প্রাণে নাহি জাগে।'

এই দেয়ালি দেখে আরেক দেয়ালির কথা মনে পড়ে গেল। আর যে-বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন তার সঙ্গে তুলনীয় বর্ণনা তিনি তাঁর দীর্ঘ কবি-জীবনে অল্পই দিতে পেরেছেন :—

'কবি বলে, যাত্রী আমি, চলিব রাত্রির নিমন্ত্রণে
যেখানে সে চিরন্তন দেয়ালির উৎসব প্রাঙ্গণে
মৃত্যুদূত নিয়ে গেছে আমার আনন্দদীপগুলি,
যেথা মোর জীবনের প্রত্যূষের সুগন্ধি শিউলি
মাল্য হয়ে গাঁথা আছে অনন্তের অঙ্গদে কুণ্ডলে,
ইন্দ্রাণীর স্বয়ম্বর বরমাল্য সাথে; দলে দলে
যেথা মোর অকৃতার্থ আশাগুলি, অসিদ্ধ সাধনা,
মন্দির-অঙ্গনদ্বারে প্রতিহত কত আরাধনা
নন্দন-মন্দারগন্ধ-লুব্ধ যেন মধুকর-পাঁতি,
গেছে উড়ি মর্ত্যের দুর্ভিক্ষ ছাড়ি।'

দেয়ালির উৎসব-আলো দেখে বার বার মনে পড়ল, জীবনের বড় বড় আনন্দ-দীপগুলি অনন্ত ওপারে তুলে নিয়ে চলে গিয়েছেন। হায়, কজনের জীবনে কখার তারা এপারের দেয়ালি সর্বাঙ্গসুন্দর করে জ্বালাতে পারে!!

গানের কথা : ভারত ও কাবুল

শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, কে জানিত কাবুলীও গান গায়!

কিন্তু সত্যই কাবুলী গান গাইতে আর শুনতে ভালবাসে।

কাবুলে কিন্তু লোকসঙ্গীতেরই রেওয়াজ বেশী। কাবুলে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চর্চা কম, এবং সে-সঙ্গীতে তার নিজস্ব কোনও ঐতিহ্য নেই বলে সে সম্পূর্ণ নির্ভর করে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের উপর। কাবুল শহরে যে দু-চারজন কালোয়াত আছেন তাঁরা প্রায় সকলেই উত্তর ভারতে বাস করে সদ্‌গুরুর কাছ থেকে কলাচর্চা শিখে গিয়েছেন। তবে উচ্চারণের বেলায় খাঁটি হিন্দী গানে তাঁরা একটুখানি বিব্রত হয়ে পড়েন যদিও উর্দু গজল গাইতে তাঁদের তেমন কোনও অসুবিধা হয় না।

যাঁদের রেডিও আছে, তাঁরা প্রায়ই ভারতীয় কেন্দ্র থেকে আমাদের ওস্তাদী, গজল-গীত শুনে থাকেন।

কাবুলীরা খাস আরবী, ইরানী বা তুর্কীস্থানী সঙ্গীত শুনে সুখ পান না।

তাই যখন খবর এল, পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর কাবুলে গান গাইতে গিয়েছেন তখন আনন্দিত হলুম। এঁর পূর্বে কজন সত্যকার ওস্তাদ কাবুলে গিয়েছেন সে-কথা আমার জানা নেই, তবে দু-চারজন গিয়ে থাকলেও ওঙ্কারনাথ যে সেখানে রাজসম্মান পাবেন সে-বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ ছিল না।

কার্যত তাই হয়েছে।

একদা কাবুলের রাজা যে-রকম শ্রমণ হিউয়েন সাঙকে সাদর অভ্যর্থনা করেছিলেন ঠিক তেমনি কাবুলের আজকের রাজা পণ্ডিত ওঙ্কারনাথকে সহৃদয় আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। রাজা জহীর শাহ পণ্ডিতজীকে বলেন, রেকর্ডে পণ্ডিতজীর সঙ্গীত শোনার সৌভাগ্য তাঁর পূর্বেই হয়েছিল, কিন্তু মুখোমুখি তাঁর আপন কণ্ঠের গান শোনার সুযোগ তাঁর জীবনে এই প্রথম।

কাবুলীরা তাগড়া জাত, তারা সঙ্গীতে গুরুগম্ভীর কণ্ঠ পছন্দ করে। ঠিক ওই বস্তুটিই পণ্ডিতজীর আছে—তিনি গাইতে আরম্ভ করলে সভাস্থল গমগম করতে থাকে। তিনি যে শুধু এদেশে সুখ্যাত তাই নয়, ইয়োরোপও তাঁর গলা শুনে মুগ্ধ হয়েছে। আমার এক জর্মন বন্ধু পণ্ডিতজীর 'নীলাম্বরী'তে গাওয়া 'মিতুয়া' রেকর্ডখানা বাজিয়ে বার বার আনন্দোল্লাস প্রকাশ করেন।

তাই ওঙ্কারনাথ যে কাবুলে অকুণ্ঠ উচ্চকণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করতে পেরেছেন তাতে আশ্চর্য হবার কী!

কিন্তু এই কি শেষ?

হাউই জ্বলে ছাই হয়ে যাওয়ার পূর্বে তার শিখা দিয়ে যে-লোক তার মাটির প্রদীপটি জ্বালিয়ে নেয় সে-ই বুদ্ধিমান। ওঙ্কারনাথ কাবুলে যে আতশবাজি দেখিয়ে দিলেন তার জের এখানেই শেষ হওয়া উচিত নয়। ওরই খেই ধরে অনেক কিছু করবার আছে।

বিদেশী কত ছাত্র ভারতীয় সরকারের বৃত্তি নিয়ে এদেশে এসে ইঞ্জিনীয়ারিং, ডাক্তারি শিখে যায়। এসব বিদ্যা আমাদের নিজস্ব নয়, ইয়োরোপের কাছ থেকে শেখা। এগুলোতে আমাদের আপন কোনও গর্ব নেই। কিন্তু কাবুলী 'শাগরেদ' যদি ভারতে এসে আমাদের নিজস্ব সঙ্গীত শিখে যায় তবে তাতে ভারতের গর্ব ষোল আনা; এই করেই পুনরায় ভারত-আফগানিস্তানে সাংস্কৃতিক যোগসূত্র স্থাপিত এবং দৃঢ়ীভূত হবে। ভারত সরকারের উচিত তার সুব্যবস্থা করা—আফগানিস্তান আমাদের তুলানায় গরিব দেশ। (আরেকটা কথা ভুললে চলবে না, কাবুলে পাশ্চাত্ত্য 'জাজ' ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে; আমরা যদি এই বেলা জোর হাতে হাল না ধরি তবে একদিন দেখতে পাব, কাবুল আর ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শুনতে চায় না।)

দ্বিতীয়ত এদেশ থেকে ছাত্র কিংবা অধ্যাপক পাঠাতে হবে কাবুল গিয়ে অনুসন্ধান করতে, আমাদের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত এবং নৃত্য একদা কাবুলে কতখানি প্রচারিত এবং প্রসারিত ছিল এবং অন্তকার পরিস্থিতিই বা কী! তাঁকে প্রস্তাব করতে হবে, কী করলে আমাদের সঙ্গীত সে-দেশে আপন অর্ধলুপ্ত গৌরব পুনরায় উদ্ধার করতে সক্ষম হবে।

এ সব কর্ম যত শীঘ্র করা যায় ততই মঙ্গল!

আমি চেষ্টা করছি, কাবুলী খবরের কাগজ থেকে পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের বিজয় অভিযান উদ্ধার করতে।—শক্ত কাজ। দিল্লিতে ত আর কাবুলী সংবাদপত্র বিক্রয় হয় না! পেলেই কিন্তু পেশ করব॥

উনো, হিন্দী, ক্রিকেট

প্রাতঃস্মরণীয় কবিরাজ সুকুমার রায় বলেছেন,

'গোঁফকে বলে তোমার আমার—গোঁফ কি কারো কেনা?
গোঁফের আমি গোঁফের তুমি, তাই দিয়ে যায় চেনা।'

অর্থাৎ মানুষ দিয়ে গোঁফের বিচার হয় না—গোঁফ দিয়ে মানুষের বিচার করতে হয়।

কথাটা আমাদের কাছে আজগুবী মনে হলেও আসলে তা নয়। চোখ খোলা রাখলে নিত্যি নিত্যি তার উদাহরণ স্পষ্ট দেখতে পাবেন। এই মনে করুন কলকাতা শহর। কী লোকসংখ্যা, কী আয়তন, কী ব্যবসা-বাণিজ্য, কী জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা—সব দিক দিয়েই কলকাতা শহর দিল্লিকে একশবার হার মানাতে পারে, কিন্তু হলে কী হয়, দিল্লি যে রাজধানী। অতএব দিল্লির মাহাত্ম্য কলকাতার চেয়ে বেশী।

অর্থাৎ রাজধানীর গোঁফ দিয়ে শহর যাচাই করতে হয়। শহরের প্রাধান্য থেকে রাজধানী হয় না।

তবেই দেখুন, সুকুমার রায়ের বাণীটি আপ্তবাক্য কিনা।

তাই দিল্লির ধারণা ইউ এন ও'র পালা-পরব করার অধিকার তারই সবচেয়ে বেশী এবং এ-সপ্তাহে দিল্লি বিস্তর ঢাক-ঢোল বাজিয়ে সে-পরব সমাধান করেছেও বটে।

মেলা গুণী বিস্তর ভাষণ দিয়েছেন। কী গলা, কী বলার ধরন, কী হাত-পা নাড়া, কী উচ্ছ্বাস—সব দেখে শুনে মনে কণামাত্র সন্দেহ আর থাকে না, এঁরা যদি দিল্লিতে বক্তৃতা না দিয়ে উনোতে দিতেন তবে অনায়াসে আমাদের জন্য কাবুল-কান্দাহার জয় করে আনতে পারতেন।

এঁরা কী বক্তৃতা দিলেন? আমার নীরস ভাষা দিয়ে তাঁদের বক্তব্য প্রকাশ করলে গুণীদের প্রতি অবিচার করা হবে, তাই প্রতীকের সাহায্যে, অর্থাৎ অ্যালজেব্রা দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করব।

এঁদের প্রায় সকলেই একই কথা বললেন। সেটা হচ্ছে এই; যদিও উনো ক, খ, গ করতে সক্ষম হন নি, তবু চেষ্টা করলে ভবিষ্যতে চ, ছ, জ হয়ত বা করলে করতেও পারেন এবং ট, ঠ, ড-ও যে তাঁদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব এ-কথাই বা বুক ঠুকে বলতে পারে কে?

যেন ইস্কুলের মাস্টার মশায় জমিদারবাবুর ফেল করা ছেলের প্রোগ্রেস-রিপোর্ট লিখছেন। জমিদারবাবুকে না চটিয়ে তাঁর গর্দভ ছেলের হাল-হকিকৎ বাতলানো সোজা কর্ম নয়। উনোর প্রশস্তিগায়করা সেই টাইট-রোপ-ডানসিং কর্মটি দিল্লিতে সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছেন।

হায় কাশ্মীর, হায় কোরিয়া, হায় ইন্দোচীন, হায় তুনিস্, আরও কত হায়, হায়!

আমি কিন্তু উনোর কাম্-কেরদানি থেকে দুটো শিক্ষা লাভ করেছি।

প্রথমত, মীটিঙে গালিগালাজ মারামারি না করা। কিছুদিনের কথা, ফ্রান্সের পার্লিমেণ্টে সদস্যেরা অন্য কোনও অস্ত্র শস্ত্র পান নি বলে গলার চেন খুলে একে

অন্যকে জোরসে ঠুকেছেন—ফলে রক্তারক্তিও নাকি হয়েছিল। বাংলা দেশের পার্লিমেণ্টেও নাকি অনেক কিছু হয়েছে, যদিও রক্তারক্তি হয়েছে বলে স্মরণ হচ্ছে না। তবে মারামারিই ত শেষ কথা নয়। ভাষা অনেক সময় ডাণ্ডার চেয়েও কঠিন কঠোরতর। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, মাস্টাররা এখন ছেলেদের চাবুক মারেন না বটে, তবে সে-চাবুক এসে আশ্রয় নিয়েছে তাঁদের জিভে; তাঁদের জিভ এখন চাবুকের চেয়ে নিষ্ঠুরতর।

কিন্তু সে-তত্ত্বালোচনা উপস্থিত থাক্।

আমার কাছে আশ্চর্য বোধ হয়, এখন উনোতে হাতাহাতি কিংবা পুরোদস্তুর একে অন্যকে অপমান না করেও তাঁরা কাজকর্ম (তা সে যতই নগণ্য কিংবা অর্থহীন হোক না কেন) সমাধান করছেন কী করে?

কাষ্ঠরসিকেরা এর উত্তরে কী বলবেন তাও আমি বিলক্ষণ জানি। তাঁরা বলবেন, 'আরে বাপু, যেখানে শুধু তর্কাতর্কি—বাক্‌যুদ্ধ, যেখানে কোনও প্রকারের জীবন-মরণ-সমস্যার সমাধান হবে না, যেখানকার কোনও বাগাড়ম্বরই আমার আপন দেশে কোনও প্রকারের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে না অর্থাৎ আমার দেশকে এক গিরে জমি কিংবা এক কড়ির আমদানি খোয়াতে হবে না, সেখানে মারামারি হাতাহাতি করতে যাব কোন্ দুঃখে?

হক্ কথা। দুনিয়ার বহু জাতই এ-তত্ত্ববাক্যে সায় দেবে। কিন্তু আমি বাঙালী। আমার মন বলে কথাটা হক্ হলেও টক করে মেনে নিতে আমার বাধছে। 'মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলে'র খেলাতে কে জেতে কে হারে, তাতে আমার কণামাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি নেই, তবু ত তাই নিয়ে তর্ক করে আমি সেদিন দুটো চড় খেয়েছি, তিনটে কিল মেরেছি। সে-রাত্রে না-খেয়ে শুতে গিয়েছি, পাশের বাড়ির শা—রা সাত টাকা সেরে ইলিশ কিনে ফিষ্টি করেছে।

দ্বিতীয় তত্ত্ব ততোধিক গুরুত্বব্যঞ্জক (সোজা বাংলায় ইমপর্টেণ্ট) হিন্দী ভাষা রাষ্ট্রভাষা। তাঁর জয় হোক। তিনি দেশ-বিদেশ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ুন; আমার বুক ফাটবে না! কিন্তু যখন বলা হয়, হিন্দী না শিখলে (এবং ইংরেজী বর্জন করার পর) আমরা দিল্লির পার্লিমেণ্টে একে অন্যকে বুঝব কী করে, তাই সবাই হিন্দী শেখ, তখন আমার মনে আসে উনোর কথা। সেখানে কে গণ্ডা ভাষা নিয়ে কারবার চলে ঠিক বলতে পারব না, তবে বিবেচনা করি ভারতে যে-কটি ভাষা চালু আছে, তার চেয়ে অনেক বেশী ভাষা-ভাষী সেখানে জমায়েত হন। তাঁদের বেশির-ভাগই বক্তৃতা দেন আপন আপন মাতৃভাষাতে। বর্মার সদস্য যখন আপন মাতৃভাষায় বক্তৃতা দেন, সঙ্গে সঙ্গে সে-বক্তৃতা ইংরেজী, ফরাসী, স্পেনিশ

ইত্যাদি বহু ভাষায় অনূদিত হয়। প্রত্যেক সদস্যের কানে 'ইয়ার-ফোন' লাগানো। সমুখে ছোট একটি কল। তিনি যে-ভাষায় অনুবাদ চান, সে-ভাষার উপর কলের কাঁটাটি লাগিয়ে অনুবাদটি শুনে নেন। যেমন যেমন বক্তৃতা হয়, অনুবাদও সঙ্গে সঙ্গে চলে। বক্তৃতা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অনুবাদ শেষ হয়—সব সদস্যই জেনে যান, বক্তা কী বললেন। যে-সব সদস্য বক্তার মাতৃভাষা জানেন, একমাত্র তাঁরাই তখন 'ইয়ার ফোন' ব্যবহার করেন না।

তবে দিল্লির পার্লিমেণ্টেই বা এ-ব্যবস্থা হতে পারে না কেন? ভারতসুদ্ধ লোককেই বা হিন্দী-উর্দু-হিন্দুস্থানী শিখতে হবে কেন?

হিন্দী-উর্দু-হিন্দুস্থানীর কথায় মনে পড়ল ক্রিকেট-কমেণ্টারির কথা।

এবারকার ক্রিকেট টেস্টম্যাচের খেলাতে হিন্দীতেও 'সমসাময়িক টীকা' ধাবমান-মল্লীনাথ (রানিং কমেণ্টারি) দেওয়া হচ্ছে। যেদিন আপিসের অত্যাচারে খেলা দেখতে যেতে পারি নি, সেদিন লাঞ্চের সময় টীকা শুনে দুধের আশ ঘোল নয়, জল দিয়ে মিটিয়েছি। মাঝে মাঝে হিন্দী টীকাও ইচ্ছা-অনিচ্ছায় শুনতে হয়েছে।

সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা।

এই টীকাকার যুক্তপ্রদেশের অতি খানদানী ঘরের ছেলে। তিনি জানেন, আমির ইলাহী বহুদিনের মুরুব্বী খেলোয়াড়। তাই তিনি বার বার বললেন, এর পর আমির ইলাহী সাহেব বড়ী খুবসুরতকে সাথ (বড় সৌন্দর্যের সঙ্গে) গেন্দ (বল) পাকড়্‌লী (ফিল্ড করলেন)। আমির ইলাহীকে 'সাহেব' বলার পূর্বে তিনি অন্য দু-একজনকে 'সাহেব' উপাধি দেন নি, এর পর তাঁর মনে হল সবাইকে 'সাহেব' বলা উচিত, তাই তিনি আঠার বছরের ছোকরা হাফীজকেও 'সাহেব' সম্বোধন করতে লাগলেন!

ক্রিকেট গণতান্ত্রিক খেলা। ক্রিকেটের দেবেন্দ্র ব্র্যাডমানকেও কোনও ইংরেজ টীকাকার মিস্টার ব্র্যাডমান কিংবা 'রেসপেকটেড' ব্র্যাডমান বলে উল্লেখ করেন না, কিন্তু ভারতবর্ষ সৌজন্য—ভদ্রতার দেশ, ক্রিকেট খেলি আর যাই খেলি, পিতৃবয়স্ক আমির ইলাহী, কিংবা মুরুব্বী অমরনাথকে 'সাহেব' না বলে বাক্য-স্ফুরণ করি কি প্রকারে?

টীকাকার আবার হিন্দী-উর্দু দুই-ই জানেন। আবার তিনি এ-তথ্যও জানেন, করাচি-লাহোরে বিস্তর মুসলমান তাঁর টীকা রেডিওর পাশে বসে কান পেতে শুনছেন। তাঁরা কট্টর হিন্দী বুঝতে পারেন না—টীকাকার তাঁদেরই বা নিরাশ করেন কী প্রকারে? তাই সমস্তক্ষণ তিনি ছিলেন আপসের তালে।

দৃষ্টান্ত দি।

পাকিস্তানের 'অবস্থা তখন বড়ই বিপদসঙ্কুল', হিন্দীতে প্রকাশ করতে গেলে বলতে হয়, 'বিপজ্জনক পরিস্থিতি', উর্দুতে বলতে হয়, 'খতর্‌নাক হালৎ'। টীকাকার দু কূল রক্ষা করলেন, 'খতর্‌নাক পরিস্থিতি'। আশা করলেন, পাকিস্তান হিন্দুস্থান উভয়েই বুঝে যাবে 'অবস্থা সঙ্গিন'।

আমি কিন্তু সত্যই স্বীকার করি, ভাষার উপর ভদ্রলোকের দখল আছে। মাকড় 'আরামকে সাথ' (অক্লেশে, আরামের সঙ্গে) গেন্দ (বল) বোলারকে ফিরিয়ে দিলেন, পঙ্কজবাবু 'আহ্‌সানীসে' (অনায়াসে, অবহেলায়) বলটাকে পাকড়ে নিলেন, গুলমহম্মদ বড় 'শানদার' (মহিমাময়) খেলা দেখালেন, নাজির মহম্মদ 'কাইম' ('কায়েমী'—অর্থাৎ সেটেলড্ ডাউন) হয়ে গিয়েছেন—আরও কত কী।

আর অদ্ভুত তাঁর নিরপেক্ষতা। বরের মাসী, কনের পিসী। একে বলেন, সাধু সাধু, ওকে বলেন, শাবাশ শাবাশ। কেউ ক্যাচ ধরলে তিনি 'অচৈতন্নি', কেউ সিঙ্গল করলে তিনি 'বেহুঁশ'।

খেলা না দেখেও খেলা দেখার আনন্দ পেয়েছি ॥

বুদ্ধং শরণং

সারিপুত্ত ও মহামৌদ্‌গল্যায়নের পূতাস্থি প্রায় এক শতাব্দীর পর পুনরায় তাঁদের সমাধিস্থলে রক্ষিত হচ্ছে।

প্রায় এক শ বছর পূর্বে সাঁচীর স্তূপের উপর থেকে নীচের দিকে সুড়ঙ্গ কেটে তলার দিকে দুটি পেটিকা পাওয়া যায় এবং তাদের উপরের লেখা থেকে সপ্রমাণ হয় যে, পেটিকা দুটিতে এই দুই মহাস্থবিরের দেহাবশেষ রক্ষিত আছে। আপাত-দৃষ্টিতে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে এই দুই মহাপুরুষের দেহাস্থি বের করা বর্বরতা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু সে-যুগের তার সত্যই একান্ত প্রয়োজন ছিল। সে-যুগে বিদেশী শাসন-কর্তারা এই ত্রিভুবনে আমাদের যে কোনও গৌরবস্থল থাকতে পারে সে-কথা আদপেই স্বীকার করতে চাইতেন না—শুধুমাত্র একটি বিষয়ে তাঁরা আমাদের বাহাদুরির শাবাশি দিতে অকুণ্ঠ ছিলেন, সে নাকি আমাদের কল্পনাশক্তি—উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল কল্পনা-প্রবণতা। এই 'প্রশস্তি' দিয়ে তার পর-মুহূর্তেই তাঁরা তার সম্পূর্ণ সুযোগ নিয়ে বলতেন, 'এদের বুদ্ধ, এদের আনন্দ, সারিপুত্ত মৌদ্‌গল্যায়ন, জনপদ-কল্যাণী সবই এদের কল্পনাপ্রসূত—অভদ্র ভাষায় গাঁজা-গুল।'

দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ ইংরেজ পণ্ডিতগণ এ মতে ঠিক সায় দিতেন না বলেই

সাঁচীর স্তূপ খুঁড়ে এই দুই শ্রমণের দেহাস্থি বের করা হয়েছিল। পেটিকা দুটি না বেরলে আমাদের আরও কতখানি এবং কতদিন ধরে গালাগাল খেতে হত তার ঠিক হিসেব করা কঠিন।

তারপর এই দুই পেটিকা বিলেতে প্রায় এক শ বছর বাস করার পর বহু দেশে বহু লক্ষ নরনারীর সশ্রদ্ধ অভিবাদন পেয়ে আবার সাঁচীতে ফিরে এসেছেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, খোঁড়া না হয় হয়েছিল, কিন্তু পেটিকা দুটি বিলেতে নিয়ে যাওয়ার কী প্রয়োজন ছিল ?

সেখানেও এঁদের জীবনের মাহাত্ম্য এক অদৃশ্য ইঙ্গিত দেখায়। এঁদের দেহাস্থি যদি একদা বিদেশে না যেতেন তবে তাঁদের দেশে ফিরে আসার উপলক্ষ্য নিয়ে এতগুলো ভিন্ন ভিন্ন দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারী তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পারত না এবং আজ সাঁচীতে তার চরম উৎসব উপলক্ষ্যে এতগুলি দেশের গুণী, জ্ঞানী, সাধু, তাপস একত্র হয়ে তাঁদের জীবন মাহাত্ম্য কীর্তন করে, একমন হয়ে, তাঁদের জীবনাদর্শের স্মরণে পৃথিবীতে পুনরায় শান্তির বাণী প্রচার এবং প্রসার করতে নবীন ভাবে অনুপ্রাণিত হতেন না।

এখানে ঈষৎ একটি অপ্রিয় মন্তব্য করে দ্বিতীয় প্রস্তাব আরম্ভ করি।

এ-দেশের সরস্বতীপূজা, দুর্গাপূজা যে আজ জাঁকজমক আর বাহ্যাড়ম্বরেই শেষ হয় সে-কথা বাংলা দেশের বিচক্ষণ লোক মাত্রেই স্বীকার করে নিয়েছেন, তাই সাঁচীর উৎসব যে বাগাড়ম্বরেই শেষ হতে পারে, সে-ভয় আমাদের সম্পূর্ণ অমূলক নাও হতে পারে। তাই প্রশ্ন, সাঁচীতে সমবেত মনীষীগণ যে একবাক্যে শপথ গ্রহণ করলেন, পৃথিবীতে পুনরায় শাক্যমুনির শান্তিবাণী প্রচারিত হোক, তার সম্ভাবনা কতটুকু ?

এ-আশা দুরাশা যে পৃথিবীতে বহু লোক এখন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করবে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এ-পর্বের প্রধান পুরোহিত পণ্ডিতজী, শ্যামাপ্রসাদ এবং রাধাকৃষ্ণণ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা কিংবা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন নি। তাই আজ যদি আমরা সবাই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ না করেও বুদ্ধদেবের শিক্ষা জীবনে সফল করবার চেষ্টা করি তাহলে আমরা কপটাচারী, এ-কথা বলা অন্যায় হবে।

আমার মনে হয়, ধর্ম পরিবর্তনের যুগ আর নেই, প্রয়োজনও নেই। একদা এ-পৃথিবীতে অন্য ধর্মের তত্ত্ব এবং সার অনুসন্ধান করতে হলে স্বধর্ম পরিত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ এবং সে-সমাজে সম্পূর্ণ প্রবেশ না করে সে-ধর্মের ফললাভ করার কোন পন্থা উন্মুক্ত থাকত না—কারণ তখন প্রত্যেক ধর্ম আপন আপন সঙ্কীর্ণ গণ্ডির ভিতর সীমাবদ্ধ থাকত। আজ সর্ব ধর্মগ্রন্থ অনায়াসলভ্য, আজ

আমরা অন্য ধর্মের সাধুসজ্জনদের সহবাস করতে পারি, ভিন্ন ভিন্ন সমাজের দোষ-গুণ আপন অভিজ্ঞতা দিয়ে বিচার করে নিতে পারি। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য, এ-কর্ম সহজ, সরল করে দেওয়াও বটে। সুতরাং আজ আর ধর্ম পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই; আজ হিন্দু খ্রীষ্টান না হয়েও আপন সমাজে অস্পৃশ্যতা বর্জন করতে পারে, মুসলমান হিন্দু না হয়েও শঙ্করদর্শন মেনে নিয়ে জীবন সে ধারায় চালাতে পারে।

শান্তির বাণী ত সব ধর্মই প্রচার করেছে; তাই এখন প্রশ্ন, শান্তির বাণীর জন্য বৌদ্ধধর্মের কাছেই হাত পাতবার প্রয়োজন।

প্রয়োজন এই, প্রত্যেক ধর্মই কোন না কোন এক কিংবা একাধিক নীতির উপর জোর দিয়েছে বেশী। বৌদ্ধধর্ম সবচেয়ে বেশী জোর দিয়েছে পৃথিবীতে শান্তি আনার জন্য (কেন দিয়েছিল সে প্রশ্নের উত্তর তৎকালীন রাজনৈতিক এবং অর্থ নৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে বিজড়িত) এবং তারই ফলে মৌর্যযুগে তাবৎ ভারতবর্ষ পৃথিবীর ইতিহাসে একদিন অখণ্ড রাষ্ট্ররূপে দেখা দিয়াছিল। সারিপুত্ত, মহামৌদ্গল্যায়ন প্রমুখ শ্রমণেরা যদি আপন প্রাণ হাতে নিয়ে প্রদেশ হতে প্রদেশান্তরে শান্তির বাণী প্রচার না করতেন (জাতকে বার বার দেখতে পাই, যে-কোনও দেশ বা প্রদেশের প্রত্যন্ত প্রদেশে যাওয়ার অর্থ সে-যুগে ছিল আপন প্রাণ নিয়ে খেলা করা) তাহলে প্রদেশ-প্রদেশের সীমান্তরেখা বিলীন হত না এবং ফলে ঐক্যবদ্ধ অবিচ্ছিন্ন ভারত কবে সে রূপ নিত—এবং আদৌ নিত কি না —আজ তার কল্পনা করা যায় না।

এবং এইখানেই তথাগতের প্রেম এবং মৈত্রী অভিযানের শেষ নয়—আরম্ভ মাত্র। পুনরায় বলি, আরম্ভ মাত্র।

তারপর এই বৌদ্ধবাণীর কল্যাণেই সিংহল গমন সহজ হল, দুর্ধর্ষ আফগানিস্তানের সঙ্গে মিত্রতা-সূত্রে বদ্ধ হল, (কাবুলের গ্রীক, বৌদ্ধ হয়ে গিয়ে গান্ধার শিল্প নির্মাণে সাহায্য করল এবং আজ যে আমরা প্রভু বুদ্ধের মূর্তি দেখে শান্তিরসে পূর্ণ হই, তার গোড়াপত্তন করে এই গ্রীকরাই), দুর্লঙ্ঘ্য হিন্দুকুশ অতিক্রম করে বৌদ্ধ শ্রমণরা বামিয়ান পৌঁছলেন (সেখানকার বুদ্ধমূর্তি পৃথিবীর আর যে-কোনও বৌদ্ধ-অবৌদ্ধ মূর্তির চেয়ে উচ্চ), তারপর বর্বর তাতার তুর্কমান পর্যন্ত বৌদ্ধ মন্ত্র গ্রহণ করল, সর্বশেষে তখনকার দিনের সবচেয়ে সভ্যদেশ চীন পর্যন্ত তথাগতের শরণ নিল।

এ-দিকে বর্মা, শ্যাম, মালয়, যবদ্বীপ, বলীদ্বীপ ভূখণ্ড।

ভারতের মত বিরাট দেশকে চীনের মত বিশালতর দেশের সঙ্গে মিলিয়ে

দয়ে এই বৌদ্ধ অভিযান যে মানব সভ্যতাকে কতখানি এগিয়ে দিল তার সুস্পষ্ট ধারণা দূরে থাক্, তার কল্পনামাত্রও আজ আমরা করতে পারি নে। জানি পরবর্তী যুগে খৃষ্টধর্ম আটলান্টিক থেকে প্রশান্ত সাগর পর্যন্ত ভূখণ্ডকে এক করে দিয়েছিল, কিন্তু সে ত অসংখ্য দ্বন্দ্ব অগণিত সংগ্রামের ভিতর এবং আজও তার শেষ হয় নি।

ভারত-চীন, ভারত-তিব্বত এবং ভারতের সঙ্গে অন্যান্য দেশের যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল তা প্রধানত বৌদ্ধ ধর্মের মাধ্যমে। এ-কথা বললে ভুল বলা হবে না যে, যেদিন ভারত বৌদ্ধ ধর্ম বর্জন করল (কেন করল, এবং না করলে তার গত্যন্তর ছিল কি না, সে প্রশ্নের উত্তর দীর্ঘ এবং এখানে অবান্তর), সেইদিন থেকেই ভারতের সঙ্গে বহির্জগতের সম্পর্ক ক্ষীণ হতে হতে একদিন সম্পূর্ণ লোপ পেল।

কিন্তু ভারত বৌদ্ধ ধর্ম বর্জন করেছে এ-কথা ভুল। তথাগতের বাক্য, নীতি, অবদান (প্রাচীনার্থে) ধম্ম সনাতন হিন্দু ধর্মের শিরা-উপশিরায় আজ এমনই মিশে গিয়েছে যে, তার বিশ্লেষণ অসম্ভব এবং অপ্রয়োজন।

পরম নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণও আজ সেগুলো হিন্দু ধর্ম থেকে বর্জন করতে সম্মত হবেন না। তাই আজ ব্রাহ্মণ শ্যামাপ্রসাদ, রাধাকৃষ্ণণ ও জওয়াহিরলালের শ্রমণাস্থি স্কন্ধে গ্রহণ কিঞ্চিন্মাৎ গুরুভার বলে প্রতীয়মান হচ্ছে না।

এবং শুধু কি তাই ? অমিতাভের বাণীতে কী অমিত অমৃত লুকানো রয়েছে যে, বর্তমান যুগে যেদিন তার বাণী ইয়োরোপে পৌঁছল সেদিন ফ্রান্সের ব্যুর্নফ ইত্যাদি পণ্ডিতগণ আগ্রহের সঙ্গে সে বাণী গ্রহণ করলেন। ইয়োরোপের জনসাধারণও কী অদ্ভুত সাড়া দিলে সে বাণী শুনে। ইয়োরোপ তখন আজকের চেয়ে বেশী ধর্মবিমুখ—বিগত দুই যুদ্ধ ইয়োরোপকে আবার আত্মার সন্ধানে তাড়া দিয়েছে—তবু তারা কী আগ্রহেই না বৌদ্ধ-ধর্মগ্রন্থ সংস্করণের পর সংস্করণ শেষ করল।

খুদ পরমেশ্বরকে বাদ দিয়ে, পাদরী-পুরুতের তোয়াক্কা না করেও ধর্মচর্চা করা যায়, একমাত্র নিজের উপর নির্ভর করে, ক্রিয়াকাণ্ড বর্জন করে, তথাগতের উপদেশের সঙ্গে সাধনাগত অভিজ্ঞতা মিলিয়ে নিয়ে, তথাগত যেখানে আগত হয়েছেন সেখানে পৌঁছনো যায়, এ-স্বপ্ন ইয়োরোপের কোন জ্ঞানী কোন গুণী দার্শনিকই দেখবার সাহস করেন নি। বুদ্ধের অশ্রুতপূর্ব বাণী এক মুহূর্তেই ইয়োরোপের সামনে এক নবীন ভুবন আলোক দিয়ে জাজ্বল্যমান করে দিল।

তাই উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমে আজ ওই এক মহাপুরুষ—বুদ্ধদেব—যাঁর

পায়ের কাছে আজ সর্ব নাস্তিক সর্ব আস্তিক স্বধর্ম-ভ্রষ্ট না হয়েও দীক্ষা গ্রহণ করতে পারে, ত্রিশরণ জপ করতে পারে—

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধর্মং শরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি ॥

অ্যার ট্রাভেল

পঁচিশ বৎসর পূর্বে প্রথম অ্যারোপ্লেন চড়েছিলুম। দশ টাকা দিয়ে কলকাতা শহরের উপর পাঁচ মিনিটের জন্য খুশ-সোওয়ারি বা 'জয় রাইড' নয়, রীতিমত দু শ মাইল রাস্তা— পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে নদী-নালা পেরিয়ে এক শহর থেকে অন্য শহর যেতে হয়েছিল। তখনকার দিনে এদেশে প্যাসেঞ্জার সার্ভিস ছিল না, কাজেই আমার অভিজ্ঞতাটা গড়পড়তা ভারতীয়দের পক্ষে একরকম অভূতপূর্বই হয়েছিল বলতে হবে।

তারপর ১৯৪৮ থেকে আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের বহু জায়গায় প্লেনে গিয়েছি এবং যাচ্ছি। একদিন হয়ত পুষ্পকরথে করেই স্বর্গে যাব, অর্থাৎ প্লেন-ক্র্যাশে অক্কালাভ করব—তাতে আমি আশ্চর্য হব না, কারণ এ ত জানা কথা, 'ডানপিটের মরণ গাছের ডগায়'। সে-কথা থাক্।

কিন্তু আশ্চর্য হয়ে প্রতিবারই লক্ষ্য করি, পঁচিশ বৎসর পূর্বে প্লেনে যে সুখ-সুবিধে ছিল আজও প্রায় তাই। ভুল বলা হল, 'সুখ-সুবিধে' না বলে 'অসুখ-অসুবিধেই' বলা উচিত ছিল, কারণ প্লেনে সফর করার চেয়ে পীড়াদায়ক এবং বর্বরতর পদ্ধতি মানুষ আজ পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারে নি। আমার পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যাঁরা প্লেনে চড়েন তাঁরা ওকীব-হাল, তাঁদের বুঝিয়ে বলতে হবে না। উপস্থিত, তাই তাঁদেরই উদ্দেশ্যে নিবেদন, প্লেনে চড়ার সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্য যাদের এ-যাবৎ হয় নি।

রেলে কোথাও যেতে হলে আপনি চলে যান সোজা হাওড়া। সেখানে টিকিট কেটে ট্রেনে চেপে বসুন—ব্যস, হয়ে গেল। অবশ্য আপনি যদি বার্থ রিজার্ভ করতে চান তবে অন্য কথা, কিন্তু তবু একথা বলব, হঠাৎ খেয়াল হলে আপনি শেষ মুহূর্তেও হাওড়া গিয়ে টিকিট এবং বার্থের জন্য একটা চেষ্টা দিতে পারেন এবং শেষ পর্যন্ত কোন গাতকে একটা বার্থ কিংবা নিদেনপক্ষে একটা সীট জুটে যায়ই।

প্লেনে সেটি হবার জো নেই। আপনাকে তিন দিন, পাঁচ দিন, কিংবা সাত দিন পূর্বে যেতে হবে 'অ্যার আপিসে'। আপনাকে সব জায়গার টিকিট দেয় না —কেউ দেবে ঢাকা, কেউ দেবে আসাম, মাদ্রাজ অঞ্চল, কেউ দেবে দিল্লির।

এবং এ-সব অ্যার আপিস ছড়ানো রয়েছে বিরাট কলকাতার নানা কোণে, নানা গহ্বরে। এবং বেশীর ভাগই ট্রাম-লাইন, বাস-লাইনের উপরে নয়। হাওড়া যান ট্রামে, দিব্য মা-গঙ্গার হাওয়া খেয়ে; অ্যার আপিসে যেতে হলে প্রথমেই ট্যাক্সির ধাক্কা।

অ্যার আপিসে ঢুকেই আপনার মনে হবে, ভুল করে বুঝি জঙ্গী দফতরে এসে পড়েছেন। পাইলট, রেডিও-অফিসার ত উর্দি পরে আছেনই, এমন কী টিকিট-বাবু পর্যন্ত শার্টের ঘাড়ে লাগিয়েছেন নীল সোনালীর ব্যাজ-ঝিল্লা-রিবন-পট্টি যা-খুশি বলতে পারেন। রেলের মাস্টারবাবু গার্ড সাহেবরাও উর্দি পরেন কিন্তু সে-উর্দি জঙ্গী কিংবা লস্করী উর্দি থেকে স্বতন্ত্র, অ্যার আপিসে কিন্তু এমনি উর্দি পরা হয়—খুব সম্ভব ইচ্ছে করেই—যে আমার মত কুনো বাঙালী সেটাকে মিলিটারী কিংবা নেভির য়ুনিফর্মের সঙ্গে গুবলেট পাকিয়ে আপন অজানাতে হুম্ করে একটা স্লুট করে।

তারপর সেই উর্দি-পরা ভদ্রলোকটি আপনার সঙ্গে কথা কইবেন ইংরেজীতে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন আপনি ধুতি কুর্তা-পরা নিরীহ বাঙালী, তবু ইংরেজী বলা চাই। আপনি না হয় সামলে নিলেন, বি-এ এম-এ পাস করেছেন—কিন্তু আমি মশাই পড়ি মহা বিপদে। তিনি আমার ইংরেজী বোঝেন না, আমি তাঁর ইংরেজী বুঝতে পারি নে—কী জ্বালা! এখন অবশ্য অনেক পোড় খাওয়ার পর শিখে গিয়েছি যে জোর করে বাংলা চালানোই প্রশস্ততম পন্থা। অন্তত তিনি বক্তব্যটা বুঝতে পারেন।

তখ্খুনি যদি রোক্কা টাকা ঢেলে দিয়ে টিকিট কাটেন তবে ত ল্যাঠা চুকে গেল, কিন্তু যদি শুধু 'বুক' করান তবে আপনাকে আবার আসতে হবে টাকা দিতে। নগদা টাকা ঢেলে দেওয়াতে অসুবিধা এই যে, পরে যদি মন বদলান তবে রিফাণ্ড পেতে অনেক হ্যাপা পোয়াতে হয়। সে না হয় হল, রেলের বেলাও হয়।

কিন্তু প্লেনের বেলা আরেকটা বিদকুটে নিয়ম আছে। মনে করুন, আপনি ঠিক সময় দমদম উপস্থিত না হতে পারায় প্লেন মিস্ করলেন। রেলের বেলায় তখুনি টিকিট ফেরত দিলে শতকরা দশ টাকার খেসারতির আক্কেলসেলামি দিয়ে ভাড়ার পয়সা ফেরত পাবেন। প্লেনের বেলা সেটি হচ্ছে না। অথচ আপনি

পাকা খবর পেলেন, প্লেনে আপনার সীট ফাঁকা যায় নি, আর-এক বিপদগ্রস্ত ভদ্রলোক পুরো ভাড়া দিয়ে আপনার সীটে ট্র্যাভেল করেছেন, অ্যার কোম্পানি ও স্বীকার করল, কিন্তু তবু আপনি একটি কড়িও ফেরত পাবেন না। অ্যার কোম্পানির ডবল লাভ। এ নিয়ে দেওয়ানি মোকদ্দমা লাগালে কী হবে বলতে পারি নে, কারণ আমি আদালতকে ডরাই অ্যার কোম্পানির চেয়েও বেশী।

টিকিট কেটে ত বাড়ি ফিরলেন। তারপর সেই মহা মূল্যবান 'মূল্য-পত্রিকা'খানি পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন তাতে লেখা রয়েছে প্লেনে দমদম থেকে ছাড়বে দশটার সময়, আপনাকে কিন্তু অ্যার আপিসে হাজিরা দিতে হবে আটটার সময়! বলে কী? নিতান্ত থাড্ডো কেলাসে যেতে হলেও ত আমরা এক ঘণ্টার পূর্বে হাওড়া যাই নে—কাছাকাছির সফর হলে ত আধ ঘণ্টা পূর্বে গেলেই যথেষ্ট, আর যদি ফার্স্ট কিংবা সেকেণ্ডের (প্লেনে আপনি ভাড়া দিচ্ছেন ফার্স্টের চেয়েও বেশী—অনেক সময় ফার্স্টের দেড়া) বার্থ রিজার্ভ থাকে তবে ত আধ মিনিট পূর্বে পৌঁছলেই হয়।

আপনি হয়ত প্লেনে থাকবেন পৌনে দু ঘণ্টা, অথচ আপনাকে অ্যার আপিসে যেতে হচ্ছে পাকা দু ঘণ্টা পূর্বে (মোকামে পৌঁছে সেখানে আরও কত সময় যাবে সে-কথা পরে হবে)।

এইবারে মাল নিয়ে শিরঃপীড়া। আপনি চুয়াল্লিশ (কিংবা বিয়াল্লিশ) পাউণ্ড লগেজ ফ্রী পাবেন। অতএব

"সোনামুগ সরু চাল সুপারি ও পান
ও হাঁড়িতে ঢাকা আছে দুই চারিখান
গুড়ের পাটালি কিছু ঝুনা নারিকেল
দই ভাণ্ড ভাল রাই সরিষার তেল
আমসত্ত্ব আমচুর—"

ইত্যাদি মাথায় থাকুন, বিছানাটি যে নিয়ে যাবেন তারও উপায় নেই। অথচ আপনি গৌহাটি নেমে হয়ত ট্রেনে যাবেন লামডিং, সেখানে উঠবেন ডাকবাংলোয়। বিছানা বিশেষ করে মশারি বিনা কী করে পোয়াবেন দিনরাতিয়া?

বিছানাটা নিলেন কি? না। তার ভেতরে যে ভারী জিনিস কিছু কিছু লুকোবেন ভেবেছিলেন সেটিও তাহলে হল না। অবশ্য লুকিয়ে কোন লাভ হত না, কারণ জিনিসটিকে ওজন ত করা হতই—মালে আপনি ফাঁকি দিতে পারতেন না।

অ্যার ট্রাভেল করবেন—মাত্র চুয়াল্লিশ পাউণ্ড ফ্রী লগেজ—অতএব আপনি নিশ্চয়ই বুদ্ধিমানের মত একটি পিচবোর্ডের কিংবা ফাইবারের সুটকেসে মালমাত্র পুরে—সেটার অবস্থা কি হবে মোকামে পৌছলে পরে বলব—রওয়ানা দিলেন অ্যার আপিসের দিকে, ছাতা বরষাতি অ্যাটাচি হাতে, তার জন্যে কালতো ভাড়া দিতে হবে না (থ্যাঙ্ক ইউ !)।

ট্যাক্সি যখন নিতেই হবে তখন সঙ্গে চললেন দু-একজন বন্ধুবান্ধব। যদিস্যাৎ দৈবাৎ প্লেন মিস করেন তবে একটি কড়িও ফেরত পাবেন না বলে দু-দশ মিনিট আগেই রওনা দিলেন এবং অ্যার আপিসে পৌছলেন পাক্কি সোয়া দু ঘণ্টা পূর্বে—আমার জাতভাই বাঙালরা যে রকম ইষ্টিশানে গাড়ি ছাড়ার তিন ঘণ্টা পূর্বে যায়।

অ্যার আপিসের লোক হন্তদন্ত হয়ে ট্যাক্সি থেকে আপনার মাল নামাবে। সে-লোকটা কুলি-চাপরাসী সমন্বয়—তা হোক গে—কিন্তু তার বাই সে 'হিন্দী'তে—রাষ্ট্রভাষাতে—অর্থাৎ তার অউন, অরিজিন্যাল হিন্দীতে কথা বলবেই—যে-রকম তার বসের ইংরেজী বলার বাই অথচ উভয়পক্ষই বাঙালী।

আমাদের বঙ্কিম, আমাদের রবীন্দ্রনাথ বলতে আমরা অজ্ঞান, কিন্তু এই বাংলা দেশের মহানগরী, রামমোহন, রবীন্দ্রনাথের লীলাভূমিতেই আপিস আদালতে, রাস্তাঘাটে 'আ মরি বাংলাভাষার' কী কদর, কী সোহাগ।

কলকাতা বাঙালী শহর। বাঙালা বলতে আপনি আমি মধ্যবিত্ত বাঙালীই বুঝি, তাই আমাদের অ্যার আপিসগুলোর অবস্থা মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের মত। অর্থাৎ মাসের পয়লা তিন দিন ইলিশ মুর্গী তারপর আলুভাতে আর মশুর ডাল।

ঢাক-ঢোল শাঁক-করতাল বাজিয়ে যখন প্রথম আমাদের অ্যার আপিসগুলো খোলা হয় তখন সায়েবী কায়দায় বড় বড় কৌচ, বিরাট বিরাট সোফা, এস্তার ফ্যান, হ্যাট-স্ট্যাণ্ড, গ্লাস-টপ টেবিল—তার উপরে থাকত মাসিক, দৈনিক, অ্যাশট্রে আরও কত কী। সাহস হত না বসতে, পাছে জামাকাপড়ের ঘষায় সোফার চামড়া নোংরা হয়ে যায়—চাপরাসীগুলোর উর্দিই ত আমার পোশাকের চেয়ে ঢের বেশী ধোপদুরস্ত ছিমছাম।

আর আজ? চেয়ারগুলোর উপর যা ময়লা জমেছে তাতে বসতে ঘেন্না করে। ফ্যানগুলো ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে ছুটির জন্য আবেদন জানাচ্ছে, দেয়ালে চুনকাম করা হয় নি সেই অন্নপ্রাশনের দিন থেকে—সমস্তটা নোংরা এলোপাতাড়ি আর আবহাওয়াটা ইংরাজীতে যাকে বলে ড্রেয়ারী ডিসমেল।

একটা অ্যার আপিসে দেখেছি—ভিতরে যাবার দরজায় যেখানে হাত দিয়ে

ধাক্কা দিতে হয় সেখানে যা ময়লা জমেছে তার তুলনায় আমাদের রান্নাঘরের তেলচিটে-কালি-মাখা দরজাও পরিষ্কার। আপনি সহজে বিশ্বাস করবেন না আসুন একদিন আমার সঙ্গে, দেখিয়ে দেব।

এইবারে একটু আনন্দের সন্ধান পাবেন। দশাসই লাশদের যখন ওজন করা হবে তখন আড়নয়নে ওজনের কাঁটাটার দিকে নজর রাখবেন। ১৬০ থেকে তামাশা আরম্ভ হয়, তারপর ডবল সেঞ্চুরি পেরিয়ে কেউ কেউ মুস্তাক আলীর মত ট্রিপলের কাছা-কাছি পৌঁছে যান। আমার বন্ধু '—মুখুজ্যে' যখন একবার ওজন নিতে উঠেছিল তখন কাঁটাটা বোঁ-বোঁ করে ঘুরতে ঘুরতে শেষটায় থপ করে শূন্যেতে এসে ভিরমি গিয়েছিল। মুখুজ্যে আমাকে হেসে বলেছিল, 'কিন্তু ভাড়া তুমি যা দাও আমিও তাই।'

কী অন্যায়!

তারপর আবার সেই একটানা একঘেয়ে অপেক্ষা।

তিন কোয়ার্টার পরে খবর আসবে মালপত্র সব বাসে তোলা হয়ে গিয়েছে। আপনারা গা-তুলুন।

রবি ঠাকুর কী একটা গান রচেছেন না?

"আমার বেলা যে যায় সাঁঝবেলাতে
তোমার সুরে সুর মেলাতে—"

অ্যার কোম্পানির বাসগুলো কিন্তু আপিসগুলোর সঙ্গে দিব্য সুর মিলিয়ে বসে আছে। লড়াইয়ের বাজারে যখন বিলেত থেকে নূতন মোটর আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তখন কচু-বন থেকে কুড়িয়ে আনা যে-সব বাস গ্রামাঞ্চলে চড়েছিলুম. আমাদের অ্যার কোম্পানির বাস প্রায় সেই রকম। ওদেরই আপিসের মত নোংরা, নড়বড়ে আর সীটগুলোর স্প্রিং অনেকটা আরবীস্তানের উটের পিঠের মত। 'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন' হওয়ার শখ যদি আপনার হয়, আরব দেশ না গিয়ে, তবে এই বাসের যে-কোন একটা দু দণ্ডের তরে চড়ে নিন। আপনার মনে আর খেদ থাকবে না।

মধ্য-কলকাতা থেকে দমদম ক মাইল রাস্তা সে-খবর বের করা বোধ হয় খুব কঠিন নয়; কিন্তু সেই বাসে চড়ে আপনার মনে হবে

'যেন পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ!

মোটর, ট্যাক্সি, স্টেট বাস, বে-সরকারী বাস এমন কি দু-চারখানা সাইকেল রিক্শাও আপনাকে পেরিয়ে চলে যাবে। ত্রিশ না চল্লিশ যাত্রীকে এক খেপে দমদম নিয়ে যাবার জন্য তৈরি এই ঢাউশ বাস—প্রতি পদে সে জাম্ হয়ে যায়,

ড্রাইভার করবে কী, আপনিই বা বলবেন কী?

দিল্লি থেকে কলকাতা আসবার সময় একবার দেখেছিলুম, যে-যাত্রী প্লেনের দোলাতে কাতর হয় নি সে এই বাসের ঝাঁকুনিতে বমি করেছিল।

দমদম পৌঁছলেন। এবারে প্লেন না-ছাড়া পর্যন্ত একটানা প্রতীক্ষা। -সেও প্রায় তিন কোয়ার্টারের ধাক্কা।

তবে সময়টা অত মন্দ কাটবে না। জায়গাটা সাফ-সুতরো, বইয়ের স্টল আছে, দমদম আন্তর্জাতিক অ্যার পোর্ট বলে জাত-বেজাতের লোক ঘোরাঘুরি করছে, ফুটফুটে ফরাসী মেম থেকে কালো-বোরকায়-সর্বাঙ্গ-ঢাকা পর্দানশিনী হজ-যাত্রিণী সব কিছুই চোখের সামনে দিয়ে চলে যাবে।

তবে একথাও ঠিক, হাওড়ার প্লাটফর্মের তুলনায় এখানে উত্তেজনা এবং চাঞ্চল্য কম।

প্লেনে যখন মাল আর আপনার জায়গা হবেই তখন আর হুড়োহুড়ি করার কী প্রয়োজন?

তবু ভারতবর্ষ তাজ্জব দেশ। দিন কয়েক পূর্বে দমদম অ্যার পোর্ট রেস্তরাঁয় ঢুকে এক গ্লাস জল চাইলুম। দেখি জলের রঙ ফিকে হলদে। শুধালুম, শরবত কি ফ্রি বিলানো হচ্ছে?

বয় বললে, জলের ট্যাঁকি সাফ করা হয়েছে, তাই জল ঘোলা, এবং মৃদুস্বরে উপদেশ দিলে, ও জল না খাওয়াই ভাল।

শুনেছি ইয়োরোপের কোন কোন দেশে নরনারী এমন কী কাচ্চা-বাচ্চারাও নাকি জল খায় না। দমদমাতে যদি কিছুদিন ধরে নিত্যি নিত্যি ট্যাকি সাফ করা হয় তবে আমরা সবাই সায়েব হয়ে যাব।

শুধু কি তাই, জলের জন্য উদ্বাস্তুরা উদ্ব্যস্ত করে তুলবে না কলকাতা কর্পোরেশনকে। আমরা সবাই এখন রুটির বদলে কেক খাব। সে-কথা থাক্।

কিন্তু দমদম অ্যার পোর্টের সত্যিকার জলুস খোলে যেদিন ভোরে কুয়াশা জমে। কাণ্ডটা আমি এই শীতেই দুবার দেখেছি। ভোর থেকে যে সব প্লেনের দমদম ছাড়ার কথা ছিল তার একটাও ছাড়তে পারে নি। তার প্যাসেঞ্জার সব বসে আছে অ্যার পোর্টে।

আরও যাত্রী আসছে দলে দলে, তাদেরও প্লেন ছাড়তে পারছে না, করে করে প্রায় দশটা বেজে গেল। এক দিক থেকে যাত্রীরা চলে যাচ্ছে, অন্য দিক থেকে আসছে; এই স্রোত বন্ধ হয়ে যাওয়াতে তখন দমদমাতে যে যাত্রীর বন্যা জাগে, তাদের উৎকণ্ঠা, আহারাদির সন্ধান, খবরের জন্য অ্যার কোম্পানির

কর্মচারীদের বার বার একই প্রশ্ন শোধানো, 'ড্যাম ক্যালকাটা ওয়েদার' ইত্যাদি কটুবাক্য, নানা রকমের গুজব—কোথায় নাকি কোন্ প্লেন ক্র্যাশ করেছে, কেউ জানে না—যে-সব বন্ধুরা 'সী-অফ্' করতে এসেছিলেন তাঁদের আপিসের সময় হয়ে গেল অথচ চলে গেলে খারাপ দেখাবে বলে কষ্টে আত্মসম্বরণ, প্লেন 'টেক অফ' করতে পারছে না ওদিকে ব্রেকফাস্টের সময় হয়ে গিয়েছে বলে যাত্রীদের ফ্রী খাওয়ানো হচ্ছে, কঞ্জুস কোম্পানিরা গড়িমসি করছে বলে তাদের যাত্রীদের অভিসম্পাত—আরও কত কী।

লাউড স্পীকার ভোর ছটা থেকে রা কাড়ে নি। খবর দেবেই বা কী?

দমদম নর্থ-পোল হলে কী হত জানি নে। শেষটায় কুয়াশা কাটল। হঠাৎ শুনি লাউড স্পীকারটা কুয়াশায়-জমা গলার কাশি বার কয়েক সাফ করে জানালে, 'অমুক জায়গার প্যাসেঞ্জাররা অমুক প্লেনে (ডি বি জি, হি বি জি, হিজিবিজি কী নম্বর বললে বোঝা গেল না) করে রওয়ানা দিন।'

আমি না হয় ইংরেজী বুঝি নে, আমার কথা বাদ দিন, কিন্তু লক্ষ্য করলুম, আরও অনেকে বুঝতে পারেন নি। গোবেচারীরা ফ্যাল ফ্যাল করে ডাইনে বাঁয়ে তাকালে, অপেক্ষাকৃত চালাকেরা অ্যার আপিসে খবর নিলে, শেষটায় যে প্লেন ছাড়বে তার কোম্পানির লোক আমাদের ডেকে-ডুকে জড়ো করে প্লেনের দিকে রওয়ানা করে দিলে—পাণ্ডারা যে-রকম গাঁইয়া তীর্থযাত্রীদের ধাক্কাধাক্কি দিয়ে ঠিক-গাড়িতে তুলে দেয়।

আমার সঙ্গে পাশাপাশি বসে যাচ্ছিলেন এক মারোয়াড়ী ভদ্রলোক। আমাকে বললেন, 'আজকাল ত অনেক ইংরেজী না-জাননেওয়ালা যাত্রী-ভী প্লেনে চড়ছে তব্ বাঙালী জবান মে প্লেনকা খবর বলে কাহে ?'

ওই বুঝলেই ত পাগল সারে।

দেবরাজকে সাহায্য করে রাজা দুষ্মন্ত যখন পুষ্পক রথে চড়ে পৃথিবীতে ফিরছিলেন, তখন যেমন যেমন তিনি পৃথিবীর নিকটবর্তী হতে লাগলেন, সঙ্গে সঙ্গে পাহাড় পর্বত, গৃহ অট্টালিকা অতিশয় দ্রুত গতিতে তার চক্ষুর সম্মুখে বৃহৎ আকার ধারণ করতে লাগল। যতদূর মনে পড়ছে, রাজা দুষ্মন্ত তখন তাই নিয়ে রথীর কাছে আপন বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন।

পুনার জনৈক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তারই উল্লেখ করে আমার কাছে সপ্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন যে, দুষ্মন্তের যুগ পর্যন্ত ভারতীয়েরা নিশ্চয়ই খ-পোত নির্মাণ করতে পারতেন, না হলে রাজা ক্রমাসন্ন পৃথিবীর এহেন পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিলেন কী প্রকারে ?

তার বহু বৎসর পরে একদা রমণ মহর্ষি একটা ঘটনা বিশদভাবে পরিস্ফুট করার জন্য তুলনা দিয়ে বলেন, উপরের থেকে নীচের দিকে দ্রুতগতিতে আসার সময় পৃথিবীর ছোট ছোট জিনিস যে রকম হঠাৎ বৃহৎ অবয়ব নিতে আরম্ভ করে, ঠিক সেই রকম ইত্যাদি, ইত্যাদি।

মহর্ষির এক প্রাচীন ভক্ত আমার কাছে বসে ছিলেন। আমাকে কানে কানে বললেন 'এখন ত তোমার বিশ্বাস হল যে, মহর্ষি যোগবলে উড্ডীয়মান হতে পারেন।' আমায় এ-কথাটি তাঁর বিশেষভাবে বলার কারণ এই যে, আমি একদিন অলৌকিক ঘটনার আলোচনা প্রসঙ্গে একটি ফার্সী প্রবাদবাক্য উল্লেখ করে বলেছিলুম :—

"পীররহা নমীপরন্দ্,
শাগিরদান উন্‌হারা মীপরানন্দ্।"

অর্থাৎ 'পীর (মুরশীদ) ওড়েন না, তাঁদের চেলারা ওঁদের ওড়ান (cause them fly)।'

তার কিছুদিন পরে আমি রমণ মহর্ষির পীঠস্থল তীরু-আন্নামালাই (শ্রীআন্না-মালাই) গ্রামের নিকটবর্তী অরুণাচল পর্বত আরোহণ করি। মহর্ষি এই পর্বতে প্রায় চল্লিশ বৎসর নির্জনে সাধনা করার পর তীরু-আন্নামালাই গ্রামে অবতরণ করেন—সাধারণ ভাষায় অবতীর্ণ হন।

পাহাড়ের উপর থেকে রমণাশ্রম দ্রৌপদী-মন্দির সব কিছু খুব ছোট দেখাচ্ছিল। তারপর নামবার সময় পাহাড়ের সানুদেশে এক জায়গায় খুব সোজা এবং বেশ ঢালু পথ পাওয়ায় আমি ছুটে সেই পথ দিয়ে নামতে আরম্ভ করলুম এবং আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলুম, আশ্রম, দ্রৌপদী-মন্দির কী রকম অদ্ভুত দ্রুত-গতিতে বৃহৎ আকার ধারণ করতে লাগল।

আমার এ-অভিজ্ঞতা থেকে এটা কিছু সপ্রমাণ হয় না যে পুষ্পক রথ কল্পনার সৃষ্টি কিংবা রমণ মহর্ষি যোগবলে আকাশে উড্ডীয়মান হন নি, কিন্তু আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, দ্রুতগতিতে অবতরণ করার সময় ভূপৃষ্ঠ কীরূপ বৃহৎ আকার ধারণ করতে থাকে।

কিন্তু এর উল্টোটা করা কঠিন, কঠিন কেন, অসম্ভব। অর্থাৎ দ্রুতগতিতে উপরের দিকে যাচ্ছি আর দেখছি পৃথিবীর তাবৎ বস্তু ক্ষুদ্র হয়ে যাচ্ছে—এ-জিনিস অসম্ভব কারণ দৌড় দিয়ে উপরের দিকে যাওয়া যায় না।

সেটা সম্ভব হয় অ্যারোপ্লেন চড়ে।

মাটির উপর দিয়ে প্লেন চলছিল মারাত্মক বেগে, সেটা ঠাহর হচ্ছিল অ্যারো-

ড্রোমের দ্রুত পলায়মান বাড়িঘর, হ্যাঙ্গার, ল্যাম্পপোস্ট থেকে ; কিন্তু সেই প্লেন যখন শ পাঁচেক ফুট উপরে উঠে গেল, তখন মনে হল আর যেন তেমন জোর গতিতে সামনের দিকে যাচ্ছি নে।

উপরের থেকে নীচের দিকে তাকাচ্ছি বলে খাড়া নারকেল গাছ, টেলিফোনের খুঁটি, তিনতলা বাড়ি ছোট ত দেখাচ্ছিলই, কিন্তু সব কিছু যে কতখানি ছোট হয়ে গিয়েছে, সেটা মালুম হল, পুকুর, ধানক্ষেত আর রেল-লাইন দেখে। ঠিক পাখির মত প্লেনও এক-একবার গা-ঝাড়া দিয়ে এক এক ধাক্কায় উঠে যাচ্ছিল বলে নীচের জিনিস ছোট হয়ে যাচ্ছিল এক এক ঝটকায়।

জয় মা-গঙ্গা! অপরাধ নিয়ো না মা, তোমাকে পবননন্দন পদ্ধতিতে ডিঙিয়ে যাচ্ছি বলে। কিন্তু মা, তুমি যে সত্যি মা, সেটা ত এই আজ বুঝলুম তোমার উপর দিয়ে উড়ে যাবার সময়। তোমার বুকের উপর কৃষ্ণাম্বরী শাড়ি, আর তার উপর শুয়ে আছে অগুনতি খুদে খুদে মানওয়ারী জাহাজ, মহাজনী নৌকা—আর পানসি-ডিঙির ত লেখাজোখা নেই। এতদিন এদের পাড় থেকে অন্য পরিপ্রেক্ষিতে দেখছি বলে হামেশাই মনে হয়েছে জাহাজ নৌকা এরা তেমন কিছু ছোট নয়, আর তুমিও তেমন কিছু বিরাট নও, কিন্তু 'আজ কী এ দেখি, দেখি, দেখি, আজ কী দেখি—' এই যে ছোট ছোট আণ্ডাবাচ্চারা তোমার বুকের উপর নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে আছে, তারা তোমার বুকের তুলনায় কত ক্ষুদ্র, কত নগণ্য। এদের মত হাজার হাজার সন্তান-সন্ততিকে তুমি অনায়াসে তোমার বুকের আঁচলে আশ্রয় দিতে পার।

প্লেন একটুখানি মোড় নিতেই হঠাৎ সর্বব্রহ্মাণ্ডের সূর্যরশ্মি এসে পড়ল মা-গঙ্গার উপর। সঙ্গে সঙ্গে যেন এ-পার ও-পার জুড়ে আগুন জ্বলে উঠল, কিন্তু এ আগুন যেন শুভ মল্লিকার পাপড়ি দিয়ে ইস্পাত বানিয়ে।

সেদিকে চোখ ফিরে তাকাই তার কী সাধ্য? মনে হল স্বয়ং সূর্যদেবের—রুদ্রের—মুখের দিকে তাকাচ্ছি ; তিনি যেন শুধু স্বচ্ছ রজত-যবনিকা দিয়ে বদন আচ্ছাদন করে দিয়েছেন। এ কী মহিমা, এ কী দৃশ্য! কিন্তু এ আমি সইব কী করে? তোমার দক্ষিণ মুখ দেখাও, রুদ্র। হে পূষন্, আমি উপনিষদের জ্যোতির্দ্রষ্টা ঋষি নই, যে বলব—

'হে পূষন্, সংহরণ
করিয়াছ তব রশ্মিজাল
এবার প্রকাশ করো
তোমার কল্যাণতম রূপ,

দেখি তারে যে-পুরুষ

তোমার আমার মাঝে এক।'

আমি বলি, তব রশ্মিজাল তুমি সংহরণ কর, তুমি আমাকে দেখা দাও, তোমার মধুর রূপে, তোমার রুদ্র রূপে নয়। তোমার বদন যবনিকা ঘনতর করে দাও।

তাই হল—হয়ত প্লেন তাঁরই আদেশে পরিপ্রেক্ষিত বদলিয়েছে—এবার দেখি গঙ্গাবক্ষে স্নিগ্ধ রজত-আচ্ছাদন, আর তার উপর লক্ষ কোটি অলস সুরসুন্দরীরা শুধু তাদের নূপুর দৃশ্যমান করে নৃত্য আরম্ভ করেছেন। কিন্তু এ-নৃত্য দেখবার অধিকার আমার আছে কি? রুদ্র না হয় অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর চেলা নন্দীভৃঙ্গীরা ত রয়েছেন! স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সমঝে চলতেন, যদিও ওদিকে পুষনের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল, তাই বলেছেন :—

'ভৈরব, সেদিন তব প্রেতসঙ্গী দল

রক্ত-আঁখি।'

অষ্ট্রিচ পাখি যে-রকম ভয় পেলে বালুতে মাথা গুঁজে ভাবে, কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছে না, আমিও ঠিক তেমনি পকেট থেকে কালো চশমা বের করে পরলুম—এইবারে নূপুর-নৃত্য দেখতে আর কোন অসুবিধে হচ্ছে না।

শুনি, 'স্যর, স্যর।' এ কী জ্বালা। চেয়ে দেখি প্লেনের স্টুয়ার্ড ট্রেতে করে সামনে লজেঞ্জুস ধরেছে। বিশ্বাস করবেন না, সত্যি লজেঞ্জুস! লাল, নীল, ধলা, হরেক রঙের। লোকটা মস্করা করছে নাকি—আমি ছোঁড়ার বাপের বয়সী—আমাকে দেখাচ্ছে লজেঞ্জুস! তারপর কি ঝুমঝুমি দিয়ে বলবে, 'বাপধন, এইটে দোলাও দেখিনি, ডাইনে বাঁয়ে, ডাইনে—আর—বাঁয়ে।'

এদিকে প্রকৃতির রসরঙ্গ, ওদিকে লজেঞ্জুসের রস। আমি মহাবিরক্তির সঙ্গে বললুম, 'থ্যাঙ্ক ইউ '

লোকটা আচ্ছা গবেট ত! শুধালে, 'থ্যাঙ্ক ইউ, ইয়েস, অর থ্যাঙ্ক ইউ, নো?' মনে মনে বললুম, 'তোমার মাথায় গোবর।' বাইরে বললুম, 'নো।' কিন্তু এবারে আর 'থ্যাঙ্ক ইউ' বললুম না।

কিন্তু বিশ্বাস করবেন না, মশাইরা, বেশীর ভাগ ধেড়েরাই লজেঞ্জুস নিলে এবং চুষলে।

তবে কি হাওয়ায় চড়ে ওদের গলা শুকিয়ে গিয়েছে, আর ওই বাচ্চাদের মাল নিয়ে গলা ভেজাচ্ছে? আল্লায় মালুম।

ও মা, ততক্ষণে দেখি সামনে আবার গঙ্গা। কাটোয়ার বাঁক।

প্লেন আবার গঙ্গা ডিঙল। ওকে ত আর খেয়ার পয়সা দিতে হয় না। কে বলেছে :—

'ভাগ্যিস আছিল নদী জগৎ সংসারে
তাই লোকে কড়ি দিয়ে যেতে পারে
ও-পারে ??'

ভাষা ও জনসংযোগ

'আনন্দবাজার পত্রিকা'র দোল সংখ্যায় (১৯৫৩) শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র সেন 'বাংলা-সাহিত্যের অতীত এবং ভবিষ্যৎ' শীর্ষক একটি সুচিন্তিত এবং তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছেন। হিন্দী ইংরেজী বনাম বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে যাঁরা কৌতুহলী, তাঁদের সকলকে আমি এই প্রবন্ধটি পড়তে অনুরোধ করি—তাঁরা লাভবান হবেন।

আমার আলোচনায় জানা-অজানাতে প্রবোধচন্দ্রের অনেক যুক্তি এসে গিয়েছে এবং আসবে। প্রবোধচন্দ্র না হয়ে অন্য কোন কাঁচা লেখক হলে আমি আমার লেখাতে পদে পদে তাঁর উদ্ধৃতির ঋণ স্বীকার করতুম—কিন্তু এঁর বেলা সেটার প্রয়োজন নেই, কারণ প্রবোধবাবু লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত, তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য বাংলা ভাষা যেন তাঁর ন্যায্য হক্ক পায় এবং সেই হক্ক সপ্রমাণ করার জন্য কে তাঁর লেখা থেকে কতখানি সাহায্য পেল, সে সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন। এবং আমার বিশ্বাস, দরকার হলে তিনিও অন্য লেখকের রচনা থেকে যুক্তি-তর্ক আহরণ করতে কুণ্ঠিত হবেন না। আমার লেখা তাঁকে সাহায্য না-ই করল।

প্রাচ্যে যে-সব বড় আন্দোলন হয়ে গিয়েছে, সে-সব আন্দোলন শুধু যে তার জন্মভূমিতেই সফল হয়েছে তাই নয়, তার ঢেউ পশ্চিমকেও তার সুপ্তিতে জাগরণ এনে দিয়েছে, সে-সব আন্দোলনকে আমরা সচরাচর ধর্মের পর্যায়ে ফেলে নবধর্মের অভ্যুদয় নাম দিয়ে থাকি। ভারতবর্ষে তাই বৌদ্ধ ও জৈনদের দুই বৃহৎ আন্দোলনকে আমরা ধর্মের আখ্যা দিয়েছি, সেমিতি ভূমিতে ঠিক ওই রকমই দুই মহাপুরুষকে কেন্দ্র করে দুটি জোরাল আন্দোলন সৃষ্ট হয়—তাদের নাম খ্রীষ্টধর্ম এবং ইসলাম।

আজকের দিনে ধর্ম বলতে আমরা প্রধানত বুঝি, মানুষের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক। পূজা-অর্চনা কিংবা কৃচ্ছ্রসাধন ধ্যানাদি করে, কী করে ভগবানকে পাওয়া যায় ধর্ম সেই পন্থা দেখিয়ে দেয়, এই আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু একটুখানি

ধর্মের ইতিহাস অধ্যয়ন করলেই দেখতে পাবেন, ভগবানকে পাওয়ার জন্য ধর্ম যতখানি মাথা ঘামিয়েছে তার চেয়ে ঢের ঢের বেশী চেষ্টা করেছে, মানুষে মানুষে সম্পর্ক সভ্যতর করার জন্য। ধর্ম চেষ্টা করেছে, ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য কমাতে, অন্ধ-আতুরের আশ্রয় নির্মাণ করাতে—এক কথায়, এমন এক নবীন সমাজ গড়ে তুলতে যেখানে মানুষ মাৎস্যন্যায় বর্জন করে, একে অন্যের সহযোগিতায় আপন আপন শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ করতে পারে। বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্ম এই সব কাজেই মনোযোগ করেছে বেশী—ভগবানের সান্নিধ্য এবং তার সাহায্য সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে।

বিত্তশালী এবং পণ্ডিতের সংখ্যা সংসারে সব সময়েই কম ছিল বলে বড় আন্দোলনকারী মাত্রই এদের উপেক্ষা করে জনগণকে কাছে আনতে—এমন কী 'খেপিয়ে তুলতে'—চেষ্টা করেছেন প্রাণপণ। তাই তাঁরা বিত্তশালী এবং পণ্ডিতের ভাষা উপেক্ষা করে যে-ভাষায় কথা বলেছেন, সেটা জনগণের ভাষা। তথাগতের ভাষা তৎকালীন গ্রাম্য ভাষা পালি এবং মহাবীরের ভাষা অর্ধমাগধী, খ্রীষ্টের ভাষা হিব্রুর গ্রাম্য সংস্করণ, আরামেয়িক এবং মুহম্মদের (দঃ) ভাষা আরবী। আরবী সে-যুগে এতই অনাদৃত ছিল যে, আরবেরাই আশ্চর্য হল, এ-ভাষায় আল্লা তাঁর কুরআন প্রকাশ (অবতরণ = নাজিল) করলেন কেন? তারই উত্তর কুরআনে রয়েছে,

আল্লা বলেছেন:

"Had we sent as
A Quaran (in a language)
Other then Arabic, they would
Have said : why are not
It's verses explained in detail ?
What ! (a book.) not in Arabic
And (a Messenger an Arab ?)"

অর্থাৎ "আমরা যদি আরবী ভিন্ন অন্য কোন ভাষাতে কুরআন পাঠাতুম, তা হলে তারা বলত, এর বাক্যগুলো ভাল করে বুঝিয়ে বলা হয় নি কেন? সে কি! বই আরবীতে নয় অথচ পয়গম্বর আরব?"

আল্লা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, আরব পয়গম্বর যে আরবী ভাষায় কুরআন অবতরণের ভাষা ব্যবহার করবেন সেই ত স্বাভাবিক, অন্য যে-কোন ভাষায় (এবং সে যুগে হীব্রু ছিল পণ্ডিতের ভাষা) সে কুরআন পাঠানো হলে মক্কার

লোক নিশ্চয়ই বলত, 'আমরা ত এর অর্থ বুঝতে পারছি নে।'

গণ-আন্দোলনে সব চেয়ে বড় কথা—আপামর জনসাধারণ যেন বক্তার বক্তব্য স্পষ্ট বুঝতে পারে।

তাই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের চতুর্দিকে যে-আন্দোলন গড়ে উঠল, তার ভাষা বাংলা, তুকারামের ভাষা মারাঠী (তিনি ব্যঙ্গ করে বলেছেন, সংস্কৃতই কেবল সাধুভাষা ?—তবে কি মারাঠী চোরের ভাষা), কবীরের ভাষা সে-সময়ে প্রচলিত হিন্দী এবং তিনিও বলেছেন, "সংস্কৃত কূপজল (তার জন্য ব্যাকরণের দড়ি-লোটার প্রয়োজন) কিন্তু 'ভাষা' (অর্থাৎ চলতি ভাষা) 'বহতা' নীর—যখন খুশি ঝাঁপ দাও, শান্ত হবে শরীর।" রামমোহন, দয়ানন্দ আপন আপন মাতৃভাষায় তাঁদের বাণী প্রচার করেছিলেন, আর শ্রীরামকৃষ্ণ যে-বাংলা ব্যবহার করে গিয়েছেন, তার চেয়ে সোজা সরল বাংলা আজ পর্যন্ত কে বলতে পেরেছেন ? এমন কি বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাঁর বিপক্ষ দলকে উপদেশ দিয়েছিলেন সংস্কৃত না লিখে বাংলায় উত্তর দিতে। তিনি নিজেও সংস্কৃতে লেখেন নি, যদিও তিনি সংস্কৃত জানতেন আর-সকলের চেয়ে বেশী।

আমার মনে হয় বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের পতনের অন্যতম কারণ সেদিনই জন্ম নিল, যেদিন বৌদ্ধ ও জৈন পণ্ডিতেরা দেশজ ভাষা ত্যাগ করে সংস্কৃতে শাস্ত্রালোচনা আরম্ভ করলেন। দেশের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল, ওদিকে সংস্কৃতে শাস্ত্রচর্চা করতে ব্রাহ্মণদের ঐতিহ্য ঢের ঢের বেশী—বৌদ্ধ-জৈনদের হার মান ত হল।

পৃথিবী জুড়ে আরও বহু বিরাট আন্দোলন হয়ে গিয়েছে—পণ্ডিতী ভাষাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, মাতৃভাষার উপর পরিপূর্ণ নির্ভর করে।

এইবারে নিবেদন, ইতিহাস আলোচনা করে দেখান ত পৃথিবীর কোথায় কোন্ মহান এবং বিরাট আন্দোলন হয়েছে জনগণের কথ্য এবং বোধ্য ভাষা বর্জন করে ?

এ-তত্ত্ব এতই সরল যে, এটাকে প্রমাণ করা কঠিন। স্বতঃসিদ্ধ জিনিস প্রমাণ করতে গেলেই প্রাণ কণ্ঠাগত হয়।

আটঘাট বেঁধে পূর্বেই প্রমাণ করেছি, এসব আন্দোলন নিছক ধর্মান্দোলন (অর্থাৎ আত্মা-পরমাত্মাজনিত) নয়, এদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অংশ অনেক বেশী গুরুত্বব্যঞ্জক।

তাই ভারতবর্ষ এখন যে নবীন রাষ্ট্র নির্মাণের চেষ্টা করছে, তার সঙ্গে এই সব আন্দোলনের পার্থক্য অতি সামান্য এবং তুচ্ছ। এই যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

করা হয়েছে, তার সাফল্যের বৃহদংশ নির্ভর করবে জনগণের সহযোগিতার উপর—এ-কথা পরিকল্পনার কর্তাব্যক্তিরা বহুবার স্বীকার করেছেন এবং ক্রমেই বুঝতে পারছেন, উপর থেকে পরিকল্পনা চাপিয়ে কোনও দেশকে উন্নত করা যায় না—যদি নীচের থেকে, জনগণের হৃদয়মন থেকে সাড়া না আসে, সহযোগিতা জেগে না ওঠে।

আমাদের সর্ব প্রচেষ্টা, সর্ব অর্থব্যয়, সর্ব কৃচ্ছ্রসাধন সম্পূর্ণ নিষ্ফল হবে যদি আমরা আমাদের সর্ব পরিকল্পনা সর্ব প্রচেষ্টা জনগণের বোধ্য ভাষায় তাদের সম্মুখে প্রকাশ না করি। এ-বিষয়ে আমার মনে কণামাত্র সন্দেহ নেই।

আমি জানি, ভারতবর্ষ এগিয়ে যাবেই, কেউ ঠেকাতে পারবে না। শুধু যাঁরা অন্তহীনকাল ধরে ইংরেজীর সেবা করতে চান, তাঁরা ভারতের অগ্রগামী গতিকে মন্থর করে দেবেন মাত্র।

এ বিশ্বাস না থাকলে আমি বার বার নানা কথা এবং একাধিকবার একই কথা বলে বলে আপনাদের বিরক্তি ও ধৈর্যচ্যুতির কারণ হতুম না॥

ইংরেজী বনাম মাতৃভাষা

'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড'এ সুপণ্ডিত, প্রাতঃস্মরণীয় শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার 'কম্পালসরি হিন্দী—ইট্স্ এফেক্ট্ অন্ এডুকেশন' শীর্ষক একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধের পূর্বার্ধে তিনি দুটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছেন। প্রথমত, অ-হিন্দী অঞ্চলের আপন ভাষা—যথা বাংলা, মারাঠী, দক্ষিণী ভাষাগুলোর স্থান হিন্দী দখল করে নিয়ে সে-সব অঞ্চলে একে অন্যের যোগসূত্রের এবং সাহিত্যে কলাসৃষ্টির মাধ্যম হতে পারবে কি? দ্বিতীয়ত, এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার জগতে আমরা যদি দূরদৃষ্টি দিয়ে দেখি, তবে এটা কি কাম্য হবে যে, হিন্দী ইংরেজীর জায়গা দখল করে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম হয়ে উঠুক?

নানা যুক্তি তর্ক দিয়ে শ্রীযুত সরকার সপ্রমাণ করেছেন, বাংলা, মারাঠী ইত্যাদির স্থান হিন্দী কখনও দখল করতে পারবে না। আমরাও তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরেও তিনি বলেছেন, ইংরেজীর স্থলে হিন্দী কাম্য হতে পারে না। শ্রীযুত সরকার তাই ব্যবসা-বাণিজ্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্য ভারতবর্ষে ইংরেজীই চালু রাখতে চান। বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি ইংরেজীকেই শিক্ষার মাধ্যমরূপে রাখতে চান—না হিন্দী, না বাংলা, এবং তাঁর লেখাতে তিনি এমন

কোনও ইঙ্গিতও দেন নি যে, আজ হোক কিংবা এক শ বছর পরেই হোক, শেষ পর্যন্ত বাংলাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম হবে। তাঁর ব্যবস্থা অনুযায়ী দেখতে পাচ্ছি, ইংরেজীই অজরামররূপে চিরকাল আমাদের শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যম হয়ে থাকবে।

সরকার মহাশয় ইংরেজী ভাষার যে গুণকীর্তন করেছেন তার সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ একমত। ইংরেজীর মত আন্তর্জাতিক ভাষা পৃথিবীতে আর নেই, অদ্যকার (বিশেষ জোর দিয়ে আমিও বলছি অদ্যকার) দিনে জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং দর্শনের চর্চা করতে হলে ইংরেজী ভিন্ন গত্যন্তর নেই।

কিন্তু ইংরেজী চিরকাল এদেশের শিক্ষার মাধ্যম, তথা উচ্চাঙ্গ জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার বাহন হয়ে থাকবে এ ব্যবস্থা আমরা কাম্য বলে মনে করি নে।

এ কথা ঠিক যে, আজই যদি আমরা ইংরেজী বর্জন করি, তবে সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হব, কিন্তু কোনও দিনই শিক্ষার মাধ্যমরূপে বর্জন করতে পারব না একথা আমরা বিশ্বাস করি নে।

পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচ্য দেশের অবস্থা আজ কী? আরব ভূখণ্ড বিশেষ করে মিশরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা কি দিল্লি-কলকাতার চেয়ে অনেক কম? মিশরে জ্ঞানচর্চার মাধ্যম আরবী, ইংরেজী না ফরাসী? 'অজহর' মুসলিম শাস্ত্রালোচনার পীঠস্থল—সেখানে যে আরবী মাধ্যম হবে, তাতে আর কী সন্দেহ! তাই সে-দৃষ্টান্ত দেব না, কিন্তু য়ুরোপীয় ঢঙে নির্মিত বাকী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম ত ফরাসী নয়, ইংরেজীও নয়। অথচ তারা দিব্য আরবীর মাধ্যমেই আলোপ্যাথি, য়ুরোপীয় ইঞ্জিনীয়ারিং শিখছে, তাদের পুরাতত্ত্ব বিভাগের প্রতিবেদন (রিপোর্ট) আরবীতেই বেরয়। বিদেশী অধ্যাপকদের আরবী শিখে সে-ভাষাতেই পড়াতে হয়।

আঙ্কারা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যম ফরাসীস্? বা তেহরানে?

এই যে চীনে এতবড় রাজনৈতিক ও সামাজিক নবজাগরণ হয়েছে সে কি রাশানকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যম করবে? না, আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রাশান শিক্ষার মাধ্যম, কিংবা চীনারা তাঁদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা রাশান ভাষায় আরম্ভ করে দিয়েছেন? পণ্ডিতজী তাঁর চিন্তার ফল ইংরেজীতে প্রকাশ করেন, কিন্তু মাওৎসে তুঙ রাশানে কেতাব লিখেছেন, এ-কথা ত কখনও শুনি নি।

জাপানে শিক্ষার মাধ্যম কি ইংরেজী? জাপানীদের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বেরয় কোন্ ভাষায়?

শ্রীযুক্ত সরকার বলেছেন,—"Even in the Latin Republics of

South America, English is fast advancing as the medium of commercial communication and displacing (except for petty purely local transactions) Portuguese and in some of the States corrupt Spanish by the people."

লাতিন-আমেরিকা সম্বন্ধে আমার সাক্ষাৎজ্ঞান নেই, তাই 'পেটি প্যুরলি লোকাল ট্রানজ্যাকশনস্' বলতে শ্রীযুক্ত সরকার কী বলতে চেয়েছেন, ঠিক বুঝতে পাবলুম না। তবে কি ওইসব অঞ্চলে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজী? এমন কথা ত কখনও শুনি নি—বরঞ্চ আমার ঠিক ঠিক জানা আছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে, জর্মনির ইস্কুলে যারা লাতিন গ্রীক পড়ত না তাদের বাধ্য হয়ে ইংরেজী, ফরাসী এবং স্প্যানিশের মধ্যে যে-কোনও দুটো শিখতে হত এবং লাতিন আমেরিকায় ইংরেজীর চেয়ে স্প্যানিশের মাধ্যমেই ব্যবসা-বাণিজ্য ভাল চলবে এ-তত্ত্ব জানা থাকায় বহু ছেলেমেয়ে স্প্যানিশ শিখত।

লাতিন আমেরিকা অনেক দূরের পাল্লা—এবারে ইংলণ্ডেব খুব কাছে চলে আসা যাক—ইংরেজী ভাষার গুণ-গরিমা প্রতিবেশী হিসাবে যারা সব চাইতে বেশী জানে এবং বোঝে। এরা সংখ্যায় খুব নগণ্য তবু ইংরেজীকে শিক্ষার মাধ্যম করে নেয় নি। হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়-গুলোতে কি শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজী, না তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করে ইংরেজীতে? এদের ব্যবসা-বাণিজ্যের বেশ একটা বড় হিস্যা ইংলণ্ডের সঙ্গে, কিন্তু কই, তারাও ত তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী অবশ্যপাঠ্য করে নি? আজকের দিনের সঠিক খবর বলতে পারব না, তবে যতদূর জানা আছে, যারা উচ্চশিক্ষাভিলাষী তাদের হয় শিখতে হয় লাতিন-গ্রীক, নয় ইংরেজী, ফবাসী, জর্মন, স্প্যানিশ ইত্যাদির যে-কোন দুটো ভাষা।

এখন প্রশ্ন, যারা মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য একটি কিংবা দুটি ভাষা শেখে তাদের জ্ঞানগম্যি ওসব ভাষাতে কতখানি হয়? পণ্ডিতদের কথা হচ্ছে না, তাঁদের সংখ্যা অতিশয় নগণ্য। জর্মন পণ্ডিতমাত্রই ক্লাসিক্স্ এবং ফরাসী, ইংরেজী, ইতালীয় পড়ে বুঝতে পারেন, ইংরেজ পণ্ডিতদেব বেশীর ভাগ ফরাসী জর্মন পড়তে পারেন—বিশেষ করে যাঁরা অর্থনীতির চচা করবেন তাঁদের মাসিক পত্রিকায় জমবার্ট, শুমপেটার পড়ার জন্য বাধ্য হয়ে জর্মন শিখতে হত। অ্যাটম-বমের গবেষণা করেছেন আমেরিকাতে বসে জর্মনরাই, কিংবা যাঁরা জর্মন জানতেন।

কিন্তু ইয়োরোপে আর যারা দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজী শেখে, ইস্কুল কলেজ ছাড়ার পর তারা ওই ভাষাতে জ্ঞান-চর্চা করে কতটুকু? উচ্চশিক্ষিত

ইংরেজমাত্রই অন্তত আট বছর ফরাসী শেখেন—কিন্তু কলেজ ছাড়ার বছর পাঁচেক পরই এঁরা আর ফরাসী বই কেনেন না। আমি এঁদের বাড়ির কেতাবের শেল্ফ্ মনোযোগ করে দেখেছি—পাঠ্যাবস্থায় যে-সব ফরাসী বই তাঁরা কিনে-ছিলেন তার উপর আর কিছু কেনবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। এঁদের 'দ্বিতীয় ভাষা' সম্বন্ধে জ্ঞান শেষ পর্যন্ত কতটুকু থাকে সে সম্বন্ধে জেরম কে জেরমের ঠাট্টা-মস্করা পড়ে দেখবেন।

বস্তুত বহু গবেষণা করে শিক্ষকগণ এই চূড়ান্ত নিষ্পত্তিতেই এসেছেন যে, মানুষকে ব্যাপকভাবে দোভাষী করা যায় না। গোলামদের কথা আলাদা। তারা যখন দেখে অর্থাগমের একমাত্র পন্থা 'মুনিবের ভাষা শেখা' তখন সব-কিছু বিসর্জন দিয়ে প্রভুর ভাষা শেখে—আমি যে-রকম শিখেছিলুম, ফলে আজ না পারি উত্তম বাংলা বলতে, না পারি মধ্যম ইংরেজী লিখতে। কিন্তু আমার ছেলে গোলাম নয়—আমার আশা সে একদিন বাংলাতেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করবে। আমার ছেলে না পারুক, যদি আপনার ছেলে পারে তাতেই আমি খুশী এবং যদি সেদিন তার খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে ইংরেজ ফরাসী আপন আপন মাতৃভাষাতে তার কেতাব অনুবাদ করে—আজ যে-রকম মাওৎসে তুঙের চীনা বই বেরনোমাত্রই ইংরেজ গায়ে পড়ে তৎক্ষণাৎ স্ব-ভাষায় তার অনুবাদ করে, এখনও যে-রকম ইংরেজ 'শকুন্তলা' নাট্যের অনুবাদ করে—তবে আমি অমর্ত-লোক থেকে তাকে দু হাত তুলে আশীর্বাদ করব। অনন্তকাল ধরে আমরা শুধু ইংরেজী থেকে নেবই, কিছু দেবার সময় কখনও আমাদের আসবে না, এ-কথা ভাবতেও আমার মন বিরূপ হয়।

তবে কি বাংলাভাষী লোকসংখ্যা পৃথিবীতে এতই কম যে, আমরা কখনও বাংলাকে ফরাসী কিংবা জর্মনের মত সমৃদ্ধিশালী করতে পারব না?

ভাষা		ভাষীদের সংখ্যা (হাজার সমষ্টিতে)
বাংলা	...	৬০০০০
আরবী	...	২৫০০০
চীন	...	৪৩০০০০
গ্রীক	...	৫৫০০
জাপানী	...	৫৫০০০
জর্মন	...	৮০০০০
হিন্দুস্থানী (অর্থাৎ হিন্দী উর্দু দুই মিলিয়ে; না হলে শুদ্ধ হিন্দীভাষীর সংখ্যা বাংলার চেয়ে কম)		৯০০০০

ওলন্দাজ	...	১০০০০
ইংরেজী	...	১৮০০৩০
ফরাসী	...	৪৫০০০
রুশ	...	৮৫০০০
তুর্কী	...	৭০০০

এবারে ভাষার ভিত্তিতে না নিয়ে লোকসংখ্যা নিন, কারণ, যে বর্ষপঞ্জী থেকে এই সংখ্যাগুলি পেয়েছি, দুর্ভাগ্যক্রমে তাতে নরউইজিয়ন, সুইডিশ, ডেনিশ, ফিনিশ ভাষার সংখ্যা দেওয়া হয় নি।

নরওয়ে	...	২৯৫২
ডেনমার্ক	...	৩৯৭০
ফিনল্যাণ্ড	...	৩৭৩৪

আমার যতদূর মনে পড়ছে, চীনা, ইংরেজী, রুশীয়, জর্মন এবং স্প্যানিশের পরেই পৃথিবীতে বাংলার স্থান।

নরওয়ে, সুইডেন তাদের ২৯,৫২, ৬৫,২৩ নিয়ে আপন আপন ভাষায় দর্শন লেখে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করে, ডাক্তারি শেখে, ইঞ্জিনীয়ারি করে আর আমরা ৬০০,০০ হয়েও চিরকাল ইংরেজীর ধামা-ধরা হয়ে থাকব?

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি আমরা কল্পনা করতে পারি নি, ফার্সী যদি এদেশ থেকে চলে যায়, তবে আমরা রাজকার্য চালাব কী করে। ইংরেজ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে, ইংরেজীতেও চালানো যায়। আজ আমরা কল্পনা করতে পারছি নে, ইংরেজী ছেড়ে আমরা যাব কোথায়?

কিন্তু অধমের বক্তব্য এইখানেই শেষ নয়।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেছেন, পণ্ডিতজনের মতের বিরুদ্ধে যেয়ো না, কারণ পণ্ডিতের জ্ঞান আছে, তোমার নেই।

তবে কি মূর্খের বিরুদ্ধে মতানৈক্য প্রকাশ করব? সে ত আরও ভয়ঙ্কর আমার আপন অজানাতে যে-সব অসিদ্ধ যুক্তি-তর্ক উত্থাপন করব, যে-সব ভুল ঐতিহাসিক তথ্য পেশ করব, মূর্খ অজ্ঞতাবশত সেগুলো মেনে নিয়ে আমাকে আরও বিপদে ফেলবে।

তাই আমি শ্রীযুত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের সঙ্গেই মতানৈক্য প্রকাশ করছি। তিনি জ্ঞানবৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ এবং সুপণ্ডিত; আমার মত অর্বাচীনের যুক্তি-তর্কে, বিশেষত ঐতিহাসিক নজির পেশ করার সময় যদি ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে,

তবে তিনি সেগুলো সানন্দে এবং অনায়াসে মেরামত করে দিয়ে আমার জ্ঞানবৃদ্ধি করে দেবেন। বাঘা টেনিস-খেলোয়াড় টিল্‌ডেনও বলেছেন, 'সব সময় তোমার চেয়ে ভাল খেলোয়াড়ের সঙ্গে খেলবে—না হলে খেলাতে তোমার কখনও উন্নতি হবে না।' ইতিহাসে শ্রীযুত সরকার ভুবন-বিখ্যাত—তাঁর সঙ্গে দ্বিমত হয়ে আমিই লাভবান হব।

ইংরেজী ভাষার জ্ঞানভাণ্ডার দেখে আমরা আজ কিছুতেই কল্পনা করতে পারি নে, এ-ভাষা বাদ দিয়ে আমরা চলব কী করে? বাংলায় এ-রকম ভাণ্ডার নির্মাণ করব কী প্রকারে?

ইতিহাস বলেন, একদা ইয়োরোপের সর্বত্র জ্ঞানচর্চা হত লাতিনের মাধ্যমে। ইংরেজী, ফরাসী, জর্মনের নামও তখন কেউ মুখে আনত না। ওই সব অপোগণ্ড অর্বাচীন ভাষা যে কখনও জ্ঞানচর্চার মাধ্যম হতে পারে একথা কেউ বললে তখন নিশ্চয়ই তাকে পাগলা-গারদে পাঠানো হত, কিংবা ডাইনী 'ভর করেছে' ভেবে জ্যান্ত পুড়িয়ে ফেলা হত। অথচ এমন দিনও এল যখন ফ্রান্সের লোক লাতিন বর্জন করে ফরাসী ভাষাকেই জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চার মাধ্যম বলে মেনে নিল। জর্মনি তখনও শিক্ষাদীক্ষায় ফ্রান্সের অনেক পিছনে, তাই জর্মন রাজা-রাজড়া, নবাব-সুবেদাররা উত্তম ফরাসী-চর্চা করাটাই জীবনের সর্বপ্রধান কাম্য বলে ধরে নিয়েছিলেন। কাচ্চা-বাচ্চাদের পর্যন্ত ফরাসী 'পার্লিয়েরেন' 'স্প্রেযেন' ক্রিয়া খাঁটি জর্মন, তার অর্থ 'কথা বলা' কিন্তু জর্মনরা তখন অনুকরণে এমনি মত্ত যে ফরাসী 'পার্লে' ক্রিয়া পর্যন্ত ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছে—তুলনা দিয়ে বলি, আমি ছেলেবেলা থেকে ইংলিশ 'স্পীক' করে আসছি) করতে শেখানো হত এবং জর্মন ভাষাটাকে চাকরবাকরের ভাষা (গ্রেজিন্‌ডে-স্প্রাখে) বলে গণ্য করা হত। ফ্রিডরিক দি গ্রেট মাতৃভাষা জর্মনকে হেয় জ্ঞান করে ফরাসীতে কবিতা লিখতেন এবং সেই রদ্দী কবিতা মেরামত করতে গিয়ে গুণী ভলতেয়ারের নাভিশ্বাস উঠত।

তারপর একদিন ফরাসী নিজের থেকেই ব্যাঙাচির ল্যাজের মত খসে পড়ল। জর্মনই জ্ঞানচর্চার মাধ্যম হয়ে গেল।

তারপর জর্মন এল ইংরেজীর আওতায়। শ্রীযুত যদুনাথ এই সম্পর্কে লিখেছেন—

"The late German Emperor, Wilhelm II, before world-war No. I, had made English a Compulsory second language in all the secondary schools of his Empire. Wsa

that a sign of his slavery to the British people? No, like a shrewd practical politician he felt that this was the best way of promoting Germany's trade all over the world." (Hindusthan Standard, Feb. 1st, '53.)

এবার দেখা যাক এই ইংরেজীর প্রভাব খদ জর্মনরা পরবর্তী যুগে কী চোখে দেখেছে।

ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুত য়োহান ভীসনার 'জর্মন-ভাষা শিক্ষা' ('ডয়েচ্‌শে স্প্রাখলেরে') নামক একখানি পুস্তিকা লেখেন। এ-পুস্তিকা অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির শিক্ষা-বিভাগ (কুলটুর্স্‌ মিনিস্টেরিয়ুমের) কলেজের জন্য পাঠ্যপুস্তক হিসাবে নির্বাচন করেন।

জর্মনের উপর লাতিন, ফরাসী তথা ইংরেজীর প্রভাব আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক ভীসনার যা বলেছেন সেটি আমি তুলে দিচ্ছি। অনুবাদের সঙ্গে মূল জর্মন এখানে তুলে দেওয়ার উদ্দেশ্য যে, অনুবাদে কোনও ভুল থাকলে গুণী পাঠক সেদিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে পারবেন। (ডবল স্পেস-ওলা শব্দগুলো ইংরেজী—পাঠকের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করছি)।

Dem 19 Jhdt war es vorbehalten, unser Deutsch mit englischen Woertern xu ueberfluten. Die weit verbreitete Kenntnis der englischen Weltsprache, dazu der maechtige Einfluss englischer Sitte und Mode bewirkten, dass der deutsche G e n t l e m a n m S m o k i n g oder S w e a t e r wenigstens bis zum Weltkriege den Englaender ebenso nachaeffte wie frueher der deutsche Cavalier den Franzosen, Jede Kneipe bis dahin warein B a r, jedes Dampfschiff ein S t e a m e r, jeder Fahrstuhl ein L i f t (mit einem L i f t b o y) jede Fuellfeder eine F o u n t a i n-p e n jeder Fuenfuhr-Tee ein F i v e o' c l o c k t e a, Deutsche Fabrikanten schrieben auf ihre fuer Deutschland bestimmten Erzeugnisse K o h-i-n o o r m a d e b y L. & C. H a r d m u t h i n A u s t r i a, B r i t i s h g r a p h i t e d r a w i n g p e n c i l, c o m-p r e s s e d l e a d, Am ueppigsten wucherte das

englische natuerlich auf dem Gebiete des S p o r t s - deutsche Mittelschulen veranstalten F o o t - b a l l - m e e t i n g s und L a w n - t e n n i s - m a t c h e s wobei alles englisch war, auch das Zaehlen, nur nicht die Auesprache, Wie leichtfertig der Deutsche sein Volkstum vollends preisgibt, wenn er mit dem Auslande in unmittelbare Beziehung tritt, sieht man an der g e m i x t e n Sprache des Deutsch-Amerikhaners ; immer bissitg (busy), kauft sich dieser eine goldene W a t s c h e n (w a t c h) s t a r t e t f o r h o m (geht nach Hause) und r i n g t die B e l l (laeutet die Glocke) order b e l l t (laeutet einfach). —ভীসনার, ডয়েচ্‌শে স্প্রাখলেরে, পৃ ৮৫।

"আর উনবিংশ শতাব্দী রইলেন আমাদের জর্মন ভাষা ইংরেজী শব্দের বন্যায় ভাসিয়ে দেবার জন্য। বিশ্বভাষা হিসেবে ইংরেজীর প্রসার এবং ইংরেজী রীতিনীতির প্রভাব হওয়ার ফলে বিশ্বযুদ্ধ (প্রথম) না লাগা পর্যন্ত জর্মন Gentleman Smoking কিংবা Sweater পরে পরে বাঁদরের মত ইংরেজের অনুকরণ করেছিল—একদা যে-রকম জর্মন Cavalier ফরাসীর অনুকরণ করেছিল। ক্নাইপেকে বলা হত bar, ডামপফশিফকে বলা হত steamer, ফারস্টুলকে lift (এবং তার ভিতরে থাকত lift-boy), ফ্যুলফেডারকে fountain-pen, ফ্যুনফউরটিকে five o' clock tea. জর্মন কারখানাওয়ালারা জর্মনিরই জন্য নির্মিত মালের উপর লিখতেন, Koh-i-noor made by L. &. C Hardmuth in Austria, British graphite drawing pencil, compressed lead. এই (শব্দের) আগাছা অবশ্য সবচেয়ে বেশী পল্লবিত হল sports-এর জমিতে। জর্মন হাইস্কুলগুলো football meetings এবং Lawn-Tennis-matches-এর ব্যবস্থা করল এবং সেখানে সবই ইংরেজীতে চলত, এমন কী, সংখ্যা গোনা পর্যন্ত—একমাত্র উচ্চারণটি ছাড়া (লেখক ব্যঙ্গ করে ইঙ্গিত করেছেন—ওই কর্মটি সরল নয় বলেই)। বিদেশীর সঙ্গে সোজা সংস্পর্শে এলে জর্মন কী অবহেলায় তার জাত্যভিমান বর্জন করে তার উদাহরণ দেখা যায় তার খিচুড়ি জমন-মার্কিন ভাষাতে, 'বিজিক' (Busy) ঘড়ি কিনলে সেটা Watschen (Watch) srartet for hom (বাড়ি রওয়ানা দিল) এবং ringt die bell (ঘণ্টা বাজায়) কিংবা শুধু belt (এখানে।

লেখক একটু রসিকতা করেছেন, শুদ্ধ জর্মনে belt অর্থ 'ঘেউ ঘেউ করা')।"

তারপর লেখক দুঃখ করেছেন যে, এই করে করে জর্মন ভাষা একটা জোব্বার মত হয়ে উঠল যার সর্বাঙ্গে রঙিন তালি এবং সে-তালির টুকরোগুলোর নানা রঙের নানা জামা থেকে ছিঁড়ে নেওয়া!

আমি অধ্যাপক ভীসনারের সঙ্গে ষোল আনা একমত নই। বাংলা এখনও অতি দুর্বল ভাষা; তাকে এখনও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রচুর বিদেশী শব্দ নিতে হবে। আমি যে এই নাতিদীর্ঘ উদাহরণটির অতি কষ্টে নকল এবং অনুবাদ পেশ করলুম (ভুল করলুম, অ্যাদ্দিন বাজারে জোর ঢোল বাজিয়েছি, আমি খুব ভাল জর্মন জানি, এইবারে অনুবাদের বেলায় ধরা পড়ব) তার উদ্দেশ্য এই যে, জর্মন যদি সুসময়ে এই পাগলামি বন্ধ না করত তবে সে এতদিনে কথামালার চিত্রিতা গর্দভী হয়ে যেত।

অর্থাৎ আমরা যদি অনন্তকাল ধরে ইংরেজীরই সেবা করি, তবে আমাদের বাংলা ভাষাটি চিত্রিতা মর্কটী হয়ে যাবেন।

এ বিষয়ে আরও অনেক বক্তব্য আছে। কিন্তু এতখানি লেখার পর আজ সকালের (রবিবারের) কাগজ এসে পৌঁছল। সে কাগজ পড়ে আমি উল্লাসে মুক্তকচ্ছ হয়ে নৃত্য করেছি। বাংলা ভাষার প্রতি দরদী-জন মাত্রই খবরটি পড়ে উল্লসিত হবেন। খুলে কই।

আশা করি, আমার পাঠকেরা বিজ্ঞানে শ্রীযুত সত্যেন বসু এবং শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পাণ্ডিত্যে কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ করেন না। যে সব গুণী আমার বৈজ্ঞানিক কৌতূহলজাত প্রশ্ন এক লহমায়, বিনা কসরতে ফৈসালা করে দেন, তাঁরাই দেখছি, এই দুই পণ্ডিতের নাম উচ্চারিত হলেই মাথা নীচু করেন।

শ্রীযুত বসু বলেন, (আমি খবরের কাগজ থেকে তুলে দিচ্ছি, সভাতে যাবার আমার অধিকার নেই—তাই প্রতিবেদনে ভুল থাকলে বসু মহাশয় যেন নিজগুণে আমাকে ক্ষমা করেন) কেউ কেউ এই ধারণা পোষণ করেন যে, অন্তত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষাকে মাধ্যমরূপে স্বীকার করে নিতেই হবে, কিন্তু তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস (confident) যতদিন না বাংলাতে বিজ্ঞানের চর্চা হয় ততদিন পশ্চিম বাঙলায় বিজ্ঞানের প্রসার হতেই পারবে না।

তাঁর বিশ্বাস বাংলাতেই প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক শব্দ কিছুটা আছে, কিছুটা বানানো যেতে পারে, এবং বাদবাকী বিদেশী ভাষা থেকে নিতে কোনও সংকোচ করার প্রয়োজন নেই।

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও বলেন, বৈজ্ঞানিক শব্দের বাংলা পরিভাষা নির্মাণের সময় হয়ে গিয়েছে।

এর পর আর কী চাই? আমি যে-জিনিস অন্ধভাবে অনুভব করেছি, আমার যে-সব দরদী পাঠক আমার সঙ্গে এতদিন মোটামুটিভাবে একমত, তাঁরা কি এই দুই পণ্ডিতের উক্তি শুনে উল্লসিত হলেন না?

একটা জিনিসকে আমি বড্ড ডরাই, আপনাদের অনুমতি নিয়ে সেটি আজ আপনাদের কাছে নিবেদন করব।

গণ-আন্দোলন বাদ দিয়ে কোনও দেশেই কোনও বড় কাজ করা সম্ভব হয় । যতদিন পর্যন্ত শুধু ভারতীয় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ই স্বরাজ-আন্দোলনের জন্য চেষ্টা করেছিলেন ততদিন ইংরেজ আমাদের থোড়াই পরোয়া করেছিল, কিন্তু যখন ভারতের জনগণ ইংরেজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল – অবশ্য সেটা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আত্মত্যাগের ফলেই সম্ভবপর হল—তখন বাধ্য হয়ে ইংরেজকে এদেশ ছাড়তে হল। তাই, আবার বলছি, গণজাগরণ, গণ-আন্দোলনের শক্তিই আমাদের স্বরাজ এনে দিয়েছে।

এবং সবচেয়ে বড় কথা, আজ যদি ভারতীয় রাষ্ট্র তার স্বরাজ্যকে সর্বাঙ্গসুন্দর করতে চায় তবে তার দরকার অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক স্বরাজ্য-লাভ। রাজনৈতিক স্বরাজ্যের আপন মূল্য আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু তার ব্যবহারিক মূল্যের দিকটা ভুললে চলবে না—রাজনৈতিক স্বাধীনতার ফলে আমাদের হাতে যে-শক্তি এল তারই প্রয়োগ করে এখন আমাদের জয় করতে হবে অন্য সর্ব-স্বাধীনতা। এক কথায় এখন আমাদের প্রধান কর্তব্য, নবীন রাষ্ট্র গড়ে তোলা।

আমরা ভাবি, রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য 'চাষাভুষো'কে 'খ্যাপাবার' দরকার ছিল, এখন যখন স্বরাজ হয়ে গিয়েছে, তখন এদের দিয়ে আর কোনও দরকার নেই, এরা ফিরে যাক ক্ষেতে-খামারে, ফলাক ধানচাল, আর মধ্যবিত্ত-শ্রেণী, আমরা শহরে বসে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা করব আর তাই দিয়ে নবীন রাষ্ট্র গড়ে তুলব। তাই আমরা সে-চর্চা ইংরেজীতে করব, বাংলায় করব, না বান্টু ভাষায় করব তাতে কিছু আসে-যায় না, আমরা বুঝতে পারলেই হল, ওরা ওদের কম-জোর মাতৃভাষা নিয়ে পড়ে থাক্। ভাবতেই আমার সর্বাঙ্গ ঘেন্নায় রী রী করে ওঠে।

বহু দেশ ভ্রমণ করে, বহু গুণীর সাহচর্যে এসে, আপন মনে নির্জনে বসে বহু

তোলপাড় করে আমার সুদৃঢ় প্রত্যয় হয়েছে, এ বড় ভুল ধারণা, এ অতি মারাত্মক বিশ্বাস। আমার মনে আজ কণামাত্র সন্দেহ নেই যে, জনগণের সহযোগিতা ভিন্ন আমরা নবীন রাষ্ট্র গড়ে তুলতে পারব না। আমি আমার সহৃদয় পাঠক-সম্প্রদায়কে কখনও কোনও তত্ত্বে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস স্থাপন করতে অনুরোধ করি নি—তার পক্ষে, স্বপক্ষে যুক্তি তর্ক পেশ করেই ক্ষান্ত দিয়েছি—কিন্তু আজ যুক্তি-তর্ক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের অনুরোধ করেও বলছি, সাহস দিচ্ছি, জনগণের ভিতর বিশ্বাস অনুপ্রাণিত করুন, তাদের সহযোগিতা আহ্বান করুন—আপনারা লাভবান হবেন। এ ছাড়া অন্য পন্থা নেই।

এখন প্রশ্ন, জনগণের সহযোগিতা, জনগণমন আমরা জয় করব কী প্রকারে?

বিদেশী প্রবাদ, সব লোককে কিছুদিন ঠকাতে পাব, কিছু লোককে সবদিন ঠকাতে পার, কিন্তু সব লোককে সব দিন ঠকাতে পাববে না। আমাদের অধঃপতনের যুগে আমাদের সব লোককে—অর্থাৎ জনগণকে—আমরা অন্ধানুকরণ করতে শিখিয়েছিলুম, কিন্তু আজ আর সে-কর্ম সম্ভবপর নয়। আমরা চাইও না। আজ আমরা চাই, জনগণ যেন আমাদের আদর্শ বুঝতে পেরে, সেই মর্মে অনুপ্রাণিত হয়ে নবীন রাষ্ট্রনিমাণে আমাদের সহায়তা করে।

তাই প্রশ্ন, জনগণ আমাদের আদর্শ বুঝবে কী প্রকারে? আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করে, ভারতীয় ইতিহাসের ধারা অনুসন্ধান করে যদি তাবৎ বস্তু ইংরেজীতে লিপিবদ্ধ করে সপ্রমাণ করি, আমাদের পক্ষে এই কর্ম কাম্য, আমাদের পক্ষে ওই নীতি প্রয়োজনীয়, আমাদের পক্ষে আরেক পন্থা সুধম তবে তারা এ-সব বুঝবে কী করে?

চট্ করে আপনি উত্তর দেবেন, মাতৃভাষাতে লিখলেই কী তারা সব কিছু বুঝতে পারবে?

এর সদুত্তর দিতে হলে আপনাকে আবার একটুখানি কষ্ট স্বীকার করে ইউরোপে যেতে হবে।

ফ্রান্স, জর্মনি, হল্যাণ্ডে বেশীর ভাগ লোক শিক্ষা সমাপন করে ম্যাট্রিকের সঙ্গে সঙ্গে। এবং ওদের ম্যাট্রিক আমাদের ম্যাট্রিকের চেয়ে উচ্চস্তরের বলে তারা আর-কিছু শিখুক আর না-ই শিখুক, মাতৃভাষাটা অতি উত্তমরূপে শেখে। তারপর টাকা-পয়সা রোজগারের ধান্ধার ভিতর কেউ করে সাহিত্যের চর্চা, কেউ করে ইতিহাসের, কেউ দর্শনের—ইত্যাদি। এবং তাই প্রায়ই দেখা যায়, বহু সুসাহিত্যিক উত্তম উত্তম পুস্তক লিখে যাচ্ছেন অথচ তাঁরা শুদ্ধমাত্র ম্যাট্রিক, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছায়া মাড়ান নি। আমাদের রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এই ধরনের—

রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্র অন্য ধরনের। কিন্তু ইয়োরোপে রবীন্দ্র-শরতের গোষ্ঠী বৃহত্তর।

এ ত হল সৃষ্টিকর্ম—এ অনেক কঠিন কাজ—এর চেয়ে অনেক সোজা, বই পড়ে বোঝা এবং সাধনা দ্বারা ক্রমে ক্রমে সুসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক অধ্যয়ন করে করে দেশের উচ্চতম আদর্শের সঙ্গে সংযুক্ত থাকা। এ-জিনিসটি ইয়োরোপে অহরহ হচ্ছে এবং তাই ইয়োরোপের যে-কোনও দেশে গুণীজ্ঞানী যে শুধু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভিতরেই পাওয়া যায় তা নয়, জনসাধারণের ভিতরেও বহু বিজ্ঞ ব্যক্তি পাওয়া যায় যাঁরা অনায়াসে অধ্যাপকের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেন।

আমাদের দেশের বাংলা দৈনিকগুলো যে ইংরেজীর তুলনায় পিছিয়ে আছে সে-কথা আমরা সবাই জানি, তবুও দেখেছি, একমাত্র 'আনন্দবাজার'-পড়নেওলা গ্রাম্য বাঙালী অনেক সময় ওরই মারফতে এতখানি জ্ঞান সঞ্চয় করতে পেরেছে যে, ইংরেজী-জাননেওলা শহুরেকে তর্কে কাবু করে আনতে পারে।

আমার তখন বড় দুঃখ হয় যে, আমাদের বড় বড় পণ্ডিতেরা ইংরেজীতে না লিখে যদি বাংলা কাগজে লিখতেন, তবে আমার গাঁয়ের পড়ুয়া জ্ঞান-লোকে আরও কত দিগ্বিজয় করতে পারত।

মিল্টন বলেছেন :—

'ক্ষুধার্ত হৃদয় নিয়ে উর্ধ্বমুখে চায় এরা কে দেবে এদের খাদ্য!'

আমাদের পণ্ডিতেরা এতদিন এদের বঞ্চিত রেখেছেন ; স্বরাজ পাওয়ার পরও এঁরা তাদের জন্য কিছু করতে চান না। (আমি অবশ্য এঁদের দোষ দিই নে —এঁদের কাছে আমরা বহু দিক দিয়ে ঋণী—কিন্তু এঁরা অন্য যুগের লোক, ইংরেজী লেখাতে তাঁরা এত অভ্যস্ত যে, আজ বাংলা লিখতে এঁদের সত্যই কষ্ট হয়।)

মুসলমানেরা প্রাদেশিক ভাষাগুলোকে কিছু কিছু সাহায্য করেছিলেন সে কথা আমরা জানি, ক্রীশ্চান মিশনারিরাও তাই করেছিলেন, কিন্তু এ-কথা ভুললে চলবে না যে, মুসলমানরা ফার্সী এবং ইংরেজ ইংরাজীকেই সম্মানের স্থান দিয়েছিল। ফলে মুসলমান যুগে যাঁরা ফার্সী জানতেন তাঁরা ছিলেন 'শরীফ' অর্থাৎ 'ভদ্র' আর ব্রিটিশ যুগে (বলা উচিত 'ক্রীশ্চান যুগে' কারণ ভারতের ইতিহাসের প্রথম দুই যুগ যদি 'হিন্দু পিরিয়ড' এবং 'মুসলিম পিরিয়ড' হয়, তবে তৃতীয় যুগ 'ক্রীশ্চান পিরিয়ড' হবে না কেন?—এ-তত্ত্বটির প্রতি আমার ক্ষীণদৃষ্টি জ্যোতিষ্মান করেছেন ছন্দ-সম্রাট শ্রীপ্রবোধ সেন) যাঁরা ইংরেজী জানতেন, তাঁরা ছিলেন 'ভদ্দরোলোগ্ ক্লাস', অর্থাৎ 'শরীফ', অর্থাৎ 'ভদ্র'।

অথচ, ভদ্র, 'ভদ্র' বলতে আমরা আবহমান কাল এমন কিছু বুঝেছি যার সঙ্গে ফার্সী কিংবা ইংরেজী জানা-না-জানার কোনও সম্পর্ক নেই।

মুসলমান যুগে বরঞ্চ ভদ্রে গ্রাম্যে কিঞ্চিৎ যোগাযোগ ছিল, কারণ মুসলমান যুগে আমাদের সভ্যতা ছিল গ্রাম্য, অর্থাৎ জনপদ সভ্যতা ; কিন্তু ক্রীশ্চান আমলে সভ্যতা ইংরেজী-অভিজ্ঞ এবং ইংরেজী-অনভিজ্ঞের মাঝখানে এমনি এক বিরাট, নিরেট পাঁচিল তুলে দিলে যে, আজও আমরা সে-দেয়াল ভাঙতে পারি নি, এবং ভাঙবার চেষ্টা করতে চাই নে। আমরা এখন ইংরেজী-জাননে-ওলা আর ইংরেজী না-জাননে-ওলার মাঝখানে সেই প্রাচীন অন্ধপ্রাচীর, অচলায়তন খাড়া রাখতে চাই।

এই ব্যবস্থাটাকেই আমি ডরাই, বড্ড ডরাই। এ-ব্যবস্থা মেনে নিলে আপনারা একদিন আবার পরাধীন হবেন। সে-কথা আরেক দিন হবে॥

টুকিটাকি

দাবা খেলার জন্মভূমি কোথায় ?

দাবা খেলার ইতিহাস সম্পর্কে নানা মুনি নানা কথা কয়ে থাকেন। দাবার শেষের দিকের ইতিহাস সুস্পষ্ট এবং সেখানে তর্কাতর্কির অবকাশ নেই। ইরান জয় করার পরে আরবরা সেদেশে প্রথম দাবা খেলা শেখে। সকলেই জানেন, কোনও খেলা সম্পূর্ণ আপন করে নেওয়ার পরও তার মূল পরিভাষা অনেক সময় আগা-গোড়া পরিবর্তিত হয় না। তাই আরবরা ইরানী দাবা খেলা শেখার পরও দাবার রাজাকে ইরানী শব্দ 'শাহ' (রাজা) দিয়ে চিহ্নিত করে, এবং 'তোমার শাহ্ বিপদে' বলার সময়, অর্থাৎ কিস্তি দেওয়ার সময় শুধু 'শাহ্' বলত।

এর পর ক্রুসেড লড়াইয়ের সময়ে বন্দী ইয়োরোপীয়রা আরবদের কাছ থেকে দাবা খেলা শেখে এবং তারাও কিস্তি দেওয়ার সময় 'শাহ' বলত। সেই 'শাহ' লাতিনের ভিতর দিয়ে ইংরেজীতে রূপ নেয় 'শেক্' এবং সর্বশেষে 'চেক্' রূপে (ব্রিটিশ 'একস্‌চেকারে'র নাম ওই 'চেক্' থেকে এসেছে)।

কিস্তিমাতের 'মাত' কথাটা ওই ভাবেই আরবী, 'শাহ্, মাতা' অর্থাৎ 'তোমার রাজা মারা গিয়েছে' ইংরেজীতে রূপ নিয়েছে 'চেক মেট' হয়ে।

এখন প্রশ্ন, ইরানীরা দাবা খেলা শিখল কার কাছ থেকে ? দাবা ইরানী খেলা এ-দাবি পারস্য দেশে কখনও করা হয় নি। বরঞ্চ সে-দেশে কিংবদন্তী

প্রচলিত যে, এ-খেলা 'পঞ্চতন্ত্র' পুস্তকের মত ভারতবর্ষ থেকে ইরানে গিয়েছে।

একাদশ শতাব্দীতে গজনীর পণ্ডিত অল-বীরুনী তাঁর ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লিখিত পুস্তকে দাবা খেলার ছক এঁকে দিয়েছেন ও ঘুঁটিরও বর্ণনা করেছেন। তবে আজকের দাবা আর সে-দাবার পার্থক্য প্রচুর। তখনকার দিনে দাবা খেলা হত চারজনে—ছকের চারকোণে চার খেলোয়াড় আপন আপন ঘুঁটি নিয়ে বসতেন এবং চালও দিতে হত পাশা (ডাইস্ বা অক্ষ) ফেলে।

তাই নিয়ে বিচলিত হওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ আজ ভারতীয় দাবা ও বিলিতী দাবা হুবহু এক খেলা নয়।

কাজেই সম্পূর্ণ নূতন কোন প্রমাণ উপস্থিত না হলে ভারতবর্ষ যে দাবা খেলার জন্মভূমি তা নিয়ে তর্ক করবার কোনও কারণ নেই।

খেলাচ্ছলে

কিছুকাল আগে পার্লিমেণ্টে জনৈক সদস্য যে প্রশ্ন শুধান তার সারমর্ম এই :—

হেলসিন্‌কিতে যে ওলিম্পিক খেলা হয় সেখানে খেলার শেষে যখন সব দেশ আপন আপন জাতীয় পতাকা নিয়ে পরিক্রমা করে তখন ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করে সেই শোভাযাত্রায় যোগ দেবার জন্য কোনও ভারতীয়কে খুঁজে পাওয়া যায় নি। অবশেষে নাকি এক ফিন্ যুবক ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করে।

প্রশ্নকর্তা কোনও কোনও ভারতীয়কে এই ঘটনার জন্য তীব্র নিন্দাও করেন।

উত্তরে সহ-শিক্ষামন্ত্রী বলেন যে, তিনিও এই রকম কথা শুনেছেন।

আমাদের মনে হয়, এর একটা কড়া তদন্ত হওয়া উচিত।

আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস ভারতীয়রা অন্যান্য জাতির তুলনায় অভদ্র নয়। এককালে ভারতীয় সৌজন্য-শালীনতা বিদেশী বহু পর্যটককে মুগ্ধ করেছিল বলে তাঁরা তাঁদের ভ্রমণ-কাহিনীতে ভারতবাসীদের উদ্দেশ্যে বিস্তর প্রশস্তি গেয়ে গিয়েছেন। মেগাস্তেনেস থেকে এ-ইতিহাস আরম্ভ হয় এবং যদিও কোনও লেখক আমাদের কোনও কোনও আচার-ব্যবহারের নিন্দা করেছেন বটে, কিন্তু আমরা অভদ্র, এ-কথা কাউকে বড়-একটা বলতে শোনা যায় নি। বিদেশে ভারতীয়েরা আরও সাবধানে চলে বলে সেখানেও তারা প্রচুর খাতির-যত্ন পায়।

তবে হঠাৎ আজ এ-রকম একটা পীড়াদায়ক ঘটনা ঘটল কেন?

আমার মনে হয়, আমাদের টীমের কর্তাব্যক্তিরা পরবটার কথা বেবাক ভুলে

গিয়েছিলেন, কিংবা ব্যাপারটার গুরুত্ব ঠিক মেকদারে যাচাই করতে পারেন নি বলে সবাই মিলে রঙ্গভূমি ত্যাগ করে শহরে ফুর্তিফার্তি করতে চলে গিয়েছিলেন আর তাই চ্যাংড়ারাও যে চলে যাবে তার আর কী সন্দেহ!

কর্তারা শহরে বেড়াতে যান নি, চ্যাংড়াদের তাঁরা যেতে বারণ করলেন, তবু তারা বে-পরোয়া চলে গেল, এ-কথা বিশ্বাস করতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। এ-টীমে যারা গিয়েছিল তাদের দু-একজনকে আমি চিনি। পতাকা তোলার জন্ত তাদের আদেশ করলে তারা নিশ্চয়ই, অতি অবশ্যই, শহরে চলে যেত না—সেখানে শেষ পরবের জন্য সানন্দে অপেক্ষা করত।

বিদেশে আপন দেশের পতাকা উত্তোলন করার জন্য নির্বাচিত হওয়া কি কম শ্লাঘার বিষয়?

কাজেই মুরুব্বীদের প্রশ্ন শোধানো উচিত, তাঁরা তখন ছিলেন কোথায়, তাঁরা কাকে কী আদেশ দিয়েছিলেন, কেউ সে আদেশ অমান্য করেছিল কি না?

এরই পিঠে-পিঠে সংবাদপত্রে আরেকটা খবর পড়লুম।

পার্লিমেণ্টে যেদিন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, সেদিনই শ্রীযুত পঙ্কজ গুপ্ত জিওলজিক্যাল সার্ভে রিক্রিয়েশান ক্লাবে বক্তৃতা দেবার সময় বলেন, ভারতের খেলোয়াড়রা যখন বিদেশে খেলতে যান তখন তাঁরা প্রায়ই অভদ্র ভাষায় লেখা বেনামী চিঠি পান এবং তাঁরা যে মন না দিয়ে ফুর্তি-ফার্তি, আরাম-আয়েশ করে বিলেতে দিন কাটাচ্ছেন সে কটুবাক্যও চিঠিগুলোতে বর্ষিত থাকে।

গুপ্তমহাশয় বলেন, এ-ধারণা ভুল এবং এ-অভিযোগ কখনও সম্ভবপর হতে পারে না, কারণ প্রতি সপ্তাহে এক নাগাড়ে ছদিন জীবন-মরণ পণ করে খেলা প্র্যাকটিস করতে হয়, এ সময় ঢলাঢলির ('ঈজী লাইফ') কথাই উঠতে পারে না।

এ অতি হক কথা—বিদেশে নানা শ্রেণীর খেলোয়াড়দের সংস্রবে এসে আমারও ওই একই ধারণা হয়েছে। তবে সব অভিজ্ঞতারই আরেকটা সাবধান হওয়ার দিকও আছে, অর্থাৎ ভুরি ভুরি অভিজ্ঞতা থাকলেও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সতর্ক হওয়ার রাশে ঢিল দেওয়া বিচক্ষণের কর্ম নয়।

এ-সংসারে দুষ্ট লোকের অভাব নেই। দেশবিদেশের বহু জায়গায় এরা ওই সন্ধানে থাকে, খেলোয়াড়দের খেলার মাঠের বাইরে এমনভাবে বেকাবু করা যায় কি না, যাতে করে পরের দিন তারা ভাল করে খেলতে না পারে। তাই তারা খেলা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে এবং যে কদিন খেলা হচ্ছে সে-কদিন রোজ সন্ধ্যায় নেটিভ-স্টেট স্টাইলে জব্বর জব্বর ককটেল পার্টি দেয় এবং দেশবিদেশের এমন

সব হোমরা-চোমরাদের নেমতন্ন করে যে, সেখানে বিদেশী খেলোয়াড়দের, ওদের সম্মান রক্ষার্থে ইচ্ছা না থাকলেও বাধ্য হয়ে যেতে হয়। তারপর নানা কায়দায়-কৌশলে খেলোয়াড়দের মদ খাওয়াবার চেষ্টা সমস্ত সন্ধ্যা ধরে চলে। যারা পালা-পরবে নিতান্ত অল্প খায় তাদের নিস্তার নেই, আর যারা খেতে ভালবাসে তারা অনেক সময় প্রলোভন সামলাতে পারে না। দলের ম্যানেজার এবং কাপ্তেন অবশ্য মুর্গীর মত চিলের ছোঁ থেকে বাচ্চাদের বাঁচাবার চেষ্টা করেন কিন্তু অনেক সময় পেরে ওঠেন না, তাই ওদের দোষ দিয়ে কোনও লাভ নেই।

কোনও কোনও সময় এমন প্রলোভনও রাখা হয় যে-সম্বন্ধে লিখতে আমার বাধো-বাধো ঠেকছে। ফার্সীতে বলে 'দানিশমন্দরা ইশারা বশ অস্ত'—অর্থাৎ বুদ্ধিমানকে ইশারাই যথেষ্ট।

ফলং ? পরের দিন তারা এমন খেলা খেলে যে, দেখে মনে হয় এরা নিতান্তই খেলাধুলো করতে এসেছে।

ভারতীয় খেলোয়াড়দের সম্বন্ধে আমার ভয় হয়ত অমূলক, হয়ত আমি খামখাই ঘামের ফোঁটায় কুমির দেখছি, হয়ত আসলে ওটা কুমির নয়, ফুসকুড়ি, কিন্তু ওকীবহাল হওয়ার জন্য বলতে হয়,

সাবধানের মার নেই
(যদিও জানি
'মারেরও সাবধান নেই')।

মনে করুন সি কে নাইডু, সি এস নাইডু, জাম সাহেব, ব্র্যাডম্যান, লারউড, অমরনাথ, অমর সিং, মুশতাক, ওয়াজিব আলী এবং একমাত্র এঁদের মত পয়লা নম্বরওয়ালারা যদি আজ ইহলোক পরলোক ছেড়ে দিল্লিতে একখানা সরেস ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে আসেন, তবে আপনার মানসিক চাঞ্চল্যটা কী রকমের হয় ?

স্বীকার করি, গেল শনিবার দিন এখানে 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' ও প্রেসিডেন্টস্ এস্টেট ক্লাবে যে একদিনের ক্রিকেট ম্যাচ খেলা হয়, তাতে নিমন্ত্রণ সত্ত্বেও 'অনিবার্য' কারণে এঁদের কোনও মহারথীই উপস্থিত হতে পারেন নি। তাই বলেই যদি আপনারা ভাবেন খেলা উচ্চাঙ্গের হয় নি, তাহলে মারাত্মক ভুল করা হবে। 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' দিল্লির রীতিমত পুরাদস্তুর কেউ-কেডা কাগজ, এবং রাষ্ট্রপতির আপন এস্টেট ক্লাবও ত আমাদের শ্লাঘার প্রতিষ্ঠান। অতএব বিবেচনা করুন, এ-খেলার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি কি অতিশয় প্রয়োজনীয় কর্তব্য সমাধান করছি নে ?

কিন্তু হায়, আমার দারুণ দুর্ভাগ্য, এ-খেলার মল্লীনাথরূপে আপনাদের সমীপে কোনও টীকা নিবেদন করার উপায় আমার নেই। কারণ ও-খেলাতে আমি সশরীরে উপস্থিত হতে পারি নি, যদিও আমার চিত্ত, হৃদয়, চৈতন্য, আত্মা, সর্ব অস্তিত্ব ওই খেলাতে উপস্থিত ছিল। দরদী পাঠক শুধাবেন, কেন উপস্থিত হতে পার নি?

অভিমান।

এই যে আমি 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে'র এত বড় সম্ভ্রান্ত দৈনন্দিন পাঠক, ওই কাগজের গুণী কর্মচারীগণের সঙ্গে আমার বহু যুগের হৃদ্যতা, তাঁরা আমার মত একটা ওস্তাদ ক্রিকেটিয়ারকে ওই পরবের দিনে বেবাক ভুলে গেলেন? কেন, আমি কি রান্নাঘরের পিছনে বাতাবি নেবু দিয়ে ঘন ঘন সেঞ্চুরি করি নি? অবশ্য স্বীকার করি উইকেট্ ছিল না—কিন্তু উইকেট ত থাকে ক্লান্ত হলে বসবার জন্য, আমি ত ক্লান্ত হইনে।

ম্যাচ ড্র গেছে। যাবে না? আমাকে না নিলে!!

পিকনিকিয়া

গল্প শুনেছি, এক ইংরেজ, ফরাসী, জর্মন এবং স্কট নাকি বারোয়ারী চড়ুইভাতির ব্যবস্থা করে। কথা ছিল সবাই কিছু কিছু সঙ্গে আনবেন। ইংরেজ আনল বেকন-আণ্ডা, ফরাসী এক বোতল শ্যাম্পেন, জর্মন এক ডজন সসেজ আর স্কট নিয়ে এল তার ভাইকে।

দিল্লিতে কিন্তু পিকনিকিয়ারা শুধু ভাইকে সঙ্গে আনেন না, আনেন ভাইয়ের শালী-শালাদের, তারা আনে তাদের কাকা-মামাদের এবং তারা কের কাদের নিয়ে আসে তার হদিস এখনও পাই নি। সঙ্গে আনে ক্রিকেট, ফুটবল, গ্রামোফোন, পোর্টেবল রেডিও, মণ তিনেক পুরি, তদনুপাতের তরকারি এবং মাংস, গোলগাপ্পা (ফুচকা) এবং মিঠা পান।

এঁদের পীঠস্থল কুতুবমিনার, হাউজ-খাস এবং লোধি গার্ডেনস্। পাঁচ-সাত জনের পিকনিক হেথা-হোথা ছড়ানো থাকলে যত না গোলমাল আর উপদ্রব হয়, তার চেয়ে ঢের ঢের বেশী পীড়াদায়ক হয় এই সব পাইকিরী পিকনিকে। বে-খেয়ালে থাকলে হঠাৎ যে কখন দুম্ করে ক্রিকেট-বলটা আপনার ঘাড়ে এসে পড়বে তার কিছু ঠিক-ঠিকানা নেই।

এঁরা আনন্দ করুন, আমার তাতে কি আপত্তি, কিন্তু এই যে সাক্ষাৎ মরু-

ভূমিসম দিল্লি শহরে এত তকলিফ বরদাস্ত করে বহুত মেহন্নত করে ঘাস গজানো হয়, তারই উপর যখন অত্যাচার চলে তখন আমার মত শান্ত লোকেও এই দিল্লির শীতে উষ্ণ হয়ে ওঠে। লনে খোলা আগুন জ্বালানো বারণ, তাঁরা জ্বালাবেনই এবং চৌকিদার আপত্তি জানালে তাঁরা ঝগড়া-কাজিয়া লাগিয়ে দেন। কিংবা দেখি, চৌকিদার আর কোন আপত্তি করছে না, যেন সে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। রৌপ্যচক্র অস্বচ্ছ, তার ভিতর দিয়ে দেখবেই বা কী করে।

তাই দিল্লিতে আগমনেচ্ছু রসিকজনকে সাবধান করি, যদি শান্ত সমাহিত চিত্তে স্থাপত্যানন্দ উপভোগ করতে চাও তবে রবির সকালে কদাচ কুতুব, হাউজ-খাস এবং লোধি উদ্যান দেখতে যেয়ো না।

নিতান্তই যদি যেতে চাও তবে যেয়ো সরযুকুণ্ডে। অতি চমৎকার স্থল এবং ভিড় নেই বললেও চলে॥

সাহিত্যিকের মাতৃভাষা

শ্রীযুক্ত নীরদ চৌধুরী তাঁর 'অজানা ভারতীয়ের আত্মজীবনী' লিখে দেশবিদেশে সুনাম (কারো কারো মতে কুনাম) অর্জন করেছেন। বইখানা পাঠ করবার সুযোগ—কিংবা কুযোগ—আমার এখনও হয় নি, তবে পুস্তকখানার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কী, সে কথা আমি চৌধুরী মহাশয়ের নিজের মুখেই শুনেছি এবং তিনি তাঁর ভুবনবিখ্যাত পুস্তক থেকে গুটিকতক অধ্যায় আমাদের পড়ে শুনিয়েছেন। ওঃ! সে কী ইংরেজীর বাহার—তার ভিতর কত ভাষা থেকে, কত কেতাব থেকে কত রকম-বেরকমের আলপনা, কত ব্যঙ্গ, কত হুঙ্কার, কত বাকচাতুরী—ছাত্রে ছত্রে হাউই উড়ছে, পটকা ফাটছে—মূল বিষয়েব দিকে ধ্যান দেয় কার ঠাকুরদার সাধ্যি!

তা সে বইয়ের কথা যাক। ও-রকম বই পড়ার বয়স আমার বহুকাল হল গেছে। এ ধরণের বই আনাতোল ফ্রাঁস কেন পড়েন না, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন, 'আমার সে বয়স গেছে, যখন মানুষ যা বোঝে না তাই ভালবাসে। আমি আলো ভালবাসি।' নীরদ চৌধুরী যে-রকম এ-যুগের ভলতেয়ার, আম্মো এ যুগেব ফ্রাঁস!!

শ্রীযুত চৌধুরী পত্রান্তরে একখানা প্রবন্ধ লিখেছেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, তিনি এককালে বাংলায় লিখতেন এবং ইচ্ছে করলেই বাংলায় সর্বশ্রেষ্ঠ লেখকদের একজন হতে পারতেন।

চৌধুরী মশাই মানুষ; তাঁরও নানা দোষ আছে। কিন্তু তিনি যে অত্যধিক বিনয়-ভারে অবনত এ কথা তাঁর পরম শত্রুও বলবে না।

ইংরেজী লেখক হিসেবে মিঃ চাওডরি কতখানি নাম করেছেন জানি নে—জানার প্রয়োজনও বোধ করি নি। বিবেচনা করি অ্যাদ্দিনে তিনি ল্যাম, রাসকিনকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন কিন্তু বাংলা সাহিত্যে তিনি 'হেলায় লঙ্কা করিত জয়' শুনে আমার মনোরাজ্যে নানাপ্রকারের খণ্ড বিদ্রোহের সৃজন হয়েছে।

তাঁর বাংলা লেখা আমার কিছু কিছু পড়া আছে। বাংলা সাহিত্যের কিঞ্চিৎ সাধনা আমিও করেছি, যদিও শ্রেষ্ঠ লেখকদের অন্যতম হওয়ার চেষ্টায়, দিল্লি আমার জন্য এখনও বিলক্ষণ দূর অস্ত্। তিনি কাঁচা বা নিকৃষ্ট বাংলা লিখতেন একথা আমি বলব না, কিন্তু তিনি যে কীট্‌সের মত কোন ভয়ঙ্কর অমৃতভাণ্ড নিয়ে বাংলা সাহিত্যে নামেন নি, সে-কথাও আমাকে বাধ্য হয়ে বলতে হচ্ছে।

তবে এ দম্ভ কেন? এর সোজা অর্থ কি এই নয়: ওহে বাঙালী গ—ভ-গণ, তোমরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও সাহিত্যের যে এভারেস্টে উঠতে পারছ না, আমি ইচ্ছা করলে পবননন্দন পদ্ধতিতে এক লম্ফেই সেখানে উঠতে পারতুম।

দ্বিতীয়ত, ছোঃ, বাংলা আবার একটা সাহিত্য, তাতে আবার নাম করা! মারি তো হাতি, লুটি তো ভাণ্ডার। নাম করতে হয় ত ইংরেজীই সই।

অর্থাৎ আপন মাতৃভাষাকেও তাচ্ছিল্য।

বৃথা তর্ক। আমি শুধু শেষ প্রশ্ন শুধাই—স্বজাতীয় লেখক, আপন আপন মাতৃভাষাকে তাচ্ছিল্য করে কে কবে সত্য বড় হয়েছে??

আসা-যাওয়া

পুব ও পশ্চিম দেশবাসীদের ভিতর মেলা মিল আর গরমিল দুইই রয়েছে বলে কেউ বলেন (কিপলিং), এ দুয়ে মিলন অসম্ভব,' আর তার বহু পূর্বে গ্যোটে বলে গিয়েছেন, 'পুব পশ্চিম এখন আর আলাদা আলাদা হয়ে থাকতে পারবে না।'

যেখানে কিপলিং, গ্যোটে, রবি ঠাকুব, লিন্ যুটাং একমত হতে পারছেন না সেখানে আমি কথা কইতে যাব কোন্ সাহসে? যেখানে ফৈয়াজখানে আর হীরু গাঙ্গুলীতে লড়াই লেগে গিয়েছে সেখানে আমি বেমক্কা বে-সমে হাততালি দিয়ে মরি আর কী?

তবু সামান্য একটা কথা নিবেদন করতে চাই।

পশ্চিমের লোক কখনও কারও সঙ্গে কথা ঠিক না করে, অর্থাৎ পাকাপাকি

এনগেজমেণ্ট না করে দেখা করতে আসে না। এবং টম যদি ডিকের বাড়িতে কিংবা আপিসে আসতে চায় তবে ডিকের অনুমতি না নিয়ে কথনও আসবে না। কিন্তু, পশ্য, টম ডিকের অনুমতি নিয়ে এল বটে—ক'টার সময় ভেট হবে—কিন্তু সে যখন খুশি চেয়ার ছেড়ে বলতে পারে, 'তবে এখন চললুম'—তার জন্য ডিকের কোন অনুমতি প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ ইয়োরোপে কারও বাড়িতে যাওয়াটা তার হাতে, বেরিয়ে আসাটা আপনাব হাতে।

প্রাচ্যের প্রায় সব দেশেই ব্যবস্থাটা উল্টো। আপনি যখন খুশি রায় মহাশয়ের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হতে পারেন। 'এই যে রায় সাহেব' বলে হুঙ্কার দিয়ে আপনি রায় মহাশয়ের বৈঠকখানায় ঢুকবেন, আর রায়ও 'এই যে চৌধুরী মশায়, আসতে আজ্ঞে হোক, বসতে আজ্ঞা হোক' বলে কোল-বালিশ আর হুঁকোর নলটা আপনার দিকে এগিয়ে দেবেন। আপনি বালিশটা জাবড়ে ধরে ফুরুৎ ফুরুৎ করে আলবোলায় দম টানতে টানতে মৃদু মৃদু পা দোলাতে থাকবেন।

কিন্তু যখন বললেন 'এবারে উঠি ?' তখন কিন্তু রায়ের পালা। আপনি যে ভুম করে চলে আসবেন সেটি হচ্ছে না, সে অধিকার আপনার নেই। রায় বলবেন, 'আরে, বসুন. স্যাব। এত তাড়া কিসের।' আপনার তখন জোর করে চলে আসাটা সখ্‌ৎ বে-আদবী।

এর গুহ্য কারণ, হয়ত আপনি বহুদিন পরে এসেছেন, হয়ত কাশীবাস সেরে ফিরেছেন, রায়-গৃহিণী খবর পেয়ে আপনার জন্য সিঙাড়া ভাজবার তোড়জোড় করেছেন, আপনি হট্ করে চলে এলে তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হবেন, অতএব আপনাকে আরও কিছুক্ষণ বসতে হবে।

অর্থাৎ বিদায় নেবার বেলা আপনাকে অনুমতি নিতে হবে।

বিশেষ করে ইরান-আফগানিস্তানে এ-নিয়ম অলঙ্ঘ্য। ভেঙেছেন কি, আপনার নামে গোটা পাঁচেক ব্যঙ্গ-কবিতা লেখা হয়ে যাবে। মাহমুদকে নিয়ে ফিরদৌসীর ব্যঙ্গ-কবিতা তার সামনে লজ্জায় বোরকা টানবে।

রুশ দেশ প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মধ্যিখানে। তাই তারা খানিকটে এদের মানে, খানিকটে ওদের মানে। শার্ট তারা সায়েবদের মত পাতলুনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়, কিন্তু তারা যখন আপন 'ন্যাশনাল ব্লাউস' জাতীয় কুর্তা পরে, তখন সেটা আমাদেরই পাঞ্জাবির মত সামনে পিছনে ঝুলিয়ে দেয়।

তারা দেখা করতে আসে খবর দিয়ে, না-দিয়ে, দুইই। বিদেয় নেবার সময় তারা কিন্তু তৃতীয় পন্থা অবলম্বন করে। গাল-গল্পের মাঝে একটুখানি মোকা

পেলে বলে, 'এইবার ভাই, তোমার সঙ্গে আরেকটি পাপিরসি খেয়ে বাড়ি যাব।'

এ বড় উত্তম পন্থা। আন্তোন যদি ভ্যাচোর-ভ্যাচোর করে আপনার প্রাণ এতক্ষণ অতিষ্ঠ করে তুলে থাকে, তবে আপনি তদ্দণ্ডেই উল্লসিত হয়ে উঠবেন, 'যাক, লক্ষ্মীছাড়াটা তাহলে আর বেশী ভোগাবে না।' আপনার তখন উপেক্ষার ভাবটা ঝেড়ে ফেলে খুশী মুখে দু-চারটি কথা বলতে কিছুমাত্র কষ্ট হবে না। পক্ষান্তরে আন্তোন যদি আপনার দিলের দোস্ত হয় তবে তার আসন্ন বিচ্ছেদ-বেদনাটার জন্য আপনি নিজেকে খানিকটা সামলে নিতে পারবেন।

এবং দ্বিতীয়ত, ইয়োরোপে দেখা হওয়া মাত্রই প্রথম প্রয়োজনীয় কথা পাড়া হয়, পরে গাল-গল্প। প্রাচ্য দেশে তার উলটো—পাঁচটি টাকা চাইবার হলে বিদেয় নিয়ে দোরের গোড়ায় এসে তখন আমতা-আমতা করে চাইতে হয়, বাড়িতে ঢুকেই হুঙ্কার দিয়ে নয়।

রুশ দেশে ওই শেষ সিগারেটের সময় যা কিছু 'বিজিনেস talk' এবং শিবরাম চক্রবর্তী অনুpunএ 'টক বিজিনেস'॥

দেহলি-প্রান্ত

দিল্লি ছাড়ার সময় আমার ঘনিয়ে এল। বিচক্ষণ জন দিল্লিতে বেশীদিন থাকে না। পঞ্চপাণ্ডব পর্যন্ত মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল দেখে হিমালয় মুখো রওয়ানা দেন। এমন কা সামান্য কুকুরটা পর্যন্ত এখানে পড়ে থাকে নি।

তবে কি যাঁরা এখানে পড়ে থেকে শেষটায় শিব হয়ে যান, তাঁরা অবিবেচক? আদপেই না। এই দুশমনের ভূমি, গরমে শিককাবাব-বানানেওলা, শীতে কুলফী-জমানেওলা, সেক্রেটারি-জয়েন্ট লুসক্স-আণ্ডার-তস্য-আণ্ডারকাভার, জাত-বেজাতের-কর্মচারী-কণ্টকিত এই ভূমিতে যে ব্যক্তি 'অশেষ ক্লেশ ভুঞ্জিয়া' পরলোকগমন করে সে 'পরশুরামী' স্বর্গে গিয়ে অপ্সরাদের সঙ্গে দুদণ্ড রসালাপ করতে পারুক আর নাই পারুক, তাকে অন্ততপক্ষে নরকদর্শন করতে হয় না। কারণ এক নরক থেকে বেরিয়েই অন্য নরকে যাবার ব্যবস্থা কোনও ধর্মগ্রন্থই দিতে পারে না। আমি বিস্তর ধর্মের ঘাটে মেলা জল খেয়েছি—এ কথাটা আপনারা প্রায় আপ্ত বাক্যরূপে মেনে নিতে পারেন।

কিন্তু এসব নিছক রাগের কথা।

এই যে আমি দেহলি-বাসীদের সঙ্গে রাশানদের মত শেষ একটা (না, দু-

তিনটে) সিগারেট খাওয়ার হুমকি দিচ্ছি সে শুধু তাঁদের আপন জন ভেবে অভিমানবশত।

আপনারা আমার সাহিত্যিক প্রচেষ্টার কদর করলেন না, আমার গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ আপনাদের সাহিত্য-সভায় পড়তে দিলেন না, যদি বা প্রধান বক্তা কোন আণ্ডার সেক্রেটারির নেমন্তন্ন পেয়ে শেষ-মুহূর্তে কামাই দিলেন বলে আমাকে রচনা পড়তে দিলেন, তখন আবার আমার গুরুগম্ভীর রচনা শুনে আপনারা হাসলেন, যখন রসরচনা (আহা আজকাল রসরচনা লিখে কত লোক রাতারাতি নাম কিনে নিলে) পড়লুম তখন আপনারা গম্ভীর হয়ে গেলেন, সেক্রেটারিদের মস্করা করে কবিতা পড়ে শুনালুম—আপনারা সভয়ে গোপনে একে একে সভাস্থল ত্যাগ করলেন, যখন তাঁদের প্রশস্তি গেয়ে রচনা পাঠ করলুম তখন স্পষ্ট শুনতে পেলুম, আপনারা ফিসফিস করে বলছেন আমি তেলমালিশের ব্যবসা (মাসাজ ইনস্টিটুট নয়) খুলেছি, কিছু না পেরে শেষটায় যখন গান গাইলুম তখন পাড়ার ছোঁড়ারা ঠিক সেই সময় গাধার লেজে টিনের কেনেস্তারা বেঁধে তাকে পাড়াময় খেদিয়ে বেড়াল, ভরতনৃত্যম্ নাচি নি—তাহলে বোধ হয় আপনারা হনুমানের ছবি এঁকে তার তলায় আমার নাম লিখে বছরের শেষে 'নরসিং দাস' প্রাইজের বদলে এই প্রাইজ দিতেন।

তবু আমি আপনাদের উপর এক ফোঁটাও রাগ করি নি। বরঞ্চ আমি আপনাদের কাছে উপকৃত হয়ে রইলুম। আপনাদের সংস্রবে না এলে এই যে সাহিত্যরচনার মামদো ভূত আমাদের কাঁধে ছিল সে কি কস্মিনকালেও নামত?

বিবেচনা করি এখন কলকাতা ফিরে গেলে পাড়ার ছোঁড়ারা আমাকে দেখা মাত্রই পরিত্রাহি চিৎকার করে পালাবে না, তরুণীরা হয়ত কিঞ্চিৎ ঘাড় বেঁকিয়ে 'এই যে' বলে একটুখানি মিঠে হাসিও জানাবেন, 'ওইরে, আবার এসেছে' বলে দুদ্দাড় করে দরজা জানলা বন্ধ করবেন না।

ব্যালাটা বেচে দিয়েছি। পাণ্ডুলিপিগুলো কাঞ্জিলালকে 'অবদান' করেছি। তার বন্ধু পরিমল দত্ত নাকি গাঁটের পয়সা খরচা করে সেগুলো ছাপাবে। তা ছাপাক; আপনারা শুধু নজর রাখবেন সে যেন অ্যাকাউন্টস্ বিভাগে বদলি না হয়—ছোকরা তাহলে তবিল তছরুপের দায়ে পড়বে। পরিমলকে আমি স্নেহ করি।

যতই ভাবছি, ততই দিল্লি দেখি খারাপ নয়।

দিল্লির গরম অসহ্য! কিন্তু বিবেচনা করুন সেই গ্রীষ্মের শেষে যখন কালো যমুনার ওপার থেকে দূর-দিগন্ত পেরিয়ে আকাশ-বাতাস ভরে দিয়ে বিজয় মন্ত্রের মত গুরুগুরু করে নবীন মেঘ দেখা দেয়, তারই আবছায়া অন্ধকারে আপনি

খাটিয়াখানা বাইরে পেতে নব বরিষণের প্রতীক্ষায় প্রহর গোনেন, আপনার ত্রিযামা-যামিনীর সখা তারার দল একে একে ম্লান মুখে আপনার কাছ থেকে বিদায় নেয়, অল-ইণ্ডিয়া-রেডিয়োর ঘড়িটা আবার তখন ঘন্টার পর ঘন্টা সেই অন্ধকার বিদীর্ণ করেই আপনারই চারপাইখানার কাছে এসে আপনাকে সকস্মুখ দেয়, দূর বৃন্দাবনের প্রথম বর্ষণে ভেজা মিঠে হাওয়া এসে আপনার গালে চুমোর পর চুমো খেয়ে যায়, হঠাৎ আকাশের এস্পার ওস্পার ছিঁড়ে-ফেঁড়ে বিদ্যুৎ চমকে দিয়ে নিজাম প্রাসাদের চুড়ো, রাশান রাজদূতাবাসের ফটক, নিমগাছে এর গায়ে ওর বুকে মাথা কোটা এক ঝলকের তরে দেখিয়ে দেয় এবং তারপর সবশেষে অতি ধীরে ধীরে রিমঝিম করে বৃষ্টিধারা যখন আপনার সর্বাঙ্গে গোলাপজল ছিটিয়ে দেয়—তখন আপনি খাটিয়া ঘরের ভিতর টেনে নিয়ে যাবার চিন্তাটা পর্যন্ত করেন না, ভিজে মাটির গন্ধ দিয়ে বুকের রক্ত ভরে নেন, ইতিমধ্যে শুনতে পান—আরকিয়োলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের দরোয়ান রামলোচন সিং তুলসীদাস-কৃত রামায়ণ সুর করে পড়তে আরম্ভ করে দিয়েছেন, আর আপনার প্রতিবেশী সারস্বত ব্রাহ্মণের মেয়ে ভৈরবীতে গান ধরেছে।

দিল্লি কি সত্যই খুব মন্দ জায়গা?

কিংবা এই শীতকালের কথাটাই নিন। নিতান্ত যদি সন্ধ্যের পর আপনাকে না বেরতে হয় তবে পুনরায় বিবেচনা করুন···

এ-রকম দিনের পর দিন গভীর নীলাকাশ আপনি কোথায় পাবেন? সকাল-বেলায় সোনালী রোদ ট্যারচা হয়ে আপনার চোখের উপর এসে পড়েছে, ক্রমে ক্রমে লেপ কাঁথা গরম হয়ে উঠল, নাকে টোস্ট স্যাকার সোঁদা সোঁদা গন্ধ এসে পৌঁছচ্ছে, এইবার ছাঁৎ করে ডিম-ভাজার শব্দ আর গন্ধ আসবে, আপনি ড্রেসিং-গাউনটা গায়ে চাপিয়ে দিয়ে বারান্দায় এসে বসলেন।

আহা! সবুজ ঘাসে শিশিরের ঝিলিমিলি, প্রাতঃস্নাত শান্ত ঋজু ঝাউ সামনে দাঁড়িয়ে, শীতের বাতাসে বুগনভেলিয়ার মৃদু কম্পন, তারপর ধীরে ধীরে প্রখর হতে প্রখরতর রৌদ্রে বিশ্বাকাশের আলিঙ্গন, ধূপছায়াতে কালো-সবুজের স্নেহ-চিক্কণ আলিম্পন, আপনার আমার মত গরিবের ফালি অঙ্গনটুকু নন্দনকানন হয়ে উঠল—আপনি সেই সৌন্দর্যের মোহে আপিস কামাই দিয়ে আনন্দঘন দিন স্বর্ণ-রৌদ্রে চক্ষু মুদ্রিত করে কাটালেন—

এ শুধু দিল্লিতেই সম্ভব।

দিল্লি ত্যাগ তাই সহজ কর্ম নয়॥

পঞ্চতন্ত্র

২য়. পর্ব

ডাক্তার রণজিৎ রায়কে
স্নেহ ও কৃতজ্ঞতার
চিহ্নস্বরূপ

সৈ. মুজতবা আলী

ঐতিহাসিক উপন্যাস

কলকাতায় এসে শুনতে পেলুম, বর্তমানে নাকি ঐতিহাসিক উপন্যাসের মরসুম যাচ্ছে। আশ্চর্য লাগলো। বঙ্কিম আরম্ভ করলেন ঐতিহাসিক উপন্যাস দিয়ে, রবীন্দ্রনাথ লিখলেন সামাজিক - কিঞ্চিৎ রোমান্টিক-ঘ্যাষা—উপন্যাস, শরৎচন্দ্র লিখলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিয়ে, তারাশঙ্কর তথাকথিত নিম্ন সম্প্রদায় নিয়ে। এর পর আবার হঠাৎ ঐতিহাসিক উপন্যাস কি করে যে ডুব-সাঁতারে রিটার্নজার্নি মারলে ঠিক বোঝা গেল না। আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি, কাজেই আর পাঁচ-জনের মত হতভম্ব হতে আমার কোনো আপত্তি নেই।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের নাকি এখন জোর কাটতি। আবার একাধিক জন বলছেন, এগুলো রাবিশ। পাঁচজনের মত আমি আবার হতভম্ব।

কিন্তু এতে করে আমার ব্যক্তিগত উপকার হয়েছে। বছর পঁচিশেক পূর্বে আমাকে বিশেষ কারণে মোগল সাম্রাজ্যের পতন ও মারাঠা শক্তির অভ্যুদয় নিয়ে প্রচুর পড়াশোনা করতে হয়। সে যুগের প্রায় সব কেতাবপত্রই ফার্সীতে। বহু কষ্টে তখন অনেক পুস্তক যোগাড় করেছিলুম। তার কিছু কিছু এখনো মনে আছে। মাঝে মাঝে আজকের দিনের কোনো ঘটনা হুবহু 'শেষ মোগলদের' সঙ্গে মিলে যায় এবং লোভ হয় সেদিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। কিন্তু সে সব কেতাবপত্র এখন পাই কোথায়? স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করলে হয়তো ইতিহাসের প্রতি অবিচার করা হবে।

কিন্তু ঐ ঐতিহাসিক উপন্যাসই এক্ষণে আমার পরিত্রাণ এনে দিয়েছে। ধরে নিন, আমি ঐতিহাসিক উপন্যাসই লিখছি।

মারাঠারা যখন গুজরাত সুবা (বা সুবে অর্থাৎ প্রদেশ, প্রভিন্স) দখল করে তার রাজধানী অহমদাবাদে ঢুকল তখন সেখানকার দেওয়ান (প্রাদেশিক প্রধান মন্ত্রী) মুহাফিজ্‌খানার (আর্কাইভ্‌স্‌-এর) তাবৎ কাগজপত্র বাড়ি নিয়ে গিয়ে গুজরাত-কাঠিয়াওয়াড়ের একখানা প্রামাণিক ইতিহাস লেখেন। বইখানি তিনি দিল্লীর বাদশা-সালামৎ মুহম্মদ শাহ বাদশাহ রঙ্গীলাকে ডেডিকেট করেন। ইতিহাসের নাম 'মিরাৎ-ই-আহমদী'। পুস্তকের মোকদ্দমায়[১] তিনি

১ বাংলায় মোকদ্দমা বলতে মামলা, 'কেস' বোঝায়। আরবীতে অর্থ অবতরণিকা। 'কদম' মানে পদক্ষেপ ('কদম্ কদম বঢ়হায়ে যা'); মোকদ্দমা প্রথম পদক্ষেপ, অবতরণিকা। আবার প্রথম পদক্ষেপ বলে তার অর্থ মামলা রুজু

বাদশা-সালামৎকে উদ্দেশ করে বলেন, যে রাজনীতি অনুসরণ করার ফলে দিল্লীর বাদশারা গুজরাতের মত মাথার-মণি প্রদেশ হারালেন সে নীতি যদি না বদলানো হয় তবে তাবৎ হিন্দুস্থানই যাবে। সেই নীতির প্রাথমিক স্বর্ণযুগ, ক্রমবিকাশ ও অধঃপতন তিনি সেই ইতিহাসে ধারাবাহিক লিপিবদ্ধ করেছেন।

সেই ইতিহাস থেকে একটি ঘটনার কথা মনে পড়ল। স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে লিখছি—তাই আবার বলছি ভুলচুক হলে ধরে নেবেন, এটি ঐতিহাসিক উপন্যাস।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে একবার পর পর কয়েক বৎসর ধরে গুজরাতে বৃষ্টি না হওয়ার ফলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। দলে দলে লোক অহমদাবাদ পানে ধাওয়া করে; সেখানে যদি দু'মুঠো অন্ন জোটে। অগণিত পিতামাতা তাদের পুত্র-কন্যাকে দাস-দাসীরূপে বিক্রয় করে দেয়। গুজরাতি মেয়েরা যে টাকা-মোহর ফুটো করে অলঙ্কার হিসেবে পরে সেগুলো পর্যন্ত বিক্রয় করে দেয়। বিস্তর লোক উপবাসে মরলো।

গুজরাত সুবার সুবেদার (গভর্নর, কিন্তু বর্তমান গভর্নরের চেয়ে অনেক বেশী ক্ষমতা ধরতেন এবং দেওয়ানের সঙ্গে এক জোটে প্রদেশ চালাতেন) তখন অহমদাবাদের সব চেয়ে ধনী শ্রেষ্ঠীকে পরামর্শের আমন্ত্রণ জানালেন। এইসব শ্রেষ্ঠীরা প্রধানত জৈন, এবং স্মরণাতীত কাল থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য করে করে বহু অর্থের অধিকারী হয়েছিলেন (বর্তমান দিনের শ্রেষ্ঠী কস্তুরভাই লালভাই, হটিসিং এই গোষ্ঠীরই লোক)।

সুবেদার সেই শ্রেষ্ঠীকে শুধালেন, দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য কিছু করা যায় কি না। শ্রেষ্ঠী বললেন, মালওয়া অঞ্চলে এবারে প্রচুর ফসল ফলেছে, সেখানে গম-চাল পাওয়া যাবে। তবে দুই প্রদেশের মাঝখানে দারুণ দুর্ভিক্ষ। মালবাহী গাড়ি লুট হবে। অতএব তিনি দুই শর্তে দুর্ভিক্ষ-মোচনের চেষ্টা করতে পারেন: ১) সুবেদার নিরাপদে মাল আনানোর জন্য সঙ্গে গার্ডরূপে ফৌজ পাঠাবেন, ২) মাল এসে পৌছলে সুবেদার শ্রেষ্ঠীতে মিলে যে দাম বেঁধে দেবেন মুদীরা যদি তার বেশী দাম নেয় তবে তদ্দণ্ডেই তাদের কঠোর সাজা দেবার জিম্মাদারী সুবেদার নেবেন। সুবেদার সানন্দে সম্মতি দিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য শ্রেষ্ঠী সুবেদারের কাছ থেকে অর্থ-সাহায্য চান নি।

করার প্রথম কদম—এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে লাতিনে যাকে বলে প্রিমা ফাশি কেস্—কিন্তু বাঙলায় এখন মোকদ্দমা বলতে পুরো কেসটাই বোঝায়।

বাড়িতে এসে শ্রেষ্ঠী বংশানুক্রমে সঞ্চিত অর্থ, অলঙ্কার-জওহরাৎ বের করলেন ; স্ত্রী কন্যাকে তাঁদের অলঙ্কার পর্যন্ত খুলে দিতে বললেন।

সেই সমস্ত ঐশ্বর্যভাণ্ডার নিয়ে শ্রেষ্ঠীর কর্মচারীরা সুবেদারের ফৌজ সহ মালওয়া পানে রওয়ানা দিলেন। কিছুদিন পরেই মুখে মুখে অহমদাবাদে খবর রটে গেল, মাল পৌঁছল বলে। পথে লুটতরাজ হয় নি।

সেই সব গম ধান ও অন্যান্য শস্য যখন অহমদাবাদে পৌঁছল তখন শ্রেষ্ঠী তাঁর একাধিক হাভেলি—বিরাট চক মেলানো বাড়ি, একসঙ্গে গোষ্ঠীর বহু পরিবার একই বাড়িতে বসবাস করতেপারে—খুলে দিয়ে আঙ্গিনার উপর সেসব রাখলেন। তারপর সুবেদারের সঙ্গে হিসেব করলেন, কি দরে কেনা হয়েছে, রাহ-খর্চা (ট্রান্সপোর্ট) কত পড়েছে এবং তাহলে এখন কি দর বেঁধে দেওয়া যায়? সুবেদার বললেন, 'আর আপনার মুনাফা ?' শ্রেষ্ঠী বললেন, 'যুগ যুগ ধরে মুনাফা করেছি ব্যবসা বাণিজ্যে। এ ব্যবসাতে করবো না। যা খর্চা পড়েছে সেই দর বেঁধে দিন। মুদীর সামান্য লাভ থাকবে।' দাম বেঁধে দেওয়া হল।

এবারে শুনুন, সব চেয়ে তাজ্জবকী বাৎ! শ্রেষ্ঠী শহরের তাবৎ মুদীদের ডেকে পাঠালেন এবং কোন্ মুদী কটা পরিবারের গম যোগায় তার শুমারী (গণনা) নিলেন। সেই অনুযায়ী তাদের শস্য দেওয়া হল। .সোজা বাঙলায় আজকের দিনে একেই বলে রেশনিং। এবং তাব সঙ্গে গোড়াতেই ব্যবস্থা, যাতে হোর্ডিং না হতে পারে। এবং ফেয়ার প্রাইস।

অহমদাবাদে চতুর্দিকে আনন্দোচ্ছ্বাস। ইতিমধ্যে শ্রেষ্ঠীর চর এসে জানালে অমুক মহল্লার দু'জন মুদী ন্যায্যমূল্য থেকে এক না দু' পয়সা বেশী নিয়েছে।

শ্রেষ্ঠী তৎক্ষণাৎ স্বয়ং সেই মহল্লায় গিয়ে সর্বজন সমক্ষে তদন্ত করলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে সোজা সুবেদারের বাড়ি গেলেন। সুবেদার তখন ইয়ার-বক্সী[2] সহ গমাগমন সেলেব্রেট করছিলেন। কিন্তু পূর্বপ্রতিজ্ঞা অনুযায়ী বেরিয়ে এসে সব কিছু শুনে সেপাই পাঠালেন মুদীদের ধরে আনার জন্য। সাক্ষীসাবুদও যেন সঙ্গে সঙ্গে আনা হয়।

২ বক্সী বা বখ্শী (বখ্শিশ কথা একই ধাতু থেকে) অর্থ, একাউন্টেন্ট জেনারেল, অডিটার জেনারেল ও ফৌজের চীফ পে-মাস্টার—এ তিনের সমন্বয়। কায়স্থরা প্রধানত এই দায়িত্বপূর্ণ চাকরি করতেন। প্রধান বা মীর বখ্শী নিয়োগ করতেন স্বয়ং দিল্লির বাদশা-সালামৎ। আর সরাসরি নিয়োগ হতেন কাজী উল কুজ্জাৎ অর্থাৎ চীফ জাস্টিস, সদর্-উস্-সদর্ (সেই অঞ্চলে বাদশা-সালামতের

তদ্দণ্ডেই সুবেদারের সামনে সাক্ষীসাবুদ তদন্ত-তক্‌তীশ হয়ে গেল। প্রমাণ হয়ে গেল সত্যই তারা বেশী দাম নিয়েছে।

সুবেদার হুকুম দিলেন, বড্ড বেশী 'খেতে চেয়েছিল' বলে মুদী দুটোর পেট কেটে ফেলা হোক। তাই করা হল। নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে গেল।

সবাই যেন এই দৃষ্টান্ত থেকে সজাগ সতর্ক হুঁশিয়ার খবরদার হয় সেই উদ্দেশ্যে সুবেদার হুকুম দিলেন, শহরের সব চেয়ে উঁচু দুটো উটের পিঠে তাদের লাশ বেঁধে দিয়ে নগর-পরিক্রমা করা হোক।

সমস্ত রাত ধরে তাই করা হল।

এরপর ঐতিহাসিক যেন নিতান্ত সাদামাটা ডালভাতের কথা বলছেন, ঐভাবে মন্তব্য করছেন, 'অতঃপর আর কেউ অন্যায্য মুনাফা করার চেষ্টা করে নি।'

(আমার হাতে যে পাণ্ডুলিপিখানা পৌঁচেছিল তাতে দেখি এ জায়গাটায় এ যুগের কোন্ এক সুরসিক পাঠক লিখছেন, 'we are not surprised !')

*　　　　*　　　　*

আমি আর কি মন্তব্য করবো? রেশনিং, ফেয়ার-প্রাইস, নো চান্স্ ফর হোর্ডিং, তন্মুহূর্তে তদন্ত, তদ্দণ্ডে দণ্ড, জনগণকে হুঁশিয়ারী দেওয়া এসবই হয়ে গেল চোখের সামনে। অবশ্য আমি নিরীহ প্রাণী, পেট কেটে নাড়িভুঁড়ি বের করার আদেশ শুনলে আমার গা শিউরে উঠে। তবে যারা দিনের পর দিন রেশন-শপের লাইনে দাঁড়িয়েছেন, চোখের সামনে কালো-বাজার এবং যাবতীয় অনাচার দেখেছেন, পুত্রকন্যাকে কচুঘেচু খাওয়াতে বাধ্য হয়েছেন এবং বিত্তশালীরা কি কৌশলে তোফা খানাপিনা করছেন সবিশেষ অবগত আছেন, তাঁরা হয়তো উল্লাস বোধ করবেন। আমি আপত্তি করবো না—কারণ পূর্বেই বলেছি, আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি॥

আপন জমিজমা উদ্ধারকের জন্য, তথা কেউ নিঃসন্তান মারা গেলে তার সম্পত্তি অধিকার করতে)। সরকার = চীফ-সেক্রেটারী, কানুনগো = লিগেল রিমেম্ব্রেনসার পরে নিযুক্ত হতেন। বখ্‌শীর কাছ থেকে টাকা পেয়ে ব্যবসায়ীরা সঙ্গে সঙ্গে সামনের বাজারে হুণ্ডি কাটতো বলে সে বাজারকে 'বখ্‌শী বাজার' বলা হত। বখ্‌শী সরকার ইত্যাদি বড় বড় এডমিনিস্ট্রেটিভ চাকরি প্রধানত কায়স্থরাই করতেন। ইংরেজ মোটামুটি এই পদ্ধতিই চালু রাখে।

কচ্ছের রাণ

ঐতিহাসিক উপন্যাস নিয়ে কথা হচ্ছিল। আর বলছিলুম, এতে করে আমার বড্ডই উপকার হয়েছে। ইতিহাস নিজেকে মাঝে মাঝে পুনরাবৃত্তি করে। চোখের সামনে যখন তাই কোনো কিছু একটা ঘটে, তখন স্মৃতিপথে আসে প্রাচীন দিনের ঐরকম কোনো একটি ঘটনা। প্রথম যৌবনে কোনো এক প্রাচীন ইতিহাসে পড়েছি। সে বই এখন আর পাবো না। একে ফার্সীতে লেখা, তদুপরি বইখানা হয়তো সে ভাষার পুস্তকের মাঝেও দুষ্প্রাপ্য। স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করলে হয়তো ঐতিহাসিকের প্রতি অবিচার করা হবে।

ইতিমধ্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস এসে আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। কেউ যদি ত্রুটিবিচ্যুতি দেখিয়ে দেয় তবে নিঃশরমে বলবো, আমি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছি।

গুজরাতের ইতিহাস 'মিরাৎ-ই-আহমদী'র কথা হচ্ছিল। বইখানা লেখা হয়, নাদির শাহ যখন ভারতবর্ষ লণ্ডভণ্ড করে যান মোটামুটি সেই সময়। এ পুস্তক গ্রন্থকার আরম্ভ করেছেন জৈন সাধু মেরুতুঙ্গাচার্যের সংস্কৃতে লেখা গুজরাতের প্রাক্-মুসলিম যুগের ইতিহাসের[১] সারাংশ নিয়ে, তারপর আছে গজনীর সুলতান মাহমূদ[২] কর্তৃক সোমনাথ আক্রমণ।

সুলতান মাহমূদ এমনিতে বলতেন, তিনি কাফিরের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন, কিন্তু সিন্ধুদেশ সপ্তম অষ্টম শতাব্দী থেকে মুসলমান অধিকারে। সে দেশ কি করে আক্রমণ করা যায়? সুলতান বললেন, 'সিন্ধুদেশের মুসলমানরা যদিও কাফির নয়, তবু কাফির-তুল্য—তারা হেরেটিক ; অতএব আক্রমণ করা যায়।'

তা সে যাই হোক, তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল কাঠিওয়াড়ের সোমনাথ মন্দিরের বিরাট ধনভাণ্ডার লুণ্ঠন করা। সেটা সিন্ধুদেশ জয় না করে হয় না।

কিন্তু তার পরই আসে কচ্ছের রাণ। সেটা অতিক্রম করা সিন্ধু-বিজয়ের চেয়েও কঠিন। মাহমূদের সাঙ্গোপাঙ্গ তাঁকে নিরস্ত করার চেষ্টা দিয়ে নিষ্ফল হলেন।

কচ্ছের রাণ অতিক্রম করতে গিয়ে মাহমূদের ফৌজের অসংখ্য সৈন্য ও অশ্ব

---

১ সংস্কৃত বইখানার নাম আমার মনে পড়ছে না। বোধ হয় 'প্রবন্ধ চিন্তামণি'।

২ মাহমূদ ও মুহম্মদ দুই ভিন্ন নাম। যে রকম হাসন, হুসেন ও হাস্‌সান (সুহ্রাওয়ার্দী), তিনটি ভিন্ন ভিন্ন নাম।

তৃষ্ণায় প্রাণ হারালো। চোরাবালিতেও অনেকে। তখনকার দিনের ঐতিহাসিকরা তার জন্য গাইডকে জিম্মেদার করেছেন; সে নাকি বিশ্বাসঘাতকতা করে। কিন্তু মাহমুদকে বাধ্য হয়ে ঐ পথেই ফিরে যেতে হয়েছিল। মাহমুদ ছিলেন ল্যাণ্ডলক্ট্ (অর্থাৎ যে দেশের সঙ্গে সমুদ্রের কোনো সংস্পর্শ নেই) দেশের লোক—হিটলারেরই মত।[৩] তাই দ্বারকা থেকে নৌবহর যোগাড় করে 'ঠাট্টা' (করাচীর কাছে প্রাচীন বন্দর) যাবার সাহস করেন নি।

* * *

এর পর পাগলা রাজা মুহম্মদ তুগলুক এই কচ্ছের রাণের কাছে মার খান।

ফার্সী ঐতিহাসিক লিখেছেন 'তগী', ফার্সীতে 'ঠ' ধ্বনি নেই—শব্দটা বোধ হয় তাই 'ঠগী'। সেই তগী মধ্য-পশ্চিম ভারতে লুটতরাজ আরম্ভ করে। বাদশাহী ফৌজ বার বার তার বিরুদ্ধে অভিযানে বেরিয়ে বার বার বিফলমনোরথ হয়ে দিল্লি ফিরে আসে। মুহম্মদ রেগে টং। বললেন, 'আমি স্বয়ং যাবো।'

একটা সামান্য ডাকুর বিরুদ্ধে স্বয়ং হুজুর যাবেন!

না যাবোই।

হুজুর স্বয়ং আসছেন জেনে তগী অহমদাবাদ পালালো। হুজুর বললেন, চলো অহমদাবাদ। পারিষদরা মহা অসন্তুষ্ট। সেই সুদূর অহমদাবাদ—দিল্লি থেকে কত দিনের রাস্তা! হুজুর কিন্তু গোঁ ছাড়লেন না। অহমদাবাদে পৌঁছলে পর জানা গেল, তগী পালিয়েছে কাঠিয়াওয়াড়ে। হুজুর বললেন, 'চলো কাঠিয়াওয়াড়।' কিন্তু তখন বর্ষা নেমে গিয়েছে। এবং শ্রান্তি-ক্লান্তিতে হুজুরের হল জ্বর। কি জ্বর, আমি বর্ণনা থেকে বুঝতে পারি নি। ম্যালেরিয়া খুব সম্ভব নয়। ম্যালেরিয়া বোধ হয় এ-দেশে পরে এসেছে। তা সে যাই হোক, হুজুর তামাম বর্ষাকালটা অহমদাবাদে জ্বরে ধুঁকে ধুঁকে রোগা-দুবলা হয়ে গেলেন। কিন্তু বর্ষা-শেষেও গোঁ ছাড়লেন না—তাঁকে যে পাগলা রাজা বলা হত সেটা প্রধানত তাঁর গোঁর জন্যই—চললেন কাঠিয়াওয়াড়। তগী পালালো কচ্ছে। হুজুর গেলেন কচ্ছ। তগী পালালো কচ্ছের রাণের উপর দিয়ে সিন্ধুদেশে। সে ডাকাত—রাণের কোথায় কি, জানে—সেখানে একাধিক বার আশ্রয় নিয়েছে। তদুপরি

৩ ফ্রান্স জয়ের পর হিটলার ইংলণ্ড আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। এর নাম অপারেশন 'সী লায়েন' (সমুদ্রসিংহ, 'জে ল্যোয়ে') কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটা বাতিল করে দেওয়া হয়। তার বহুবিধ কারণ নিয়ে নানা গুণী নানা আলোচনা করেছেন। অন্যতম কারন বলা হয়, হিটলার ল্যাণ্ডলক্ট্ দেশের লোক ছিলেন

সে তো আর বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে যাচ্ছে না ; তার দানাপানির আর কতটুকুই বা দরকার !

এবারে পারিষদরা তারস্বরে প্রতিবাদ জানালেন। গজনীর মাহমুদ বাদশা যে রাণে কি রকম নাজেহাল হয়েছিলেন সে কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। সঙ্গে ছিলেন রাজসভার সরকারী ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বরনী (ইনি 'দিল্লি দূর অস্ত'-এর সাধু নিজামুদ্দীন আউলিয়া ও কবি আমির খুসরুর নিত্যালাপী বন্ধু ছিলেন); তিনিও নিশ্চয়ই প্রাচীন ইতিহাস কীর্তন করেছিলেন। তদুপরি তুগলুক নিজে ছিলেন সুপণ্ডিত। ইতিহাস ভূগোল উত্তমরূপেই জানতেন। কিন্তু হিটলার যদিও অত্যুত্তমরূপেই নেপোলিয়নের রুশ-অভিযান ও তার মারাত্মক ফলাফল সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং যদিও তাঁর সেনাপতিরা তাঁকে বার বার রুশ-অভিযান থেকে নিরস্ত থাকতে উপদেশ দেন, তবুও তিনি সেই কর্মটি করেছিলেন। এখানেও তাই হল। তুগলুক নিরস্ত হলেন না।

কচ্ছের রাণে বাদশা মুহম্মদ তুগলুকের কী নিদারুণ দুরবস্থা হয়েছিল, তার বর্ণনা একাধিক ঐতিহাসিক দিয়েছেন। আজ আমার আর ঠিক মনে নেই, তাঁর সৈন্য এবং ঘোড়া খচ্চরের ক'আনা বেঁচেছিল, আর ক'আনা মরেছিল।

এ সময়ের একটি ঘটনা ঐতিহাসিক বর্ণনা করেছেন। রোগে জীর্ণ দুর্বল দেহ নিয়ে ঘোড়ার উপরে বসে মুহম্মদ তুগলুক ধুঁকতে ধুঁকতে এগোচ্ছেন। এমন সময় তিনি ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বরনীকে ডেকে পাঠালেন—কাউকে ডেকে না পাঠালে হুজুরের কাছে যাবার কারো অনুমতি ছিল না। বরনী কাছে এলে তুগলুক তাঁকে বললেন, 'আচ্ছা বরনী, তুমি তো জানো আমি আমার প্রজাদের কতখানি ভালোবাসি। আমি যে-সব ফরমান-হুকুম জারি করেছি সে তো একমাত্র তাদেরই মঙ্গলের জন্য। তবে তারা একগুঁয়েমি করে আমার আদেশ অমান্য করে কেন ?' তারপর শুধোলেন, 'আচ্ছা বরনী, তোমার কি মনে হয়, আমি বড্ড কড়া হাতে শাসন করেছি, প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত শাস্তি দিয়েছি ? তবে কি এখন আমার উচিত আরো ক্ষমা-দয়ার সঙ্গে শাসন করা ?'

বলে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে দুআভুআ করতেন। গ্রীস জয় করার পর তিনি তাই মল্টাদ্বীপ আক্রমণ ক্রমাগত পিছিয়ে দিয়ে ভুল করেন। ফলে রমেলও পুরো সাহায্য পেলেন না। এ-দেশের মোগল-পাঠান রাজাদের বেলাও তাই। নৌবাহিনীর সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ছিল না বলে তাঁরা ইংরেজকে অবহেলা করেন। ফলে ভারতবর্ষ সমুদ্রপথে বিজিত হয়।

বরনী লিখছেন, 'এই শেষকালে যদি হুজুর হঠাৎ তাঁর নীতি বদলান তবে হয় তো আরো বিপর্যয়ের সৃষ্টি হবে ভেবে আমি নীরব থাকাটাই যুক্তিযুক্ত বলে মনে করলুম।'

এদিকে দিল্লিতে বসে তুগলুকের প্রধান মন্ত্রী পড়েছেন মহাবিপদে। হুজুরের কোনো খবর নেই। রাণ থেকে তো দূত পাঠানো যায় না, যে দিল্লি আসবে। দূত আর তার পার্টি পথে জল পাবে কোথায়? পিছনপানে অবশ্য মৃত্যু—সম্মুখ দিকে তবু বাঁচবার আশা আছে। কাজেই দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে, হুজুরের কোনো খবর নেই। প্রধান মন্ত্রীর ভয়, খবরটা রটে গেলে তুগলুকের কোনো আত্মীয় বা অন্য কোনো দুঃসাহসী রাজা মরে গেছেন এই সংবাদ রটিয়ে কিছু সৈন্যসামন্ত যোগাড় করে দিল্লির তখতে না বসে যায়। রাজকোষ তখন তার হাতে এসে যাবে এবং ফলে সে আরো সৈন্য সংগ্রহ করে নেবে। হুজুর যখন ফিরে আসবেন তখন তাঁর সঙ্গের সৈন্যদল পরিশ্রান্ত ক্লান্ত। হুজুর তখন লড়াই দেবেন কি করে? প্রধান মন্ত্রী তখন শুরু করলেন স্রেফ ধাপ্পা। হুজুর রোজ সকালে যে ঝরোকায় দাঁড়িয়ে দেখা দিতেন সেখানে প্রধান মন্ত্রী দাঁড়িয়ে বলতেন, 'বড় আনন্দের বিষয়, আজও হুজুরের চিঠি পেয়েছি। হুজুর বহাল তবীয়তে আছেন। শিগগীরই রাজধানীতে ফিরে আসছেন।' তারপর আঙ্গরখার (অঙ্গরক্ষা) ভিতরের জেব থেকে বগাস্ চিঠি বের করে, গভীর সম্মানের সঙ্গে সেটি চুম্বন করে উচ্চকণ্ঠে সেটি পড়ে শোনাতেন—আগাগোড়া নিছক গুল! তার পর আরো সসম্মানে চিঠিখানা চুম্বন করে পকেটে রেখে দিতেন।

প্রধান মন্ত্রী হওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। ধাপ্পা, গুল, থিয়েটারি সব রকম এলেম পেটে ধরতে হয়।

ওদিকে অশেষ ক্লেশ ভুঞ্জে হুজুর সিন্ধুনদের তীরে এসে পৌঁছলেন। তগীর কি হল আমার মনে নেই। পৌঁছেই হুজুর দিল্লি-পানে ঘোড় সওয়ার রওনা করলেন। তারা দিল্লি পৌঁছলে প্রধান মন্ত্রীর ধড়ে জান এল।

হুজুর আর কচ্ছের রাণ ধরে দিল্লি ফিরলেন না। স্থির হল, নৌকায় করে সিন্ধু উজিয়ে উজিয়ে তারই উপনদী দিয়ে লাহোর পৌঁছবেন। উত্তম ব্যবস্থা। ইতিমধ্যে রোজার মাস বা রমজান এল। হুজুর বললেন, 'উপোস করবো।' আমীর-ওমরাহ বললেন, 'হুজুর একে অসুস্থ, দুর্বল। তদুপরি ভ্রমণকালে উপবাস করা ইচ্ছাধীন—কুরান শরীফের আদেশ।' হুজুর তেড়ে বললেন, 'যে মুসাফিরীতে (ভ্রমণে) তকলীফ হয় আল্লাতালা সেইটের কথাই বলেছেন। আমরা তো যাচ্ছি আরামসে নৌকায় শুয়ে শুয়ে। আমি উপোস করবোই।'

পুনরায় গোঁ। তর্ক করবে কে? মুহম্মদ তুগলুকের সঙ্গে শাস্ত্র নিয়ে তর্ক করবার মত এলেম কারো পেটে ছিল না। (আরেক ধনুর্ধর পণ্ডিত ছিলেন ঔরঙ্গজেব।)

কয়েকদিন পরে ধরা পড়ল একটি চমৎকার মাছ। কিন্তু এ জাতের মাছ দিল্লিবাসীরা কখনো দেখেন নি। তারা বললেন, 'যে মাছ চিনি নে সেটা খাব না।' হুজুর বললেন, 'কুরান, হদীস কোনো শাস্ত্রে এ জাতীয় মাছের বর্ণনা দিয়ে খেতে যখন বারণ করা হয় নি তখন আমি ইটি খাবই।' আবার গোঁ।

খেলেন। দারুণ তেলওলা মাছ ছিল। হুজুরের শরীরও ছিল রোগা, রাগের ধকলে দুর্বল। পেট ছাড়লো। কিছুতেই বন্ধ হয় না। বোধ হয় তৃতীয় দিনে হুজুর ইন্তিকাল করলেন, অর্থাৎ পটল তুললেন।

ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন লিখছেন, 'এই প্রকারে হুজুর তাঁর অবাধ্য প্রজাকুলের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে রক্ষা পেলেন; প্রজাকুলও হুজুরের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বাঁচলো!'

* * *

আমি বঙ্গসন্তান। মাছের নামে অজ্ঞান। আমার মনে প্রশ্ন জাগলো, বাদশা-সালামৎ কি মাছ খেয়ে শহীদ হলেন!

বরনী, মিবাৎ দিয়েছেন মুসলিম চান্দ্র মাসের হিসাবে তুগলুকের মৃত্যুদিবস। তার থেকে কোন্ ঋতুতে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ধরা যায় না। বিস্তর ক্যালেণ্ডার ঘেঁটে যোগবিয়োগ করে বের করলুম ঋতুটি।

আমার এক সিন্ধী দোস্ত আছেন, ইতিহাসে তাঁর বড্ড শখ। তার বাড়ি গিয়ে তাঁকে শুধালুম।

তিনি বললেন, 'নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, পাল্লা মাছ।'

* * *

গঙ্গা উজিয়ে যেটা আসে বা একদা আসতো, সেটা ইলিশ—হিল্‌সা। নর্মদা উজিয়ে ঐ মাছটা যখন আসে তখন ব্রোচের (broach—ভৃগুকচ্ছ) লোক এটাকে বলে মদার, পার্সীরা বলে বিম্। সিন্ধু উজলে এই মাছকেই বলে পাল্লা।

অনেকেই অনেক কিছু চড়ে স্বর্গে যান, ঐরাবত, পুষ্পকরথ, কত কি?

শাহ-ইন্-শাহ বাদশা-সালামৎ মুহম্মদ তুগলুক শাহ ইলিশ চড়ে স্বর্গে গেলেন। স্বর্গে যাবেন না তো কোথায় যাবেন? ইলিশ খেয়ে যে প্রাণ দেয় সে তো শহীদ—মার্টার।

দর্শনাতীত

ছন্নের মত ঘুরে বেড়াচ্ছি বিরাট বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডরে। সবে এসেছি 'ত্যাশ' থেকে—হাইকোর্টটি দেখিয়ে দেবার মতও কোনো থাটাশকে পাচ্ছি নে। কিন্তু রমণীজাতি দয়াশীলা—বেদরদীরা বলে হরবকৎ শিকার-সন্ধানী—আমার সঙ্গে কথা কইলে নিজের থেকে। আমি তখন বিবর্ণ বিস্বাদ বদখদ কোন এক মাংস, তদধিক বিজাতীয় হর্স-ক্যাবেজ (সচরাচর এ বস্তু ঘোড়া ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের দেওয়া হয়) খাবার চেষ্টা করছি, চোখের জলে নাকের জলে। সব শুনে বললে, 'দর্শন? তাহলে শ্মিটকে মিস্ করো না; বুড়ার বয়স আশী পেরিয়ে গেছে, কখন যে পটল তুলবে (জর্মনে বলে 'আপজেগ্‌লেন') ঠিক নেই।'

পোড়ার দেশে লেকচার-রুমে সীট রিজার্ভ করতে হয়। পাগুক্ত যুবতীটি ধানী-লংকার মত এফিশেণ্ট। সাত দিন পরে প্রথম লেকচারে গিয়ে দেখি, একদম পয়লা কাতারে পাশাপাশি দু'খানা চেয়ার রিজার্ভ করে বসে আছে প্রফেসারের চেয়ার থেকে হাত আষ্টেক দূরে।

অধ্যাপক এলেন ঘণ্টা পড়ার মিনিট পাঁচেক পরে। বয়েস আশী না, মনে হবে সোয়া-শো—যেভাবে আস্তে আস্তে পা ফেলে ফেলে ঘরে ঢুকলেন। ইয়া বিরাট লাশ। ফ্রলাইন উরজুল লাফ দিয়ে এগিয়ে গেলেন তাঁর দিকে। বুড়ো রোষকষায়িত লোচনে তাঁর দিকে তাকিয়ে হাত দু খানা অল্প তুলে ধংলেন। উরজুল এক দিকের ওভাবকোটটা তাঁর দেহ থেকে মুক্ত করার পর তিনি অতি কষ্টে শরীরে একটু মোচড় দিলেন। এই গুহ্যতম তান্ত্রিক মুষ্টিযোগ প্রসাদাৎ তিনি তাঁর ওভারকোটের নাগপাশ থেকে মুক্তিলাভ করলেন। শেষনাগকেও বোধ হয় তাঁর বাৎসরিক খোলস থেকে মুক্ত হতে এতখানি মেহন্নৎ বরদাস্ত করতে হয় না।

ধীরে ধীরে প্ল্যাটফর্মে উঠে চেয়ারে আসন নিলেন। সচরাচর অধ্যাপকরা প্ল্যাটফর্মের নিকটতম কোণে উঠেই বক্তৃতা ঝাড়তে আরম্ভ করেন। ইনি চুপচাপ বসে রইলেন ঝাড়া পাঁচটি মিনিট। ধবধবে সাদা কলারের উপর হাঁড়িপানা তাঁর বিরাট মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি তাতে অন্তত ডজনখানেক কাটাকুটির দাগ। লেকচার আরম্ভ না হওয়া পর্যন্ত ফিস্‌ফিস্ করে কথা কইতে বারণ নেই। আমি উরজুলকে শুধালুম, 'মুখে ওগুলো কিসের দাগ?'

'ফেনসিঙের। সিনেমাতে দেখ নি, লম্বা সরু লিকলিকে তলওয়ার দিয়ে

একে অন্যের কলিজা ফুটো করার পাঁয়তারা কষে ? পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, তলওয়ার নাকের কাছে এলেও ইনি পিছু-পা তো হনই নি, মাথাটা পর্যন্ত পিছনের দিকে ঠেলে দেন নি। প্রত্যেকটি কাটাতে ক'টা স্টিচ লেগেছিল ওঁকে শুধোতে পারো।'

আমি বললুম, 'উনি না দর্শনের অধ্যাপক!'

'হ্যাঁ, কিন্তু ওঁর বাপ-পিতামো ছিলেন কট্টর প্রাশান ঐতিহ্যের পাঁড় জেনারেল গুষ্টি। তাঁদের বর্মের মত শক্ত হৃদয় ভেঙে ইনি দর্শনের অধ্যাপক হয়ে গেলেন। কৈশোরে বোধ হয় সে মতলব ছিল না। তাই ঢুঁদে ঢুঁদে ফেনসারদের চেলেঞ্জ করে এসব অস্ত্র-লেখার কলেক্‌শন্ আপন মুখে নিয়ে বাকী জীবন দর্শন পড়াচ্ছেন। তাইতে বাপ-দাদার ততোধিক মনস্তাপ যে, এমন পয়লানম্বরী তলওয়ারবাজ হয়ে গেল মেনিমুখো মেস্টার-মেলের একজন।'

আমি বললুম, 'পেন্ ইজ মাইটিয়ার দেন সর্ড!'

'ছোঃ! ভদ্রলোক জীবনে এক বর্ণ কাগজে কলমে লেখেন নি—সাত ভলুমি কেতাব দূরে থাক, এক কলমের প্রবন্ধ পর্যন্ত না। কলমই ওঁর নেই। বোধ হয় টিপসই দিয়ে—'

অধ্যাপক ছাদ-ছোঁয়া গ্যালা'রর উপর-নিচ ডান-বাঁ'র উপর চোখ বুলিয়ে আরম্ভ করলেন—ওঃ, সে কি গলা! যেন নাভিকুণ্ডলী থেকে প্রণবনাদ বেরুচ্ছে, 'মাইনে ডামেন্ উন্‌ট্ হেরেন্!'—'আমার মহিলা ও মহোদয়গণ!' তার পর দম নিয়ে বললেন, 'অন্যবারের মত এবারেও আমি রেকটরকে'—তার পর গলা নামিয়ে বিড়বিড় করে বললেও সমস্ত ক্লাসই শুনতে পেল—'আস্ত একটা গাধা—'

আমার তো আক্কেল গুড়ুম। রেকটর যিনি কিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বময় কর্তা, তাঁকে গর্দভ বলে উল্লেখ করা—তা সে বিড়বিড় করেই হোক আর রাসভ-কণ্ঠেই হোক—এ যে অবিশ্বাস্য।

অধ্যাপক বলে যেতে লাগলেন, 'রেকটরকে আমি অনুরোধ জানালুম, আমাকে এই টাম থেকে নিষ্কৃতি দিতে। অবাচীন বলে কিনা, আমাকে না হলে তার চলবে না। এ উত্তর আমি ইতিপূর্বেও শুনেছি। তার পূর্বের রেকটর—' আবার বিড়বিড় করলেন, 'বলদ, বলদ! স্রেফ বলদ—তাকেও আমি একই অনুরোধ করেছিলুম, এবং একই উত্তর পেয়েছিলুম। তার পূর্বের রেকটর—কিন্তু কাহিনী সম্প্রসারিত করার প্রয়োজন নেই—এবং তার পূর্বেরও সবাই একই উত্তর দেয়। বস্তুত, মাইনে ডামেন্ উন্‌ট্ হেরেন্, গত বাইশটি বৎসর ধরে আমি এই একই উত্তর শুনে আসছি। মনে হচ্ছে, অরিজিনালিটি রেকটর সম্প্রদায়কে

এড়িয়ে চলেন। তা সে যাক, তাদের বক্তব্য, আমাকে ছাড়া চলবে না, আমি ইনডেস্‌পেন্‌সিবল।'

এবারে তিনি স্বয়ং সিন্ধী বলদের মত ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'তবে কি সাতিশয় সন্তাপের সঙ্গে স্বীকার করতে হবে, জর্মনি এমনই চরম অবস্থায় পৌঁছেছে যে, এদেশে আর দার্শনিক নেই? কিন্তু এই আমার শেষ টার্ম। আমি মনস্থির করে ফেলেছি।' তার পর চোখ বন্ধ করে খুব সম্ভব প্রথম বক্তৃতায় প্রথম কি বস্তু দিয়ে আরম্ভ করবেন তার চিন্তা করতে লাগলেন। উরজুল আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, 'তাঁর শেষ টার্ম! এ ভয় তিনি দিচ্ছেন পঁচিশ বচ্ছর ধরে দেখাচ্ছেন—প্রতি টার্মের গোড়ায়।' বুড়ার চোখ বন্ধ হলে কি হয়, কান দিব্য সজাগ। চোখ খুলে বললেন, 'নো, আবার নো। এই আমার শেষ টার্ম—কেউ ঠেকাতে পারবে না।'

তার পর গ্রীক দর্শন নিয়ে আরম্ভ করলেন। তাঁর পড়াবার পদ্ধতি অনুকরণ করা অসম্ভব। কারণ, তাঁর পড়ানোটা সম্পূর্ণ নির্ভর করত তাঁর স্মৃতিশক্তির উপর। সে স্মৃতিশক্তি বিধিদত্ত। কোন্ সালের, কোন্ বইয়ের, কোন্ অধ্যায়ে, এমন কি মাঝে মাঝে কোন্ পাতায় কি তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে সেগুলো বলে যেতে লাগলেন কোনো প্রকারের নোট না দেখে। প্রত্যেকটি সেন্টেন্স স্বয়ংসম্পূর্ণ। ভাষা সরল। এবং মাঝে মাঝে প্লাতো, আরিস্ততল বোঝাতে গিয়ে হঠাৎ মারেন দু'হাজার বছরের ডুব-সাঁতার। এ যুগের কে তার সর্বোত্তম ব্যাখ্যা করেছেন, কোথায়, কোন্ পারচ্ছেদে—তার সবিশদ বর্ণন। আমি হতভম্ব।

ঘন্টা পড়তে আস্তে আস্তে উঠলেন। ফ্রলাইন উরজুল তাঁকে পুনরায় ওভার-কোট পরিয়ে দিলেন। ধীরে মন্থরে করিডরে নামলেন।

আমি উরজুলকে বললুম, 'এ কী কাণ্ড! গণ্ডাখানেক রেকটরকে ইনি গাধা-বলদের সঙ্গে—?'

'ওঃ! এঁরা সবাই এসব জানেন। এঁরা সবাই তাঁর ছাত্র।'

'ওকে ছুটি দেয় না কেন?'

'সক্কলেরই বিশ্বাস, সঙ্গে সঙ্গে তিনি পাল তুলবেন বলে। মাধ্যাকর্ষণ নয়, দর্শনাকর্ষণ তাকে ইহলোকে আটকে রেখেছে।'···

এখানে রোল-কল হয় না। টার্মের গোড়াতে ও শেষে আপন আপন 'স্টুডেন্টস বুকে' অধ্যাপকের নাম দু'বার সই করিয়ে নিতে হয়।

গোড়ার দিকে ভিড় ছিল বলে হাল্কা হলে পর আমি আমার 'বুক' নিয়ে পাতলুম। এযাবৎ অন্য কারো সঙ্গে তিনি বাক্যবিনিময় করেন নি। আমাকে

দেখে চেয়ারে আরামসে হেলান দিয়ে বললেন, 'আঃ! বাঃ বাঃ! তার পর? আচ্ছা। বলুন তো আপনি কি জর্মন বেশ বুঝতে পারেন?'

আমি বললুম, 'অল্প, অল্প।'

'বেশ, বেশ। তা—তা, আপনি কোন্ দেশ থেকে এসেছেন?'

'ইণ্ডিয়া।'

কেন যে এতখানি তাজ্জব হয়ে তাকালেন বুঝতে পারলুম না। বললেন, 'ইণ্ডিয়া? কিন্তু ইণ্ডিয়াই তো দর্শনের দেশ। আপনি এখানে এলেন কেন?'

আমি সবিনয় বললুম, 'নিশ্চয়ই, কিন্তু আধুনিক দর্শনে জর্মনির সেবা ও দান তো অবহেলার বিষয় নয়।'

কী আনন্দে, কী গর্বে অধ্যাপকের সেই কাটাকুটি-ভরা মুখ যে প্রসন্ন হাস্যে ভরে গেল, সেটি অবর্ণনীয়। শুধু মাথা দোলান আর বলেন, 'বস্তুত তাই, প্রকৃতপক্ষে তাই।'

এবারেও যখন তিনি 'আপনি' বলে সম্বোধন করলেন তখন আমি যেন 'তুমি' শুনতে পেলুম। তাঁর বিরাট সাদা মাথাটা আমার দিকে ঠেলে কাছে এনে বেদনা-ভরা গলায় বললেন, 'কিন্তু জানো, ভারতীয় দর্শন—অবশ্য সব দর্শনই দর্শন—শেখবার সুযোগ আমি পাই নি। ব্যাপারটা হয়েছে কি, আমার যৌবনে ভারতীয় দর্শনের জর্মন-ইংরিজি অনুবাদ পড়তে গিয়ে দেখি সব পরস্পরবিরোধী বাক্যে পরিপূর্ণ। আমি বললুম, "এ কখনই হতে পারে না। ভারতের জ্ঞানী ব্যক্তিরা এরকম কথা বলতে পারেন না। যাঁরা অনুবাদ করেছেন তাঁরা কতখানি জর্মন জানেন জানি নে, কিন্তু দর্শন জানেন অত্যল্প, এবং ভারতীয় দর্শনে তাঁদের অপরিচিত যে দৃষ্টিভঙ্গি, দৃষ্টিকোণ সেটা আদৌ বুঝতে পারেন নি।" ছেড়ে দিলুম পড়া, বিরক্তিতে। কিন্তু জানো, বছর দশেক পূর্বে আমার ছাত্র—' তিনি রেকটরের নাম করলেন—'অমুক—ভারী ব্রিলিয়ান্ট ছেলে—আমাকে বললে, এখন নাকি কম্পিটেন্ট অনুবাদ বেরুচ্ছে। কিন্তু ততদিনে আমি বড্ড বুড়িয়ে গিয়েছি। নূতন করে নূতন "স্কুলে" যাবার শক্তি নেই। বড় দুঃখ রয়ে গেল।'

আমি একটু ভেবে যেন সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, 'তার জন্য আর অত ভাবনা কিসের, স্যর? হিন্দুরা পরজন্মে বিশ্বাস করে। আপনি এবারে জন্ম নেবেন কাশীর কোন দার্শনিকের ঘরে।'

এবারে তাঁর যে কী প্রসন্ন অট্টহাস্য! শুধু বলেন, 'ঐ তো! ঐ তো! বাঃ, বাঃ! বেশ, বেশ। যাক, শেষ দুশ্চিন্তা গেল।'

তারপর শুধালেন, 'বক্তৃতা সব বুঝতে পারো তো?'

আমি বললুম, 'আজ্ঞে, জর্মন ভালো জানি নে বলে মাঝে মাঝে বুঝতে অসুবিধে হয়।'

অধ্যাপক বললেন, 'তখন হাত তুলো; আমি সব ভালো করে বুঝিয়ে বলবো।'

আমি কাঁচু-মাচু হয়ে বললুম, 'আমার জর্মন জ্ঞানের অভাববশত সমস্ত ক্লাস সাফার করবে—এটা কেমন যেন–'

গুরু গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বললেন—প্রত্যেকটি শব্দ যেন আমার বুকের উপর হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে ঠুকে—'আমি একশজনকে পড়াবো না একজনকে পড়াবো, কাকে পড়াবো আর কাকে পড়াবো না, সেটা স্থির করি একমাত্র আমি।'

* * *

আমার দুর্ভাগ্য, আমি খুব বেশী দিন তাঁর কাছ থেকে শিক্ষালাভের সুযোগ পাই নি। পরের টার্মেই তিনি ওপারে চলে যান।

তার পর প্রায় ৩৫ বৎসর কেটে গিয়েছে।

আমার ব্যক্তিগত সংস্কার যে, সৃষ্টিকর্তা মানুষকে পৃথিবী নামক জায়গাটিতে একবারের বেশী দু'বার পাঠান না। একই নিষ্ঠুর স্থলে একাধিকবার পাঠিয়ে একই দণ্ড দেওয়ার মধ্যে কোনও বৈদগ্ধ্য (রিফাইনমেণ্ট) নেই। তবু যখন কোনো যুবাজনের মুখে ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা শুনে মনে হয়, এ-তরুণ এর কিছুটা গভীরে ঢুকতে পেরেছে, তখন আপন অজান্তে তার চেহারায় জর্মনগুরুর বিরাট কাটাকুটি-ভরা, হাঁড়াপানা চেহারার সাদৃশ্য খুঁজি॥

মা-মেরীর রিস্ট-ওয়াচ

একদা রম্য রচনা কি রীতিতে উত্তমরূপে লেখা যায়, এই বাসনা নিয়ে কলেজের ছেলের বয়সীরা আমাকে প্রশ্ন শুধাতো; অধুনা শুধোয়, ঐতিহাসিক উপন্যাস কি প্রকারে লেখা যায়? আমি বাঙালী, কাজেই বাঙালীর স্বভাব খানিকটে জানি—পাচু, ভূতো আর পাচজন যে ব্যবসা করে—যথা পাব্লিশিং হাউস কিংবা লণ্ড্রী—পয়সা কামিয়েছে, সে সেইটেই করতে চায়, নূতন ব্যবসার ঝুঁকি নিতে সে নারাজ। অতএব হাল-বাজারে যখন ঐতিহাসিক উপন্যাস ছেড়ে দিয়ে কালোবাজারের চেয়েও সাদা-বাজারে লাভ বেশী, তবে চলো ঐ লালকেল্লা ফতেহ্ করতে; মা-মেরীতে বিশ্বাস রাখলে কড়ি দিয়েও কিনতে হবে না,

সায়েবের মুন্‌শীও ঐ আশ্বাস দিয়েছেন।

যাঁরা পণ্ডিত লোক, ইতিহাস জানেন ও উপন্যাস লেখার কায়দাটাও যাঁদের রপ্ত আছে, তাঁরাই ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতে পারেন। আমি ও আমার মত আর পাঁচজন পারে না, আমরা পণ্ডিত নই। কিন্তু পণ্ডিত না হয়েও দিব্য বুঝতে পারি, ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতে যাওয়ার বিপদটা কি?—পাখীর মত উড়তে না জেনেও চমৎকার বুঝতে পারি মনুমেণ্টের উপর থেকে লাফ দিয়ে পাখীর মত ওড়বার চেষ্টা করলে হালটা মোটামুটি কি হবে।

এই তো হালে একটি সাপ্তাহিকের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে অলস নয়নে পড়লুম, 'তুমি ওমরাহ নও।'

সর্বনাশ! এটা কি প্রকার হল? 'ওমরাহ' তো 'আমীরে'র সাদামাটা বহুবচন—যে রকম 'গরীব' থেকে 'গুর্‌বাহ'; তাই বলি 'গরীব-গুর্‌বো'। সেই আইনেই বলি 'আমীর-ওমরাহ' ('আমীর-ওমরো'ও শুনেছি; আকারান্ত শব্দ বাঙলায় 'এ' 'ও'-তে আকছারই পরিবর্তিত হয়, যেমন 'ফিতে' 'জুতো'—এর কোনো পাকা নিয়ম নেই)। আরবী বা ফার্সী শব্দের একবচন এবং বহুবচন পাশাপাশি বসিয়ে আমরা অনেক সময় বাঙলায় কালেকটিভ নাউন তৈরি করি—যেমন 'আমীর-ওমরাহ্‌' অর্থাৎ 'আমীরসম্প্রদায়' কিংবা 'গরীব-গুরবো' 'দীনসম্প্রদায়' 'দীনজন'। তা সে যাই হোক, 'ওমরাহ' কথাটা বরহক্ বহুবচনেই আছে। কাজেই যে রকম আপনি 'আমীরসম্প্রদায় নন' ব্যাকরণে ভুল, তুমি 'ওমরাহ্‌ নও' ভুল।

(ঠিক সেই রকম 'আলিম্‌' পণ্ডিতের বহুবচন 'উলেমা'—জমিয়ৎ-ই-উলাম-ই-হিন্দ; অনেকেই না জেনে ইংরিজীতে লেখেন ulemas।)

কাজেই প্রথম চোরাবালি শব্দ নিয়ে। ঠিক ঠিক অর্থ না জানলে আমাদের মত অপণ্ডিত জন খায় মার। ঠিক সেই রকম গুপ্তযুগের উপন্যাস লিখতে গিয়ে না ভেবে ফুটিয়ে দিলুম রজনীগন্ধা, কৃষ্ণচূড়া—শব্দ দুটো থেকে বিশেষ করে যখন সংস্কৃতের সুগন্ধ বেরিয়েছে—অথচ দুটো ফুলই এদেশে এসেছে অতি হাল আমলে। এবং শুধু শব্দার্থ জানলেই হয় না—রূঢ়ার্থে তার ব্যবহার জানতে হয়। তসবী[১]-

[১] কত না হস্ত চুমিলাম আমি
তসবীমালার মত,
কেউ খুলিল না কিস্মতে ছিল
আমার গ্রন্থি যত।

খানা কথাটির দুটো শব্দই আমরা চিনি—যে ঘরে বসে বাদশা তসবীমালা জপ করেন। মোগল আমলে কিন্তু ঐ ঘর ছিল অতিশয় গোপন (top secret) মন্ত্রণালয়।

কেউ যদি লেখেন 'অতঃপর সম্রাট ঔরঙ্গজেব সমস্যা সমাধানের জন্য সমস্ত রাত কুরান শরীফ ঘেঁটেও কোনো হদীস পেলেন না', তবে বাঙালী পাঠক এ-বাক্যে কোনো দোষ পাবেন না। কারণ হদীস বা হদিশ বলতে বাঙ্গালা পাঠক প্রিসিডেন্স বা পূর্ব উদাহরণ বোঝে। কিন্তু কুরানে হদীস খোঁজা আর বেদে মনুসংহিতা খোঁজা একই রকমের ভুল। কুরানে আছে পয়গম্বরের কাছে প্রেরিত ঐশী বাণী—আপ্তবাক্য। আর হদীসে আছে পয়গম্বর কি ভাবে জীবন যাপন করতেন, কাকে কখন কি করতে আদেশ বা উপদেশ দিয়েছিলেন ইত্যাদি (এগুলোও অতিশয় মূল্যবান—কিন্তু আপ্তবাক্য নয়)। কাজেই এগুলোর (হদীসের) সন্ধান কুরানে পাওয়া যাবে কি করে ? বস্তুত কোনো অর্বাচীন সমস্যা ও তার সমাধান কুরানে না পেলে আমরা হদীসে (শাস্ত্রে 'স্মৃতি'র সঙ্গে তুলনীয়) যাই। সেখানে না পেলে ইজমাতে এবং সর্বশেষে কিয়াসে। কিন্তু শেষের দুটো স্মৃতিশাস্ত্রের গভীরে—ঐতিহাসিক উপন্যাসে প্রতিবিম্বিত হওয়ার সম্ভাবনা অত্যল্প। তা সে যাই হোক, মুসলমান ধর্ম সম্বন্ধে যে কিছুটা জ্ঞান বাঞ্ছনীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কিন্তু তার চেয়েও বেশী প্রয়োজন, মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে পরিচয়। ঐতিহাসিক উপন্যাসে সেটা প্রধানত বিস্ময়বোধক বাক্যে। তুলনা দিয়ে বলতে পারি, ফরাসী উপন্যাসের ইংরিজী অনুবাদে 'মঁ দিয়ো' 'পার ব্ল্য' 'ভাত্র ব্ল্য'-গুলো ইংরেজ ফরাসীতেই রেখে দেয় ; জর্মন উপন্যাসের অনুবাদে 'মাইন গট্' 'হ্যার গট্' 'ডনার ভেটার' মূলের মত রেখে দেয়। এগুলোর অনুবাদ সম্পূর্ণ অসম্ভব নয়। অবশ্য স্মরণ রাখা উচিত, মঁ দিয়ো, মাইন গট্ এবং মাই গড একই জিনিস, একই বাক্য হলেও ইংরেজের পক্ষে 'মাই গড' বলা নিন্দনীয় ; নিতান্ত বিপাকে না পড়লে ইংরেজ 'মাই গড' বলে না। পক্ষান্তরে ফরাসী জর্মন কথায় কথায় 'মঁ দিয়ো' 'মাইন গট্' বলে থাকে। তাই ইংরিজী অনুবাদের সময় মূলের আবহাওয়া রাখবার জন্য অনুবাদক এগুলো অনুবাদ করেন না।

অলহমদুলিল্লা, মাশাল্লা, ইয়া আল্লা, তওবা তওবা, বিসমিল্লা এগুলো অবস্থা-

অর্থাৎ তসবীমালা জপ করে এক সাধু অন্য সাধুর হাতে তুলে দেন, কিন্তু কেউই দয়া করে মালার সুতোটি কেটে মুক্তোগুলোকে মুক্তি দেন না।

ভেদে ব্যবহৃত হয়। 'আপনার ছেলে এম-এ পাস করেছে? তওবা তওবা!' (বা তোবা তোবা।) বললে যে ভুল হয় সেটা সাধারণ জনও বোঝে। তাই এসব বাক্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে অনেকটা কারো প্রথম বংশধর জন্মালে আপনি যদি উচ্চকণ্ঠে 'বল হরি, হরিবোল বলে ওঠেন' তা হলে যেরকম হয়! এসব ভুল সাধারণ সামাজিক উপন্যাসে থাকলে পাঠক শুধু একটুখানি মুচকি হাসে, কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাস যিনি লেখেন তাঁর কাছ থেকে পাঠক একটু বেশী প্রত্যাশা করে।

'শার্ঙ্গদেবে'র মত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের গভীরে যাঁরা গিয়েছেন তাঁরাই জানেন, পাঠান-মোগল যুগের সঙ্গীত তথা এদের আগমনের পূর্বে ভারতীয় সঙ্গীতের প্রকৃত স্বরূপ কি ছিল; এ নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন তাঁদের কতখানি ফার্সী ভাষার সঙ্গে পরিচিত হবার প্রয়োজন। ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের অতখানি ফার্সী জানার প্রয়োজন নেই, কিন্তু তিনি যদি রানী রিজিয়ার দরবারে সেতার বাজাতে আরম্ভ করেন তবে বোধ হয় সঙ্গীতজ্ঞদের অনেকেই আপত্তি জানাবেন। আমি বিশেষজ্ঞ নই, তাই পণ্ডিতেরা যখন কিছু বলেন তখন সেটা মনে রাখবার চেষ্টা করি। মৌলানা আজাদ আমাকে বলেন, 'সেতার তৈরি কবেন আমীর খুসরো। এটা বীণার অনুকরণে তৈরি, কিন্তু বীণার চেয়ে সহজ।'

আমি উত্তরে বললুম, 'আমি আরেক পণ্ডিতের কাছে শুনেছি, বাদ্যযন্ত্র-নির্মাতার পক্ষে সেতার-নির্মাণ বীণার চেয়ে কঠিনতর। কিন্তু বাজানেওলার পক্ষে সেতার বাজানো সহজতর। ঐ পণ্ডিত আমাকে বলেন, "অনেক সময় যে জটিল বাদ্যযন্ত্র নির্মাণ করা হয় সেটা বাজানেওলার পক্ষে বাজানো সহজ করে দেবার জন্য"।' (শার্ঙ্গদেব হয়তো খাঁটি খবর রাখেন।)

এসব ঝামেলার মাঝখানে পাঠান বা মোগল দরবারের গানের মজলিস বর্ণনা করা যে বিপদসঙ্কুল, সে কথা পাঠকমাত্রেই বুঝতে পারবেন।

ঠিক তেমনি মোগল আমলের ফিস্টির বর্ণনা। কোরমা, কালিয়া, কোফ্‌তা কবাব (শিক্-কবাব প্রাক-মুসলিম যুগেও ছিল—শূল্যপক্ব মাংস—কিন্তু সেটা আঁকাবাঁকা শিকের ভিতর ঢুকিয়ে করা হত, না শূলের ডগায় ঝুলিয়ে ঝলসানো হত, তা জানি নে,) যে সব কটাই যাবনিক খাদ্য তা জানি, কিন্তু মোগল ফিস্টিতে বাঁধাকপির পাতার ভিতর কিমা দিয়ে যে দোলমা তৈরি হয়, সেটা কি চলবে? কপি জাতীয় জিনিস এদেশে এল কবে? এমন কি যে সিম জিনিসটা ঘরোয়া বলে মনে হয় সে সম্বন্ধেও একখানি চিরকুটে দেখি ঋষিতুল্য দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন শাস্ত্রীকে শুধোচ্ছেন, 'সংস্কৃতে আপনি সিম জিনিসটার

উল্লেখ পেয়েছেন কি ?'

মোগল ছবিতে তাদের জামাকাপড় গয়নাগাঁটি পরিষ্কার দেখতে পাই। কিন্তু সব কটার নাম তো জানি নে। মা-দুর্গার নাকের নথ দেখে দ্বিজেন্দ্রনাথ চিত্রকারকে শুধান, 'নথ কি মুসলমান আগমনের পূর্বে ছিল ?'

কিন্তু আপত্তি কি ? গদাযুদ্ধে নামার সময় ভীমের পকেটে যদি ফাউণ্টেনপেন দেখা যায়, তবে কী আপত্তি ! জেরুজালেমের এক মেরী মূর্তির বাঁ-কব্জিতে দেখি, ছোট্ট দামী একটি রিস্টওয়াচ ! ভক্তের চোখে মা-মেরীর বাঁ-হাতখানা বড্ড ন্যাড়া-ন্যাড়া দেখাচ্ছিল, তাই। জানি নে, বারোয়ারি দুর্গাপূজোয় মা-দুর্গা নাইলন পরতে আরম্ভ করেছেন কি না !

অনুবাদ সাহিত্য

কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করছি, অনুবাদ যে অনুবাদ সেটা স্বীকার করতে প্রকাশক, সম্পাদক, স্বয়ং লেখকেরও কেমন যেন একটা অনিচ্ছা। কেন, এ প্রশ্ন শুধাতে একজন প্রকাশক সোজাসুজি বললেন, 'বাঙালী অনুবাদ পড়তে ভালবাসে না, তাই অসাধু না হয়ে যতক্ষণ পারি ততক্ষণ তথ্যটা চেপে রাখি।' কিছুকাল পূবে আমিও একটি বড়-গল্প অনুবাদ করি ও তার প্রথম বিজ্ঞাপনে সেটি যে অনুবাদ সে কথা প্রকাশিত হয় নি। আমি সেই সম্পাদককে বেনিফিট অব্ ডাউট দিয়ে মনকে সান্ত্বনা দিচ্ছি এই বুঝিয়ে যে, দ্বিতীয় বিজ্ঞাপনে এই গাফিলতি মেরামত করা হবে। ঐ সময়ে আমারই সহকর্মী (কারণ দু'জনাই 'দেশ'-সেবক, এবং তিনি অন্যার্থেও) শ্রীযুত বিদুর ঐ নিয়ে কড়া মন্তব্য করে যা বলেন তার নির্যাস, যত বড় লেখকই হোন না কেন, তিনি যদি অনুবাদ-কর্ম করেন তবে সেটা যেন পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়। অতিশয় হক্ কথা। তবে এটা আমি গায়ে মাখছি নে, কারণ আমি 'যত বড়' কেন অ্যাটুটুন বড় লেখকও নই। আমি বরঞ্চ গোড়াতেই চেয়েছিলুম যে ফলাও করে যেন বলা হয়, এটি অনুবাদ। এবং সেই মূল প্রখ্যাত লেখকের অনুবাদ প্রসাদাৎ তাঁর সঙ্গ পেয়ে আমিও কিছুটা খ্যাত হয়ে যাবো—'রাজেন্দ্র সংগমে, দীন যথা যায় দূর তীর্থ-দরশনে।'[১] কিংবা কালিদাস রঘুবংশের অবতরণিকায় যে কথা বলেছেন—বজ্র কর্তৃক মণি সছিদ্র

১ এই সুবাদে একটি ঘটনার কথা মনে পড়লো। গুরুদেব আমাকে কয়েক পাতা প্রুফ মেরামত করতে দেন। সেটা তৈরী হলে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে

হওয়ার পর আমি স্যুতো সুরুৎ করে বেতক্‌লিফ উৎরে যাবো।

এবং এস্থলে এটাও স্মরণ রাখা উচিত, কালিদাস বা মধুসূদন কেউই বাল্মীকির আক্ষরিক কেন, কোনো প্রকারেরই অনুবাদ করেন নি। সম্পূর্ণ নিজস্ব, মৌলিক কৃতিত্ব দেখিয়েও এঁরা অতখানি বিনয় দেখিয়েছেন। মডার্ন কবিতা যে আমার পিত্তি চটিয়ে দেয়, তার অন্যতম কারণ এঁদের অনেকেরই অভ্রংলিহ দম্ভ। 'আধুনিক' গাওয়াইদের কণ্ঠেও সেই স্বর শুনতে পাই। আর মডার্ন পেন্‌টাররা কি করেন—অন্তত তাঁদের দু'জনার ব্যবহার সম্বন্ধে তো অনেক কথাই বেরিয়েছে।

কিন্তু সেকথা থাক। আমাব প্রশ্ন, অনুবাদ পড়তে বাঙালী ভালবাসে না কেন?

আমার কিন্তু কথাটা কেন জানি বিশ্বাস কবতেই ইচ্ছে যায় না।

বাংলা ভাষার কচিকাঁচা যুগে কালীপসন্ন সিংহ মহাভারতের অতি বিশুদ্ধ আক্ষরিক অনুবাদ করেন। আজ পর্যন্ত যে তার কত পুনর্মুদ্রণ হল তার হিসেব হয়তো আজ বসুমতীই দিতে পারবেন না। পাঠকদের শতকরা ক'জন নিছক পুণ্য-সঞ্চয়ার্থে এ অনুবাদ পড়েছে? এমন কি রাজশেখর বসুর অনুবাদও—যদিও একটি বারো বছরের ছেলেকে বলতে শুনেছি, 'ঐ বসুমতীরটাই ভালো। বেশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে লেখা—ধীরেসুস্থে পড়া যায়। রাজশেখর বাবুরটায় বড্ড ঠাসাঠাসি।' 'বেতালপঞ্চবিংশতি' 'বত্রিশ সিংহাসন' এ যুগের ছেলেমেয়েরাও তো গোগ্রাসে গেলে। (বিষ্ণুশমার 'পঞ্চতন্ত্রে'র আরবী অনুবাদ ইরাক থেকে মরক্কো পর্যন্ত আজও 'আরব্য রজনী'র সঙ্গে পাল্লা দেয়।) ঈশান ঘোষের জাতক জনপ্রিয় হওয়ার পূর্বেই বাজার থেকে উধাও হয়ে গেল—(পরম পরিতাপের বিষয় যে এখনো তার পুনর্মুদ্রণ হল না) অথচ তার থেকে নেওয়া বাচ্চাদের জাতক তাদের ভিতর খুব চলে। জ্যোতিঠাকুরের সংস্কৃত নাটক ও ফরাসী কথা-সাহিত্যের অনুবাদ এককালে বিদগ্ধ বাঙালীই পড়তো। ওদিকে এসবের বহু পূর্বে আলাওল অনুবাদ করলেন—যদিও আক্ষরিক নয়—জয়সীর 'পদুমাবৎ'। এবং তার পর,

---

গিয়ে দেখি তিনি ৺ক্ষিতিমোহন ও ৺বিধুশেখরের সঙ্গে গল্প করছেন। আমি থামের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে শুনি, তিনি বলছেন, 'বনমালী (কিংবা সাধুও হতে পারে, কিন্তু সে গুরুদেবের সঙ্গে ছিল অল্প দিন) তো গেল আমার সঙ্গে এলাহাবাদ। আমি বললুম, "ওরে বনমালী, প্রয়াগে এসেছিস; স্নান করে নিস্।" কিন্তু মশাই কি বলবো, সে ও-পাশই মাড়ালো না। বোধ হয়, আমার সঙ্গে থেকে থেকে দেবদ্বিজে ওর আর ভক্তি নেই। কিংবা ঐ ধরনেরই।' মাইকেলের কথা তা হলে সব সময়ে ফলে না।

পর পর বেরুলো 'ইউসুফ-জোলেখা', 'লায়লা-মজনু' ইত্যাদি। মোল্লার বাড়িতে এবং পূব-বাঙলার খেয়াঘাটে, বটতলায় এখনো তাদের রাজত্বের অবসান হয় নি। ওদিকে কাশীরাম, কৃত্তিবাস। 'আরব্যোপন্যাস', 'হাতিমতাই', 'চহারদরবেশ' উনবিংশ শতাব্দীতেই বাঙলা দেশে নাম করেছে। তারপর 'রবিনসন ক্রুসো', 'গালিভার্স ট্রেভল' এবং ফরাসী থেকে 'লে মিজেরাবল' এদেশে কী তোলপাড়ই না সৃষ্টি করলো।

আমি অতি সংক্ষেপে সারছি। কিন্তু আমার বয়েসী কোন্ পাঠক 'তীর্থসলিল' 'তীর্থরেণু'র কথা ভুলতে পারবেন? সত্যেন দত্ত অনুবাদের যাদুকর। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সত্যেন দত্তের শোকসভাতে বলেছিলেন, 'যে-দিন দেখলুম সত্যেন আমার চেয়ে ঢের ভালো অনুবাদ করতে পারেন ও ছন্দের উপর তাঁর দখল আমার চেয়ে অনেক বেশী, সেই দিনই অনুবাদ-কর্ম থেকে অবসর নিলুম। তারপর ভাল কবিতা চোখে পড়লেই সত্যেনকে অনুবাদ করতে বলতুম।' (এস্থলে যদিও অবান্তর তবু স্মরণে আনি, রবীন্দ্রনাথ নিজের মৌলিক রচনা কিছুক্ষণের জন্য ক্ষান্ত দিয়ে সত্যেন দত্তের 'চম্পা' কবিতাটির ইংরেজি অনুবাদ করেন।)

আর বর্তমান যুগের হীরেন দত্ত মশায়ের 'তিন সঙ্গী' যাঁরাই পড়েছেন, তাঁরাই স্বীকার করবেন, এরকম অনবদ্য অনুবাদ হয় না।

এর একটু তথাকথিত 'নিম্নপর্যায়ে' নামলেই দীনেন্দ্রকুমারের 'রহস্যলহরী'। বাংলাদেশের হাজার হাজার নারী-নরকে এঁর অনুবাদ আনন্দ দিয়েছে। দীনেন্দ্র-কুমার লিখতেন অতি সরল, ছলছল-গতির বাংলা—পাঠককে কোনো জায়গায় হোঁচট খেতে হত না। তাঁর মৌলিক গ্রন্থ 'পল্লীচিত্র'—নামটি আমার ঠিক মনে নেই—পড়লে তাঁর বাংলা-শৈলী ও ভাষার সরলতা ও আপন বৈশিষ্ট্য পাঠককে আরাম ও চমক দুই-ই দেয়। (অরবিন্দ ঘোষ যখন বরোদায় চাকরি নিয়ে বাংলা শেখার জন্য গুরুর সন্ধান করেন, তখন দীনেন্দ্রকুমারকে সেখানে পাঠানো হয়। পরবর্তী যুগে যখন তিনি তাঁর অতুলনীয় মধুর বাংলায় পাঠকের কৌতূহল সদাজাগ্রত রেখে তাঁর জীবনস্মৃতি— বিশেষ করে বরোদার ইতিহাস ও শ্রীঅরবিন্দের সাহচর্য সম্বন্ধে লেখেন, তখন তিনি দুর্ভাগ্যক্রমে দু'একটি বিতর্কমূলক তথ্য বলে ফেলেন। আমার ব্যক্তিগত মতে তিনি সম্পূর্ণ সত্যভাষণই করেছিলেন। ও আমার অগ্রজ, কাঙাল হরিনাথ, দীনেন্দ্রকুমার, মীর মুশর্‌রফ হুসেন সম্বন্ধে কুষ্টিয়ায় সরজমিনে গবেষণা করে ঐ সিদ্ধান্তেই পৌঁছন। ফলে তখনকার দিনের মাসিক-সাহিত্য মহলের এক বলবান ক্লিক্ দীনেন্দ্রকুমারকে, জাস্ট হাউণ্ডেড্ হিম আউট অব বেঙ্গলী লিটারেচার। সেই অনুপম জীবনস্মৃতি শেষ করার সুযোগও তখন

তিনি পাননি। অথচ আমি যখন তাঁর লিখিত শ্রীঅরবিন্দের সহকর্মী খাসেরাও যাদব অংশ বরোদার যাদব গোষ্ঠী ও অন্যান্য মারাঠাদের অনুবাদ করে শোনাই তখন তাঁরা অশ্রুবিসর্জন করে বলেন, 'বাংলাদেশই শুধু সে যুগের মারাঠীবিপ্লবীদের স্মরণে রেখেছে। বাঙালী প্রাদেশিক, এ কুসংস্কার আমাদের ভাঙলো।' এর পর হঠাৎ যখন দীনেন্দ্রকুমারের ধারাবাহিক বন্ধ হয়ে গেল, তখনো তাঁরা উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনতে চাইলেন পরের পর্বের কথা। আমি কোন্ লজ্জায় স্বীকার করি কেন তাঁর লেখা বন্ধ হয়ে গেল।)

কোথা থেকে কোথা এসে পড়লুম ! কিন্তু এই বিষয় নিয়ে আমার বহুদিনের মনস্তাপ—আজ বেমোকায় বেরিয়ে গেল. পাঠক ক্ষমা করবেন।

আমার মনে একটা সন্দেহ জাগে। প্রাচীন যুগের সব অনুবাদই যে উত্তম ছিল, একথা ঠিক নয়। কিন্তু এঁদের বেশীর ভাগই উত্তম সংস্কৃত ও তৎকালীন প্রচলিত বাঙলা ভাষার সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। এবং পণ্ডিতজন যত বাঁকা বাংলাতেই অনুবাদ করুন না কেন, তাঁদের শব্দভাণ্ডারে দৈন্য ছিল না বলে অনুবাদ মূল থেকে দূরে চলে যেত না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কৃত পিয়ের লোতির 'ইংরেজবর্জ্জিত ভারত-' এর অনুবাদ পড়লেই পাঠক আমার বক্তব্য বুঝতে পারবেন। লোতির শব্দভাণ্ডার ছিল অফুরন্ত (উত্তর-মেরু-সমুদ্রের আলো-বাতাসের বর্ণনা দিতে গিয়ে এক জায়গায় তিনি পর পর তিনটি শব্দ দিয়েছেন, ডায়াফনাস, এফিমেরাল, কাইমেরিক—এর অনুবাদ তো দীন শব্দভাণ্ডার নিয়ে হয় না!)। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জানতেন অত্যুত্তম সংস্কৃত—ভাসের নাটক তখনো ছাপায় প্রকাশিত হয় নি বা তাঁর হাতে পৌঁছয় নি—ভাসকে বাদ দিলে তিনি সংস্কৃতের প্রায় সব নাট্য-লেখকের অনুবাদ করেছেন—তাই সে ভাষা থেকে তিনি অনায়াসে শব্দচয়ন করে মূলের বৈচিত্র্যের মর্যাদা রক্ষা করতে পারতেন। অক্ষম অনুবাদকের হস্তে সে-স্থলে অনুবাদ হয়ে যায় একেঘেয়ে—পড়তে গিয়ে পাঠকের ক্লান্তি এসে যায়।

অধুনা একাধিক যোগ্য ব্যক্তি অনুবাদ-কর্মে লিপ্ত হয়েছেন। এঁদের কেউ কেউ ইংরিজী ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। এঁরা আমার চেয়ে অনেক বেশী যুক্তিতর্ক দিয়ে প্রমাণ করতে পারেন, ইংরিজী সাহিত্য বহু ভাষা থেকে বহু বস্তু অনুবাদ করে কি ভাবে পরিপুষ্ট হয়েছে, নব নব অনুপ্রেরণা পেয়েছে, নব নব অভিযানে বেরিয়েছে—সেই আদিযুগের শুভক্ষণ থেকে।

আমি অনুবাদ করতে গিয়ে পদে পদে নিজের কাছে লাঞ্ছিত হয়েছি। এই লেখাটি তারই অভিজ্ঞতাপ্রসূত।

বাবুর শাহ্

এদেশে তিন রকমের ইংরেজ এসেছিল। বড় দলের কাজ ছিল পৃথিবীর সামনে আমাদের হেয় প্রমাণ করে এদেশে শ্বেত (আমি বলি ধবল কুষ্ঠ) রাজত্ব যুক্তি ও নীতির উপর খাড়া করা। এক কথায় যাকে বলে, 'হোয়াইট ম্যানস বার্ডেন' যে কী ভীষণ ভারী এবং ইংরেজ স্বদেশের বেকন-আণ্ডা ঘোড়দৌড়ের জুয়োখেলা, খেঁকশেয়ালি শিকার করা স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়ে এই 'নচ্ছার' দেশে এসে পৃথিবীর ইতিহাসে যে কী অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে, সেটা সপ্রমাণ করা। অতি দৈবে-সৈবে দু'একজন তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন সহৃদয় মহাজন এ ভণ্ডামি ধরতে পেরেছিলেন। তাঁরই একজন প্রখ্যাত হাস্যরসিক জেরম কে জেরম। তিনি মারাত্মক ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন—পড়ে মনে হয়, তিনি যেন সিকনি ঝাড়ছেন—'বার্ডেন যদি হেভিই হয় তবে ওটা বইছিস কেন, মাইরি? আমি তো খবর পেয়েছি, ইণ্ডিয়ানরা সেই সেবা, সেই হোলি ক্রুসেডের জন্য থ্যাঙ্ক্যু-টি পর্যন্ত বলে না। তবে ফেলে আয় না ঐ লক্ষ্মীছাড়া বোঝাটা ঐ হতভাগাদেরই ঘাড়ে!'

কিন্তু প্রাগুক্ত ঐ বড় দলের ইংরেজদের একটি 'আপ্তবাক্য' নিয়ে আজ আমার আলোচনা। এরা মোকা বেমোকায় বলতো, 'পাঠান-মোগল আদৌ ইতিহাস লিখতে জানতো না—শুধু লড়াই আর লড়াই।'

অন্য দল সংখ্যায় নগণ্য। এঁরা এসব কথায় কান না দিয়ে সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী শিখতেন, বাঙলায় বাইবেল অনুবাদ করতেন, এবং প্রাচ্যভাষায় লিখিত জ্ঞানবিজ্ঞানের বই ইংরিজীতে অনুবাদ করতেন। ফার্সী ইতিহাস যে শুধু 'লড়াই আর লড়াই' নয় (আহা! তাই যদি হত আর আমরা তাই পড়ে ক্ষেপে গিয়ে সেই আমলেই ইংরেজকে ঠ্যাঙাতে আরম্ভ করতুম!) সেটার বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ তাঁরা জানিয়েছেন ফার্সী ইতিহাস অনুবাদ করে।

এক তৃতীয় শ্রেণীর পিচেশও এদেশে এসেছিল। এরা প্রথম শ্রেণীর মত অশিক্ষিত বর্বর নয়, আবার দ্বিতীয় শ্রেণীর মত নিরপেক্ষ সাধুজনও নয়। এরা অল্পবিস্তর সংস্কৃত আরবী ফার্সী চর্চা করে, অল্প বিদ্যা যে ভয়ঙ্করী সেইটে আপন অজানতে প্রমাণ করে দিত এই বলে, 'ওসব তাবৎ মাল আমাদের পড়া আছে; সব রাবিশ।'

দুর্ভাগ্যক্রমে এদেশের ইংরিজী 'শিক্ষিতেরা' এদেরই বিশ্বাস করে বসলেন।

আমার বক্তব্য, নিজের মুখেই ঝাল চেখে নিলে পারেন। বিশেষত যখন কিছু দিন ধরে 'শেষ মোগলদের' সম্বন্ধে ঐতিহাসিক উপন্যাস বেশ কিছুটা জনপ্রিয়

হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতে আমি ভারী খুশী হয়েছি, কারণ অনেক স্থলে সাধারণ পাঠক এই করেই উচ্চতর পর্যায়ে উপনীত হয়। আমারই স্যাওটা একটি ম্যাট্রিক-ফেল ছোকরা—কিন্তু র‍্যাপিড রীডিঙের ফলে সে দিব্য শিলিং-শকার, পেনি-থ্রিলার পড়তে পারতো—আমার কাছ থেকে রোম সাম্রাজ্যের ঐতিহাসিক উপন্যাস 'আই ক্লাউডিউস' পড়ে এমনই 'ক্ষেপে যায়' যে, সে তারপর দুনিয়ার যত রোমান ইতিহাস পড়তে আরম্ভ করে, এস্তেক জুলিয়াস সীজারের 'ব্রিটন বিজয়' পর্যন্ত।

তালে বাবুর বাদশার আত্মজীবনী বেরিয়েছে—বাঙলা অনুবাদে। অবশ্য সে অনুবাদ এসেছে তিন ঘাটের জল খেয়ে। বাবুরের মাতৃভাষা ছিল তুর্কী—চুগতাই-তুর্কী অর্থাৎ তুর্কোমানিস্থানের তুর্কী, টার্কির (যার রাজধানী আঙ্কারা) ভাষা ওসমানলি তুর্কী। আমার যতদূর জানা আছে, মোগল আমলে যদিও দরবারী ভাষা ছিল ফার্সী, তবু শেষ বাদশা বাহাদুর শাহ পর্যন্ত অন্তঃপুরে তুর্কীতেই কথা-বার্তা বলেছেন, উর্দুতে কবিতা লিখেছেন[১]—দিল্লীর বিখ্যাত বিখ্যাত মুশায়েরায় (কবি-সম্মেলনে) দূত মারফৎ আপন কবিতা পাঠিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন (সে আমলের প্রখ্যাত কবি ছিলেন উর্দুর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি গালিব)—এবং রাজকার্য করেছেন ফার্সীতে।

বাবুরের সেই আত্মজীবনী অনূদিত হয় ফার্সীতে, ফার্সী থেকে ইংরেজীতে ও বিবেচনা করি, এই বাঙলা অনুবাদ সেই ইংরিজী থেকে। তাতে করে যে খুব মারাত্মক ক্ষতি হবে সে ভয় আমার নেই, কারণ অনুবাদে সবচেয়ে বেশী জখম হয় গীতিরস, এবং বাবুরের সাহিত্যসৃষ্টি গীতিরসপ্রধান নয়। এবং লড়াইয়ের কথা যদিও এটাতে আছে, তবু সেইটেই প্রধান কথা নয়। আসল কথা বাবুরের পর্যবেক্ষণশক্তি। ভারতবর্ষ—প্রধানতঃ দিল্লী-আগ্রা অঞ্চল—তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছেন এবং অতিশয় নিষ্ঠার সঙ্গে তার বর্ণনা দিয়েছেন। আমি যখন কাবুলে ছিলুম তখন বাবুর বর্ণিত, কাবুল পাঞ্জ্‌শীর (পাঞ্জ্‌শীর অর্থ পঞ্চ-ক্ষীর, সংস্কৃত 'ক্ষীর' শব্দ ফার্সীতে 'শীর', কিন্তু অর্থ দুধ, আর পাঞ্জ অর্থ পঞ্চ—ঐ জায়গায় পাঁচটি নদী

---

১ 'শুনেছ, রাজা কবিতা লেখে, এ আবার কেমন রাজা!' এই বলে তখনকার দিনের ইংরেজ বাদশা-হাসালামৎকে নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করতো। পরবর্তী যুগের এক জহুরী ইংরেজ এই নিয়ে মন্তব্য করে লেখেন, 'ঐসব বর্বর ইংরেজ জানতো না যে, ওয়ারেন হেস্টিংসও কবিতা লিখতেন, এবং বাহাদুর শা'র তুলনায় অতিশয় নিরেস।'

বয় ; আমাদের পায়েসকে কাবুলীরা বলে শীর-বিরঞ্জ,—বিরঞ্জ্ অর্থ চাল) ইত্যাদি আমি আপন অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছি। বস্তুত বাবুর বর্ণিত কাবুল ও আমার দেখা কাবুলে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। হালে যাঁরা কাবুল দেখে ফিরেছেন তাঁরা বলেন, গত দশ বৎসরে নাকি কাবুলের চেহারা একদম পালটে গিয়েছে।

কাবুলীরা বাবুরকে ঘৃণা করে। কারণ ইব্রাহিম লোদী ছিলেন আফগানিস্থানের পাঠান। তাঁকে পরাজিত করে হিন্দুস্থানের তখৎ ছিনিয়ে নেন তুর্কমানিস্থানের মোগল বাবুর। আমাকে এক সম্ভ্রান্ত, সুশিক্ষিত বিশ্বপর্যটক পাঠান কূটনৈতিক বেদনাবিকৃত কণ্ঠে বলেন, 'আপনি কি কল্পনা করতে পারেন, ডক্টর, এই বর্বর বাবুর কি করেছিল ? কল্পনা করতে পারেন, সেই নরদানব ইব্রাহিম লোদীর অন্তঃপুরের পুণ্যশীলা অসূর্যম্পশ্যাদের খোলা বাজারে ক্রীতদাসী হিসাবে বিক্রয় করেছিল ! এ শুধু বর্বর যাযাবর তুর্কীদের পক্ষেই সম্ভব।'

কাজেই আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে, কয়েক বৎসর আগে পর্যন্ত বাবুরের কবরের উপর না ছিল আচ্ছাদন (একদা নাকি ছিল, কিন্তু সেটা লুট হয়ে, কিংবা ভেঙে পড়ে যাওয়ার পর আফগানরা স্বভাবতই সেটা মেরামত করে দেবার কোন প্রয়োজন অনুভব করে নি), না ছিল কোনো অলঙ্কার-আভরণ ; কয়েক ফালি পাথর দিয়ে তৈরী অতিশয় সাদামাটা একটি কবর। হালে নাকি আফগান সরকার বাবুরের ঐতিহাসিক মর্যাদা অনুভব করতে পেরেছেন—জাত্যভিমান কিঞ্চিৎ সংযত করার ফলে—এবং কবরের সুব্যবস্থা করেছেন।

আজকের দিনের বাঙালী ইনফ্লেশন কারে কয়, সেটা চোখের জলে নাকের জলে শিখেছে। রোকা একটি টাকার ক্রয়মূল্য আজ কতখানি, সে তা বিলক্ষণ জানে। বাঙালী তাই বাবুরের ইনফ্লেশন-জ্ঞান দেখে আনন্দিত হবেন। দিল্লী-জয়ের পর বাবুরের আমীর-ওমরাহ্ বিস্তর ধনদৌলত লুট করে বললেন, 'এ বারে চলো কাবুল ফিরে গিয়ে নবাবী করা যাক।' বাবুর তখন তাদের বুঝিয়েছিলেন যে, তাদের সিন্দুকে কাঁড়া কাঁড়া টাকা থাকলেই সঙ্গে সঙ্গে কাবুল উপত্যকার শরাব-কবাবের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে না। যেখানে আণ্ডার দাম আগে এক পয়সা ছিল সেখানে ওদের এখন দিতে হবে আট গণ্ডা (কিংবা ঐ ধরনের কিছু-একটা —বইখানা আমার হাতের কাছে নেই)। কারণ সেপাই-পেয়াদারাও কিছু কম মাল লুট করে নি, তারাও এখন নিত্যি নিত্যি আণ্ডা খেতে চাইবে।

এর পর যে বইখানা পড়ে বাঙালী পাঠক আনন্দ পাবেন সেটি ফার্সীতে লেখা বাঙলার (খুব সম্ভব প্রথম পূর্ণাঙ্গ) ইতিহাস। 'বাহারিস্তানে গায়েবী'[২] —

২ বাঙলা আজগুবী অর্থ—'আজ' মানে 'হতে' 'from' ; 'গায়েবী' মানে

অজানা বসন্তভূমি। লেখক দিল্লী-আগ্রা-বিহারের শুকনো দেশ দেখে দেখে বাঙলার দেহলিপ্রান্তে এসে পেলেন, চতুর্দিকে শ্যামলে শ্যামল আর নীলিমায় নীল। তাঁর চোখ জুড়িয়ে গেল।

এর কথা আরেক দিন হবে।

ফের্ডিনাণ্ট্ জাওয়ারব্রুখ

বৈদ্যরাজ জাওয়ারব্রুখকে নিয়ে আবার সুইস জর্মন কাগজে বাদ-প্রতিবাদ আরম্ভ হয়েছে। প্রথম দলের বক্তব্য, সত্যই বৃদ্ধ বয়েসে তাঁর মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছিল ; অন্য দলের বক্তব্য তিনি পূর্ব-বার্লিনের সোভিয়েৎ কূটনীতির বলির পাঁঠা হয়েছেন। বার্লিনের সবচেয়ে বড় হাসপাতাল 'শারিতে' (charite—চ্যারিটি—খয়রাতি) প্রতিষ্ঠানের তিনি অধ্যক্ষ ছিলেন, এবং বার্লিন ভাগাভাগির পর শারিতে পড়েছিল পূর্ব-বার্লিনে, রাশান আওতায়।

এই কলকাতা শহরের অন্তত একজন খ্যাতনামা চিকিৎসককে আমি চিনি, যিনি জাওয়ারব্রুখের শিষ্য। তিনি ম্যুনিকে তাঁর কাছে বুকের যক্ষ্মার অপারেশন শেখেন—জাওয়ারব্রুখ বহু বৎসর ম্যুনিক হাসপাতালেরও বড় কর্তা ছিলেন। এছাড়া তাঁর অন্যান্য শিষ্যও হয়তো কলকাতায় আছেন। অবশ্য বুকের, মাথার ও ক্যানসারের সার্জারি নিয়েই যাঁদের কারবার তাঁরাই জাওয়ারব্রুখের গবেষণার সঙ্গে অল্পাধিক পরিচিত

জর্মন সার্জন-সমাজ মনে করেন, পৃথিবীর তিনজন সার্জনের নাম করতে হলে জাওয়ারব্রুখের নাম কালানুক্রমে তৃতীয়। অন্য দুজন বোধ হয় হিপপোক্রাতেস ও নেপোলিওনের সার্জন—কিন্তু আমি কি চিকিৎসা-শাস্ত্র, কি সে শাস্ত্রের ইতিহাস কোনোটারই বিন্দুবিসর্গ মাত্র জানি নে বলে হলফ খেয়ে কিছুই বলতে পারবো না। তদুপরি এ ধরনের নির্ঘণ্ট নির্ণয় সব সময়ই কিঞ্চিৎ উদ্দাম হয়ে থাকে—যেরকম পৃথিবীর সপ্তমাশ্চর্য নির্ণয়ে ভিন্ন লোক ভিন্ন নির্ঘণ্ট দেয়।

অতএব অতিশয় সারবান আপত্তি উঠতে পারে, চিকিৎসা-শাস্ত্রের কিছুই যখন আমি জানি নে, তখন হাতের নাগালের বাইরে যে শল্যরাজ জাওয়ারব্রুখ বিরাজ করছেন, তাঁর প্রতি আমি উদ্বাহু হয়েছি কেন? উত্তর অতি সরল। এই শল্যরাজ মৃত্যুর পূর্বে একখানি নাতিবৃহৎ আত্মজীবনী লেখেন—বস্তুত পুস্তকখানি প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পর এবং সেটি আদৌ শল্যরাজ বা বৈদ্য-সম্প্রদায়ের 'অজানা' 'লুপ্ত' 'অদৃশ্য' 'বিধিকৃৎ'। অর্থাৎ অজানা থেকে আগত বলে অদ্ভুত।

উদ্দেশে রচা হয় নি; রচনা হয়েছে আপনার আমার মত মামুলী জনের জন্য। এমন কি সে পুস্তকে ক্যানসার সম্বন্ধে তাঁর দীর্ঘ জীবনব্যাপী গবেষণার ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ যে প্রবন্ধটি উদ্ধৃত করেছেন, সেটিও সাধারণ জনের উদ্দেশে লিখিত, কারণ তিনি সেটি সর্বসাধারণের উপকারার্থে জর্মন রেডিও থেকে বেতারিত করেন। অতি সরল জর্মনে, সর্বপ্রকারের চিকিৎসা সংক্রান্ত পারিভাষিক শব্দ সযত্নে বর্জন করে তিনি এই বেতার-ভাষণটি নির্মাণ করেছিলেন বলে সেটি জর্মন-বালকেও বুঝতে পারে—বাঙলায় অনুবাদ করলে বঙ্গবালকও বুঝতে পারবে।[১]

কিন্তু এইটেই সর্বপ্রধান বা সর্বশেষ তত্ত্ব নয়। তাঁর আত্মজীবনীর সাহিত্যিক মূল্য আছে, এবং তাঁর লেখার ভিতর দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে তাঁর হাস্যকৌতুকোজ্জ্বল নীল চোখ দুটি প্রকাশ পায়। তার সামান্য একটি উদাহবণ দি।

ব্যঙ্গরস অতিশয় প্রাচীন রস—করুণ ও বীর রসের সমবয়সী সে। প্রাচীনতম গ্রীক সাহিত্যে তার ভূরি ভূরি নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু অসূয়া সে-রসের উৎস বলে আমাদের রসপ্রিয় মনও সেটা সব সময় গ্রহণ করতে পারে না। বিশুদ্ধ হাস্যরস—যেটা সৃষ্টি করার জন্য কাউকে পীড়া দিতে হয় না, নট অ্যাট দি কস্ট অব এনি ওয়ান—আপন আনন্দে উচ্ছল এবং সেটা ব্যঙ্গরসের বহু পরবর্তী যুগের রস। এবং আমার ব্যক্তিগত শাবাসী সেই হাস্যরসের, সেই ব্যঙ্গরসের উদ্দেশে যেখানে রসস্রষ্টা নিজেকে নিয়ে নিজে হাসেন, নিজেকে ব্যঙ্গ করেন, লাফস অ্যাট হিজ ওন কস্ট। তারই একটি উদাহরণ দি:

জাওয়ারব্রুখ বলছেন, তাঁর সময়কার এক বিখ্যাত চিকিৎসাশাস্ত্রের অধ্যাপক

---

১ এবং এর অনুবাদ করার বাসনা আমার ছিলও—অবশ্য সাবধানের মার নেই বলে ক্যানসার-রোগ-বিশেষজ্ঞ আমার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে দিয়ে সেটি সেনসর করিয়ে নিতুম। এ বেতারভাষণটি এখনো আদৌ গাজীমিয়ার বস্তানীতে আশ্রয় নেয় নি, অর্থাৎ আউট-অব-ডেট হয়ে যায় নি। ঐ ভ্রাতুষ্পুত্রীর আদেশে আমি সর্বাধুনা প্রকাশিত জর্মন-বিশ্বকোষে সবিস্তর লিখিত ক্যানসার প্রবন্ধটি পড়ি। এবং যদিও সব জিনিস বুঝতে পারি নি (বিশেষ করে কুআণ্টুম্ থিয়োরি দিয়ে ক্যানসার রোগের কারণ নির্ণয়ের আধুনিক প্রচেষ্টা!) তবু এটা লক্ষ্য করলুম যে ক্যানসারের পূর্বাভাস সম্বন্ধে জাওয়ারব্রুখ অজ্ঞজনকে যে সব দিকে লক্ষ্য রাখতে বলেছেন, সর্বাধুনিক জর্মন-বিশ্বকোষও তাই বলেছেন।…উল্লেখযোগ্য যে, ক্যানসার গবেষণা আরম্ভ করার পূর্বে জাওয়ারব্রুখ বার্লিনের ইণ্ডলজি ডিপার্টমেণ্টে গিয়ে খবর নেন, প্রাচীন ভারতীয় বৈদ্যেরা ক্যানসার সম্বন্ধে কি বলে গিয়েছেন।

ছাত্রদের মৌখিক (ভাইভা) পরীক্ষা নেওয়ার পর প্রতিবারেই অতিশয় গম্ভীর কণ্ঠে বলতেন, 'এই পৃথিবীতে বিস্তর গর্দভ নিজেদের ডাক্তার রূপে পরিচয় দিয়ে নির্ভয়ে অগুনতি লোক মেরে বেড়াচ্ছে ; তার উপর যদি আরো একটা গর্দভ বাড়ে তাতে করে কণামাত্র ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। তুমি পরীক্ষা পাস করলে।' জাওয়ারক্রুখও তাই তাঁর যুগের শিক্ষার্থীদের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন না। কিন্তু অন্তত একবার তাঁরও শিক্ষা হয়ে যায় এ বাবদে। জাওয়ারক্রুখ লিখছেন, 'সকাল দশটায় তিনটি ছেলে আসবে আমার কাছে ভাইভা দিতে। আমি নার্সকে বললুম, ক্যাণ্ডিডেটরা এলে অমুক রোগীকে পাঠিয়ে দিয়ো—তার পেটে ছিল টিউমার। ওরা এলে আমি কাগজপত্র দস্তখৎ করতে করতে একজনকে বললুম, রুগীকে পরীক্ষা করে বলতে তার কি হয়েছে। আমি কাজে ডুব মারলুম। দশ মিনিট পরে শুধালুম, "কি হল ?" ছেলেটা ভয়ে ভয়ে বললে, "কিছুই তো পেলুম না, স্যর।" আমি হুঙ্কার দিয়ে বললুম, "গেট আউট"—আর নামে দিলুম ঢ্যাবা কেটে। তারপর একই আদেশ দিলুম দু নম্বর ক্যাণ্ডিডেটকে। একেও যখন শুধালুম, কি পেল সে—সে প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে একই উত্তর দিল। ছাড়লুম আরেক হুঙ্কার, কাটলুম আরেক ঢ্যাবা। এবারে তিন নম্বরের পালা। সে-ও যখন ফেল মারলে তখন আমি ছাড়লুম শেষ হুঙ্কার। এ ছেলেটি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঘাবড়ে না হয়ে শান্ত কণ্ঠে বললে, "তা হলে আপনি দেখান না, স্যর, কি হয়েছে।" কী! এত বড় আস্পদ্দা! দেখাচ্ছি! লম্ফ দিয়ে গেলুম রুগীর কাছে, পেটে দিলুম হাত। ও হরি! কোথায় টিউমার! ভুলে অন্য লোক পাঠিয়েছে নার্স! তখন শুরু হয় আমার আর্তরব। "আরে, আরে, কোথায় গেল সেই দুই ক্যাণ্ডিডেট। নিয়ে এসো ওদের।" এস্থলে যে-ক্যাণ্ডিডেট বিশ্ববিখ্যাত জাওয়ারক্রুখকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল, তাকে বোধ হয় আর কোনো পরীক্ষাতে না ফেলে সঙ্গে সঙ্গে পয়লা নম্বরী ডিগ্রী দেওয়া উচিত।

এ রকম আরো বহু মজার মজার কথা আছে এই অসাধারণ পুস্তকে ; বস্তুত পুরো বইখানাই হাস্যরসের কুমকুমে কুমকুমে ভর্তি। পাঠকের চটুলহৃদয়ে একটুখানি চাপ পড়লেই আবীরে আবীরে ছয়লাপ। কিন্তু এর ফাঁকে ফাঁকে আবার ট্র্যাজেডির করুণ রসও আসে বলে সে রস যেন জল এনে দেয় চোখের পাতায়, বুক ভরে দেয় নিবিড়তর ব্যথায়—আরো বেশী।

একবার একটি মহিলা তাঁর কাছে এসে বললেন, তাঁর নিশ্চয়ই ক্যানসার হয়েছে। ডাক্তার তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন ভিন্ন ভিন্ন ল্যাবরেটরিতে যেখানে আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রোগের জাতগোত্রের বিচার হয়। নানাবিধ

পরীক্ষা নিরীক্ষার পর তাঁরা সবাই এক বাক্যে সমস্বরে বললেন, 'ক্যানসার নয়'।

সব শুনে মহিলাটি মাথা নেড়ে বললেন, 'না, হের প্রফেসর, এটা ক্যানসারই বটে।'

মহিলাটি কয়েক দিন পর আবার এসে ক্যানসারের ফরিয়াদ করলেন। আবার গোড়ার থেকে তাবৎ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হল, আবার নির্দ্বন্দ্ব নেতিবাচক উত্তর এল। এই করে করে ছ'মাস ধরে মহিলাটি আসেন—তাঁর মনে কোনো সন্দেহ নেই, তাঁর উদরবেদনা ক্যানসারজনিত।

শেষটায় জাওয়ারব্রুখ স্থির করলেন, কাটাই যাক পেট। মাদামকে তখন বলতে পারবেন, স্বচক্ষে দেখেছি পেটে কোনো ক্যানসার নেই। কিংবা হয়তো তিনি ভেবেছিলেন, অনেক বর্ষীয়সী মহিলার এই অপারেশন-মেনিয়া থাকে; হয়তো তাঁরা আপন জানা-অজানায় সেণ্টার অব অ্যাট্রাকশন বা কৌতূহলের কেন্দ্র হতে চান। তাকে অস্ত্রোপচারের জন্য তৈরি করা হল।

তারপর কবিরাজ জাওয়ারব্রুখ যা বলেছেন, তার মোদ্দা কথা: 'আমরা তো নিশ্চিন্ত মনে পেট খুললুম। সর্বনাশ! এ কি দেখি! পেট ভর্তি ক্যানসার! এবং এখন যে চরমে পৌঁচেছে সে অবস্থায় অপারেশনের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। সন্তপ্ত চিত্তে আমরা পেট সেলাই করে দিলুম। মহিলা সম্বিতে ফিরলে আমি তাঁকে বললুম, 'হ্যাঁ, ক্যানসারই ছিল, আমরা সেটা কেটে সরিয়ে দিয়েছি।'

জাওয়ারব্রুখ তার পর বলেছেন, 'মহিলাটি প্রথম যেদিন আমার কাছে এসেছিলেন, তার সঙ্গে সঙ্গে যদি অপারেশন করতুম, তবে হয়তো তাঁকে বাঁচাতে পারতুম। কিন্তু প্রশ্ন, আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি যখন নঙর্থক উত্তর দেয়, তখন শুধুমাত্র রোগীর অনুমানের উপর নির্ভর করে পেট কাটা যায় কি প্রকারে?'

জাওয়ারব্রুখ সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আপনাদের কাছে আরো নিবেদন করার বাসনা রইল। কিন্তু আমার বিশ্বাস, কোনো বাঙলাভাষী সার্জন সেটা করলেই ভালো হয়; আমার মত আনাড়ী তা হলে অনধিকার-প্রবেশ থেকে নিষ্কৃতি পায়।

কলকাতা ও বোম্বাইয়ে যে সব ক্যানসার-প্রতিষ্ঠান আছে, তাঁরা মাঝে মাঝে খবরের কাগজে বিবৃতি প্রকাশ করে সাধারণ জনকে সাবধান করে দেন, শরীরে কোন্ কোন্ আকস্মিক বা মন্দগতিতে বর্ধমান পরিবর্তন দেখলে ক্যানসারের সন্দেহ করতে হয়। এগুলি আমি সর্বদাই শ্রদ্ধা ও মনোযোগ সহকারে পড়ি।

ঠিক ঐ একই সুবাদে প্রফেসর ডক্টর গেহাইম্‌রাট জাওয়ারব্রুখ অবতরণিকা হিসাবে কয়েকটি কথা বলেছেন এবং আপন বক্তব্য বোঝাতে গিয়ে এমন একটি

অত্যুৎকৃষ্ট বিরল তুলনা দিয়েছেন, যেটি ব্যবহার করতে পারলে যে কোন যশস্বী সাহিত্যিকও শ্লাঘা অনুভব করবেন। বৈদ্যরাজ যা বলেছেন, তার নির্যাস : অধিকাংশ রোগই কোনো না কোনো সাবধান-বাণী, ইঙ্গিত, ওয়ার্নিং দিয়ে আসে। যেমন, সামান্য মাথা ধরলো—সেইটে ওয়ার্নিং—পরের দিন জ্বর হল। কিন্তু ক্যানসার কোনো ওয়ার্নিং তো দেয়ই না, বরঞ্চ সে নিতান্ত নিরপরাধীর মত দেখা দেয়। যেমন, আপনার জিভে একটি দানা দেখা দিল। সেটাতে কোনো বেদনা নেই, আপনার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না, আপনি ভাবলেন, এরকম তো কত দানা এখানে সেখানে দেখা দেয় আবার মিলিয়ে যায়, এটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করার বা চিকিৎসকের কাছে যাবার কোনো প্রয়োজন নেই। তারপর সেটা অতি ধীরে ধীরে বড় হতে লাগলো, কিন্তু কোনো বেদনা বা অস্বস্তি নেই বলে আপনি তখনো কোনো প্রতিকার করলেন না। তারপর একদিন ঢোক গিলতে, খাবার গিলতে আপনার অসুবিধা হতে লাগলো। আপনি তখন গেলেন ডাক্তারের কাছে, কিন্তু হায়, ততদিনে বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছে, তখন আর অপারেশন করা যায় না। আপনি যদি, দানা যখন ছোট ছিল, তখন আসতেন, তবে সার্জন আপনাকে অনায়াসে ক্যানসারমুক্ত করতে পারতেন—অবশ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর। তাই জাওয়ারক্রথ বলছেন, 'দানাটি আদৌ অপরিচিত শত্রুরূপে বেদনা যন্ত্রণা সঙ্গে নিয়ে এল না। ক্যানসার এল যেন আপনার কোনো বন্ধুজনের চেহারার সঙ্গে হুবহু মিলিয়ে একটি মুখোশ তৈরি করে সেটা পরে। তার পর কাছে এসে হঠাৎ মুখোশ সরিয়ে ফেলে আপনার বুকে মারলো ছোরা!'

এর পরই অধ্যাপক কতকগুলো চিহ্নের উল্লেখ করেছেন—এগুলোকে তিনি ওয়ার্নিং বলেন নি বটে, কিন্তু সেগুলো দেখলেই তৎক্ষণাৎ ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত। জিভেতে বা অন্য কোথাও দানা বা ঐ জাতীয় বস্তু বা পরিবর্তন, কণ্ঠস্বর অকারণে কর্কশ হয়ে যাওয়া, আপনার পেটের অসুখ ছিল না—হঠাৎ আরম্ভ হল দিনের পর দিন পেট খারাপ হতে, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এটা আমার অনধিকারপ্রবেশ। আপনার উচিত, আমাদের যে কোনো ক্যানসার-প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁদের সুলিখিত প্রামাণিক বিবৃতি সংগ্রহ করা। বিবৃতিতে সব ক'টা চিহ্নের পরিপূর্ণ (exhaustive) লিস্ট থাকে। আমি এযাবৎ যা লিখেছি, সেটা ভুলে গিয়ে ঐ বিবৃতি মন দিয়ে পড়বেন। কারণ, এগুলো আমাদের জন্যই লেখা —ডাক্তারদের জন্য নয়[২] ॥

২ এ-প্রবন্ধ "দেশে" প্রকাশিত হওয়ার পর আমি চিকিৎসক অচিকিৎসক

হিডজিভাই পি মরিস্

একদা 'স্ট্র্যান্ড্' পত্রিকা একটি নূতন ধরনের অনুসন্ধানের সূত্রপাত করে সাহিত্যের মহা মহা মহারথীদের শুধোয়, তাঁরা সর্বজন-সম্মানিত, সর্বশিক্ষিতজনের অবশ্যপাঠ্য কোন্ কোন্ পুস্তক, যে কোনো কারণেই হোক, পড়ে উঠতে পারেন নি। উত্তরে এমন সব তথ্য আবিষ্কৃত হল যাকে 'মোহনে'র ভাষায় লোমহর্ষক বলা যেতে পারে: যেমন, কথার কথা কইছি— বার্নার্ড শ পড়েন নি অলিভার টুইস্ট, কিংবা মনে করুন—রবীন্দ্রনাথ পড়েন নি 'একেই কি বলে সভ্যতা'?

কাজেই বিখ্যাত সাহিত্যিকদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে এই অখ্যাত সাহিত্য-সেবক যে তাঁরা যেন তড়িঘড়ি শ্রীযুত বিশী মহাশয়ের শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে বই-খানা পড়ে নেন।

এই পুস্তকে 'কাব্যের উপেক্ষিতা' জাতীয় দু'চারটি চরিত্রের উল্লেখ করে বিশী মহাশয় বহু প্রাক্তন শান্তিনিকেতনবাসীদের সাধুবাদ পেয়েছেন। তাঁদেরই একজন হিডজিভাই মরিস।

তাঁর পুরো নাম হিডজিভাই পেস্তনজি মরিসওয়ালা। গুজরাতীদের প্রায় সকলেরই পারিবারিক নাম থাকে; যেমন গান্ধী, জিন্না (আসলে ঝিঁড়া ভাই), হটিসিং ইত্যাদি। পার্সীদের অনেকেরই ছিল না বলে কেউ কেউ তাঁদের ব্যবসার নাম পারিবারিক নাম রূপে গ্রহণ করতেন। যেমন ইঞ্জিনীয়ার, কনট্রাক্টর ইত্যাদি। এই নিয়ে পার্সীরা ঠাট্টা করে একটি চরম দৃষ্টান্ত দেন—সোডাওয়াটার-বট্‌লওপনারওয়ালা!

বোম্বাইয়ের পতীত্ পারবার বিখ্যাত। এঁরা ফরাসী 'পতী' (Petit) ফার্মে কাজ করতেন বলে প্রথমে পতীত্ওয়ালা ও পরে পতীত্ নামে পরিচিত হন। ঠিক সেইরকম মরিস কোম্পানিতে কাজ করে আমাদের অধ্যাপক মরিসওয়ালা পরে শুধু মরিস নামে বোম্বাই অঞ্চলে নাম করেন।

অত্যুত্তম ফরাসী ও লাতিন শেখার পর না জানি কোন্ যোগাযোগে তিনি

একাধিক সজ্জন পাঠকের কাছ থেকে অনুরোধ পেয়েছি, ক্যানসার সম্বন্ধে জাওয়ারক্রুখের প্রাগুক্ত প্রবন্ধটি যেন আমিই অনুবাদ করি। আমি করজোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করছি, কারণ অসুস্থতাবশত আমার দেহে শক্তি মনে উৎসাহ বড়ই হ্রাস পেয়েছে। তবে এটাও নিবেদন, আমৃত্যু দুটি প্রবন্ধ অনুবাদ করতে পারার দুরাশা আমি কখনো সম্পূর্ণ ত্যাগ করবো না; ক্যানসার সম্বন্ধে প্রবন্ধটি ও অধ্যাপক ভিন্টারনিতস্ রচিত ক্ষুদ্রাকার রবীন্দ্র-জীবনী।

শান্তিনিকেতন পৌঁছে সেখানে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন।

দুটো বিষয়ে তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙালী—সেন্টিমেন্টাল এবং আদর্শবাদী। আমার আশ্চর্য লাগতো, কারণ অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে যেসব গুজরাতী ছেলেরা—এবং পাঠিকারা অপরাধ নেবেন না, মেয়েরাও—শান্তিনিকেতন আসে, তারা পর্যন্ত টাকা আনা পাই হিসেব করতো; শুনেছি, ছাত্রেরা আকছারই আদর্শবাদী হয়। (নইলে অত নিঃস্বার্থ ট্রাম-বাস পোড়ানোর সৎকর্মটা করে কে ? কিন্তু এ সম্বন্ধে আর কথা না। হক্ কথা কইলে পুলিসে ধরবে।) তাই গুজরাতী মরিস সাহেবের আদর্শবাদ আমাকে বিস্মিত করেছিল।

সামান্য বাঙলা শেখার পরই মরিস সাহেবের প্রেম উপচে পড়ল রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রতি এবং তিনি সম্মোহিত হলেন

"তাহাতে এ জগতে ক্ষতি কার
নামাতে পারি যদি মনোভার" শুনে।

অন্যত্র আলোচনা করেছি, ভারতের বাইরে কোনো ভাষাই 'ত' এবং 'ট'-র উচ্চারণে পার্থক্য করে না; এমন কি ভারতীয়দের ভিতর যাঁদের গায়ে প্রচুর বিদেশী রক্ত তাঁরাও এ-দুটোতে গুবলেট করেন। উদাহরণ স্থলে, গুজরাতের বোরা সম্প্রদায়—এখানকার রাধাবাজারে এঁদের ব্যবসা আছে—ব্রহ্ম উপত্যকার আসাম-বাসী ও পার্সী সম্প্রদায়।

তাই মরিস সাহেবের উচ্চারণে ছত্র দু'টি বেরুতো :

"টাহাটে এ জগটে ক্ষটি কার
নামাটে পারি যডি মনোভার।"

আমরা আর কি করে ওঁকে বোঝাই যে 'ত' 'দ'-এর অনুপ্রাস ছাড়াও গুরুদেবের গান আছে।

মরিস সাহেব নূতন বাঙলা শেখার সময় যে না বুঝে বিশীদাকে 'বেটা ভূত' বলেছিলেন তার চেয়েও আরো মারাত্মকতম উদাহরণ আমি শুনেছি। তিনি আমাদের ফরাসী শেখাতেন, এবং শ্রদ্ধেয় বিধুশেখর, ক্ষিতিমোহন এবং আরো কিছু অধ্যাপকও তাঁর ক্লাসে যেতেন। আমার হাসি পেত যখন গুরু মরিস ছাত্র বিধুশেখরকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করতেন ও ছাত্র বিধুশেখর তাঁকে 'তুমি' বলে। একদিন হয়েছে কি, ফরাসী ব্যাকরণের কি একটা কঠিন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ফেলেছেন অধ্যক্ষ বিধুশেখর। মরিস সাহেব বললেন, 'চমৎকার। শাস্ট্রী মশায়। সট্যি, আপনি একটি আস্টো ঘুঘু।'

শাস্ত্রী মশাইয়ের তো চক্ষুস্থির। একটু চুপ করে থাকার পর গুরু, গুরু—

যদ্যপি ছাত্র, তথাপি গুরু-কণ্ঠে শুধালেন, 'মরিস, এটা তোমাকে শেখালে কে ?'

নিরীহ মরিস বোধ হয় কণ্ঠনিনাদ থেকে বিষয়টার গুরুত্ব খানিকটে আমেজ করতে পেরে বললেন, 'ডিনড়া (দিনদা, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর)। উনি বলেছেন ওটার অর্ট "অসাডারণ বুড্‌ডিমান"। টবে কি ওটা ভুল ?'

শাস্ত্রী মশাই শুধু ঈষৎ কঠিন কণ্ঠে বললেন, 'আচ্ছা, আমি দিনেন্দ্রনাথকে বোঝাবো।'

দিনুবাবু নাকি বিদেশীকে ভাষা শেখাবার সময় কর্তব্যবোধহীন চপলতার জন্য বেশ কিছুটা ভালোমন্দ শুনেছিলেন শাস্ত্রী মশাইয়ের কাছ থেকে।

ঐ সময় প্যারিস থেকে অধ্যাপক সিলভঁা লেভি সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে আসেন। উভয়েই একাধিকবার বলেন, মরিস সাহেব উল্লেখ না করা পর্যন্ত তাঁরা কখনো বিশ্বাস করতে পারেন নি, ফ্রান্স না গিয়ে মানুষ কি করে এরকম বিশুদ্ধ ফরাসী শিখতে পারে। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাছে বড়ই কৃতজ্ঞ যে তিনি আমাকে রলঁার 'যীশুজীবনী' পড়ান। এ বই আমার মহদুপকার করেছে এবং করছে।

বলা বাহুল্য এই সরল সজ্জন যুবা পণ্ডিতটি সকলেরই হৃদয়ে স্থান পেয়েছিলেন। গুরুদেবের তো কথাই নেই, মরিস সাহেব ঋষিতুল্য দ্বিজেন্দ্রনাথেরও অশেষ স্নেহ পেয়েছিলেন। বড়বাবু বিদেশী পণ্ডিতদের সঙ্গে বাক্যালাপ কালক্ষয় বলে মনে করতেন ; বলতেন, 'এরা সব তো জানে কোন্ শতাব্দীতে প্রজ্ঞাপারমিতা কিংব একাক্ষরপারমিতা প্রথম লেখা হয়, প্রথম ছাপা হয়। ওসব জেনে আমার কি হবে ? তার চেয়ে নিয়ে আসো না ওদের কোনো একজন, যে কাণ্টের দর্শন সমর্থন করতে পারে, আর আমি নেব বিরুদ্ধ মতবাদ, কিংবা সে নেবে বিরুদ্ধ মতবাদ, আমি নেব কাণ্টপক্ষ—তার যেটা খুশী।' মরিস সাহেব তাঁকে তখন অনুনয়-বিনয় করে সম্মত করাতেন বিদেশী পণ্ডিতকে দর্শন দিতে। অবশ্য দু' মিনিট যেতে না যেতেই বড়বাবু সব ভুলে গিয়ে কোনো কিছু অন্য তত্ত্ব নিয়ে আলোচনায় তন্ময় হয়ে যেতেন। আমাদের মতন ছেলে-ছোকরাদের কিন্তু তাঁর কাছে ছিল অবাধ গমন। আমার মনে পড়তো খৃস্টের কথা ; তিনি যেহোভার মন্দির থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন বিস্তর তথাকথিত কুলাঙ্গার ভি আই পি-কে, এবং আদেশ দিতেন 'লেট দি চিলড্রেন কাম্ আনটু মী'।

মরিস সাহেব প্রথমটায় সম্মত ছিলেন না ; আর সকলের চাপাচাপিতে তিনি প্যারিসের সরবনে গিয়ে ডক্টরেটের জন্য প্রস্তুত হতে রাজী হলেন।

প্যারিসের ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে তাঁর সঙ্গে আমার অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা।

আমাকে আপনি বলে সম্বোধন করাতে আমি দুঃখ প্রকাশ করলুম। তিনি বললেন, 'তুমি এখন বড় হয়েছ ; জর্মনিতে ডক্টরেট করবে। আমিও এখানে তাই করছি। আমরা এখন এক-বয়েসি।' আমার বয়েস তখন চব্বিশ, তাঁর বত্রিশ। তারপর আমাকে রেস্তোরাঁয় উত্তমরূপে খানদানী ডিনার খাওয়ালেন। বিনয় এবং সঙ্কোচের সঙ্গে পরের দিন বললেন, 'তোমাকে ভালো করে এণ্টারটেন করতে পারলুম না। তোমাকে বলতে লজ্জা নেই, আমার এ মাসের টাকাটা এখনো দেশ থেকে আসে নি।' আমি তারস্বরে প্রতিবাদ জানালুম। বহু বৎসর পরে ঐ সময়কার এক প্যারিসবাসী ভারতীয়ের কাছে শুনতে পাই, মরিস সাহেব অন্যান্য দুঃস্থ ভারতীয় ছাত্রদের টাকা 'ধার' দিয়ে দিয়ে মাসের বেশীর ভাগ দেউলে হওয়ার গহ্বর-প্রান্তে পড়ি পড়ি করে বেঁচে থাকতেন। আসলে তাঁর পরিবার বিত্তশালী ছিল।...তাঁর সঙ্গে এই আমার শেষ দেখা। কিন্তু এখনো তাঁর সেই শান্ত সংযত প্রসন্ন বদনটি আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

কিন্তু তার পূর্বের একটি ঘটনা চিরকাল ধরে আমার ও আমার সতীর্থদের চিত্তে কৌতুক রস এনে দেবে, প্রতিবার সেটার স্মরণে।

গুরুদেব শারদোৎসবের মোহড়া নিচ্ছেন। তিনি স্বয়ং, দিনুবাবু—এমন কি জগদানন্দবাবুর মত রাশভারী লোক—অজিন ঠাকুর এঁরা সব অভিনয় করবেন। এক প্রান্তে বসে আছেন শুষ্কাস্য বিষণ্ণবদন মরিস সাহেব। আমি হোম্‌টাস্‌ক্ না করলে তাঁর মুখে যে বিষণ্ণতা আসতো তিনি যেন তারই গোটাদশেক 'হেলপিং' নিয়েছেন। মোহড়ার শেষে দিনুবাবু কাচুমাচু হয়ে গুরুদেবকে অনুরোধ জানালেন, মরিস সাহেবকে ড্রামাতে একটা পার্ট দিতে।

গুরুদেবের ওষ্ঠাধর প্রান্তের মৃদুহাস্য সব সময় ঠাহর করা যেত না। এবারে গেল। কিন্তু ইতিমধ্যে সব পার্টেরই বিলিব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। গুরুদেব বললেন, 'ঠিক আছে। একে শ্রেষ্ঠীর পার্ট দিচ্ছি।' হয় মূল নাটকে শ্রেষ্ঠীর পার্ট আদৌ ছিল না, ঐটে মরিস সাহেবের জন্য 'ইস্‌পির্সিলি' তৈরি হয় কিংবা হয়তো তখন মাত্র বড় বড় পার্টগুলোর বণ্টনব্যবস্থা আছে।

তা সে যা-ই হোক, শ্রেষ্ঠীর অভিনয় করবেন 'নটরাজ' মরিস—শাস্ত্রী মশাই তাঁর নাম দিয়েছিলেন মরীচি (ব্রহ্মার পুত্র, কশ্যপের পিতা ও তিনি সূর্যকিরণও বটেন)—মরিসও সগর্বে কাঁচা-হাতে সেই নামই সই করতেন। এবারে শুনুন, পার্টটি কি ?

রাজা : ওগো শ্রেষ্ঠী !

শ্রেষ্ঠী : আদেশ করুন, মহারাজ !

রাজা : এই লোকটিকে হাজার কার্ষাপণ গুনে দাও।

শ্রেষ্ঠী : যে আদেশ!

ব্যস্! ঐটুকু! আমার শব্দগুলো ঠিক ঠিক মনে নেই, কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে মরিসকে ঐ পাঁচটি শব্দ বলতে হবে; গুরুদেব সায়েবের বাঙলা উচ্চারণ সম্বন্ধে বিলক্ষণ ওকীব-হাল ছিলেন বলে। কিন্তু মরিস সাহেব বেজায় খুশ, জান্ তর্‌র্‌র্—ড্যাম্‌গ্ল্যাড—হোক না পার্ট ছোট, তাতেই বা কি? বলেন নি স্বয়ং গুরুদেব, 'The rose which is single need not envy the thorns which are many?'

কিন্তু এইবারে শুরু হল ট্রবল। গুরুদেবের ভাষাতেই বলি, মরিসকে শুতে হল কণ্টকশয্যায়, গোলাপ-পাপড়ির আচ্ছাদিত পুষ্পশয্যায় নয়—যদিও থর্ন মাত্র একটি। গুরুদেব যতই বলেন 'আদেশ করুন, মহারাজ' মরিস বলেন, 'আডেশ করুন, মহারাজ।' মহা মুশকিল। মরিস আপন মরীচি-তাপে ঘর্মাক্তবদন। শেষটায় গুরুদেব বরাত দিলেন দিনুবাবুকে, তিনি যেন সাহেবের 'ত' 'ট'র জট ছাড়িয়ে দেন। আফটার অল—তিনিই তো খাল কেটে ঘরে কুমির এনেছেন; বিপদ, এক্‌স্‌কিউজ মি—বিপডটা টো টাঁরই টৈরি।

মরিস সাহেব ছন্নের মত হয়ে গেলেন। সেই প্রফেট জরথুস্ত্রের আমল থেকে কোন্ পার্সী-সন্তান এই 'ত' 'ট'য়ের গর্দিশ মোকাবেলা করেছে—এই আড়াই হাজার বছর ধরে—যে আজ এই নিরীহ, হাড্ডিসার মরিস বিদেশ-বিভুঁইয়ে একা একা এই 'ত'য়ের তাবৎ 'দ'য়ের দানব—আই মীন ডানব, টাবড ডানবের সঙ্গে লড়াই দেবে?

মরিস ছন্নের মত আশ্রমময় ঘুরে বেড়ান—দৃষ্টি কখনো হেথায় কখনো হোথায়, আর ঠোঁট দুটি বিড়বিড় করে কি যেন বলছে। আমি বললুম, 'নমস্কার, স্যার।' সম্বিতে এসে বললেন, 'আ! সায়েড (সৈয়দ)—' ও হরি! এখনো 'সায়েড'! তবে তো আডেশ এখনো মোকামে কায়েম আছে, রাজাদেশেরই মত —'শোনো টো ঠিক হচ্ছে কি না "আডেশ করুন, মহারাজ"।' আমি সন্তপ্ত চিত্তে চুপ করে রইলুম। বার দশেক আডেশ আডেশ করে বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়ে এগিয়ে গেলেন।

একটা ডরমিটরি-ঘরের কোণ ঘুবতেই হঠাৎ সমুখে মরিস—বিড়বিড় করছেন 'আডেশ আডে—।' রেললাইনের কাছে নির্জনে 'আডেশ—।' দূর অতি দূর খোয়াইয়ের নালা থেকে মাথা উঠছে সায়েবের, আবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। চন্দ্রালোকে, খেলার মাঠে মরিস, আসন্ন উষার প্রদোষে শ্মশানপ্রান্তে কার ঐ

ছায়ামূর্তি ? মরিস। হিন্দী কবি সত্যি বলেছেন, গুরু তো লাখে লাখে, উত্তম চেলা কই। আশ্রমের ছেলেবুড়ো এখন সবাই সায়েবের গুরু। এস্তেক শিশু-বিভাগের কানাই, সাগর কেউ বাদ পড়ে নি। পড়ে থাকলে তাদের দোষ। সবাইকে টেস্ট করতে অনুরোধ করেন তাঁর আডেশ আডেশানুযায়ী হচ্ছে কি না। ইতিমধ্যে এক সন্ধ্যায় মোহড়া শেষে দিনুবাবু গুরুদেবকে ভয়ে ভয়ে অনুরোধ জানালেন 'আদেশে'র বদলে অন্য কোনো শব্দ দিতে, যেটাতে "ত" "দ" নেই। গুরুদেব বললেন, 'না ; মরিসকে "ত" "দ" শিখতেই হবে।'

এর পর দ্বিতীয় পর্ব। হঠাৎ সক্কলের সামনে এক দিন বেরিয়ে গেল 'আদেশ' অত্যুত্তম 'দ' সহ। আমি 'ইয়াল্লা' বলে লম্ফ দিলুম। কেউ 'সাধু সাধু', কেউ বা 'কনগ্রাচুলেশনস্' বললেন। কিন্তু হা অদৃষ্ট! আমরা বন থেকে বেরুবার পূর্বেই হর্ষধ্বনি করে ফেলেছি! সায়েব পরক্ষণে আডেশ-এ ল্যাপস্ করেছেন। তারপর তাঁর ক্ষণে আসে 'দ' ক্ষণে 'ড'। কলকাতার বাজারে মাছ ওঠা-না-ওঠার মত বেটিঙের ব্যাপার! এই করে করে চললো দিন সাতেক। সমুখে আশার আলো।

এর পর তৃতীয় পর্ব। দ্বিতীয় পর্বের মত এটাও অপ্রত্যাশিত। সায়েব এখন চাঁচাছোলা, ভোরবেলার নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক শিশিরবিন্দুর ন্যায় 'দ' বলতে পারেন। পয়গম্বর জরথুস্ত্র এবং তাঁর প্রভু আহুর মজদাকে অশেষ ধন্যবাদ!

আমরাও আমাদের সঙ্কটটা ভুলে গেলুম। মোহড়ায় প্রতিবার ঋষি মরীচি বৈদিক পদ্ধতিতে 'দ' উচ্চারণ করেন।

মরিস সাহেব স্টেজে নামলেন পার্সী দস্তুর বা যাজকের বেশ পরে। সব-কিছু ধবধবে সাদা। শুধু মাথার টুপিটি দাদাভাই নোরজী স্টাইলের লেটার-বক্স্ প্যাটার্নের কালোর উপর সফেদ বুট্টাদার। গুরুদেব এই বেশই চেয়ে নেছিলেন, 'তোমরা পার্সীরা বাপু এ দেশের শ্রেষ্ঠী। তোমরা যা পরবে তাই হবে শ্রেষ্ঠীর বেশ।'

নাট্যশালা গম গম করছে। ওঃ, সে কী অভিনয়! গুরুদেবকে দেখাচ্ছে দেবদূতের মত। অজিনের চেহারা এমনিতেই খাপসুরত, এখন দেখাচ্ছে রাজপুত্রের মত। গুরুমশাই জগদানন্দ রায়ের কী বেত্রাস্ফালন! আশ্রমে বেতের বেসাতি বিলকুল বে-আইনি। এ মোকায় জগদানন্দবাবু যেন হৃতোপবীত-দ্বিজ লুণ্ঠিত যজ্ঞোপবীত ফিরে পেয়েছেন। তাঁর কঠিনদর্শন মুখচ্ছবি ঈষৎ স্নিগ্ধতা ধরেছে।

মরিস সাহেব প্রবেশ করলেন রঙ্গমঞ্চে।

রাজা দিলেন ডাক।

মরিস সাহেব—হে ইন্দ্র, তোমার বজ্র কেন তৎপূর্বেই অবতীর্ণ হল না?

উৎকণ্ঠা, উত্তেজনায় মরিস বলে ফেলেছেন, 'আ ডে শ।'

অট্টহাস্যে ছাদ যেন ভেঙে পড়ে। তিনি কিন্তু ঐ একই উত্তেজনার নাগপাশে বদ্ধ বলে সে অট্টহাস্য শুনতে পান নি।

সে সন্ধ্যার অভিনয়ের জন্য অধ্যাপক হিড্‌জিভাই মরিসই পেয়েছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনন্দন। আমাদের বিবেকবুদ্ধি সেই আদেশই দিয়েছিল—খুব সম্ভব আডেশই।[১]

'আধুনিক' কবিতা

'সুশীল পাঠক—'

ছেলেবেলায় এ ধরনের সম্বোধন পড়ে হৃদয়ে বড় আনন্দ হত। মনে হত, কত মহান লেখক এই কালীপ্রসন্ন সিঙি, যিনি কিনা মহাভারতের মত বিরাট গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন, তিনি আমাকেই সম্বোধন করে কথা বলেছেন! এটা যে নিছক সাহিত্যিক ঢং, বলার একটা আড়, সেটা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারতুম না। বিশেষ করে যখন আমার ধারণা হল—সেটা হয়তো ভুল—যে দরদ-ভরা কথা কয়ে যখন তিনি আমার সহানুভূতি আকর্ষণ করতে চান, তখনই 'পাঠক' বলে সম্বোধন করেন। এবং আরো বেশী করে 'সহৃদয় পাঠক' বলে সম্বোধন করতেন সিঙি মশাইয়ের মত দরদী লেখককুল যখন তাঁরা এমন কোনো অভিজ্ঞতার বর্ণনা করতে যেতেন, যেটার মোক্ষম মার বেশীর ভাগ পাঠকই খেয়েছে। এ অধম প্রাচীনপন্থী। সে এখনো পাঁচকড়ি দে পেলে গোপনে পড়ে। এবং বটতলাতে কিছুক্ষণ হল একখানা 'সচিত্র প্রেমপত্র' কিনে সে বড় ভরসা পেয়েছে। যৌবনে ভাষার উপর দখল ছিল না—এখনই বা হল কই?—মরমিয়া প্রেমপত্র লিখতে পারতো না বলে রায়ের ভাষায়, "উনিশটি বার প্রেমেতে সে ঘায়েল করে থামলো শেষে।" আর ভয় নেই! এখন এই অমূল্য গ্রন্থ থেকে নকল করে ফিলিমস্টার থেকে মেয়ে-পুলিস সকলেরই 'সজল নয়নে হৃদয়-দুয়ারে ঘা' দেওয়া যাবে।

১ মরিস সর্বদাই ঈষৎ বিষণ্ণ বদন ধারণ করতেন—খুব সম্ভব এটাকেই বলে 'মেলানকলিয়া'। প্যারিস থেকে ফেরার পথে তিনি জাহাজ থেকে অন্তর্ধান করেন। আমার মত আর পাঁচজন তার কারণ জানে না। শুনেছি, তিনি উইল করে তাঁর সর্বস্ব বিশ্বভারতীকে দিয়ে যান।

বইখানার প্রথম চার লাইন পড়লেই বুঝতে পারবেন, মাইকেল রবীন্দ্রনাথ এর থেকে কতখানি পিছিয়ে আছেন :—

'প্রিয়তমা চারুশীলা পিতৃগৃহে গিয়ে
আছ তো সুখেতে তুমি গোষ্ঠিজন নিয়ে ?
তুমি মোর জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট ধন।
তুমি মোর হৃদয়ের শান্তিনিকেতন।'

জানি, জানি - বাধা দেবেন না, জানি আপনারা বলবেন, এই মডার্ন যুগে এসব পণ্য অচল। কিন্তু আপনারা কি এ তত্ত্বটাও জানেন না যে, ফ্যাশান হর-হামেশা বদলায় এবং আকছারই প্রাচীন যুগে ফিরে যায়? পিকাসো ফিরে গেছেন প্রাগৈতিহাসিক গুহাবাসীর দেয়াল-ছবিতে, অবনঠাকুর মোগলযুগে, নন্দলাল অজন্তায়, যামিনী রায় কালীঘাটের পটে। কাব্যে দেখুন, দুর্বোধ্য মালার্মে র‍্যাঁবো যখন অনুবাদের মারফৎ ইংলণ্ড জয় করে বসে আছেন, তখন হাউসম্যান লিখলেন সরল প্রাঞ্জল 'শ্রপশার ল্যাড'। বলা হয়, ইংলণ্ডে কবির জীবিতাবস্থায় তাঁর একখানা বইয়ের এত বিক্রির অন্য উদাহরণ নেই। কোনো ভয় নেই। বাঙলা দেশের মডার্ন কবিতাও একদিন 'পাখি সব করে রবে'র অনবদ্য শাশ্বত ভঙ্গিতে লেখা হবে।

আমি মডার্ন কবিতা পছন্দ করি নে, তাই বলে মডার্ন কবিতার কোনো 'রোজোঁ দেত্রর্' রীজন ফর এগজিস্টেনস্ অর্থাৎ পুচ্ছটি তার উচ্চে তুলে নাচাবার 'রোজোঁ' রাজন, ন্যায্যহক্ক নেই এ কথা কে বলবে।

প্রথমেই নিন মিলের অত্যাচার। এবং এই মিলটা আমাদের খাঁটি দিশী জিনিস নয়। সংস্কৃতের উত্তম উত্তম মহাকাব্যে, কাব্যে মিল নেই। যদিস্যাৎ থাকে, তবে সেটা আকস্মিক দুর্ঘটনা, প্রায় কবির অনিচ্ছায় ঘটেছে। সংস্কৃতে প্রথমে মিল পাই—আমার জানা মতে—মোহমুদ্গরে। এবং তিনিও সেটা বহিরাগত ভাষা থেকে নিয়েছিলেন, এমত সন্দেহ আছে। সংস্কৃতে সহোদরা ভাষা গ্রীক লাতিনে কি মিল আছে? এ দেশেই দেখুন, উর্দু তার জননী সংস্কৃত ভাষা থেকে বহু দূরে চলে গিয়েছে, জোব্বা-জাব্বা পরে প্রায় মুসলমান হয়েছে (প্রায় বললুম কারণ এখনো বহু হিন্দুর মাতৃভাষা উর্দু; উর্দু কবি-সম্মেলনে তাঁরা সম্মানিত সক্রিয় অংশীদার। কিঞ্চ, পণ্ডিত নেহরু, তেজবাহাদুর সপ্রু ইত্যাদির মাতৃভাষা ছিল উর্দু), তথাপি আজও উর্দুতে বিনা মিলে দোঁহা রচনা করা হয়, সংস্কৃত সুভাষিতের অনুকরণে। 'মিল' শব্দটা কি শুদ্ধ সংস্কৃত? সংস্কৃতে একে বলে 'অন্ত্যানুপ্রাস'—স্পষ্ট বোঝা যায়, বিপদে পড়ে মাথায় গামছা বেঁধে ম্যানু-

ফেকচার্ড এরজাৎস্ মাল। অতএব যদি মডার্ন কবিরা সে-বস্তু এড়িয়ে চলেন তবে পাঠক তুমি গোস্সা করো ক্যান্? ওঁরা তো মাইকেলেরই মত আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য পুনর্জীবিত করছেন। এই যাবনিক ম্লেচ্ছাচারের যুগে সেটি কি চাট্টিখানি কথা!

তারপর ছন্দ? ছন্দহীন কবিতা হয় না, আপনাকে বলেছেন কোন্ অলঙ্কার-শাস্ত্রের গোসাঁই? উপনিষদ পড়েছেন? তার ছন্দটি কান পেতে শুনেছেন? ছন্দে বাঁধা কবিতা আসতে পারে তার কাছে? বস্তুত বেদমন্ত্রে ছন্দ মেনে মেনে হায়রান হয়ে ঋষিকবি উপনিষদে পৌঁছে কি যুগপৎ তাঁর আধ্যাত্মিক ও কাব্যিক মোক্ষ লাভ করলেন না? এ অধম অশিক্ষিত—তথাপি গুণীজনের কাছে শোনা উপনিষদের একটি সামান্য সাদামাটা প্রশ্ন নিন :—

'সূর্য অস্ত গেছে, চন্দ্রও অস্ত গেছে, অগ্নি নির্বাপিত (অর্থাৎ আগুন জ্বালিয়ে যে একে অন্যকে দেখবো তার উপায় নেই), কথাও বন্ধ (অর্থাৎ চিৎকার করে ডাকবারও উপায় নেই)। তখন কোন্ জ্যোতি নিয়ে মানুষ (বেঁচে) থাকে, বলুন তো যাজ্ঞবল্ক্য?'

এবার সংস্কৃতটা শুনুন :—

'অস্তমিতি আদিত্যে, যাজ্ঞবল্ক্য, চন্দ্রমস্যস্তমিতে, শান্তেঽগ্নৌ, শান্তায়াং বাচি, কিংজ্যোতিরেবায়ং পুরুষঃ?'

প্রচলিত মন্দাক্রান্তা বা শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে এই অতুলনীয় সঙ্গীতমন্দ্রিত-স্পন্দিত ছত্র বেঁধে দিলে কি প্রভু যীশুর ভাষায় লিলিফুলের উপব তুলি নিয়ে রঙ বোলানো হত না?

এতেও যদি আপনাদের মন না ভরে তবে পড়ুন ইংরিজী অনুবাদে বাইবেল—রাজা দায়ুদের গান, সুলেমান বাদশার গীতি (সং অব্ সংজ, সং অব্ সলোমন)। সে তো গদ্যে, এবং স্বয়ং বার্নার্ড শ বলেছেন, ঐ সলোমনের গীতিটি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতা।

আবার আপনি যদি মুসলমান হন তা হলে তো কথাই নেই। আপনি জানেন প্রাক-পয়গম্বর যুগেও আরবদের ছিল বহু বিচিত্র ছন্দে, মিলেব কঠোরতম আইনে বাঁধা অত্যুৎকৃষ্ট কাব্যসৃষ্টি। গদ্য ছিল না, কিংবা প্রায় না থাকারই মত। তথাপি আল্লা-তালা পয়গম্বরকে যে কুরানের বাণী পাঠালেন সে তো গদ্যে। অথচ আরবী-ভাষা নিয়ে যাঁরা সামান্যতম চর্চা করেছেন তাঁরাই শপথ করে বলবেন, এঁর ছন্দোময় গদ্য যে কোনো বাঁধা কাব্যকে হার মানায়। পয়গম্বরকে যখনই তাঁর বিরুদ্ধপক্ষ কোনো প্রকারের মিরাকল্ (অলৌকিক কীর্তি) দেখাতে আহ্বান

করতো তখনই তিনি সবিনয় বলতেন, 'আমি নিরক্ষর আরব। তৎসত্ত্বেও আল্লা-তালা আমার কণ্ঠ দিয়ে যে কুরান পাঠালেন তার কাছে কি আসতে পারে তোমাদের শ্রেষ্ঠতম কাব্য? এইটেই হল সবচেয়ে বড় মিরাকল্।'

অতএব মর্ডান কবিরা যদি ছন্দ অস্বীকার করেন তবে আপনি চটেন ক্যান্?

তৎসত্ত্বেও মর্ডান কবিতার দুশ্মনরা হয়তো বলবেন, তারা সুন্দর সুন্দর জিনিসের সঙ্গে বিৎকুটে সব জিনিসের তুলনা দেয়—যেমন তালগাছের ডগায় চাঁদ দেখে লিখলে, এ যেন আকাশের সুচিক্কণ সুমসৃণ তাল। কিংবা প্রিয়ার বিনুনি দেখে কবির মনে এল পানউলীর দোকানে ঝোলানো অগ্নিমুখ নারকোলের পাকানো দড়ি—যার ডগায় লাগিয়ে আমি আকছারই বিড়ি ধরাই। সেই দড়ি হাওয়ায় দুলে কবির কুর্তা পুড়িয়ে দিয়ে পিঠে ছ্যাঁকা দিয়েছে, ঠিক তেমনি প্রিয়ার বিনুনি দেখা মাত্রই তাঁর বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে।

এটা পড়ে তাজ্জব মানছেন কেন?

রাজা শূদ্রকের 'মৃৎ-শকটিকা' পড়েন নি? জর্মনরা সংস্কৃতের সমজদার এস্তেক গ্যোটে হাইনে সংস্কৃত না জেনেও ভারতীয় নাট্যের স্মরণে উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করতেন। শূদ্রকের এই নাটকটি জর্মন ভাষাতে ক'বার যে ভিন্ন ভিন্ন রসিকজন দ্বারা অনূদিত হয়েছে বলা কঠিন, ক'বার যে জর্মনিতে মঞ্চস্থ হয়েছে সেটা বলা তার চেয়েও কঠিন। সেই নাট্যে আছে, ক্ষুধিত সূত্রধার বাড়ি ফেরার সময় গভীর দুশ্চিন্তায় মগ্ন—বাড়িতে তো চালডাল কিছুই নেই, গৃহিণী কি আদৌ রন্ধন করতে পেরেছেন? বাড়ি ঢুকেই সূত্রধার সানন্দে সবিস্ময়ে দেখেন, সাদা মাটির উপর লম্বা লম্বা কালো কালো আঁজি আঁজি দাগ—কালিমাখা হাঁড়ি মাটিতে ঘষে ঘষে গৃহিণী সাফসুৎরো করেছেন। অতএব ধূম্র দেখলে যে রকম বহ্নির উপস্থিতি স্বীকার করতেই হয়, হাঁড়ি পারষ্কার করা হয়ে থাকলে রান্নাও যে হয়েছে সে বিষয়ে কি সন্দেহ? সূত্রধার তখন সোল্লাসে উপমা দিয়ে বললেন, ওহো! সাদা মাটির উপর এই কালো কালো আঁজি যেন তুষারধবলা গৌরীর ললাটে কৃষ্ণাঞ্জন-তিলক!

কী মারাত্মক গন্ধময় হাঁড়িকুঁড়ি, মাটিতে সেগুলো ঘষার ফলে নো রা কালো আঁজির সঙ্গে শিবানী গৌরীর অসিত তিলকের তুলনা! এ যে রীতিমত হেরেসি, এ হেন তুলনা চার্বাকের বেদ নিন্দার চেয়েও ধর্মঘ্ন কটু-ভাষণ।

এর পরও আপনি আপত্তি করে বলবেন মর্ডান কবিতা ন দেবায় ন ধর্মায়?

বুদ্ধিমান তথা না-ছোড়-বান্দা পাঠক, আমি বিলক্ষণ জানি, আপনার প্রধান আপত্তি কোন্খানে—ছোটখাটোগুলো উপস্থিত না হয় বাদই দিলুম। আপনি বলবেন ওদের কবিতা পড়ে মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারি নে। আম্মো পারি নে

—ধাপ্পা না মেরে হক্ক কথাই কই। সে তো আপনার দোষ, আমার দোষ। আপনি আমি পয়সাওলার ছেলে হয়ে জন্মালে সত্যকার অপ্‌টুডেট্‌, chic, dernier cri, লেটেস্ট মডেলের হাইয়ার এডুকেশন পেতুম; আপনি, আমি আমরা নিদেন যদি অধ্যাপক হতুম, তারো নিদেন যদি আমরা তাঁদের শিষ্য হবার সুযোগ পেতুম, তবে তো আজ এ প্রশ্ন তুলতুম না। কিন্তু এহ বাহ্য।

'বুঝতে পারি নে' কথাটার অর্থ কি? আপনি ভৈরবী বা পূরবী শুনে যদি রস না পান তবে কি গায়ককে এ প্রশ্ন শুধান, 'ভৈরবীর অর্থ আমায় বুঝিয়ে দাও?' আরো সহজ দৃষ্টান্ত দি। পদ্মাবক্ষে আপনি সূর্যোদয় দেখে মুগ্ধ হলেন, মাঝি হলো না। সে যদি আপনার তন্ময় ভাব দেখে শুধোয়, 'কত্তা', সূর্যযি তো উঠলেন, কিন্তু আপনি এমন বে-এক্তেয়ার হলেন কেন? এ সূযযি ওঠাতে কি আছে আমাকে বুঝিয়ে দেন', তাহলে আপনি কি বোঝাবেন? তাজমহল দেখে হাক্‌স্‌লি মুগ্ধ হন নি, কিন্তু তিনি তো গাইডকে এ প্রশ্ন শুধোন নি, 'তাজমহলের অর্থ আমায় বুঝিয়ে বলো'। কিংবা ভরতনাট্যম দেখে আপনি যদি 'অর্থ' বুঝতে চান, তবে হয়তো অভিনয়াংশের অর্থ আপনাকে বোঝানো যাবে কিন্তু বিশুদ্ধ নাট্যরসের (যেমন যন্ত্রসঙ্গীতের) 'অর্থ'-ই বা কি, আর বোঝাবেই বা কে? চিত্রে একদা লোকে কোনো বস্তুর সঙ্গে তার সাদৃশ্য দেখে কিছুটা অর্থ পেত কিন্তু এখন ক্যুবিজম্‌, দাদাইজমে কেউ সাদৃশ্য খোঁজে না, অর্থও খোঁজে না। কাঠের একটা গুঁড়ি নিয়ে বিখ্যাত ভাস্কর ছ'মাস ধরে প্রাণপণ খাটলেন; প্রদর্শনীর মধ্যকক্ষে সেটি স্থাপিত করে তলায় নাম লিখলেন, কাঠের একটা গুঁড়ি। কাঠের গুঁড়ি, কাঠের গুঁড়ি; ভৈরবী, ভৈরবী। তার আবার অর্থ কি?

মনে হচ্ছে আপনি তন্ত্রের কিছুই জানেন না। তন্ত্রের নিগূঢ়তম মন্ত্রের অর্থ শোধান না গুরুকে? যদি তিনি প্রকৃত গুরু হন তবে আপনার হাড় ক'খানা আর আস্ত থাকবে না। আর অত গভীরে যাবার কি প্রয়োজন? এই যে পৃথিবীর কোটি কোটি নর-নারী উপাসনা করে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায়, তার ক'টা ভাষা লোকে বোঝে? আপনি উত্তরে হয়তো বলবেন, আমরা রস নিয়ে বিচার করছি। তা হলে স্মরণে আনুন, সেই বুড়ি—দাড়িওয়ালা কথকঠাকুরের কথকতা শুনে হাউ-হাউ করে কেঁদেছিল—কথকতার এক বর্ণ না বুঝেও। তার স্মরণে কি এসেছিল সেটা অবান্তর। তার কান্নাটা সত্য। তার রসবোধটা সত্য।

অলঙ্কার-শাস্ত্র অধ্যয়ন করে তলিয়ে দেখুন, অর্থ বোঝা মাত্রই রসোৎপন্ন হয় না—অর্থ পেরিয়ে যে ব্যঞ্জনা যে ধ্বনি যে অনির্বচনীয়তার সৃষ্টি হয়, রস সেই গভীর গুহায়। উপনিষদে আছে সত্য (এবং সত্যই অনুভূতির ক্ষেত্রে রস—

কারণ সৎ আনন্দ এবং চিৎ নিয়ে সচ্চিদানন্দ) আছেন সোনার পাত্রে লুকানো। সাধারণ জন সোনার পাত্র দেখেই মুগ্ধ, ভিতরে তাকিয়ে দেখে না। কাব্যে, সঙ্গীতে সর্বত্রই অর্থ জিনিসটা সুবর্ণপাত্র, তাই দেখে লোক মুগ্ধ। রস কিন্তু ভিতরে। তার সঙ্গে পাত্রের কি সম্পর্ক? পাত্রস্থিত অমৃতরসের সঙ্গে যে ধাতু (অর্থ) দিয়ে পাত্র নির্মিত হয়েছে তার কি সম্পর্ক? কিছুই না। তাই, এ সব বুঝেই কবি দ্বিজেন্দ্রলাল গেয়েছিলেন,

'জননী বঙ্গভাষা, এ জীবনে চাহি না **অর্থ**।'

মূর্খের উপাসনা অপেক্ষা পণ্ডিতের নিদ্রা শ্রেয়ঃ

আমাকে অনেকেই প্রশ্ন শুধান, হিন্দু, ধর্ম, হিন্দু শাস্ত্র নিয়ে যে অফুরন্ত কাহিনী কিংবদন্তী আছে—যেরকম যমদূত একবার ভুল করে মৃত্যুর নির্ধারিত দিবসের পূর্বে এক নায়েবকে নরকে নিয়ে যাওয়ার ফলে কি রকম তুমুলকাণ্ড ঘটেছিল—মুসলমানদের ভিতরও তেমনি আছে কি না। আছে, কিন্তু সেগুলো প্রধানত লোকশিক্ষার জন্য এবং অনেকগুলোতেই প্রচুর হাস্যরসও আছে। এসব গল্পের প্রাচুর্য ইরানেই বেশী, এবং তুর্কীতে খুবই কম। তুর্কীরা নাকি বড্ড বেশী সিরিয়াস। অতএব গোঁড়া। অতএব রসকষহীন।

আমার একটি গল্প মনে পড়ল এবং সেটা সকলেরই কৌতূহল জাগাবে। কারণ কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি ইহুদি, কি খৃষ্টান—সকলেই জানতে চায় মহাপ্রলয় (আরবীতে কিয়ামৎ) কবে আসবে? সর্ব ধর্মের শাস্ত্র-গ্রন্থেই তার কিছু কিছু ইঙ্গিত আছে, কিন্তু পাকাপাকি কোনো-কিছু জানার উপায় নেই। একদা নাকি খৃষ্টানদের বিশ্বাস ছিল, খৃষ্টজন্মের ১০০০ বৎসর পূর্ণ হলে মহাপ্রলয় আসবে শুনতে পাই, অনেক লোকেই নাকি তার কিছুদিন পূর্বে সর্বস্ব বিক্রয় করে দান-খয়রাতে উড়িয়ে দেয়।

১০০০ খৃষ্টাব্দ পূর্ণ হওয়ার দিনে শেষটায় যখন মহাপ্রলয় হল না তখন এরা পস্তিয়ে ছিলেন কি না জানি নে, তবে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হওয়া ভালো। এখন ১৯৬৬। যদি রটে যে, ২০০০-এ মহাপ্রলয়, তবে এখন যারা যুবা এবং বালক তারা যেন ঐ সময়টায় একটু ভেবেচিন্তে দান-খয়রাৎ করেন।

মহাপ্রলয় কবে আসবে, সে সম্বন্ধে আরবদের ভিতর একটি কাহিনী প্রচলিত আছে।

আল্লা-পাক নাকি একদিন প্রধান ফিরিশ্‌তা (বাঙলায় ফেরেস্তা লেখা হয় ; অর্থ এঞ্জেল, দেবদূত) জিব্রাইলকে (ইংরিজিতে গেব্রিয়েল) ডেকে আদেশ দেবেন, যাও তো, মানুষের ছদ্মবেশ ধরে পৃথিবীতে। যে কোনো একজন মানুষকে শুধোও, জিব্রাইল এই মুহূর্তে কোথায় আছেন ? জিব্রাইল পৃথিবীতে নেমে একজন মর্ত্যবাসীকে সেই প্রশ্ন শুধোলেন। লোকটা কিঞ্চিৎ বিরক্ত হয়ে বললো 'এরকম বেফায়দা প্রশ্ন করে লাভটা তোমার কি ? আমার এসব জিনিসে কোনো কৌতূহল নেই, তবে যখন নিতান্তই শুধোলে তবে—দাঁড়াও, বলছি।' লোকটি দুই লহমা চিন্তা করে বলল, 'হুঁ, ঠিক বলতে পারবো না—তবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, সে (আরবীতে ইংরিজীর মত he-র সম্মানার্থে কোনো 'তিনি' শব্দ নেই এখন পৃথিবীতে। বেহেশ্‌তে নয়।' জিব্রাইল স্বর্গে ফিরে আল্লাকে উত্তরটা জানালে তিনি বলবেন, 'ঠিক আছে।' তার পর কেটে যাবে আরো বহু সহস্র বৎসর। তার পর আবার আল্লা-পাক ঐ একই প্রশ্ন একই ভাবে শুধোবার জন্য জিব্রাইলকে পৃথিবীতে পাঠাবেন। এবারে যে মর্ত্যবাসীকে শুধোনো হল, সে বিরক্ত হল আরো বেশী। বললে, 'কি আশ্চর্য ! এখ.না মানুষ এরকম সম্পূর্ণ বাজে বেকার প্রশ্ন করে ! হিসেব কষলে যে এরকম প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না তা নয়, তবে দেখো, এসব ব্যাপারে আমার কোন উৎসাহ নেই। আচ্ছা…' এক সেকেণ্ড চিন্তা করে লোকটা বললে, 'স্বর্গে তো নয়, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে…', ফের দু'সেকেণ্ড চিন্তা করে বললে, 'পৃথিবীতেই যখন, দাঁড়াও, হাঁ, কাছেপিঠেই কোথাও—আমি চললুম।' জিব্রাইল বেহেশ্‌তে ফিরে এসে আল্লাকে সব কিছু বয়ান করলেন। আল্লা বললেন, 'ঠিক আছে।' তার পর কেটে যাবে আরো কয়েক হাজার কিংবা কয়েক লক্ষ বৎসর। আবার জিব্রাইল সেই হুকুম নিয়ে ধরাভূমিতে আসবেন। এবার যাকে শুধালেন সে তো রীতিমত চটে গেল—'এসব বাজে বাজে প্রশ্ন…ইত্যাদি।' জিব্রাইল বেশ কিছুটা কাকুতি-মিনতি করাতে সে নরম হয়ে বললো, 'তাহলে দেখি ! হুঁঃ, স্বর্গ নয়, পৃথিবীতে।' তারপর আরেক সেকেণ্ড চিন্তা করে বললে, 'কাছে-পিঠে কোথাও।' তারপর আরো দু'সেকেণ্ড চিন্তা করে তাজ্জব মেনে বলবে, 'কী আশ্চর্য, যে এরকম মস্করা করো। তুমিই তো জিব্রাইল—তবে শুধাচ্ছো কেন ?' এবারে জিব্রাইল সব খবর দিলে আল্লা-পাক হুকুম দেবেন মহাপ্রলয়ের শিঙা বাজাতে।

কথিকাটির তাৎপর্য কি ?

প্রথমত, মানুষ তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করে করে এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছবে যে স্বর্গের খবর পর্যন্ত তার কাছে আর অজানা থাকবে না।

দ্বিতীয়ত, কিন্তু, তার তাবৎ জ্ঞান-বিজ্ঞান বিদ্যাচর্চার একমাত্র উদ্দেশ্য হবে সাংসারিক, বৈষয়িক, প্র্যাকটিকাল জিনিস নিয়ে।[১] ইহলোক ভিন্ন পরলোক, পাপপুণ্যের বিচার, সে স্বর্গে যাবে না নরকে জ্বলে পুড়ে খাক হবে—এ সম্বন্ধে তার কোনো কৌতূহল থাকবে না, কারণ স্বয়ং জিব্রাইলকে হাতের কাছে পেয়েও সে এসবের কোনো অনুসন্ধান করলো না। এমন কি সৃষ্টিকর্তা আল্লা— দীন দুনিয়ার মালিক—যাঁকে পাবার জন্য কোটি কোটি বৎসর ধরে শত শত কোটি মর্ত্যের মানুষ স্বর্গের দেবদূত আমৃত্যু দেবদুর্লভ সাধনা করেছে, তাঁর প্রতিও সে উদাসীন।

তৃতীয়ত, যেহেতু সে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব, তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন অতএব কল্পনা করা কঠিন নয় যে, সে তখন বিশ্বভুবন তার খেয়াল-খুশী মর্জি মাফিক নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টায় লেগে যাবে। তারই ফলে হয়তো বেরুবে শত শত আইষমান কোটি কোটি ঈশ্বরসৃষ্ট জীবকে বিনাশ করতে।

* * *

ভরসা হচ্ছে, বিশ্ববিবর্তনে যদ্যপি সেই চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি, অর্থাৎ মানুষ ক্রমেই সত্যসুন্দরের অল্-হক্ অল্-জমীল) সাধনার পথ থেকে দূরে চলে যাচ্ছে তবু এখনো বোধ হয় পরিপূর্ণ জড়বাদে পৌঁছতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে। পক্ষান্তরে ইসলাম একথাও বলেন, কিয়ামৎ যে-কোনো মুহূর্তে আসতে পারে। তার অর্থ, মানুষ হয়তো হঠাৎ এক লম্ফে পরিপূর্ণ জড়বাদে পৌঁছে যেতে পারে।

পয়গম্বর বলেছেন, "আল্লার থেকে মানুষকে দূরে নিয়ে যায় শয়তান।" সেই শয়তান জড়বাদের প্রতিভূ এবং প্রতীক। অতএব প্রত্যেক সত্য-জ্ঞানান্বেষীর প্রধান কর্তব্য জড়বাদ অর্থাৎ শয়তানের কীর্তিকলাপ কি প্রকারে বাহ্যজগতে স্বপ্রকাশ হয় সে সম্বন্ধে সচেতন থাকা—তথা শয়তান প্রলোভন নিয়ে উপস্থিত হলে আত্মহারা না হয়ে জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা তার স্বরূপ চিনতে পারা। শুদ্ধমাত্র আচার-

---

১ ইমাম গজ্জালী মুসলিম জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ—কেউ কেউ বলেন সর্বশ্রেষ্ঠ—মনীষী। তিনি একাধারে দার্শনিক, শাস্ত্রী ও সুফী (রহস্যবাদী ভক্ত) ছিলেন। আরব্যোপন্যাস যুগের বিখ্যাত বাগদাদ নগরীর বিশ্ববিদ্যালয় সে যুগের মধ্যপ্রাচ্যের সর্বোত্তম জ্ঞানকেন্দ্র ছিল। ইমাম গজ্জালী তার রেক্টর (শেখ) ছিলেন। অধুনা তাঁর একখানা বইয়ে দেখি, তিনি মনস্তাপ করছেন যে, তাঁর কালের (মৃত্যু ১১১১ খৃষ্টাব্দে) লোক শুধু প্র্যাকটিক্যাল বিদ্যা শেখে। আমি ভরসা পেলুম।

অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে সরল জীবন যাপনই যথেষ্ট নয়; জ্ঞানানুসন্ধান নিত্য-প্রয়োজনীয় অবশ্যকর্তব্য। এই মর্মে আরেকটি কাহিনী আছে :—

একদা শয়তানের রাজা, ধাড়ি শয়তান এক বাচ্চা শয়তানকে তালিম দিচ্ছিল, সৎপথগামীদের কোন্ কোন্ পদ্ধতিতে বিপথগামী করা যায়। ধাড়ি শয়তান অতিশয় ধুরন্ধর গুরু এবং বিশ্বপর্যটক (জাহানদীদা) রূপে অপর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে সম্যক অবগত আছে, কোন্ প্রকারের মানুষ কোন্ পদ্ধতিতে চলে, কাকে সমঝে চলতে হয়, আর কেই বা অগা আহাম্মুখ। ঐ অনুচ্ছেদে এসে ধাড়ি বললে, 'কিন্তু বৎস, হুঁশিয়ার। আচারনিষ্ঠ সাধুজনকে বরঞ্চ আমাদের পথে (মানবীয় ভাষায় কুপথে) নিয়ে যাবার চেষ্টা করো কিন্তু জ্ঞানী পণ্ডিতকে সমঝে-বুঝে চলো। ওরা বড়ই ভীষণ প্রাণী। সৃষ্টির আদিম কাল থেকে ওরাই আমাদের আদিম দুশমন।'

শাগরেদ ক্ষুদে শয়তান আশ্চর্য হয়ে বললে, 'সে কি কথা। আচারনিষ্ঠ জন তো সদাই জপতপ নিয়ে ব্যস্ত থাকে; আমার কথা ভাববার তার ফুরসৎ কই? আর পণ্ডিতদের কথা যখন বললেনই, প্রভু, তবে নিবেদন করি, আজকের দিনে তাদের অবস্থাটা একটু পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখুন। খেতে পায় না, পরতে পায় না আর আকাট-মূর্খ নিষ্কর্মারা বড় বড় চাকরির পদবী নিয়ে ওদের মাথায় ডাণ্ডা বোলায়। নিজে মেস্টার, ওদিকে ছেলেটাকে কলেজে পাঠাতে পারে না। এসব হাভাতেদের লোভ দেখিয়ে পথ ভোলাতে কতক্ষণ?'

ধেড়ে হেসে বললে, 'খুব তো মুখে মুখে হাই-জাম্প লঙ-জাম্প দেখালি। কাজের বেলা কি হয় সেটা বোঝা যাবে পরশু দিন প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে।'

পরশু দিনের দিন প্র্যাকটিক্যাল। সে বড় কঠিন তালিম। তাবৎ হপ্তার এলেম হাতেনাতে বাৎলাতে হয়। আমাদের ইস্টুডেন্টরা টুকলি-নকল করলে আমরা যে রকম সেটাকে 'শয়তানী' নাম দিয়ে চোটপাট করি, এখানে তেমনি সাধু সরল পন্থায় কম উদ্ধার করতে গেলে সেটাকে 'সাধুমী' বলে গুরু কান মলে দেয় শিষ্যের।

ধেড়ে আদেশ দিলেন, 'ঐ যে হোথা একটি সরল সাধু জপ করছে ওকে আমাদের পথে নিয়ে আসার ডিমনস্ট্রেশনটি করো তো, বৎস।'

বাচ্চা শয়তান প্রমাদ গুনলো। এই সৌম্যদর্শন, কৃচ্ছ্রসাধনজনিতপাণ্ডুর তথাপি মধুরবদন সাধুকে ধর্মপথ থেকে বিচলিত করা কি তার মত চ্যাংড়া শাগরেদের কর্ম। না জানি, আজ কপালে কি আছে।

ক্লাসে যে নোট দেওয়া হয়েছিল, সেগুলো সে দফে দফে স্মরণে আনলো। তার

পরে বিএলজব্‌ব, ইব্‌লিস, ডিয়াবলুস, শয়তান-উস্‌শয়াতীন সবাইকে মনে মনে হাজার হাজার আদাব-বন্দেগী জানিয়ে গেল বেশ ধারণ করতে।

আহা! সে কী চিত্তহারিণী ভূষা! ধেড়ে, আণ্ডা, সব শয়তানকে লড়তে হয় ফিরিশ্‌তা অর্থাৎ দেবদূতদের সঙ্গে—তাই ওঁদের চালচলন বেশভূষা তারা খুব ভালো করেই চেনে। এ যুগে হিটলার পোলাণ্ড আক্রমণ করার পূর্বে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কিছু জর্মনদের পরিয়ে দেন পোলিশ সৈন্যের উর্দী। সেই উর্দী পরে তারা 'আক্রমণ' করে একটি জর্মন বেতারকেন্দ্র—পোলিশ-জর্মন সীমান্তে। সেই 'আক্রমণে'র ও 'আক্রমণে নিহত পোলিশ সৈন্যে'র ছবি হিটলার বিশ্বময় প্রকাশ করে সপ্রমাণ করেন যে, পোলরাই প্রথম জর্মনি আক্রমণ করে!

হিটলার, হিমলার, আইষমান, হোস এঁরা তো খাস শয়তানের তুলনায় শিশু।[২] ছদ্মবেশ ধারণে এনারা এমন আর কি 'কৈশল' দেখাবেন।

বাচ্চা শয়তান ধারণ করলো দেবদূত—ফিরিশ্‌তার বেশ।

অঙ্গ থেকে বেরুচ্ছে দিব্যজ্যোতি এবং নন্দনকাননমন্দারসৌরভ; তার প্রতি পদক্ষেপে ঝংকৃত হচ্ছে অপ্সরাবিনিন্দিত সঙ্গীত-নিক্বণ—সঙ্গে এসেছে বসন্তপবনের মৃদু হিল্লোল মলয়ানিল বিলোলানন্দোল্লাস!

বাচ্চা শয়তান সম্মুখীন হল সাধুর। বললে, 'তোমার তপশ্চর্যায় পরিতুষ্ট হয়ে আল্লা-তালা আমাকে পাঠিয়েছেন তোমাকে সশরীরে স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্য। তুমি আমার স্কন্ধে আরোহণ করো।'

বলা মাত্রই সে বুরাকের বেশ ধারণ করলো।

বুরাক্ অনেকটা পক্ষীরাজের মত। সর্বাঙ্গ অত্যুত্তম অশ্বন্যায় এবং উভয় স্কন্ধে দুটি পক্ষ।[৩]

২ অনেকে মনে করেন এ-অধম নাৎসি দলের নির্ভেজাল দুশমন। তাই বলতে বাধ্য হচ্ছি, যুদ্ধের গোড়ার দিকে হিটলার যে ইংরেজকে বেধড়ক চড় কশায় সেটা এ অধমের চিত্তে সাতিশয় বিমলানন্দ দিয়েছিল। আমার মতে হিটলারের সব চেয়ে মারাত্মক ভুল হয়, তিনি ফ্রান্সের পতনের পর যখন ইংলণ্ড আক্রমণ করলেন না। না হয় তিনি নিলক্ষকাম হতেন। তাতেই বা কি! মহৎ কর্ম করতে গিয়ে নিষ্ফল হওয়া অপকর্মে (রুশ আক্রমণ) সফল হওয়ার চেয়ে শ্রেয়ঃ।

৩ মুসলমানী ও পার্সী রেস্তোরাঁতে নাত্যুন্নাসিক হিন্দু পাঠকও এই ছবি দেখে থাকবেন। পয়গম্বর হজরৎ মুহম্মদ সাহেব এই বুরাকে চড়েই স্রষ্টিকর্তা সন্নিধানে যান। বিরুদ্ধ পক্ষ বলেন, তিনি সশরীরে যান নি; তাঁর রূহ, অর্থাৎ আত্মা

কিন্তু বাচ্চা শয়তান ক্লাসের থিয়োরেটিকাল সর্ব আদেশ মেনে চলতে চলতে ভয়ে বেপথু-কম্প্রমান, এই সামান্য ফাঁদটা সাধু না ধরে ফেলেন!

কিন্তু ধেড়ে শয়তান দূর থেকে নিশ্চিন্ত মনে সব-কিছু দেখছে। সে বিলক্ষণ জানে, এসব আচারনিষ্ঠ জন বড় দম্ভী হয়। এরা ভাবে, সংসারের সর্বভোগ যখন ত্যাগ করেছি, তখন আর স্বর্গের সর্বসুখ আমি পাবো না কেন?

এই দম্ভই তাঁদের সর্বনাশ আনে, সে তত্ত্ব শয়তান দেখেছে, যুগ যুগ ধরে।[৪]

তপস্বী সাধু ক্ষণমাত্র চিন্তা না করে চেপে বসলেন সেই ভেজাল বুরাকের স্কন্ধে।

তারপর কি হল, সেটা বর্ণনা করতে আমার বাধে। কারণ সেটাতে আছে বীভৎস রস। সংক্ষেপে বলি, সাধুর যখন জ্ঞান হল তখন তিনি বিষ্ঠাকুণ্ডে। বাচ্চা শয়তান একবার তাঁকে কাঁধে পেয়ে পেয়েছে বাগে। ক্লাসের নোট-মাফিক তাঁকে সর্বযন্ত্রণা দিয়ে অজ্ঞানাবস্থায় ফেলে দিয়ে গেল পুরীষ-গহ্বরে।

সুশীল পাঠক। তুমি বলবে, আচারনিষ্ঠ সজ্জনের এই অসদ্‌গতি হল কেন? আমিও গল্পের এই পর্যায়ে কাহিনী কীর্তনিয়া মৌলানাকে ঐ একই প্রশ্ন শুধোই।

তিনি শান্তকণ্ঠে বললেন, 'পুচ্ছাংশ দেখিয়াই সর্বাঙ্গ বিচার করা যায় না। অবহিত চিত্তে সর্বাঙ্গসুন্দর কাহিনীটি প্রণিধান করহ।'

এবারে ধেড়ে শয়তান বাচ্চাকে বললে, 'ঐ যে দেখা যাচ্ছে দূরে এক আলিম। এবারে বাবাজী, সাবধান!

বাচ্চা কিন্তু ভয় পাওয়ার মত কিছুই দেখলো না। পণ্ডিত বটে লোকটি, কিন্তু নামাজ রোজায় যে তাঁর মাঝে মাঝে ত্রুটি হয়ে যায়, সে তো জানা কথা। বইয়ের নেশায় তাঁর কাটে অষ্টপ্রহর। এটাকে বাগে আনতে আর কতক্ষণ?!

গিয়েছিল। অর্থাৎ বুরাক ইত্যাদি রূপকার্থে নিতে হবে।

৪ কবি রবীন্দ্রনাথ কৃচ্ছ্রসাধনে দম্ভ দেখে সর্বত্যাগী ভৈরব-শঙ্করকে উদ্দেশ করে বলছেন—

'আমাকে চেনে না তব শ্মশানের বৈরাগ্যবিলাসী
দারিদ্র্যের উগ্র দর্পে খলখল ওঠে অট্টহাসি
দেখে মোর সাজ।'

সর্বত্যাগী শঙ্কর হিন্দুর উপাস্য। কিন্তু তাঁর সর্বস্ব ত্যাগের অন্ধানুকরণ ও তৎসহ তাই নিয়ে দম্ভ, সেই ত্যাগের luxury, যেমন মূর্খ চেলারা করেন, কবি সেইটে এই কবিতায় বুঝিয়েছেন।

পূর্ববৎ দেবদূত-বেশ ধারণ করে বাচ্চা শয়তান পণ্ডিতের সামনে এসে দাঁড়ালো। পূর্ববৎ তাঁকে স্বর্গে নিয়ে যাবার প্রস্তাব জানালো।

পণ্ডিত তখন রকে বসে বদনা থেকে জল ঢেলে মুখ ধুচ্ছিলেন।

ভুললে চলবে না, ইনি পণ্ডিত। সশরীরে স্বর্গে যাওয়ার প্রস্তাব শুনেই তাঁর চড়াকসে মনে পড়ে গেল ইতিপূর্বে কে কে আল্লার সমীপবর্তী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। মুসা (Moses), ঈসা (যীশু), হজরৎ পয়গম্বর—ব্যস্।

তাই পণ্ডিত উত্তমরূপেই জানতেন, তিনি এমন কিছু পুণ্যশীল মহাপুরুষ 'প্যাকম্বর' নন যে আল্লা তাঁকে স্বর্গে যাবার জন্য ডেকে পাঠাবেন।

'বটে রে, ব্যাটা!' মনে মনে বললেন পণ্ডিত। 'মস্করা করার জায়গা পাও না! আজ তোমারই একদিন, আর আমারই একদিন।'

স্মহাস্য-আস্যে মৌলবী বললেন, 'কী আনন্দ, কী আনন্দ! স্বর্গে যাবার জন্য তো আমি হামেহাল তৈরি। কিন্তু, ভদ্র, এ যুগে বড় ভেজাল চলছে। কি করে জানবো, তুমি সত্যই দেবদূত। শুনেছি দেবদূতেরা মুআজিজা কেরামৎ (miracle) দেখাতে পারেন। তুমি কিছু একটা দেখাতে পারলেই আমি তোমার সঙ্গে যেতে প্রস্তুত।'

বাচ্চা শয়তান বলল, 'আপনি কি মিরাক্‌ল্ দেখতে চান, বলুন।' তার মনে বড় আনন্দ, অর্ধেক কেল্লা ফতেহ্ করে ফেলেছে!

পণ্ডিত বললেন, 'শুনেছি, দেবদূত অনায়াসে ক্ষুদ্র, বৃহৎ, সব আকার গ্রহণ করতে পারেন। তুমি পারো?'

'নিশ্চয়!'

'তাহলে তুমি ক্ষীণ কলেবর গ্রহণ করে আমার এই বদনার নালি দিয়ে ভিতরে ঢুকতে পারো?'

বাচ্চা শয়তান উল্লাসে মনে মনে নৃত্য করছে, পণ্ডিত এর চেয়ে অন্য কঠিন কর্ম করতে ইচ্ছা জানান নি বলে। তাকে তো অনায়াসে তিনি আরবীস্তানের বিরাট মরুভূমি, কিংবা ইউফ্রাতেস নদী, কিংবা আকাশের সূর্য বা দিবাভাগে পূর্ণচন্দ্র হতে বলতে পারতেন।

পাছে তিনি মত পরিবর্তন করে ফেলেন, তাই সে তন্মুহূর্তেই পণ্ডিতের বদনার নালির ভিতর দিয়ে ঢুকে পড়লো।

যেই না ঢোকা, পণ্ডিতের আর কোনো সন্দেহ রইল না ব্যাটা বদমাশ। তিনি ভালো করেই জানেন, আল্লার আপন দূত একটা বদনাতে ঢুকতে যান না। তিনি বহুবিধ শাস্ত্র পড়েছেন, তাতে এমন মিরাক্‌ল্, কেরামতের উল্লেখ নেই।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি পাশের পিঁড়িটা বদনার উপর চেপে তার উপর আরো ভালো করে চেপে নিজে বসে পড়লেন এবং বদনার নালিতে ঢুকিয়ে দিয়েছেন একটা খেজুর। বেশ মোলায়েম ফল ; টায়ে টায়ে বদনায় সেঁটে যায়।

এবং চিৎকার :—

'গিন্নী, গিন্নী! নিয়ে এসো তাড়াতাড়ি উনুনটা। ব্যাটাকে আজ সেদ্ধ করে হালুয়া বানাবো। ব্যাটা আমার সঙ্গে মস্করা করতে এসেছে! শা—, হা—জা—, বা—।[৫]

হৈহৈ রৈরৈ কাণ্ড! বুড়ো শয়তান দূর থেকেই বুঝেছে বেপারটা সঙ্গীন।

সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত-মৌলবীর পায়ে এসে পড়লো।

বাচ্চাটাকে বাঁচাবার জন্য সন্ধি-আপোস করতে চায়।

সন্ধির শর্ত হল, শয়তান এবং তস্য গোষ্ঠী ঐ মৌলবী-পণ্ডিত গোষ্ঠীর কাউকে প্রলোভিত করতে পারবে না।

* *

প্রথম গল্পের সঙ্গে এ গল্পের কি সম্পর্ক ?

যতক্ষণ অবধি পণ্ডিত-মৌলবী-মৌলানা-রাব্বী-ফাদার-দস্তুর সুদ্ধমাত্র প্র্যাকটিকাল বিষয়ে মত্ত হবেন না, ততদিন মহাপ্রলয় আসবে না।

* *

কিন্তু পাঠক, তোমার মস্তিষ্কে, হৃদয়ে যে প্রশ্ন আমারো তাই। কী দরকার সেই মহা-মহাপ্রলয় ঠেকিয়ে? যেখানে পৌঁচেছি, চাল নেই, তেল নেই, মাছ নেই—

২।১০।৬৫

৫ পণ্ডিত মাত্রেই কি ভারত, কি আরব সর্বত্র আমাদের আজকের দিনের বিচারে বড় অশ্লীল গালাগাল দেন। 'তোমার সঙ্গে আলোচনা বন্ধ্যাগমন' আমাকে একাধিক পণ্ডিত বলেছেন। আমি তখন শান্তিপুরে নব্যন্যায় শিক্ষার 'বন্ধ্যাগমন' করছি। দোষ আমারই, তাঁদের নয়। কাইরোতেও একই অবস্থা!

আলবের্ট শোয়াইৎসার্

"আজিকে একেলা বসি শোকের প্রদোষ-অন্ধকারে,
মৃত্যুতরঙ্গিণীধারা-মুখরিত ভাঙনের ধারে
তোমারে শুধাই,—আজি বাধা কি গো ঘুচিল চোখের
সুন্দর কি ধরা দিল অনিন্দিত নন্দনলোকের
আলোকে সম্মুখে তব,—উদয়শৈলের তলে আজি
নবসূর্য বন্দনায় কোথায় ভরিলে তব সাজি
নবছন্দে, নূতন আনন্দগানে?"

এই কবিতাটি রচিত হবার পর প্রায় চল্লিশ বৎসর কেটে গিয়েছে। আমার চেনা-অচেনা অনেক প্রখ্যাত পুণ্যশ্লোক জন ইহলোক ত্যাগ করেছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এ প্রশ্নটি তাঁদের উদ্দেশে শুধাই নি। হয়তো ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু আজ আর এ প্রশ্ন না শুধিয়ে থাকা গেল না।

কারণ এই মহাপুরুষ জীবনে সত্য সুন্দর শিবের যে সাধনা করেছিলেন সেটা সর্বযুগেই বিরল। এবং তার চেয়েও আশ্চর্য, তিনি একই পথে আজীবন সাধনা করেন নি।

আল্‌সেসের কাইজারবের্ক অঞ্চলে ১৪ই জানুয়ারী ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে এঁর জন্ম।[১] সে অঞ্চল তখন জর্মন ছিল বলে তিনি জর্মন। ধর্মতত্ত্ব (প্রটেস্টান্ট বা এভানজেলিক) পড়ে তিনি চব্বিশ বছর সহপাদ্রিরূপে ঈশ্বর-মানুষ-গির্জার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। কিন্তু বছর তিন যেতে না যেতেই খৃষ্টধর্মের মূলতত্ত্ব নিয়ে তাঁর মনে যে-সব প্রশ্নের উদয় হয় সেগুলো নিয়ে চিন্তা, গবেষণা ও সাধনা গির্জার সেবায় নিযুক্ত থেকে হয় না। তাই তিনি বিখ্যাত স্ট্রাসবুর্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার হয়ে কাজে যোগ দেন। এই অল্প বয়সেই তিনি যে গবেষণা করেন সেটা খৃষ্টধর্মের ইতিহাসবিদ্‌দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এবং সে গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য পাণ্ডিত্য সঞ্চয় বা পাণ্ডিত্য প্রকাশ আদৌ নয়। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কি প্রকারে খৃষ্টের বাণী ও তৎপরবর্তী খৃষ্টধর্মের প্রথম উৎপত্তিযুগের এমন একটি অর্থপূর্ণ সর্বাঙ্গসুন্দর ছবি পাওয়া যায় যেটা আজও এবং আবার নূতন করে খৃষ্টসমাজে নূতন প্রাণ, নূতন ভক্তি, চরিত্রসংগঠন ও সমাজবাস করার জন্য নূতন নীতি নির্মাণ করে দেবে।

এদেশে রামমোহন তাই করেছিলেন। অর্থাৎ উপনিষদের স্বর্ণযুগ পুনরায়

আলোকিত করতে চেয়েছিলেন।

সউদী আরবের রাজা ইব্‌ন্ সউদ যে-সম্প্রদায়ভুক্ত তার প্রতিষ্ঠাতা ওয়াহ্‌-হাবও তাই করেছিলেন।

শ্বোয়াইৎসার্ এই সব তত্ত্বচিন্তায় ধ্যানধারণায় নিযুক্তকালীন প্রচুর সময় ব্যয় করেন সঙ্গীতস্রষ্টা য়োহান্ সেবাস্টিয়ান্ বাখ্-এর উপর। এখানেও সেই নবাবিষ্কারের কথা। এটা সত্য যে, বহু বৎসর দু-চারিটি কেন্দ্র ভিন্ন অন্য সর্বত্র বাখ্ অনাদরে থাকার পর সঙ্গীতস্রষ্টা মেণ্ডেলজোন্ পুনরায় রসিকজনের দৃষ্টি বাখ-এর দিকে আকৃষ্ট করেন। এর পরেই বাখ-এর অন্যতম প্রধান ভাষ্যকার শ্বোয়াইৎসার্। গির্জার অর্গেনসঙ্গীত তাঁরই প্রচেষ্টা ও প্রচারের ফলে পুনরায় নবজীবন লাভ করে। (অর্গেন ও অর্গেল এদেশের সঙ্গীতকে উনবিংশ শতাব্দীতে প্রচুর প্রভাবান্বিত করে। এই নিয়েই কিঞ্চিৎ গবেষণা কিছুদিন পূর্বে এদেশে হয়। তার অন্যতম প্রশ্ন তখন ছিল, অর্গেনকে কেটে হারমোনিয়ামরূপে প্রবর্তিত করে কে জনপ্রিয় হন কি করে, এর প্রতি আকাশবাণীর এত রাগ কেন, যদিও খান আবদুল করীম খানের মত মহাপুরুষ যখন এরই সঙ্গতে গেয়েছেন ? এ নিয়ে আরো আলোচনা হলে ভাল হয়। আবার কৃতজ্ঞচিত্তে শার্ঙ্গদেবের শরণ নিচ্ছি। এবং এর সঙ্গে আরেকটি নিবেদন, ইয়োরোপীয় সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচয়কামী নবীন ভারতীয় শাগরেদকে একাধিক ইয়োরোপীয় বাখ্ নিয়ে আরম্ভ করতে বলেন। বাখ-এর রস পাওয়া আমাদের পক্ষে সহজতর। এ বিষয় নিয়েও তুলনাত্মক সঙ্গীত-মহলে আলোচনা হওয়া উচিত।) এমন কি বলা হয় শ্বোয়াইৎসার্ স্বহস্তে উত্তম অর্গেনও নির্মাণ করতে শেখেন।

উপরের দুটি সাধনা—খৃষ্টের জীবনানুসন্ধান ও বাখ্—ভিন্ন তাঁর প্রধান অনুসন্ধান ছিল রাষ্ট্রবিজ্ঞানে, রাষ্ট্রচালনায়, ধর্মনীতিকে পুনরায় দৃঢ় ভূমিতে স্থাপন করা।

* *

সাধনা, অধ্যয়ন, ধ্যানধারণা, বাখ-এর ভগবদ্‌সঙ্গীত এ সমস্ত নিয়ে যখন শ্বোয়াইৎসার্ তন্ময়, যখন তাঁর খ্যাতি জর্মনির বাইরে বহুদূরে চলে গিয়েছে, তখন এই মহাত্মা হঠাৎ একদিন ত্রিশ বৎসর বয়সে, অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়ে ভর্তি হলেন মেডিকেল কলেজে। কারণটি সরল অথচ সুদূরে নিহিত।

ফরাসী-কঙ্গ অঞ্চলে যে-সব অনাচার হয়ে গিয়েছে তার খেসারতি মেরামতি করতে হবে। কঙ্গর গভীরতম জঙ্গলে যে শত শত আফ্রিকাবাসী কুষ্ঠরোগে দিন দিন ক্ষয় হচ্ছে তাদের সেবা করতে হবে।

তার পূর্বে কিন্তু তা হলে তো চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে হয়। ঠিক সেই জিনিসটিই সমাধান করে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে মিশনারি ডাক্তাররূপে তিনি ফরাসী-কঙ্গর দুর্গম অরণ্যের লাঁবারেনে-অঞ্চলে গিয়ে কুষ্ঠরোগীদের জন্য হাসপাতাল খুললেন। তাঁর স্ত্রী দেশে নার্সের ট্রেনিং নিয়ে সেখানে সেবিকার কাজ গ্রহণ করলেন।

কিন্তু এই কঙ্গবাসী কুষ্ঠরোগীদের অর্থসামর্থ্য কোথায়? শ্বোয়াইৎসার্ আবার সর্বশ্রেষ্ঠ ওষধি, সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি, সর্বোত্তম সহকর্মী নিয়ে চিকিৎসা করতে যান! তার জন্য অর্থ কোথায়?

এর পরের ইতিহাস দীর্ঘ। তাতে আছে আদর্শবাদ, নৈরাশ্য, অকস্মাৎ অযাচিত দান এবং সর্বোপরি শ্বোয়াইৎসারের অকুণ্ঠ বিশ্বাস: "মানুষের জীবন বিধিদত্ত রহস্যাবৃত—এর প্রতি প্রত্যেকটি মানুষের ভক্তি বিস্ময় ভয় থাকা উচিত।" এই অটল বিশ্বাস নিয়ে তিনি কিছুদিন পর পর সেই দুর্গম জঙ্গল অতিক্রম করে, ইয়োরোপে এসে অত্যুৎকৃষ্ট স্বরচিত আপন অভিজ্ঞতাপূর্ণ (বিশেষ করে অন্ধকার-কঙ্গর) পুস্তক প্রকাশ করে, প্রাচীন দিনের বাখ-এর সঙ্গীত বাজিয়ে অর্থোপার্জন করতেন। প্রথম যুদ্ধের সময় তাঁর কাজে বাধা পড়ে; কারণ তিনি জাতে জর্মন হয়েও বাস করছেন ফরাসী কলনিতে—কিন্তু সেটা দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি এতই ভুবনবিখ্যাত যে দুই যুযুধান সৈন্যদলই তাঁর হাসপাতালকে এড়িয়ে বাঁচিয়ে যুদ্ধ করে।

কিন্তু ১৯১৩ থেকে ১৯১৫—এই দীর্ঘ বাহান্ন বৎসরের একনিষ্ঠ সাধনা তো ক্ষুদ্র একটি প্রবন্ধে শেষ করা যায় না। যদি কখনো সে সাধনার সিকি পরিমাণ খবরাখবর সংগ্রহ করতে পারি তবে পুনরায় চেষ্টা নেব।[২]

মরহুম ওস্তাদ ফৈয়াজ খান

বিসমিল্লাতেই অতিশয় সবিনয় নিবেদন—আর্‌জ্ করে রাখি, এ অধম উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মারপ্যাঁচ বিলকুল বোঝে না, ভরত থেকে আরম্ভ করে ধূর্জটিপ্রসাদ তক্

২ শ্বোয়াইৎসার্ ভারতীয় চিন্তাধারা সম্বন্ধে ১৯৩৫ সালে Die Weltanschauung der indischen Denker নামক একখানা বই লেখেন। এ বই সম্বন্ধেও অনেক-কিছু বলার আছে। আমি বহু বৎসর পূর্বে পড়েছি। সেখানি ফের পেলে কিছু লেখার দুরাশা আছে।

যে সব গুণীজ্ঞানী সঙ্গীতশাস্ত্র নির্মাণ করে গেছেন তাঁদের প্রতি আমার অগাধ ভক্তি, কিন্তু তাঁদের বর্ণিত রাগরাগিণীর পুত্রকন্যা গোষ্ঠীকুটুম কে যে কোন্ মেলে পড়েন, কিছুতেই মনে রাখতে পারি নে। শুধু তাই নয়, সবচেয়ে মারাত্মক তত্ত্ব, আমি পূর্ণ একটি বছর রেওয়াজ করেও তবলার গভীরে কেন—কানি পর্যন্ত পৌঁছতে না পেরে নিরাশ হয়ে সাধনাটি ছেড়ে দি, অতি দুঃখে অতি অনিচ্ছায়। অবশ্য নিতান্ত সত্যের অপলাপ হবে—তাই এটাও ক্ষীণ কণ্ঠে বলে রাখি, দ্রুতের রেওয়াজ করতে গিয়ে আমার হাতের কড়াতে আর্তরাইটিস হয়।

দ্বিতীয়ত, এ ক্ষুদ্র রচনাটি মজলিস্-রোশন সমঝদারদের জন্য নয়, নয়, নয়। আমি খান সাহেবকে পেয়েছিলুম মানুষ হিসাবে, বন্ধু হিসাবে। তিনি আমাকে মুগ্ধ করেছিলেন, সম্মোহিত করেছিলেন তাঁর মধুর ব্যক্তিত্ব দিয়ে—যদিও তিনি খুব ভালো করেই জানতেন, আমি তাঁর জয়-জয়ন্তীতে যত না রস পাই, তার চেয়ে বেশী পাই তাঁর কাফি হোলিতে।

তাই দয়া করে মেনে নিন, এ লেখাটি সাধারণ পাঁচজনের জন্য, যারা যুগর্ষি স্রষ্টাদের দৈনন্দিন জীবন, তাঁদের সুখ-দুঃখ, মান-অভিমান সম্বন্ধে জানতে চায় মাত্র—কারণ তারা আমারই মত সুরকানা, তালকানা হওয়া সত্ত্বেও গান শুনতে ভালোবাসে এবং যেহেতু সঙ্গীতের গভীরে পৌঁছতে পারে না, তাই স্রষ্টাদের জীবনটা, তাঁদের চালচলন, ওঠনবৈঠন নিয়েই সন্তুষ্ট। অশ্বত্থামার সঙ্গে আমাদের তুলনা করুন, আমাদের কোনো আপত্তি নেই।

১৯৩৫ সালে, এই সময়ে, আজ হতে ঠিক ত্রিশ বৎসর আগে এ-অধম বরদা শহরে চাকরি নিয়ে পৌঁছয় এবং স্টেট্ গেস্ট্ হাউসে অতিথিরূপে স্থান পায়। মহারাজা স্বর্গত সয়াজীরাওয়ের সঙ্গে দেখা শেষ হওয়া মাত্রই আমার মনে যে অদম্য বাসনা জাগলো সেটা নিতান্ত স্বাভাবিক।

ওস্তাদের ওস্তাদ রাজানুগ্রহপ্রাপ্ত শ্রীযুত ফৈয়াজ খান বাস করেন এই বরদা শহরেই। তাঁর কণ্ঠসঙ্গীত শুনতে না পেলে এই দুনিয়াতে জন্মালুমই বা কেন, আর এই বরদা শহরে এলুমই বা কেন? তার চেয়ে বাঁ-হাতের তেলোতে জল নিয়ে সেটাতে ডুবে আত্মহত্যা করলেই হয়!

খবর নিয়ে শুনতে পেলুম, তাঁর বাড়িতে রোজ সন্ধ্যায় মহ্‌ফিল-জলসা বসে, আর প্রায় প্রতি সকালে শাগরেদান সহ রেওয়াজ।

ইতিমধ্যে একটি অতিশয় অজানা-অচেনা বঙ্গসন্তানের সঙ্গে আলাপ হল। তার নাম বলবো না, কারণ ছেলেটি এখনো বড় লাজুক। তবে সে যদি চিঠি লিখে আপত্তি না জানায় তবে অন্য সুবাদে তার নাম প্রকাশ করে দেব। উপস্থিত

ধরে নিন, তার নাম পরিতোষ চৌধুরী। ওস্তাদের শিষ্য—অবশ্য ন'সিকে পাকা কথা বলতে হলে, ওস্তাদের বড় ভাইয়ের কাছেই সে রেওয়াজ করে বেশী। কারণ একাধিক সমঝদার আমাকে বলেছেন—আমার টুটি চেপে ধরবেন না!—যে যদিও দাদাটি নিজে সভাস্থলে গাইতেন না, তবু সঙ্গীতশাস্ত্র তিনি জানতেন ওস্তাদ ফৈয়াজের চেয়ে বেশী। তাঁরাই বলেছেন, ওস্তাদ তাই শাগরেদদের কণ্ঠস্বর সুললিত গম্ভীর মধুর করার ভার নিতেন নিজে—অন্য 'কাজে'র জন্য ভিড়িয়ে দিতেন দাদার কাছে, বিশেষ করে অচলিত, প্রায়-লুপ্ত রাগরাগিণীতে যাদের দিল্‌চসপী- শখ্ অত্যধিক।

চৌধুরী তার গুরু খান সাহেবকে কি বলেছিল জানি নে, এক রবিবার সকালে তিনি সশরীরে আমার ডেরায় এসে উপস্থিত। আমি হতভম্ব। কোথায় তাঁকে বসাবো, কী আপ্যায়ন করবো, আমার মাথায় কিছুই খেলছে না। মহারাজ সয়াজীরাও এলেও আমি এতখানি গর্ব এবং নিজেকে এত অসহায় অনুভব করতুম না।

আর ওস্তাদ—বিশ্বাস করবেন না—বার বার শুধু আমার হাত দু'খানা ধরে নিজের বুকে চেপে ধরেন। তিনি আমার চেয়েও বে-এক্তেয়ার! আর বার বার দরবারী (কানাড়া নয়!) কায়দায় আমাকে কুর্নিশ করেন।

বহুদিন ধরে সে বেইমান পাষণ্ডকে খুঁজেছি যে আমায় দুশমনী করে তাঁকে বলেছিল, আমি গুরুঘরের ছেলে এবং মুসলিম বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান কেন্দ্রভূমি কাইরোতে এ্যাসন্ মুসলিমশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি যে স্বয়ং মহারাজা আমাকে সেখান থেকে বরদা রাজ্যে নিয়ে এসেছেন।

আমি আদৌ অস্বীকার করছি নে আমি গুরুবংশের ছেলে, এ ভারতে সে রকম শতলক্ষ আছে। কিন্তু তার চেয়ে আমার গুরুতর আপত্তি, আমার ক' পুরুষ পূর্বে কে যে শেষ-গুরু হয়ে গেছেন, সেটাও প্রত্নতত্ত্বের বিষয়। এবং আমার সর্বাপেক্ষা মারাত্মক আপত্তি: কাইরোতে আমি যেটুকু আরবী শিখেছি সেটি আমি আপনাকে ছ' মাসে শিখিয়ে দিতে পারি।

এ বিষয়টা আমি উল্লেখ করলুম কেন? এই যে গানের রাজার রাজা, এই ফৈয়াজ খান কী অদ্ভুত সরল ছিলেন সেটা বোঝাবার জন্য। পরে আমি চিন্তা করে বুঝেছি, তিনি সঙ্গীতের সর্বোচ্চ শিখরে উঠে গিয়েছিলেন বলে সরল বিশ্বাসে ভাবতেন, সয়াজীরাও যখন আমাকে খাতির করেন তখন আমিও নিশ্চয়ই আমার শাস্ত্রের সর্বোচ্চ শিখরে। তাঁর সঙ্গীতজ্ঞানের জন্য তিনি যখন রাজবল্লভ হয়েছেন, তখন আমিও তাই। একই লজিক।

এর পর কতবার আমাদের দেখাশোনা হয়েছে—গানের মজলিস-মহ্‌ফিলের তো কথাই নেই। আমি প্রতিবার তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি, 'দেখুন ওস্তাদ! কত রাজা আসবে যাবে, কত শম্‌স্‌ উল্‌-উলিমা (মহামহোপাধ্যায়) কত পাণ্ডিত্য দেখিয়ে যাবেন—এমন কি এই যে আমাদের বরদার দেওয়ান সাহেব, যাঁর হাম্বাই-তাম্বাইয়ের অন্ত নেই—তিনিও চলে যাবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আরেক দেওয়ান এসে উপস্থিত হবেন, কিন্তু আপনার মত লোক আবার কবে আসবে কে জানে? আমি বেঁচে থাকলে আরো রাজা দেখব, আরো দেওয়ান দেখব, কিন্তু আপনার মত কাকে পাবো?'

আর কী সুদর্শন পুরুষ ছিলেন তিনি! চেহারা রং গোঁপ সব মিলিয়ে তিনি যেন তাঁরই গানের '(বন্দে) নন্দকুমারম্‌'—শুধু নন্দকুমার ছিলেন শ্যাম, আর ইনি গোরাচাঁদ।

আমাকে শুধোলেন, 'কবে এসে একটু গান—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'তওবা, তওবা! আপনি আসবেন এখানে! আমি যাবো যে কোনো সন্ধ্যায়, আপনার ইজাজৎ পেলেই।'

তিনি কিছুতেই রাজী হলেন না।

কতবার তিনি সন্ধ্যে সাতটায় এসে ভোর পাঁচটায় উঠেছেন। আমাকে কতবার তিনি বেহেশৎ দেখিয়েছেন। তাঁর ওফাতের (মৃত্যুর) পর আর কেউ দেখায় নি।

বিশ্বাস করবেন না, আমি নন্দকুমার গানটি ভালোবাসি জেনে একদিন তিনি আমাকে—আবার বলছি আমার মত অতি-সাধারণ শ্রোতাকে—পুরো দেড় ঘণ্টা ধরে ঐ গানটি শুনিয়েছিলেন।

কিন্তু কত লিখব! আমার স্মৃতির কত বড় অংশ জুড়ে এখনো তিনি বিরাজ করছেন!

তাই একটি ছোট্ট ঘটনার উল্লেখ করে শেষ করি।

একটি বরদাগত বাঙালী মহিলার অনুরোধে আমার বাড়িতে মহ্‌ফিল বসেছে। ওস্তাদ সেদিন বড় মৌজে।

দুপুরে বরদায় ১১৪ ডিগ্রী গরম পড়েছিল। রাতদুপুরেও অসহ্য গরম, বর্ষা নামতে তখনো দু'মাস বাকি। ওস্তাদ অনেক-কিছু গাওয়ার পর শুধোলেন, 'আদেশ করুন, কি গাইব।' সেই মহিলাটি অনেক চাপাচাপির পর ক্ষীণ কণ্ঠে অনুরোধ জানালেন, 'মেঘমল্লার।'

ওস্তাদ সঙ্গে সঙ্গে গান ধরলেন।

যেন তিনি তাঁর সমস্ত সাধনা, সমস্ত ঘরানা (হয়তো ভুল হল, কারণ 'রঙিলা' ঘরানা মেঘমল্লারের প্রতি কোনো বিশেষ দিল্‌চস্‌পী ধরেন কিনা আমার জানা নেই), সমস্ত সৃজনীশক্তি, বিধিদত্ত গুরুদত্ত সর্বকলাকৌশল সেই সঙ্গীত সম্মোহন ইন্দ্রজালে ঢেলে দিলেন। আমরা নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে যেন সর্ব লোমকূপ দিয়ে সে মাধুরী শোষণ করছি।

এমন সময় বাইরে নামল কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি!

মহ্‌ফিলে হুলস্থুল পড়ে গেল। কে কি ভাবে ওস্তাদকে অভিনন্দন জানিয়েছিল, কে সূক্ষ্মমাত্র কুমড়ো-গড়াগড়ি দিয়েছিল, কে ওস্তাদের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল মাত্র—এ সবের বর্ণনা দেওয়ার শক্তি আমার নেই। অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা তো শুধু তিনিই দিতে পারেন যাঁর লেখনীতে অলৌকিক শক্তি আছে।

অন্য দিন ওস্তাদ আমাদের অভিনন্দন, প্রশংসাবাদ, মরহাবা যতখানি ঝুঁকে ঝুঁকে সেলাম জানিয়ে গ্রহণ করতেন, আজ তিনি সেরকম করলেন না। দু-একবার সেলাম জানিয়ে গালে হাত দিয়ে চুপ করে বসে রইলেন। আমার একটু আশ্চর্য লাগলো।

অবশ্য তার পরও তিনি গেয়েছিলেন ভোর অবধি।

শেষ ভৈরবী গেয়ে তিনি আমার কাছ থেকে বিদায় নিতে এলেন। আমি বললুম, 'ওস্তাদ, বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন ; একটু বিশ্রাম নেবার জন্য বসুন।'

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকার পর যে কী বিষণ্ণতা মুখে মেখে আমার দিকে তাকালেন তার অর্থ আমি কিছুই বুঝতে পারলুম না। করুণ কণ্ঠে বললেন, 'আচ্ছা, সৈয়দ সাহেব, লোকে আমাকে এরকম লজ্জা দেয় কেন বলুন তো ? আমি কি গান গেয়ে বৃষ্টি নামাতে পারি ?'

আমি ক্ষণমাত্র চিন্তা না করে বললুম, 'সে জানেন আল্লা। আমি শুধু জানি, অন্তত আজ রাত্রে তিনি আপনার সম্মান রাখতে চেয়েছিলেন।'

৯।১০।৬৫

'পঞ্চাশ বছর ধরে করেছি সাধনা।'
'কটা ভাবা ?' 'হা কপাল ! বাঙলাই হল না।'

প্রথমেই নিবেদন জানাই, আকাশবাণীর বিরুদ্ধে আমার ব্যক্তিগত কোনো ফরিয়াদ নেই। কেন নেই, যখন চৌদ্দআনা পরিমাণ লোকের আছে এ-সব তর্কের ভিতর

আমি ঢুকতে নারাজ। বিশেষত যখন খুব ভালো করেই জানি, এই বিশ্ব-সংসারটা রিফর্ম করার গুরুভার আল্লা-তালা আমার স্কন্ধে চাপান নি। আমি শুধু আজ আকাশবাণী বাবদে একটি কাহিনী নিবেদন করবো। শোনা গল্প। সত্য না-ও হতে পারে। তবে ক্যারেকটিরিষ্টিক—অর্থাৎ গল্পটি শুনেই চট করে চোখের সামনে ভেসে ওঠে আকাশবাণীব একটি বিশেষ স্থূলাঙ্গের ছবি।

'সুনন্দ' রাগে বিতৃষ্ণায় বিকৃত কণ্ঠে তাঁর জর্নালে ইন্টাবভ্যু নামক প্রতিষ্ঠানটির ব্যঙ্গ করেছেন। হায় রে কপাল! তিনি কখনো ইন্টারভ্যুর রাজার রাজা 'অডিশনিং' নামক খাটাশ্‌টির দাঁত ভ্যাংচানি দেখেছেন—ঈভন ফ্রম এ ভেরি লঙ সেফ ডিসটেন্স? তা হলে বুঝতেন ঠ্যালা কারে কয়। আমি স্বয়ং একাধিক 'অডিশনিং' বোর্ডের বড়কর্তা ছিলুম বেশ কিছুকাল ধরে। আমার জানার কথা! কিন্তু আমি এ সুবাদে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের একটি কাহিনী কীর্তন করবো।

একদা 'গ্রামে গ্রামে এই বার্তা রটি গেল' যবে যে, কী বড় কী ছোট তাবৎ সঙ্গীতকাররা পরীক্ষা (এরই 'ভদ্র' নাম অডিশনিং) দিয়ে তবে গান গাইবার প্রোগ্রাম পাবেন, তখন পরীক্ষকদেরই একজন আপত্তি তুলে বললেন, 'বাজারে যাঁদের গ্রামোফোন রেকর্ড রয়েছে, এবং/কিংবা স্টুডিয়ো-রেকর্ড রয়েছে তাঁদের আবার অডিশনিং-এর কি প্রয়োজন? যাঁদের নেই তাঁদেব কথা আলাদা।' কিন্তু তখনকার দিনের আকাশবাণী রাজাধিরাজ স্বাধিকারমত্ত। মোকা যখন পেয়েছেন তখন ছাড়বেন কেন?

তখন ধরুন, এই লখ্‌নৌ শহরে ছোট বড় তাবৎ গাওয়াইয়া বাজানেওলারা একজোটে স্থির করলেন, তাঁরা পরীক্ষা দেবেন না। তাঁদের আপত্তি, যারা পরীক্ষা নেবে তারাই বা সঙ্গীত-জগতের কী এমন বাঘ-সিঙ্গি?

আবার বলছি, এটা গল্প।

অবস্থা যখম চরমে, তখন দুনিয়ার হালচাল বাবদে সম্পূর্ণ বেখেয়াল, লখ্‌নৌয়ের সবচেয়ে বড় ওস্তাদ একদিন ভোরবেলা শিষ্য-সমাবৃত হয়ে রেওয়াজ করতে করতে হঠাৎ শুধোলেন, 'হ্যাঁ মিয়া, "আডিশনিং আডিশনিং" চারো তরফ লোগ শোরগোল মচা রহে হৈঁ, সো ক্যা ব্‌লা?' (পাঠক, আমার উর্দুজ্ঞান সঞ্চিত হয়েছে কলকাতার পানওয়ালাদের দোকান থেকে—অপরাধ নিয়ো না, বরায়ে মেহেরবানী!) মোদ্দা কথা তিনি জানতে চাইলেন, চতুর্দিকে যে এই অডিশনিং অডিশনিং রব উঠেছে, সেটা আবার কি বালাই (আপদ, গেরো)।

শিষ্যেরা প্রাঞ্জল ভাষায় সে 'বালাইয়ের' জন্ম, বয়োবৃদ্ধি ও বর্তমান পরিস্থিতি

গুরুকে বুঝিয়ে দিলেন, এবং তাঁদের কেউই যে এই অপমানকর প্রতিষ্ঠানের সম্মুখীন হবেন না সেটাও জানিয়ে দিলেন।

গুরু তাজ্জব মেনে বললেন, 'সে কি? ইম্‌তিহান্‌-পরীক্‌ষা দিতে তোমাদের কি আপত্তি? ভেবে দেখো আমি যখন বিরাট জলসায় গান ধরি তখন কি শেষ কাতাবের পানওয়ালাটা পর্যন্ত আমার পরীক্ষা আরম্ভ করে দিয়ে ভাবে না, আমি রসসৃষ্টি করতে পারবো কি না, তার দিল ভিজিয়ে নরম করতে পারবো কি না? সোজা কথায় বলতে গেলে, মহ্‌ফিলের সবাই প্রতিবারেরই আমার পরীক্ষা নেয়। হাঁ, আল্‌বত্তা, তারা না বলে পরীক্ষা নেয়, এরা বলে কয়ে নিচ্ছে। তাতে কীই বা এমন ফারাক?'

শিষ্যেরা অচল অটল।

ওস্তাদ হেসে বললেন, 'মৈঁ তো জাউংগা জরূর।'

শিষ্যরা বজ্রাহত। আর্তরব ছেড়ে পাঞ্জাবী, যুক্তপ্রদেশী, বাঙালী, হিন্দু, মুসলমান তাবৎ শাগরেদ আর্‌জ্‌ করলে, 'আমরা যাচ্ছি নে ঐ সব পাঁ—দের সামনে পরীক্ষা দিতে, আর আপনি যাবেন হুজুর?'

হুজুর বললেন, 'য়েকীনান্‌— নিশ্চয়ই।'

শিষ্যেরা তখন 'ফারাম' (form)-এর ভয় দেখালে। তাতে মেলা অভদ্র প্রশ্ন আছে। ওস্তাদ বললেন, 'সে তো আদমশুমারীর সময়ও আমার বুড়টী বাবাকে শুধিয়েছিল, তিনি অন্য কোনো পন্থায় কিছু আমদানি করেন কি না? ওসব বাদ দাও। ফাবাম ভর দো।'

* *

অডিশনিং-এর দিন টাঙা চড়ে গুরু চললেন, স্টুডিয়োর দিকে। সঙ্গে মাত্র একটি চেলা। বাকি চেলারা চালাকি করে আকাশবাণীকে জানায় নি যে তাদের ওস্তাদ অডিশনিঙে আসছেন—ওদের শেষ ভরসা এপয়েন্টমেণ্ট নেই বলে শেষ-মেষ যদি সবকুছ বরবাদ-ভণ্ডুল হয়ে যায়। অবশ্য এ-কথাও ঠিক, ওস্তাদ ওদের পরীক্ষা দেবার জন্য হুকুম দেন নি। নইলে ওরা নিশ্চয়ই অমান্য করতো না।

লখ্‌নৌয়ের—কথার কথা বলছি—আকাশবাণী সেদিন কারবালার ময়দানের মত খাঁ-খাঁ করছে। এমন সময় নামলেন গুরু টাঙা থেকে।

আকাশবাণীর 'চ্যাংড়াদের' যত দোষ দিন, দিন—প্রাণভরে দিন, কিন্তু একথা কখনো বলবেন না, এরা ওস্তাদদের সম্মান করে না। আমার চোখের সামনে কত বার দেখেছি, প্রোগ্রাম-এসিসটেণ্ট কুলীনস্য কুলীন ব্রাহ্মণসন্তান কী রকম মুসলমান গুরুর পায়ের কাছে কুমড়ো-গড়াগড়ি দিচ্ছে, মুসলমান পীরের ছেলে হিন্দু

গুরুর পায়ে ধরে বসে আছে। এঁদের অসম্মান করে—অবশ্য সেটা ওদেরই রুচির অভাব—ওপরওলারা যারা সঙ্গীত বাবতে দীর্ঘকর্ণ।১

ছোকরা কর্মচারীরা তো তন্মুহূর্তেই ওস্তাদকে তাদের চোখের পাতার উপর তুলে নিয়ে ঢুকিয়ে দিলো অডিশনিং রুমে—যেখানে 'পরীক্ষকরা' বেকার উকীলদের মত অনুপস্থিত মাছি মারছিলেন আর নিষ্ফল আক্রোশে আর্টিফিশেল দাঁতে দাঁতে কিড়মিড় খাচ্ছিলেন।

ওস্তাদকে দেখে তাঁরা স্তম্ভিত। এ কী কাণ্ড! যে-সব আনাড়ী ছোকরা গাওয়াইয়ারা দিনকে দিন বেতারকেন্দ্রের ছারপোকা-ভর্তি বেঞ্চিতে বসে দশ রুপেয়ার প্রোগ্রামের জন্য ধন্না দেয় তারা পর্যন্ত আসে নি অডিশনিঙে—আর এই ওস্তাদের ওস্তাদ লখ্‌নৌয়ের কুৎব্‌মিনার, তানসেনের দশমাবতার তিনি এসে গেছেন—এ যে অবিশ্বাস্য, বিলকুল গয়ের মুম্‌কিন্‌ তিলিস্‌মাৎ!

একথা অনস্বীকার্য তাঁরা ওস্তাদকে প্রচুরাধিক ইজ্জৎ দেখিয়ে ইস্‌তিক্‌বাল (অভ্যর্থনা) জানালেন, সর্বোত্তম তাকিয়াটি তাঁর পিছনে চালান দিলেন। ওস্তাদের মুখ যথারীতি পানে ভর্তি ছিল। একটি ছোকরা ছুটে গিয়ে ওগল্‌দান্‌

১ প্যারিসে একবার একটি উৎকৃষ্ট সঙ্গীতানুষ্ঠান কর্তাদেব নেকনজর পায় নি শুনে ভলতেয়ার সেই সঙ্গীতস্রষ্টাকে একটি চৌপদী লিখে সান্ত্বনা জানান, 'হায়, বড়লোকদের যে কানও বড় হয়' (অর্থাৎ গাধা)। আমি ব্যক্তিগতভাবে একটি উদাহরণ জানি। গুণী, ওস্তাদ রবিশঙ্কর তখন দিল্লি-আকাশবাণীর সঙ্গীতাধিনায়ক। গাঁধীর জন্মদিনে সেক্রেটারি তাঁকে ডেকে হুকুম দেন, ঐ উপলক্ষে তিনি গাঁধীর তাবৎ জীবনী—দক্ষিণ-আফ্রিকা, ববদলৈ, উপবাস, সল্ট্‌-মার্চ—প্রতিফলিত করে যেন নূতন কিছু 'কম্পোজ' করেন। বিহ্বল, প্রায়ান্ধ উদ্‌ভ্রান্তদৃষ্টি রবিশঙ্কর চলেছেন করিডর দিয়ে—আমার সঙ্গে আচমকা কলিশন। সম্বিতে এসে আমাকে দেখে করুণ হাসি হেসে তাবৎ বাৎ বয়ান করে শুধোলেন, 'এ কখনো হয়?' আমি বললুম, 'আপনি যখন বাজান তখন আমার মত সঙ্গীতে আনাড়ীরও মনে হয়, আপনার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। তবে কি না—হেঁ, হেঁ—সেক্রেটারি বোধ হয় বিলিতী সিমফনি, পাস্তোরাল-টাস্তোরাল বই পড়ে (শুনে নয়) আমেজ করছেন, এ দেশেই বা হবে না কেন?' রবি শুধোলেন, 'করি কি?' আমি সবিনয়ে বললুম, 'একটা বাবদে আমার মত আকাটও একটা সজেশন দিতে পারে।' 'কি কি?' 'ঐ সল্ট্‌-মার্চের জায়গায় এসে আপনি যন্ত্রের তারগুলোতে করকচ-নুন মাখিয়ে নেবেন।'

(পিকদান) নিয়ে এসে সামনে ধরলো।

কেউ কিছু বলার পূর্বেই ওস্তাদ বললেন, 'সব যব্ জম্‌গয়ে তব কুছ হো জায়—' অর্থাৎ সঙ্গীতামোদীরা যখন একজোট হয়ে গিয়েছি তখন হোক কিঞ্চিৎ গাওনা-বাজনা। সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। নইলে কে তাঁকে সাহস করে পরীক্ষা দিতে বলতো? ওস্তাদ সবিনয় শুধোলেন, 'কি গাইবো?' তারস্বরে চিৎকার উঠলো, 'সে কি, সে কি? গজব কী বাৎ! আপনার যা খুশী।' (সাধারণ পরীক্ষার্থী জানে, এদের মামুলী পেশা বিৎকুটে, অচেনা রাগ বৎখৎ তালে গাইবার আদেশ দেওয়া।)

ইতিমধ্যে বেতারকেন্দ্রের যে পয়লা-নম্বরী সারেঙ্গীওয়ালা ও ওস্তাদ তবলচী অডিশনিং বয়কট করে কেন্টিনে চা খাচ্ছিল তারা টাট্টু ঘোড়ার মত ছুটে এসেছে সঙ্গত দিতে—কর্তারা এদের অভাবে যে দুটি আকাট যোগাড় করেছিলেন, তারা বহু পূর্বেই গা-ঢাকা দিয়েছে।

ওস্তাদ ধরলেন তোড়ি। আলাপের সময় প্রত্যেকটি ধ্বনি যেন বকুলগাছ থেকে এক একটি ফুল হয়ে এদিক ওদিক ছিটকে পড়তে লাগলো। যখন তালে এলেন তখন যেন ফুল নিয়ে সাতলহরা মালা গাঁথতে লাগলেন, প্রিয়ার কুন্তলদামে পরাবেন বলে।

আর সমস্তক্ষণ মুখে কী খুশীর ছটা! জান্‌টা যেন ফুর্তিতে ভরপুর! ক্ষণে সারেঙ্গীওলার দিকে মুখ বাড়িয়ে তার বাজনার তারিফ করে বলেন, 'ক্যা বাৎ, ক্যা বাৎ!' ক্ষণে তবলচীর দিকে দুই হস্ত প্রসারিত করে হুঙ্কার দেন, 'শাবাশ, শাবাশ, আফরীন, আফরীন!' যেন ওরাই সব জমিয়ে চলছে! ওঁর কোন কৃতিত্ব নেই!

গান থামলো। আনন্দে বিস্ময়ে সবাই এমনই স্তম্ভিত যে পুরো এক মিনিট পরে হর্ষধ্বনি ও সাধুবাদ রব উঠলো।

ইতিমধ্যে 'পরীক্ষক'দের একজন ওস্তাদের সঙ্গী ছোকরা শাকরেদের কাছ থেকে অন্য সকলের অজানতে সেই 'ফারাম্'খানা চেয়ে নিয়েছে। ঐটেতে পাস না ফেল, কোন্ হারে দক্ষিণা বেঁধে দিতে হবে সে-সব লিখে দিতে হয়।

হঠাৎ তার চোখে পড়লো, যেখানে প্রশ্ন, 'আপনি কোন্ কোন্ রাগ-রাগিণী জানেন?' তার উত্তরে লেখা মাত্র একটি শব্দ : 'তোড়ি'।

বিস্ময়! বিস্ময়!! এ কখনো হয়!!! পরশু দিনের কাঁচা গাওয়াইয়াও তো লিখতো ডজন দুই। ওস্তাদ জানেন কত শত, এ তো রসজ্ঞদেরও কল্পনার বাইরে।

অতিশয় বতরিবৎ এবং প্রচুর মাফ চেয়ে সেই 'পরীক্ষক'টি বৃদ্ধ ওস্তাদকে শুধোলেন—অল্প অবিশ্বাসের স্মিতহাসি হেসে, 'ওস্তাদ, এ কখনো হয় যে, আপনি একমাত্র তোড়ি ছাড়া আর কিছুই জানেন না ?'

সকলের মুখেই প্রসন্ন মৃদু হাস্য। সারেঙ্গী-তবলা মাথা নিচু করে জাজিমের দিকে তাকিয়ে।

যে কোনো বিদ্যাতেই তোমাব যদি অভিমান থাকে তবে, পণ্ডিত পাঠক, এই বেলা তুমি কান পেতে শোনো,—আমাব জীবনে তাঁর উত্তবটি নিবিড়ঘন আঁধারে ধ্রুবতাবাব মত জ্বলে—তিনি কি উত্তব দিলেন।

ঠণ্ডী সাস লে কর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ওস্তাদ বললেন, 'পচাস সালসে তোড়ি গা রহা হুঁ—অভী ঠিক তরহ্ সে নহী নিকলতী।'

অর্থাৎ পঞ্চাশ বছর ধরে তোড়ি গাইছি। এখনও ঠিকমত বেবয় না। অন্য রাগ-রাগিণীর কথা কেন বৃথা শুধোও ॥

১৬।১০।৫৮

ইণ্টারভ্যু

'ইণ্টাবভ্যু' নামক চবম বেইজ্জতীব মস্কবা যে কত নব নব রূপে প্রকাশিত হয় তাব বণনা আবেক দিন দেব। 'দেশে' এই মর্মে একাধিক চিঠি বেরিয়েছে, এবং আগে-ভাগে কাকে চাকরি দেওয়া হবে সেটা ঠিক কবে নিয়ে যে চোট্টামীর ইণ্টারভ্যু-প্রহসন করা হয় তাবও বণনা এ-চিঠিগুলোতে ও আমাব সতাথের মূল প্রবন্ধে আছে। তবু এ বাবদে শেষ কথা বলেছে আমার এক তুখোড় তালেবব ভাগিনা। ডাঙর নোকবি করে, ঢাউস যা গাড়ি ব্যাঙ্ক দিয়েছে তার ভিতর একপক্ষে মা সহ্ তাব তিন মাসী অন্য পক্ষে তার তিন মামী বাতিমত ব্যূহ নির্মাণ করে কাশ্মীর-শিয়ালকোট-কচ্ছের রণেব[১] রণমোহড়া দিতে পারেন (বলা বাহুল্য মামীরাই হাবেন, কারণ তাঁরা এসেছেন তিন ভিন্ন ভিন্ন পরিবার থেকে)। ভাগিনাটিকে প্রায়ই ইণ্টারভ্যু নিতে হয়—অর্থাৎ সিট্স্ অন দি রাইট্ সাইড্ অব দি টেব্‌ল্। একদিন বেজায় উত্তেজিত হয়ে সে আমাকে একটি কর্মখালির বিজ্ঞাপন পড়ে শোনালে। তাতে ওমেদারের বয়স কত হবে, কি কি পাস থাকা

১ আমার যদ্দূব জানা, কচ্ছবাসীবা জায়গাটার নাম কচ্ছী বা গুজরাতী বা কাঠিয়াওয়াড়ীতে বানান করে কচ্ছের 'রণ'—'রান' বা 'রাণ' নয়।

চাই, এপেন্‌ডিক্‌সের দৈর্ঘ্য তার কতখানি হবে, তার পরিবারে নিদেন কটা খুন হয়ে থাকা চাই ইত্যাদি বেবাক বাৎ ছিল। ভাগিনা তারপর ভ্রূকুঞ্চিত করে খানিকক্ষণ খুঁত খুঁত করে বললে, 'খাইছে! ফোডোগেরাপ্‌টা ছাওনের বাৎ বেবাক ভুল্যা গ্যাছে। হুইডার তলায় লেখা থাগ্‌বো, "None need apply whose appearance does not resemble the above photograph" কি কন্‌, মামু?' আমি আর কি বলবো? এটা করলে তো অত্যন্ত সাধুজনোচিত আচরণ হত। এর চেয়ে ঢের ঢের নাষ্টি (ইচ্ছে করে ন্যাষ্টি উচ্চারণে করতে, সে উচ্চারণে যেন ঘেন্নাটার খোলতাই হয় বেশী যেমন 'পিশাচ' বা 'পিচাশ' না বলে সর্বোৎকৃষ্ট হয় 'পিচেশ' বললে!) উদাহরণ আমি একটা জানি।

ফার্সীর লেকচারার নেওয়া হবে। আমাকে স্পেশালিস্ট হয়ে যেতে হবে। আমি বে-কসুর না মঞ্জুর করে দিলুম। যদিও চাকরির বিজ্ঞাপন দেখে মনে হল না, এর ভিতরে কোনো নষ্টামী আছে। তবু, আমি এই 'জামাই ঠকানো'র—সুনন্দের ভাষায়—ফিস্কিরি-মস্করার হিস্সেদার হতে চাই নে। দু'দিন পর মৌলানা আজাদ ফোন করে জানতে চাইলেন, আমি যেতে আপত্তি করছি কেন? তখন বুঝলুম, উনিই আমার নাম স্পেশালিস্ট-রূপে প্রস্তাব করেছিলেন এবং এখন আমি সেটি গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হচ্ছি বলে কর্তৃপক্ষ তাঁকে সেটা জানিয়ে ফরিয়াদ করেছেন—। মৌলানার পাণ্ডিত্যের প্রতি আমার অসাধারণ শ্রদ্ধা ছিল। তাই কাচুমাচু হয়ে এই ইণ্টারভ্যু বাবদে পরীক্ষক হিসেবেই, আমার পূর্ব পূর্ব নোংরা (ন্যাষ্টি!) তজরুবা-অভিজ্ঞতা জানালুম। দেখি, মৌলানা সমুচাহ্‌ ওয়াকিফ্‌-হাল। কোনো প্রকারের তর্কাতর্কি না করে বললেন, 'আপনি গেলে ওরা সোজা পথে চলবে। যদি অন্যায় আচরণ দেখেন, আমাকে জানাবেন।' ইণ্টারভ্যুতে যে-সব অনাচার হয় তার কোনো বিচার নেই বলে, আমি টেবিলের কি এদিকে কি ওদিকে কোনো দিকে বসতে চাই নে (পেত্যয় না পেলে শ্রীযুত কালিদাস ভশ্চাযকে শুধোন!); কিন্তু এক্ষেত্রে মৌলানা আমার কাছ থেকে অনাচার-সংবাদ পেলে যে ওদের কান মলে দেবেন সেই ভরসায় গেলুম।

আমার সঙ্গে আরেকটি স্পেশালিস্ট ছিলেন। বাকীরা পাকা মেম্বার। তাদের একমাত্র কামনা, কাম খতম করে বাড়ি ফেরার। বিশেষত 'লেড়ে'র ব্যাপার—চাকরিটা মিম্বরুল্লা পেল না মৃদম খান পেল সে নিয়ে তাদের 'মাতাব্যাতা' হবে কেন, ছাই!

তবু ভদ্রতার খাতিরে তাঁরা দু-একটি প্রশ্ন শুধোলেন। সে ভারী মজা। যেমন,

'আপনার মাদ্রাসায় ইংরিজীও পড়ানো হত ?'—কথাবার্তা অবশ্য আংরেজীতেই হচ্ছে। কারণ প্রশ্নকর্তারা ফারসী ও ফরাসীর তফাৎ জানেন না।

'জী, হ্যাঁ।'

'কি পড়েছেন ?'

'জী, রাস্কিনের "সিসেম অ্যাণ্ড লিলিজ", মিলটনের "এরিয়োপেজি—",

'শেকস্পীয়র ?'

'জী।'

'কি ?'

'হ্যামলেট।'

এবারে প্রশ্নকর্তা দারুণ উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'বাব্বা, বাব্বা! বেশ, বেশ! সুপ্রস্তাব!'

তার পর তিনি সোৎসাহে আরম্ভ করলেন, হ্যামলেটের আত্ম-আর্তনাদ—সলিলকি—"To·be or not to be—"। তাকিয়ে আছেন কিন্তু আমার দিকে, ওমেদারের দিকে না—আমার অপরাধ ? ইংরিজী খবরের কাগজেও একটা অত্যন্ত বেকার খবর বেরিয়েছে, আমার কি একটা বই কি যেন একটা প্রাইজ পেয়েছে, এবং স্বয়ং রাষ্ট্রপতি নাকি আমাকে প্রাইজটি দেবেন স্বহস্তে! আমাকেই ইমপ্রেস করা এখন তাঁর জীবন্মৃত্যুর চরম কাম্য—বলা তো যায় না, এখন থেকেই যদি রীতিমত আমাকে তোয়াজ করে ইম্প্রেস্ করা যায় তবে তো আমি হয়তো প্রাইজ নেবার সময় কানে কানে রাষ্ট্রপতিকে বলে দেবো, 'হুঁজুরের আণ্ডার সেক্রেটাবি অনন্তভূত-পরাশরলিঙ্গম্‌কে এখন একটি প্রমোশন দেওয়া উচিতস্য উচিত!' অবশ্য সেটা সেরকম মোকা নয়। কিন্তু বলা তো যায় না—যদি হয়েই যায়। নেপোলিয়ন (আজকালকার 'জ্ঞানীরা' যাঁকে নাপোলেওঁ বলেন, যেন আমাদের মত সে-যুগের রাম-পন্টকরা খাঁটি উচ্চারণ জানতো না বলে বাংলাতে তদনুযায়ী সঠিক বানান লিখতে পারে নি!) বলেছেন, অসম্ভব বলে কিছুই নেই। নিশ্চয়ই তিনি জানতেন, কখন কি ভাবে কাকে লুব্রিকেট-তেলাতে হয়!

তা সে যাই হোক, আমাকে ন'সিকে ইম্প্রেস করে হকচকিয়ে দেবার পর ওমেদারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বাকিটা কও কি ? "Or to take arms against a sea of—" বাকিটা বলে যাও তো ?'

কালো চামড়ার তৈরী সর্বোৎকৃষ্ট স্প্রিং-সম্বলিত, পঞ্চাধিক ক্যুশন্‌বিজড়িত গভীর আরাম-কেদারার তলা থেকে তিনি হাস্যরসের তুফানে ওঠা-নাবা করতে

করতে বার বার বলেন, 'তার পর কি, go on! ইউ সেড্ ইউভ্ রেড হ্যামলেট, against a sea of troubles—আরো সাহায্য করলুম তোমাকে। বাকিটা বলে যাও!' আবার তিনি সোফাতে বৃন্দাবনের রসরাজসুলভ হিন্দোল-দোলে দুলতে লাগলেন।

আমি তাজ্জব! বেচারী ওমেদার এসেছে ফার্সী ভাষার মেস্টারির চেষ্টায়। আঁ পাসাঁ, বেচারী একটুখানি ইংরিজী শিখেছিল বটে, কিন্তু সেইটেই তার ফর্, fort, সেইটেই তার piéce de résistance, সেইটেই তার বলতে গেলে, কিছুই নয়—ইংরিজীর মাধ্যমে ফার্সী পড়াতে গেলে যতখানি ইংরিজী জানবার প্রয়োজন তার চেয়েও সে বেশী জানে, সেটা তো ইতিমধ্যে তার কথাবার্তাতেই প্রমাণ হয়ে গেছে। তা সে যাকগে। ওমেদার বেচারী তো ঘেমে-নেয়ে ঢোল। আমি তখন তার দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বললুম, 'ওরকম নার্ভাস হবেন না। আপনি কতখানি ইংরিজী জানেন না-জানেন তার গুরুত্ব সামান্যই। ওটা আপনি ভুলে যান। এবারে চলুন ফার্সীতে। সেইটে কিন্তু আসল। ঐ যে আপনার সামনে ফার্সী বই কয়েকখানা রয়েছে তারই যে কোনো একখানা থেকে কয়েক লাইন পড়ুন—প্রথম আপন মনে চুপে চুপে, পরে আমাদের শুনিয়ে। অনুবাদ? না, না, অনুবাদ করতে হবে না। আপনার পড়ার থেকেই তো বুঝে যাবো, আপনি ফার্সী বোঝেন কি না। আর যেটা পড়বেন তার দু-একটা শব্দ আপনার জানা না থাকলে কোনো ক্ষতি নেই। সবাই কি আর সব ফার্সী শব্দ জানে? তা হলে দুনিয়াতে অভিধান লিখত কে, পড়ত কে? তা সে যাক। আমার আর কোনো প্রশ্ন-ট্রশ্ন নেই।'

এবারে ছেলেটার—হ্যাঁ, আমার ছেলের বয়েসি—মুখে শুকনো হাসি ফুটলো; একটুখানি ভর্সা পেয়েছে। সেই হ্যামলেটওলা লোকটিও আসলে কিন্তু মানুষ ভালো। পাঁচটা কুশন্ দুলিয়ে ঠাঠা করে হেসে উঠলেন। বললেন—তাঁরই হ্যামলেটের স্মরণে—'জস্টিস্ ডিলেড হয় নি।. হা হা, হা হা।'

ছেলেটি সুন্দর উচ্চারণে গড় গড় করে ফার্সী পড়ে গেল। কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ-সন্তান; এবং পরে দেখা গেল, আরো হিন্দু ওমেদার ছিল। ফার্সীর আবহাওয়াতে আপন ঠাকুদ্দার কাছে লেখাপড়া শিখেছে। চেয়ারমেন বললেন, 'আপনি এখন যেতে পারেন।' ছেলেটি সবাইকে মুসলমানী কায়দায় সেলাম জানালে, আমার দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞতার একটু শুকনো হাসি হাসতে গিয়ে থেমে গেল—কি জানি ওটা ঠিক হবে কি না, যদি ওতে করে নম্বর কাটা যায়! আমি মনে মনে বললুম 'মারো ঝাড়ু, স্রা নোকরি ওর উসকী ইণ্টারভ্যু পর্।'

উহুঁ! এটা শেষ নয়, এটা আরম্ভ মাত্র। ছেলেটির সেলামপর্ব শেষ হওয়ার পূর্বে আমার সঙ্গের দ্বিতীয় স্পেশালিস্টটি বললেন, 'একটু বসুন'—এবং সঙ্গে সঙ্গে আপন পকেট থেকে একটি চিরকুট বের করে তার হাতে দিয়ে বললেন, 'পড়ুন।'

হায় বেচারা ক্যাণ্ডিডেট! ভেবেছিল, তার গব্বযন্তনা শেষ হল। এখন এ আবার কি ফাঁসি! বেচারী পর্চাখানির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। স্পেশালিস্ট দশ সেকেণ্ড অন্তর অন্তর গুঁতোচ্ছেন, 'পড়ুন। পড়ছেন না কেন?' ছেলেটি হোঁচট ঠোক্কর খেতে খেতে খানিকটে পড়লো। স্পেশালিস্ট বললেন, 'অনুবাদ করুন।' বাম পাঁঠা! পড়ার কায়দা থেকেই তো পরিষ্কার হয়ে গেছে যে পাঠ্যবস্তু তার এলেমের বাইরে, তবে স্যাডিস্টের মত মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা কেন?

ছেলেটা নড়বড় পায়ে বেরিয়ে গেল।

আমি পর্চাটির জন্য স্পেশালিস্টের দিকে হাত বাড়ালুম। তিনি 'কুছ নহী, কুছ নহী' বলে সেটি পকেটে পুরে নিলেন। দুসরা ক্যাণ্ডিডেট এল। এবারে হ্যামলেটের বদলে গ্রে'র কবিতা। সর্বশেষে আবার ঐ অভিনয় সেই পর্চা নিয়ে। আমি স্পেশালিস্টের উদ্দেশে মনে মনে বললুম, 'তুমি ব্যাটা খোট্টা মুসলমান, আম্মো হালা বাঙাল পাঁতি ল্যাড়ে! দেখাচ্ছি তোমাকে।' এবারে ক্যাণ্ডিডেট পর্চাটি যেই ফেরত দিতে যাচ্ছে অমনি, তৈরী ছিলুম বলে, আমি সেটা নিয়ে নিলুম। ওমা! যত পড়ি, আগা-পাস্তলা ঘুরিয়ে দেখি, ততই কোনো মানে ওৎরায় না। ইতিমধ্যে আরেক ওমেদার এসে গেছে এবং চসার না পৌণ্ড কি যেন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। আমার দৃষ্টি ঐ পর্চাটির দিকে নিবদ্ধ।

ইয়াল্লা! অব্ সমঝ্‌লন বা। যে দু'লাইন কবিতা ছিল সেটা অনেকটা আমাদের।

হরির উপরে হরি
হরি বসে তায়
হরিকে দেখিয়া হরি
হরিতে লুকায়!

'হরি' শব্দের কটা মানে হয়, আমি সত্যই জানি নে—কান ছুঁয়ে বলছি। কিন্তু ছিঃ! কারো বাংলা জ্ঞানের পরীক্ষা যদি নিতান্তই নিতে হয় তবে এই ধরনের 'জামাই-ঠকানো' কবিতাই কি ন্যায্যতম, প্রশস্ততম?!

কিন্তু এহ বাহ্য।

পরে, অন্তত আমি বুঝতে পারলুম দই খাচ্ছেন কোন্ রমাকান্ত আর বিকার

হচ্ছে কোন্ গোবদ্ধনের ?

দু-একটি পাকা মেম্বরও হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন ব্যাপারটা কি। লেখা-পড়ায় এক-একটি আস্ত বিদ্যেসাগর বলেই ওঁদের নাসিকায় থাকে সারমেয়বিনিন্দিত গন্ধসন্ধানী অন্ধিসন্ধি।

ক্যাণ্ডিডেটের পরে ক্যাণ্ডিডেট—কেউ ভালো, কেউ মন্দ, কেউ মাঝারি, সংসারে যা হয়—ইণ্টারভ্যু স্বয়ংবরে আমাদের মত ইন্দুমতীর সামনে স্বপ্রকাশ হলেন। কিন্তু সবাই মার খেলেন, ঐ পর্চাটুকুর সামনে, ঐ চিরকুটটি সব্বাইকার ওয়াটারলু।

ইতিমধ্যে কী আশ্চর্য, কী তিলিস্মাৎ—একটি ওমেদার পর্চাটি পাওয়া মাত্রই সেটি গড়গড়িয়ে পড়ে গেল, আদ্যন্ত। যেন তার প্রিয়ার আড়াইশ' নম্বরী প্রেমপত্র।

* *

ইণ্টারভ্যু শেষে লাঞ্চ। সরকারী লাঞ্চকে আমি বলি লাঞ্ছনা। অবশ্য সর্বোচ্চ মহলে নয়। সেখানে লাঞ্চের অজুহাতে আপনার জন্য পেলেটে করে রোলস্-রঈস গাড়ি আসতে পারে তন্বঙ্গী পরী-পয়্করী চালিতা। ড্রাইভারিণীটি ফাউ, থ্রোন্ ইন্ ফর গুড মেঝার!

পালাবার চেষ্টা করার সময় ধরা পড়লুম সেই পঞ্চ-ক্যুশন-মর্দন মহাজনের হাতে। বললেন, 'হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ, আপনাদের ঐ স্পেশালিস্টটি আপন ওমেদারকে একটু ভালো করে রিহার্সেল করালেন না কেন? ও যদি সাত বার ঢোঁক গিলতো, এগারো বার হোঁচট খেয়ে খেয়ে চিরকুটটির কবিতা পড়তো, তবে হয় তো, আমাদেরও বিশ্বাস জন্মাতো, সে ঐ কবিতাটি ইতিপূর্বে কখনো দেখে নি।'

অর্থং অর্থং

একটা 'ফরেন'-ওলার কথাই বলি।

ইণ্টারভ্যুতে আমিও ছিলুম। সেই ছাব্বিশ বছরের 'ফরেন'—বাট্ ড্যাম কালা আদমী ছোকরাটা তার বাপের বয়সী ওমেদার অধ্যাপককে যা বেহায়া প্র শুধোতে লাগলো তাতে আমি স্তম্ভিত। কারণ সেই অধ্যাপকের কিছু কিছু লেখার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। এ যুগে আর কটা হিন্দু ফার্সী শিখে ভারতবর্ষের সাতশ,' বছরের ইতিহাস অধ্যয়ন করে? ইনি তাঁদেরই একজন। অথচ ওই

'করেন'-পণ্টক ফার্সীর এক বর্ণও জানে না। শুধু ইতিহাসের অধ্যাপক—ঠিক ইতিহাসও নয়, ইণ্ডলজির—বলেই গুণধর বোর্ডে এসেছেন, এবং যে-মোগল ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি নিরেট আকাট, সেই সম্বন্ধে চোখাচোখা প্রশ্নবাণ ঝাড়ছেন। সেগুলো তৈরি করে নিয়ে এসেছেন গতকাল লাইব্রেরি থেকে, দু'তিনখানা মোগল ইতিহাসের ইংরেজী অনুবাদ পড়ে—প্রধান উদ্দেশ্য, বাদবাকী মেম্বরদের তাক্ লাগিয়ে দেওয়া। সে সব মেম্বররা এসেছেন অপরাপর য়ুনি থেকে। ফলে সে সব য়ুনিতে তিনি একস্‌টেন্‌শন লেকচারে নিমন্ত্রিত হবেন, এগ্‌জামিনার হবেন, বহুবিধ কনফারেন্সে নিমন্ত্রিত হবেন, তাঁর প্রিয় ছাত্রের অখাদ্য থীসিসে তাঁরা একস্‌টারনেল পরীক্ষক হিসেবে ডিটো মারবেন, তিনো এ-বাগে তাই করবেন, গয়রহ, ইত্যাদি, এট্‌সেটরা। কি কি প্রশ্ন শুধিয়েছিলেন, আমার ঠিক মনে নেই, তবে রেডুক্‌ৎসিয়ো আড্ আব্‌সুর্ডুমে পরিণত করতে যদি অনুমতি দেন তবে কাল্পনিক দু-একটি পেশ করতে পারি: 'আকবর যখন আহমদাবাদ আক্রমণ করছিলেন তখন সাবরমতী বেয়ে হাওয়া পুব না দক্ষিণ থেকে বইছিল?' 'সিলেটের শাহজলাল মসজিদে পূর্বে যে জালালী কবুতর ছিল তারা এখন চলে যাচ্ছে কোথায়?'

এবং এমনই খাজা ইংরিজী উচ্চারণে যে আমি একবার দু'প্রশ্নের ফাঁকে তাঁকে কানে কানে বললুম, 'I am glad, Oxbridge has not been able to damage your original pronunciation."

আমি সবিনয়ে নিবেদন করছি, আমি সে অধ্যাপককে বাঁচাতে পারি নি। সেই প্রাচীন গল্প তা হলে আবার বলি। বার্নার্ড শ'র একটি নাট্য করে থিয়েটার থেকে গম্ গম্ তুলে ধরেছে, দ্রষ্টাদের সপ্রশংস চিৎকার, 'নাট্যলেখককে স্টেজে বেরুতে বলো, আমরা তাঁকে দেখব।' শ' এলেন। মিনিট পাঁচ ধরে চললো তুমুল হর্ষরব, করতালি, যাবতীয়। সবাই যখন শান্ত হলেন, এবং শ' তাঁর ধন্যবাদ জানাবার জন্য মুখ খুলতে যাবেন এমন সময় সর্বশেষ সস্তা গ্যালারি থেকে একটা আওয়াজ এল 'বূ বূ বূ বূ!' শ' ওই দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ব্রাদার, ঠিক বলেছ; এ নাট্যটা রদ্দী। কিন্তু তোমাতে-আমাতে, মাত্র দুজনাতে, এই শত শত লোকের পাগলামি ঠেকাই কি করে!'

* *

তার পরই আমি বিদেশে চলে যাই। না, স্যর! Sorry, কোনো সোভিয়েট, মার্কিন, বার্লিন ডেলিগেশনে নয়। তা সে যাক্। ফিরে এসে বোম্বায়ে আমার বন্ধু প্রসাদদাস মানিকলাল শুক্লের বাড়িতে উঠলুম। ওই অক্‌সব্রিজওলার কথা কি

করে উঠলো জানি নে, কারণ লেখাপড়ির ব্যাপারে আমরা charleton-ধাপ্পাবাজদের নিয়ে কখনো আলোচনা করতুম না।

শুরু বললে, 'সে বড় মজার ব্যাপার। তোমার ওই ব্রাদার চৌধুরী শনৈঃ শনৈঃ উঠতে লাগলেন খ্যাতির শিখর পানে। আজ এই কলেজে, কাল অন্য য়ুনিভার্সিটিতে—আস্ত একটা হনুমানের মত চড় চড় করে পদোন্নতির অশথগাছের মগ-ডালে, বয়েস পঁইত্রিশ পেরুতে না পেরুতে। ইতিমধ্যে তাঁর নিজস্ব উমদা গ্যোবেল্‌সী শানাই তাঁর গুণের রাগ-রাগিণী বাজাতে বাজাতে এটাও জাহির করেছে যে, ওই চৌধুরী স্বচেষ্টায় ফরাসী, জর্মন, রুশ গয়রহ ভাষাও আয়ত্ত করে ফেলেছেন।'

শুরু ফিক করে একটুখানি হেসে বললে, 'সে বড় মজার। তোমার ওই চৌধুরীর তখন এমনই আস্পদ্দা বেড়ে গেছে যে, সে ছাপিয়ে দিলে বুর্নফের একটি অচলিত ছোট লেখার অনুবাদ ইংরিজীতে—চটি বই, ব্রশুর বলতে পারো। আসলে সে সেটা করেছিলো এক আনাড়ি ছোকরার সাহায্যে, যার ফরাসী জ্ঞান ছিল অত্যন্ত কাঁচা—কিন্তু ছোকরা ধাপ্পা মারতে জানতো চৌধুরীর চেয়েও দুই বাঁও বেশী।

শুরু বললে, 'ওঃ! সে বই নিয়ে এ দেশে কী তুলকালাম, ফাঁ ফাঁর! অবশ্য তার চোদ্দ আনার উৎপত্তি চৌধুরীর গ্যোবেল্‌সী কলসী থেকে। এবং এখনো এ দেশের লোকের বিশ্বাস এ রকম অনুবাদ হয় না। মাত্র দু'একটি প্রাণী জানে যে, কি করে যেন ওই অনুবাদ প্যারিসে পৌঁছে গেলে তাদের এক পত্রিকায় বেরোয়—"The originality of the translator has come out with extraordinary success in those passages where he has failed to understand the original!" অবশ্য তাতে করে চৌধুরীর রত্তিভর লোকসান হয় নি, কারণ এই ফরাসীতে লেখা সমালোচনা—তাও প্রকাশিত হয়েছে পণ্ডিতীয়া কাগজে—এ দেশে পড়ে কটা লোক! তা সে যাক।

'ইতিমধ্যে এ-দেশে একটি পোলিটিশিয়ানের প্রাণ হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলো জননী ভারতের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার করার জন্য। আসলে তুমি তো জানো, এ সব নির্জলা ব্লাফ্। ভদ্রলোক চান, তিনি যেন 'কল্‌চর'-জগতেও সম্মানিত হোন। অবশ্য পরের হাত দিয়ে তামাক খেয়ে। সেই "পরে"রও অভাব হল না। এ অঞ্চলের শেঠীয়াদের টাকের ঠিক জায়গায় হাত বুলোতে পারলে গৌরীশঙ্করের শিখরে মরূদ্যান নির্মাণের জন্যও পিল পিল করে টাকা বেরিয়ে আসে।

তারপর শ্যানায় শ্যানায়[১] কুলোকুলি। তোমার এই প্যারা চৌধুরী—'

আমি বললুম, 'শট্ অপ্।'

'আহা, চটো কেন? তারপর সাড়ম্বর স্থাপিত হল, "জম্বূদ্বীপ-সমন্বিতাসমুদ্র—" যাক্‌গে যাক্, আমার নামটা ঠিক মনে নেই, ওই "কল্‌চর" "মল্‌চর" নিয়ে কি যেন একটা প্রতিষ্ঠান, আর চৌধুরী হলেন তার "সর্বাধিকারী" "মহাস্থবির" না কি যেন একটা।···কিছুদিন পর—ইতিমধ্যে অবশ্য প্ল্যান মাফিক দু-দশখানা ভালো-মন্দ-মাঝারি "কলচরল" বই "জম্বুদ্বীপসমন্বিত–" দুচ্‌ছাই আবার ভুলে গেলুম প্রতিষ্ঠানের নামটা—বই বেরিয়েছে। সর্বাধিকারী চৌধুরী প্রতিষ্ঠানের কর্তাকে বোঝালেন—

(ক) ঋগ্বেদের যে সব অনুবাদ গত এবং এই শতকে ইংরিজী-বাংলা-ফরাসী-জর্মনে বেরিয়েছে, সেগুলো ইতিমধ্যে বিলকুল বেকার ঔট অব্ ডেট হয়ে গিয়েছে, (খ) একটি নূতন অনুবাদ দরকার, (গ) সেটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করতে হলে বড় বড় পণ্ডিতদের সাহায্য নিতে হবে, (ঘ) এবং তাঁদের দক্ষিণা এবং ছাপা বাবদ লাগবে আশী হাজার টাকা।

আমি তাজ্জব মেনে বললুম, 'কি বললে, আশী হাজার টাকা? বলো কি!'

'বিলক্ষণ! আশী হাজার টাকা! ব্যাপারটা হল গিয়ে, ওই যে প্রতিষ্ঠাতা পলিটিশিয়ান কল্‌চরড্ হতে চান, তিনি শেয়ারবাজার, টেভয় টিন্ থেকে ওমরা তুলো, শিবরাজপুর মেঙ্গানীজ সব বোঝেন, কিন্তু—কিন্তু বড় বড় পণ্ডিতদের তেজীমন্দী বাবদে বিলকুল না-ওয়াকিফহাল। ঢেলে দিলেন টাকাটা। তার পর বেরুতে লাগলো কিস্তিতে কিস্তিতে বেদের নবীন ইংরিজী অনুবাদ। যে রকম আমাদের হরিবাবুর বাংলা কোষ বেরিয়েছিল। উত্তম প্রস্তাব! কিন্তু, ব্রাদার, নিরবচ্ছিন্ন শান্তি এই দগ্ধ সংসারে কোথায়? হঠাৎ পুণার এক পণ্ডিত আমাদের কল্‌চর-প্রতিষ্ঠাতার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে অনুবাদের খুঁনিয়া খুনিয়া সব ভুল দেখাতে লাগলেন। যেমন মনে করো—কথার কথা কইচি, আমি তো ওখানে ছিলুম না—"রবিকর" অনুবাদে হয়েছেন, "সূর্য যে খাজনা দেন" কিংবা "রাজকর" অনুবাদে হয়েছেন, "রাজা যে রশ্মি দেন"।···এ রকম বিদকুটে বরবাদ অনুবাদ কেন হল কিছুই বোঝা গেল না। সামান্যতম বৈদিক ভাষা যে জানে সেও তো এরকম ভুল করবে না। হ্যাঁ, আলবৎ, 'ক্রন্দসী' 'রোদসী' ধরনের অচলিত শব্দ

১ 'চলন্তিকা' বলেন 'সজ্ঞান' থেকে সেয়ানা। বড়বাবু বলেন, শ্যেনদৃষ্টি রাখে যে জন তার থেকে শেয়ানা, শ্যানা।

নিয়ে সাতিশয় সাধু মতান্তর হতে পারে, কিন্তু এ ধরনের আকাট, বর্বর—? রহস্যটা তবে কি ?'

আমিও সায় দিয়ে বললুম, 'রহস্যটা তবে কি ?'

'ওই কল্‌চরকামী প্রতিষ্ঠাতা বেদবেদান্ত বাবদে বেকুব হতে পারেন, কিন্তু তিনি "ইঁদুরের গন্ধ পান"—শয়তানীর শ্বাস পান। নইলে সাদা-কালো-গেরুয়া বাজার কনট্রোল করছেন বৃথাই। তিন দিন যেতে না যেতে স্বয়ং চৌধুরীই এসে যা বললেন তার থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল, তিনি কি ভারতীয়, কি ফরাসী, কি ইংরেজ, কি জর্মন কোনো পণ্ডিতকেই অনুবাদ-কর্মে নিযুক্ত করেন নি। তাবৎ কর্ম করিয়াছেন একটি দুঃস্থা জর্মন রমণীকে দিয়ে। সে বেচারী সংস্কৃতেরও এক বর্ণ জানে না—বেদের ভাষা মনোজের ভাষায় কহাঁ কহাঁ মুল্লুকে! সে স্রেফ জর্মন পণ্ডিত গেল্টনার-কৃত কয়েক বৎসর পূর্বে প্রকাশিত বেদের অনবদ্য জর্মন অনুবাদ ইংরিজীতে অনুবাদ করে গেছে। মেয়েটি ভালো জর্মন জানে বটে, কিন্তু তার ইংরিজী কাঁচা। কিন্তু সেইটেই মূলতত্ত্ব নয়। আসল বিপদ হয়েছে, বেদের অনেক বস্তু অস্পষ্ট, রহস্যময়, দ্ব্যর্থ কেন—বহু অর্থসূচক। সেগুলো জর্মন পণ্ডিত গেল্টনারও করেছেন সন্তর্পণে, আবছা-আবছা রেখে—যেন সান্ধ্যভাষায়। এ নারী তাই তার অনুবাদে—আদৌ সংস্কৃত জানে না বলে—রবিকর, রাজকর, নরকর, হাতীর কর (কথার কথা কইচি!) গুবলেট করে বসেছে। তখন পরিষ্কার হল রহস্যটা।

তস্য বিগলিতার্থ, চৌধুরী দশ-বিশজন পণ্ডিত লাগিয়ে, তাদের ন্যায্য দক্ষিণা দিয়ে অনুবাদ করান নি। মেমসাহেবকে দিয়ে কম্মটি করিয়ে নিয়েছেন।

আরো অর্থাৎ এবং সেখানেই অর্থ, মেমসাহেবকে তিনি দিয়েছেন এক হাজার টাকা, ছাপার খরচা বাদ দিয়ে তিনি পকেটস্থ করেছেন সত্তর হাজার টাকা। হল ?'

*　　　*

চৌধুরী এখন ফট্‌কা-বাজারে ভালো পয়সা কামায়॥

অদ্যাপিও সেই খেলা খেলে গোরা রায়।
মধ্যে মধ্যে ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥

এই 'দেশ' পত্রিকাতেই আমার এক সতীর্থ কিছুদিন পূর্বে 'ফরেন ডিগ্রী'-ধারীর দম্ভের প্রতি ক্ষণতরে ঈষৎ ভ্রূকুটিকুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মর্মঘাতী আপন মূল

বক্তব্যে চলে যান। হয়তো সে-স্থলে এ বিষয় নিয়ে সবিস্তর আলোচনা করার অবকাশ ছিল না, অর্থাৎ তিনি শেখ চিল্লীর মত মূল বক্তব্যের লাভ এবং ঈষৎ অবান্তর বক্তব্যের ফাউ দুটোই হারাতে চান নি।

ওঃ! গল্পটি বোধ হয় আপনি জানেন না, কারণ শেখ চিল্লী জাতে খোট্টা এবং বাঙলা দেশে কখনো পদার্পণ করেন নি। যদ্যপি শ্রীযুক্তা সীতা এবং শান্তা এবং খুব সম্ভব তাঁদের অগ্রজও মিয়া শেখ চিল্লীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন উপকথার মারফতে—স্বর্গত রামানন্দের পরিবার যে খোট্টাই দেশে বাল্যকাল কাটিয়েছেন সে কথা আগে জানা না থাকলেও তাঁর শতবার্ষিকী উপলক্ষে লিখিত প্রবন্ধাদি পড়ে বহু বাঙালীই জেনে গিয়েছেন। কিন্তু এস্থলে আমার যে গল্পটি স্মরণে এল সেটি বোধ হয় তাঁরা ইতিপূর্বে সবিস্তর বয়ান করে আমাকে পরবর্তী যুগের 'চোর' প্রতিপন্ন করার সুব্যবস্থা করে যান নি—এই ভরসাতেই সেটি উল্লেখ করছি। করে গেলেও ঝুটমুট 'ঝেপবার' ভয় নেই—কারণ গল্পটি ক্লাসিক পর্যায়ের, অর্থাৎ এর বিষয়বস্তু সর্বসাধারণের কার্যকলাপে নিত্য নিত্য সপ্রকাশ হয় বলে এটি নিত্যদিনের ব্যবহার্য গল্প।

মা-সরস্বতীর বর পাওয়ার পূর্বে কালিদাস যে আক্কেল-বুদ্ধি ধারণ করতেন, হিন্দী-উর্দুভাষীদের শেখ চিল্লীও সেই রকম আস্ত একটি 'পণ্টক' ('কণ্টক' থেকে 'কাঁটা'—সেই সূত্রানুযায়ী 'পণ্টক' থেকে কি উৎপন্ন হয় সে তত্ত্ব সুচতুর পাঠককে বুঝিয়ে বলতে হবে না; আসলে এই গূঢ় তত্ত্বটি আবিষ্কার করার ফলেই শ্রীযুত সুনীতি চট্টো অস্মদ্দেশীয় শব্দতাত্ত্বিকদের পঙ্‌ক্তিতে আপন তখ্‌ৎ-ই-তাউসে গ্যাট হয়ে বসবার হক্ক কব্জা করেন।)।

সেই শেখ চিল্লীকে তাঁর মা হাতে একটি বোতল আর পয়সা দিয়ে বাজার থেকে তেল কিনে আনবার আদেশ দিলেন এবং পুত্রের পেটে কি পরিমাণ এলেম গজগজ করছে সেটা জানতেন বলে পই পই করে স্মরণ করিয়ে দিলেন, আসল তেলটা পাওয়ার পর সে যেন ফাউ আনতে না ভোলে। শেখ চিল্লী এক গাল হেসে বললেন, 'তা-ও কখনো হয়!'

আমি জানি, আজকের দিনের পাঠক কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না যে, কোনো জিনিসের দাম বাজারে কস্মিনকালে কখনো কমে। কিন্তু করতেই হবে, এই হালের সুকুমার রায়ের যুগেও 'বাড়তি' 'কমতি' ছিল—এমন কি বয়সের বেলাও। আমি যে যুগের বয়ান দিচ্ছি সেটা তারও বহু পূর্বেকার। তাই মিয়া চিল্লীর আম্মাজানের অজানতেই বাজারে তেলের দর হঠাৎ কমে গিয়েছিল। হয়তো কোনো 'রাধা'কে নাচাবার জন্য নবাব সাহেবের 'ন মন তেলে'র প্রয়োজন

হওয়াতে তিনিও শায়েস্তা খানের মত তেলের দর সস্তায় বেঁধে দিয়ে বাজার শায়েস্তা করেছিলেন। সেটা এ যুগের 'সন্দেশ' শায়েস্তা করতে গিয়ে স্বহস্তে স্বপৃষ্ঠে ভূতের কিল খাওয়া নয়।

তা সে যা-ই হোক্, তেল সস্তা হয়ে যাওয়ার দরুন মূল তেলেই বোতল কানায় কানায় ভরে গেল। শেখ চিল্লীর ঘটে বুদ্ধি কম ছিল সত্য কিন্তু তার স্মৃতিশক্তিটি আমাদের 'দাদখানী তেল, মসুরির বেল'-এর মত ছিল না! তিনি দোকানীকে বললেন, 'ফাউ?'

দোকানী বললে, 'কী আপদ, বোতলে জায়গা কোথায়?'

শেখ বললেন, 'বটে! চালাকি পেয়েছ? এই তো জায়গা।' বলে তিনি বোতলটি উপুড় করে, বোতলের তলার গর্তটি দেখিয়ে দিলেন। মেরি মাগডেলেন যে খৃষ্টের পদদ্বয় তৈলাক্ত করেছিলেন সেটাকেও হার মানালেন শেখ—অবশ্য স্বহস্তে। দোকানী মুচকি হেসে সেই গর্তটি এক কাঁচ্চা তেল নিয়ে ভরে দিয়ে শেখের ফাউয়ের খাঁইও ভরে দিল।

বোতলটি অতি সন্তর্পণে 'স্টাটুস কুয়ো' বজায় রেখে ধরে ধরে শেখ বাড়ি পৌঁছে মাকে বললেন, 'এই নাও আম্মা, তোমার ফাউ।' তারপর বোতলটি উল্টে খাড়া করে ধরে বললেন, 'আর ভিতরে তোমার আসল।'

আম্মা-জানের পদদ্বয় অবশ্য খৃষ্টের তুলনায় অল্পই অভিষিক্ত হল!

* *

দেশ থেকে যে বোতলটি নিয়ে এ-দেশের ছাত্র বিদেশে বিদ্যার তেল—না ভুল বললুম, ডিগ্রীর তেল—কিনতে যায়, সেটি নিয়ে সে কোন শেখ চিল্লীর মত কি বেসাতি করে সে তত্ত্বটি অনেকেরই জানা নেই। না জানারই কথা, কারণ ইংরেজ আমলের পূর্বে এ-দেশে কখনো এই 'ফরেন' ভূতের উপদ্রব হয় নি। মুসলমান আমলে কি হয়েছিল সেটা পরের কথা। তার পূর্বে কোনো ভারতসন্তান 'ফরেন' ডিগ্রীর জন্য কামচাটকা থেকে কাসাব্লাঙ্কা কোথাও গিয়েছে বলে শুনি নি। তবে জাতক পড়লে পাই, ঐ যুগে তক্ষশিলা ছিল বৌদ্ধ জ্ঞানবিজ্ঞান-চর্চার কেন্দ্র এবং বারাণসী ছিল সনাতন ধর্ম-জ্ঞানবিজ্ঞান-চর্চার জন্য সর্বপ্রসিদ্ধ তীর্থ। তাই জাতকের একাধিক গল্পে পাই, বৌদ্ধ কিংবা বৌদ্ধভাবাপন্ন বারাণসী গৃহী পুত্রকে তক্ষশিলায় বিদ্যার্জনের জন্য পাঠাতেন। তদ্রূপ কাশী সর্বকালেই সনাতন ধর্ম ও জ্ঞানবিজ্ঞানের কেন্দ্রভূমি থাকা সত্ত্বেও হয়তো বিক্রমাদিত্যের যুগে সারা ভারতের কোনো কোনো অঞ্চল থেকে কিছু ছাত্র উজ্জয়িনীতে বিদ্যাভ্যাস করতে গিয়েছে।

মুসলমান আমলে রাজকার্য তথা জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা ফার্সীতে হত। (বৌদ্ধধর্ম লোপ পাওয়ার ফলে বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো লোপ পায়; কিন্তু কাশী ও পরবর্তী যুগে বৃন্দাবনে হিন্দুশাস্ত্র চর্চার ব্যাপক ব্যবস্থা ছিল এবং এখনো আছে।) কিন্তু ফার্সী যদিও পারস্যের ভাষা, তবু এ-দেশের কোনো ফার্সী শিক্ষার্থী তেহ্‌রান বা মেশেদ্‌ শহরে ফার্সী শিখতে যেত না। ধর্মচর্চার জন্য ছাত্রেরা পড়তো আরবী, কিন্তু তারাও মক্কা, মদিনা বা কাইরোতে গিয়ে 'ফরেন' ডিগ্রী নিয়ে আসতো না। অবশ্য কোনো কোনো ছাত্র এ-দেশে পাঠ সমাপন করে মক্কায় গিয়ে হজ্‌ করার সময় কাবার চতুর্দিকে যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা দেওয়া হয়, সেগুলো শুনে নিত। অধীনের মাতামহ তাই করেছিলেন।

বিদেশে না যাওয়ার কারণ এ-দেশেই আরবী-ফার্সীর মাধ্যমে উত্তম জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ব্যবস্থা ছিল। এবং পাঠান-মোগল যুগেও কাবুল, কান্দাহার বা মজার-ই-শরীফে কোনো বড় কেন্দ্র গড়ে ওঠে নি—উঠেছিল দেওবন্দ, রামপুর, সুরট অঞ্চলের রাঁদেরে, হায়দ্রাবাদে, ঢাকায়, সিলেটে। বস্তুত কাবুল অঞ্চলের মেধাবী ছাত্র মাত্রই আমানুল্লার আমল পর্যন্ত দিল্লী অঞ্চলেই পড়াশুনো করতে আসত। আমি কাবুলে যাই ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে। তখন যে কয়টি আরবী-ফার্সীজ্ঞ পণ্ডিতের সঙ্গে সেখানে আমার আলাপ-পরিচয় হয় তাঁরা সকলেই উর্দু ও জানতেন, কারণ সকলেই বিদ্যাভ্যাস করেছিলেন ভারতে। ঠিক যে রকম বৌদ্ধ যুগে চীনা তথা অন্যান্য বৌদ্ধধর্মাবলম্বী শ্রমণরা এদেশে শিক্ষালাভের জন্য আসতেন, এখনো অল্পবিস্তর আসেন।

এমন কি, যে কাইরোর আজহর বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় এক হাজার পনরো বছর ধরে ধীরে ধীরে মুসলিম শাস্ত্রচর্চার সর্বশ্রেষ্ঠ সর্ববৃহৎ সর্বাপেক্ষা বিত্তশালী কেন্দ্ররূপে স্বীকৃত হয়েছে, সেখানেও ভারত থেকে কখনো খুব বেশী ছাত্র যায় নি। আমি যখন (১৯৩৩।৩৫) কাইরোতে ছিলুম তখন পাক (বর্তমান) ভারত উভয়ে মিলিয়েও ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জনারও বেশী ছাত্র ছিল না। পক্ষান্তরে, সেখানে আরবী দর্শনের যে পাঠ্যপুস্তক সম্মানিত ছিল, সেটি জনৈক ভারতীয় মৌলানা দ্বারা লিখিত।

[এস্থলে সম্পূর্ণ অবান্তর নয় বলে উল্লেখ করি, সাত শ বছর আরবী-ফার্সীর কঠিন একনিষ্ঠ সাধনা করে ভারতীয় মৌলবীরা জ্ঞানবিজ্ঞান ধর্মচর্চায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন সত্য, কিন্তু আরবী দূরে থাক, ফার্সী সাহিত্যেও কোনো কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। তার এক মাত্র কারণ মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য কোনো ভাষায় সাহিত্যের কুৎব্‌মিনার গড়া অসম্ভব। তাই যখন দেখি, মাত্র এক শ বছর ইংরেজী

চর্চার পর এদেশে, কেউ কেউ সে সাহিত্যে ঢিপি তৈরি করে ভাবছেন সেটি মিনার, তখন বড়ই বিস্ময় বোধ হয়। তাঁরা কি সত্যই ভাবেন, সেই সাত শ বছরের তাবৎ গুণীজ্ঞানীরা—এবং তাঁরা রাজার্থানুকূল্য পেয়েছিলেন চেরাপুঞ্জির বর্ষণের চেয়েও বেশী—এঁদের তুলনায় অতিশয় কুক্কুটমস্তিষ্কধারী ছিলেন ? তাই যখন দেখি র‍্যাবোর বদলে হ্র্যাবো—তা হলে 'rare' অর্থাৎ 'বিরল' হবে 'হ্রাহ্র', France হবে 'ফ্হ্রাঁস এবং যেখানে 'r' অক্ষরের সঙ্গে উ-কার যুক্ত, যেমন 'প্রুস্ত', সেখানে গতি কি ? কারণ 'প'র নিচে 'হ' এবং তারও নিচে উ-কার দিয়ে তৈরি কোন 'হাঁসজারুই' (হাঁস+সজারু+রুই) জাতীয় অক্ষর তো বাঙলা ছাপাখানায় নেই—তখন শুধু সবিনয় সকাতর সভয়ে প্রশ্ন শুধোতে ইচ্ছা করে, 'আপনারা তরুণরা, যে নানাবিধ ভাষা শিখছেন সেটা বড়ই আনন্দের কথা, কিন্তু একবার একটু ভেবে নিলেই তো হয় যে মাইকেল, জ্যোতি ঠাকুর, বীরবল, ধ্বনিবিদ সুনীতি চট্টো, শহীদুল্লা এঁরা কেউই এই বিদকুটে ফরাসী 'র' ধ্বনি যে আলাদা সেটা লক্ষ্য করলেন না, এটা কি প্রকারে সম্ভবে ?' এবং শেষ নিবেদন—জানি আপনারা পেত্যয় যাবেন না, ফরাসী জর্মন এমন কি ইংরাজি 'r'ও বাঙলা 'র'-এর মত নয় সেটা সত্য, কিন্তু তাদের 'r'র সঙ্গে যে আমাদের 'র' মিলছে না সেটা আমরা 'র'-এর উচ্চারণ করার সময় মুখগহ্বরের অন্য জায়গা থেকে করি বলে নয়—তাদের আপত্তি আমরা 'r' উচ্চারণের সময় সেটিকে 'ট্রিল' করি বলে, অর্থাৎ আমরা যখন বলি 'পারি' (প্যারিস) তখন ফরাসী শুনতে পায় যেন আমরা 'r'টা তিনবার উচ্চারণ করে বসে আছি। বিচক্ষণ ফরাসী গুরু তদ্দণ্ডেই বলেন, 'কিন্তু মসিয়ো Paris শব্দে মাত্র একটি "r" আপনি তিনটে "r" উচ্চারণ করলেন যে ?' আমি আরো জানি—আপনারা আরো পেত্যয় যাবেন না যদি বলি, ফরাসী জর্মন উভয় অভিনেতাই [এবং উচ্চারণের ক্ষেত্রে ধ্বনিবিদ্ পণ্ডিতের চেয়ে এঁরাই সর্বসাধারণের কাছে অধিকতর সম্মান লাভ করেন—ইংলণ্ডেও বার্নার্ড শ-কে যে বি বি সি উচ্চারণ-বোর্ডে সসম্মানে নিমন্ত্রণ করা হত তাঁর কারণ তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতি নয়, নাট্যে উচ্চারণ বাবদে তাঁর ওয়াকিফহালত্ব] চেষ্টা করেন বাঙালীর 'র'র মত আপন 'r' উচ্চারণ করতে !!! —কিন্তু ট্রিল না করে। অর্থাৎ জর্মনে যাকে বলে হ্যাল[১]—উজ্জ্বল—ফরাসীতে

১ কথাটা জর্মনে hell, কিন্তু বাঙলায় আমি 'হেল' না লিখে হ্যাল কেন লিখলুম সে বিষয় নিয়ে সুদূর ভবিষ্যতে আলোচনা করবার আশা রাখি। কারণ জনৈক পত্রলেখক ইটিকে আমার 'হিমালয়ান ব্লাণ্ডার' পর্যায়ে ফেলেছেন।

যাকে বলে ক্ল্যার—ক্লিয়ার, পরিষ্কার, স্বচ্ছ 'r' উচ্চারণ করাটাকে আদর্শ 'r' উচ্চারণ মনে করেন। তাই মোটামুটি ভাবে বলা যায় ফরাসী বা জর্মন এমন কি ইংরিজী 'r' উচ্চারণ করার সময় যদি জিভটাকে মুখের ভিতর ঝুলিয়ে রেখে—অর্থাৎ সেটাকে তালু, মূর্ধা বা দাঁতের পিছনে ছুঁতে না দিয়ে, এবং কাজে কাজেই কোনো প্রকারের ট্রিল বা ফ্ল্যাপ করবার সুযোগ না দিয়ে—বাঙলা 'র' ধ্বনি উচ্চারণ করা হয় তবে ঐ তিন ভাষায় ধ্বনিবিদ্ পণ্ডিতরাই আদর্শ "r" উচ্চারিত হয়েছে বলে মনে করেন। তার পর অবশ্য যদি কেউ সেটাকে খাঁটি প্যারিসিয়ান করতে চান তবে সেটা গলা থেকে আরবী 'গাইন' ঘেঁষা করবেন, দক্ষিণ-ফ্রান্সের মত করতে হলে ফার্সী 'খে' ঘেঁষা করবেন এবং জর্মন বলার সময় কলোন-বন্ অঞ্চলের 'r' উচ্চারণ করতে হলে সেটাকেও ঐ ফার্সী 'খে' ঘেঁষা করবেন। কিন্তু সর্বক্ষণ সাবধান থাকতে হবে যে, ট্রিলিং দুষ্কর্মটি যেন করা না হয়। বীরভূম অঞ্চলে যখন 'রাম'-এর পরিবর্তে 'আম' উচ্চারণ শোনা যায় তখন ঐ ট্রিলটি করা হয় না বলে—এবং রেডুকৎসিয়ো আড্ আব্‌সুর্ডুম হয়ে যাওয়ার ফলে 'র'-এর সর্বনাশ হয়ে 'অ' ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়। ইংরিজীতেও তাই, কিংবা প্রায় তাই হয়—যখন 'r' কোনো স্বরবর্ণের পরে আসে। যথা 'hard'; এস্থলে 'r' শুধু আগের a-টিকে দীর্ঘ করে। 'r'-এর পরিপূর্ণ ব্যঞ্জনধর্ম লোপ পায় কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে বলে কোনো কোনো ধ্বনিবিদ্ উচ্চারণ দেখাবার সময় তাই 'r' হরফটি উল্টো করে দিয়ে লেখেন এবং ছাপাখানায়ও হরফটি উল্টো করে ছাপা হয়—লাইনো বা টাইপ রাইটারে অবশ্য সেটা সম্ভব নয়। আর 'r' বলার সময় যদি বাঙলার মত সেটাকে ট্রিল করতে চান, তবে প্রাণভরে করা যায় ইতালির 'r' উচ্চারণ করার সময়। ইংরিজিতে যে স্থলে 'Irregular' বলার সময় প্রথম যে দুটো 'r' একসঙ্গে এল, সে দুটোকে দু'বার উচ্চারণ করতে তো দেয়ই না, একবারই—বাঙলার হিসেবে—প্রাণভরে করতে দেয় কই? সেখানে ইটালিয়ান 'birra' (বিয়ার) বলার সময় যদি 'r'-টা প্রেমসে ট্রিল না করেন—কম-সে-কম দুবার—তবে বিয়ারের বদলে সেই যে ফুটোয় ভর্তি এক রকম পনির হয় বেয়ারা তারই ফুটোগুলো শুধু প্লেটে করে হয়তো নিয়ে আসবে! এবং শেষ কথা: ফরাসী জর্মন ধ্বনিবিদ্ যে তাঁদের 'r' পরিষ্কার ক্ল্যার হ্যাল উজ্জ্বল রাখতে চান, তার অন্যতম কারণ, গ্রীক এবং লাতিন যে 'r' আছে সেটা সংস্কৃত 'র'-এরই মত পরিষ্কার উজ্জ্বল—এবং জানা-অজানাতে ইয়োরোপীয় পণ্ডিত মাত্রই গ্রীক-লাতিন থেকে খুব দূরে চলে যেতে চান না। এরই উদাহরণ 'গুড্‌বাই, মিঃ চিপ্‌স্ ফিল্মে আছে'।]

সত্য জ্ঞানলাভের জন্য তৃষ্ণার্ত জন যুগে যুগে বিদেশ গিয়েছে, বিধর্মীর কাছে গিয়েছে। পয়গম্বর বলেছেন, 'জ্ঞানলাভের জন্য যদি চীন যেতে হয় তবে সেখানে যেয়ো'—বলা বাহুল্য, তাঁর আমলে চীন দেশে কোনো মুসলমান ছিলেন না এবং তাই ধরে নিতে পারি বিধর্মী 'কাফেরে'র কাছ থেকে জ্ঞানসঞ্চয় করতেও তিনি আপত্তিজনক কিছু পান নি।

কিন্তু এই যে 'ফরেন' যাওয়ার হিড়িক আরম্ভ হল প্রায় শ' খানেক বছর আগে এবং স্বরাজ পাওয়ার পর—কিমাশ্চর্যমতঃপরম্—এখনো বাড়তির দিকে, তার বেশীর ভাগই ছিল 'ইস্টাম্বো' নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে – পেটটাকে এলেমে ভর্তি করার জন্য নয়। পাঠান এবং মোগল রাজারা এ-দেশেই বাস করতেন, এইটেই তাঁদের মাতৃভূমি, কাজেই বিদেশের ইস্টাম্বোর প্রতি তাঁদের কোনো অহেতুক মোহ ছিল না—যদিও বিদেশাগত হুনুরী গুণীকে তাঁরা আদর করে দরবারে স্থান দিতেন। কিন্তু ইংরেজ কলকাতায় বসেও চোখ বন্ধ করে তাকিয়ে থাকতো লণ্ডনের দিকে, Kedgeree ('কেজরী'—খিচুড়ি—কৃশর, কৃশরান্ন ?—) খাওয়ার সময় চিন্তা করতো আল্লায় মালুম কিসের!

অতএব সেখানে থেকে যদি কপালে একটি 'ইস্টাম্বো' মারিয়ে নিয়ে আসা যায় তবে পেটে আপনার এলেম গজ্‌গজ্ করুক আর নাই করুক, আপনি 'ফ্রেশ্ ফ্রম্ ক্রিস্টিয়ান হোম', আপনিও এখন গোরা রায়। তাই স্বরাজ লাভের পরও

অদ্যাপিও সেই খেলা খেলে গোরা রায়।
দিবাভাগে মন্দ ভাগ্যে তার মার খায়॥

সাবিত্রী

দক্ষিণ ভারতের একটি সানাটরিয়ামে আমার এক বন্ধুকে নিয়ে যেতে হয়েছিল। ব্যামো গোড়াতেই ধরা পড়েছিল বলে কেস্ খারাপ হতে পায় নি। আমাকেও তাই কোন প্রকারের সেবা-শুশ্রূষা করতে হত না। হাতে মেলা সময়। তাই কটেজে কটেজে—এ-সব কটেজে থাকে অপেক্ষাকৃত বিত্তশালীরা আর বিরাট বিরাট প্লাটের একাধিক জেনরেল ওয়ার্ড তো আছেই—ডাক্তাররা সকাল বেলাকার রোগী-পরীক্ষার রোঁদ সেরে বেরিয়ে যাবার পরই আমি বেরতাম আমার রোঁদে। বেচারাদের অধিকাংশকেই দিনের পর দিন একা-একা শুয়ে

শুয়ে কাটাতে হয় বলে কেউ তাদের দেখতে এলে সঙ্গে সঙ্গে তাদের মুখ যে কী রকম খুশীতে উজ্জ্বল— এবং যে-ক'টি ফোঁটা রক্ত গায়ে আছে, সব ক'টি মুখে এসে যেত বলে রাঙা—হয়ে যেত, সেটা সত্যই অবর্ণনীয়।

করে করে প্রায় সব্বাইকেই আমি চিনে গিয়েছিলুম— তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতীই বেশী।

একটি কটেজে আমি কখখনো যাই নি, ডাক্তার ভিন্ন আর কাউকে কখনো যেতেও দেখি নি। রোগীর পাশে সর্বক্ষণ দেখা যেত একটি যুবতী—বরঞ্চ তরুণী-ঘেঁষা যুবতী বললেই ঠিক হয়—মোড়ার উপর বসে উলের কাজ করে যাচ্ছেন; তাই বোধ হয় কেউ তাঁদের বিরক্ত করতে চাইতো না।

একদা রোঁদ শেষে, পথিমধ্যে হঠাৎ আচমকা বৃষ্টি। উঠলুম সেই কটেজ-টাতেই।

যুবতীটি ধীরে ধীরে মোড়া ছেড়ে আমার দিকে এগিয়ে এসে অতি ক্ষীণ ম্লান হাসি হেসে বললেন, 'আসুন, বসুন। কী ভাগ্য বৃষ্টিটা নেমেছিল। নইলে আপনি হয়তো কোনদিনই এ-কটেজে পায়ের ধূলি দিতেন না।'

কী মিষ্টি গলা! আর সৌন্দর্যে ইনি রাজরানী হওয়ার উপযুক্ত। কিন্তু সে কী শান্ত সৌন্দর্য! গভীর রাত্রে, ক্ষীণ চন্দ্রালোকে, আমি নিস্তব্ধ, নিস্তরঙ্গ সমুদ্রে দেখেছি এই শান্ত ভাব—দিক্-দিগন্ত জুড়ে। আমরা প্রাচীন যুগের বাঙালী। চট করে অপরিচিতার মুখের দিকে তাকাতে বাধো বাধো ঠেকে। এঁর দিকে তাকানো যায় অসঙ্কোচে।

রোগীও সুপুরুষ, এবং এই পরিবেশে খাটে শুয়ে না থাকলে বলতুম, রীতিমত স্বাস্থ্যবান। শুধু মুখটি অস্বাভাবিক লালচে—যেন গোরা অফিসারের মুখের লাল।

স্ত্রীর কথায় সায় দিয়ে হেসে বললেন—গলাটা কিন্তু রোগীর—'রোজ চারবেলা দেখি আপনাকে এ-পথ দিয়ে আসতে যেতে। পাশের কটেজে শুনি আপনার উচ্চহাস্য। শুধু আমরাই ছিলুম অস্পৃশ্য! অথচ দেখুন, আমি মুখুজ্যে বামুন—'

আমি গল্প জমাবার জন্য বললুম, 'কোন্ মেল ? আমার হাতে বাঁড়ুজ্যে ফুলের মেল একটি মেয়ে আছে।'

এবারে দুজনার আনন্দ অবিমিশ্র। এ লোকটা তাহলে পরকে 'আপনাতে' জানে। তিন্মুহূর্তে জমে গেল।

খানিকক্ষণ পরে আমি বললুম, 'আপনারা দুজনাই বড় খাঁটি বাঙলা বলেন, কিন্তু একটু যেন পুরনো পুরনো।'

মুখুজ্যে বললেন, 'আমি ডাক্তার—অবশ্য এখন অবস্থা "কবরাজ! ঠেকাও আপন যমরাজ।" তা সে যাকগে। আসলে কি জানেন, আমরা দুজনাই প্রবাসী বাঙালী। তিনপুরুষ ধরে লক্ষ্ণৌয়ে। আমার মা কাশীর, ঠাকুরমা ভট্ট-পল্লীর। সেই ঠাকুরমার কাছে শিখেছি বাঙলা—শাস্ত্রীঘরের সংস্কৃতঘেঁষা বাঙলা। সেইটে বুনিয়াদ। সবিতা আমাদের প্রতিবেশী। আমার ঠাকুরমার ছাত্রী। আমরা দুজনা হুবহু একই বাঙলা পড়েছি, শিখেছি, বলেছি। তবে ম্যাট্রিক পর্যন্ত উর্দু শিখেছি বলে মাঝে মাঝে দু-একটি উর্দু শব্দ এসে যায়—আমার ভাষাতে, সবিতার না। আপনার খারাপ লাগে?'

আমি প্রতিবাদ করে বললুম, 'তওবা, তওবা! আমি বাঙালী মুসলমান; আমরা ইঁও্হী দু-চারটে ফাল্‌তো আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহার করি।'

পাশ ফিরে, আপন দুই বাহু আমার দিকে প্রসারিত করে দিলেন। আমি আমার হাত দিলুম। দু'হাত চেপে ধরে, চোখ বন্ধ করে, গভীর আত্মপ্রসাদের দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'বাঁচালেন। আপনি মুসলমান!'

আমি একটু দিশেহারা হয়ে চুপ করে রইলুম।

জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি যত্রতত্র খান এখানে? ডাক্তার হিসেবে বলছি, সেটা কিন্তু উচিত নয়।'

আমি বললুম, 'আমি যত্রতত্র যা-তা খাই, এবং ভবিষ্যতেও খাবো। অপরাধ নেবেন না।'

'বাঁচালেন।' এবারে আমি আরো দিশেহারা। আমি তাঁর পরামর্শ অমান্য করছি দেখে তিনি খুশী।

'বাঁচালেন! জানেন, প্রথম দিনই আপনার চেহারা দেখে, অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ করলুম আমার এক মুসলমান বন্ধুর সঙ্গে।'

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমায় বলি নি, সবিতা?'

সবিতা এতক্ষণ ধরে শুধু উল বুনে যাচ্ছিলেন। মাথা তুলে সম্মতি জানিয়ে বললেন, 'এমন কি, চলার ধরনটি, গলার সুরও!'

মুখুজ্যে বললেন, 'সেই বন্ধুটি যদি আজ এ-লোকে থাকতো, তবে আজ আমার এ-দুর্দশা হত না! সে কথা থাক। মূল বক্তব্য এই: ঠাকুরমা প্লাস তামাম পরিবার, প্লাস সেই সখার পরিবার—সবাইকে লুকিয়ে, বিস্তর ছলনা-জাল বিস্তার করে আমি ছেলেবেলা থেকে খেয়েছি ওর মায়ের তৈরী মুর্গী-মটন। সে খেত আমাদের বাড়িতে নিশ্চিন্ত মনে। আপনি বোধ হয় জানেন না—'

'বিলক্ষণ জানি, স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—আপনার ঠাকুরমার পাড়ার লোক -

বাড়িতে দিশী-বিদেশী সবাইকে খাওয়াতেন। তাঁর ছেলে, স্বর্গত বিনয়তোষ তিনিও নিষ্ঠাচারী ছিলেন। ঝাড়া আটটি বছর প্রতি রোববারে, তাঁর সামনে বসে, তাঁর সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজন করেছি আমি, মুসলমান।'

ডাক্তার বললেন, 'তারপর ঠাকুরমা মা আর সবাই গত হলেন। রইল ঐ দোস্ত-ইয়ার-সখা বেদার্-বখ্‌শ্। একই বছরে দুজনায় ডাক্তারি পাস করলুম। ইতিমধ্যে আমার বিয়ে হয়েছে। সবিতা রাঁধে ভালো, কিন্তু তার মা তাকে বলে দিয়েছিলেন, 'অন্তত রান্নার ব্যাপারে বাপের বাড়ির ঐতিহ্য ভুলে গিয়ে, স্বামী যে-ভাবে খেতে চায় ঠিক সেইভাবে খাওয়াবি।' তাই সবিতা বেদারের মায়ের কাছ থেকে শিখলো বিরয়ানী থেকে ফালুদা, বুরহানী থেকে আজওয়ান রুটি। অতএব স্যার, কাল দ্বিপ্রহরে এখানে একটু হবিষ্যান্ন করবেন—' হেসে বললেন, 'অবশ্যই, মোগলাই। আসলে কি জানেন, এই যে চোখের সামনে সবিতা উদয়াস্ত উল বোনে, এটা, it gets on my nerves। আর সবিতা একটি পারফেকট আর্টিস্ট। রন্ধনে। তার অনুশীলন নেই, রেওয়াজ নেই। আপনার শোক হয় না? আমার তো ওসব খাওয়া বারণ। নিজের জন্য—'

আমি সবিতার দিকে তাকিয়ে আমার মাকে দেখতে পেলুম; বাড়িতে কেউ না থাকলে মা হাঁড়ি পর্যন্ত চড়াতো না। তেল-মুড়ি খেয়ে শুয়ে পড়তো। আর এই সবিতা নাকি বিস্বাদ বিবর্ণ মাছসেদ্দ, কপিসেদ্দ, পাতলাসে পাতলা যেন কড়াই-ধোয়া-জল স্যুপ নামে পরিচিত গব্বযন্ত্রণা স্বামীকে খেতে দিয়ে নিজে গণ্ডার-গ্রাসে খাবে বিরয়ানী, বুরহানী কাবাব-মুসল্লম!

আমি বললুম, 'ফিন্‌সে তওবা! তা-ও কখনো হয়! কিন্তু আমি একা-একা খাব?—কেমন যেন?'

আর্তনাদ করে বললেন, 'আপনি বিশ্বাস করতে পারেন না, রান্নাঘর থেকে সবিতার রেওয়াজের গন্ধ আমার নাকে আসবে—আচ্ছা, আপনি না-হয় আড়ালেই খাবেন, শুধু আমি পদগুলো কম্পোজ করে দেব। আপনাকে এ-নিমন্ত্রণ সাহস করে জানালুম, আপনি যত্রতত্র খান শুনে। নইলে—'

আমি বললুম, 'ডাক্তার, আমি জানি আপনাদের অনেকক্ষণ ধরে কথা বলা বারণ। কাল সকালের রোঁদ সেরেই আসবো। দুপুরে খাব।'

সবিতা রাস্তা অবধি নেমে এসে বললেন—মাথা নিচু করে, প্রায় হাতজোড় করে, 'এই দু'বছর ধরে আমরা এখানে আছি। এই প্রথমবার তিনি পুরো আধ ঘণ্টা ধরে খুশিতে আনন্দে সময় কাটালেন। আপনি দয়া করে আসতে ভুলবেন না। বড় ডাক্তার বলেছে, উনি ফুর্তিতে থাকলে তাড়াতাড়ি সেরে উঠবেন। আমি

ওঁকে বাঁচাতে চাই। আপনি আমার প্রতি দয়া করুন—'

হঠাৎ ধপ্ করে রাস্তার পাশে হাঁটু গেড়ে আমার পায়ের উপর তার মাথা ঠুকে দিল। এত দুঃখের ভিতরও আমি দেখলুম, বন্যার জলের মত একমাথা গোছা গোছা গাদা গাদা কালো চুল ঘোমটার বাঁধ সরিয়ে আমার দুই গোড়ালির হাড় পেরিয়ে, মাঝ-হাঁটু অবধি ছাপিয়ে দিল। এ-চুল আমি দেখেছি, অতিশয় শৈশবে, আজ মনে হয়, যেন আধাস্বপ্নে, যেন কুয়াশার ভিতর দিয়ে, আমার মায়ের মাথায়।

সতীসাধ্বী যুবতীকে স্পর্শ করা গুনাহ্। জাহান্নামে যাক গুনাহ্!

দু'হাত দিয়ে তাকে তুলে ধরলুম। বললুম, 'মা! ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখো।'

সীমন্তিনী বললে, 'আমি আল্লাকে ইয়াদ করি।' ॥

আধুনিকা

থেকে থেকে 'মর্ডান' মেয়েদের বিরুদ্ধে খবরের কাগজে নানা জাতের চিঠি বেরোয়। সেগুলোর মূল বক্তব্য কি, তার সবিস্তার বয়ান দেবার প্রয়োজন নেই এবং সেগুলো যে সর্বৈব ভিত্তিহীন সে-কথাও বলা যায় না। হালে পাড়ার বুড়োরা আমাকে দফে দফে মডার্নীদের 'কুকীর্তি'র কাহিনী কয়ে গেলেন। সেই সুবাদে আমার একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল।

ত্রিশ বছর আগেকার কথা। তখনও এদেশে 'পেট-কাটা' 'নখরাঙানো' মডার্নীদের আবির্ভাব হয় নি, এ তো জানা কথা, কিন্তু 'মর্ডান' মেয়ে সর্বযুগে সর্বদেশেই থাকে। আমার মনে হত, সে যুগের মডার্নতম দেখা যেত চাঁদপুর—নারায়ণগঞ্জ—গোয়ালন্দী জাহাজে। এরা ঐসব অঞ্চলের ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়েথদের মেয়ে—তবে বৈদ্যই বেশী—কলকাতায় আসতো,যেতো কলেজে পড়বে বলে। এক একটির চেহারা ছিল অপূর্ব। তন্বী, শ্যামাঙ্গী, স্বাস্থ্যবতী—আপন আনন্দে থার্ড ক্লাস ডেকের যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়, চায়ের স্টলে বসে খেতেও ওদের বাধে না। প্রাচীনরা ওদের দিকে একটু বাঁকা নয়নে তাকালেও একথা আমি কিছুতেই স্বীকার করবো না, ওরা বেহায়া বা বেশরম ছিল।

সে-আমলে ইন্টার ক্লাস প্যাসেঞ্জারের জন্য দুটো জালে ঘেরা কামরা—বা খাঁচা থাকতো। একটা পুরুষ, একটা মেয়েদের। খুব যে আরামের ছিল তা নয়, তবে যে-সব লাজুক বউঝিরা পরপুরুষের সামনে কখনো বেরোয় নি তারা সেখানে

খানিকটে আরাম বোধ করতো।

সেকেণ্ড ক্লাসের কামরাতেই শুয়ে শুয়ে শুনতে পেলুম, থার্ড ক্লাস ডেক ও দুটো খাঁচা অঞ্চলে হঠাৎ আন্দোলন উত্তেজনা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। বয়েস আমার তখনো কম, তাই কৌতূহল ছিল বেশী। কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে শুধোই, ব্যাপারটা কি ?

হট্টগোল হচ্ছে বটে, কিন্তু যাকেই প্রশ্ন শুধোই সে-ই পাশ কাটিয়ে যায়। এস্তেক চা'র স্টলের দোকানটি পর্যন্ত এমন ভাব করলে যেন আমার প্রশ্নটা আদৌ শুনতে পায় নি।

সুর্‌-রিয়ালিজম দাদাইজম যাঁরা জানেন তাঁরা বুঝতে পারবেন, আমি যদি তখনকার অবস্থার বর্ণনাটা দিতে গিয়ে বলি, ডেকের সর্বত্র যেন 'ছি ছি' আঁকা, কানে আসছে 'ছি ছি' স্বর, নাকের ভিতরও যেন 'ছি ছি' ঢুকছে।

টুয়েন্টিনাইন খেলা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, দশ-পঁচিশের দান একদিকে অবহেলে পড়ে আছে, এদিকে ওদিকে ছোট ছোট দলের ঘোটালা, আর সারেঙ্গ জাহাজময় হন্তদন্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে। কিন্তু সর্বোপরি ঐ ছি ছি ভাব।

তখন হঠাৎ চোখে পড়ল, মেয়েদের ইন্টার ক্লাসের খাঁচা বেবাক ফাঁক—খানিকক্ষণ পূর্বেও যেটাকে কাঁঠাল-বোঝাই দেখে গিয়েছি—অবশ্য আড়নয়নে। আরো ভালো করে তাকিয়ে দেখি, খাঁচাটার এক কোণায় আপাদমস্তক চাদরে ঢাকা কি যেন একটা বস্তু—মানুষই হবে—পড়ে আছে মেঝেতে। মনে হল, সেটা গোঙরাচ্ছে, কিন্তু ঐ 'ছি ছি'-র ভিতর দিয়ে ঠিক ঠিক ধরতে পারলুম না।

এমন সময় খানসামার সঙ্গে দেখা। পূর্বেই লোকটির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল—সে সিলেটি।

ইতিউতি করে বললে, 'কেলেঙ্কারি ব্যাপার। ইন্টার ক্লাসের ঐ মেয়েটি গর্ভযন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে।'

আমি অবাক হয়ে বললুম, 'সে কী ব্যাপার! একে কেউ সাহায্য করছে না কেন? স্টিমারে তো গণ্ডায় গণ্ডায় বুড়ী-হাবড়ী রয়েছে যারা কুড়িবুড়িতে আণ্ডাবাচ্চা বিইয়েছে ?'

খানসামার পো ঈষৎ লাজুক প্রকৃতি ধরে। আবার গাই-গুঁই করে বললে, 'ব্যাপারটা কি হয়েছে, হুজুর, মেয়েটার বিয়ে হয় নি।'

'তা হলে এল কোত্থেকে ? সঙ্গীসাথী নেই ?'

'যা শুনেছি, তাই বলছি হুজুর। কেউই সঠিক খবর জানে না। মেয়েটার সঙ্গে একটা ছোকরা ছিল ওরই বয়সী। সে মাঝে মাঝে ওকে চা-টা পৌঁছে

দিয়েছে। ছেলেটা আমার কাছেই মুর্গী-কারি খেয়েছে। মেয়েটা কোনো কিছুই খেতে রাজী হয় নি। শুধু চা-টি খেয়েছে অনেক চাপাচাপির পর—বোধ হয় জাতঘরের হিন্দু মেয়ে।'

আমি অসহিষ্ণু হয়ে বললুম, 'তা তো বুঝলুম, কিন্তু ছেলেটা কোথায়? সেই তো জিম্মেদার।'

'গর্ভযন্ত্রণার প্রথম লক্ষণ দেখা দিতেই সে গা-ঢাকা দিয়ে মাঝখানের স্টেশনে নেমে পড়ে পালিয়েছে। লোকে অনুমান করছে, মেয়েটাকে সে নিয়ে যাচ্ছিল কলকাতায় কোনো একটা ব্যবস্থা করার জন্য। দেশ থেকে বেরুতে দেরি হয়ে যায়, তাই হঠাৎ এ গর্দিশ এসে পড়েছে।'

আমি বললুম, 'সেও বুঝলুম, কিন্তু মেয়েটা বিপদে পড়েছে, আর কেউই সাহায্য করছে না! এটা একটা কথার কথা হল?'

অসহায় ভাব দেখিয়ে বললে, 'হিন্দুদের ব্যাপার, কি করে বুঝি বলুন। দু' একটি মুসলমান আছে। তারাও হিন্দুদের ঐ সব দেখে বোধ হয় সাহস পাচ্ছে না।'

আমি বললুম, 'জাহাজে ডাক্তার নেই? প্যাসেঞ্জারের ভিতরেও?'

'তারই সন্ধান চলছে, হুজুর।'

তারপর খানসামা বিজ্ঞভাবে দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে যেন আপন মনে বললে, 'যত সব নাদান বেকুবের কারবার। আরে বাপু, মেয়েটার মাথায় এক থাবড়া সিঁদুর আগে লেপটে দিলেই তো পারতো।'

(জানি নে, তাতে করে কি হত। হালে এ্যারোপ্লেনে নাকি এমতাবস্থায় এ্যারহোস্টেস্ সাহায্য করতে রাজী হয় নি)।

আপন ক্যাবিনে ফিরে যাচ্ছি। এমন সময় এক সহৃদয় প্যাসেঞ্জার আমাকে পাকড়ে বললে, 'আপনি চলুন না, স্যার।'

তাজ্জব মেনে বললুম, 'আমি!'

'কেন? আপনি তো ডাক্তার!'

বুঝলুম, আমার ট্রাঙ্কে বা রিজার্ভেশন কার্ডে দেখেছে, লেখা, Dr.। কাতর কণ্ঠে বোঝাতে চেষ্টা করলুম, সেটা ভিন্ন বস্তু, বেকার, 'ফরেন'। এটা দিয়ে মাছিটার ছেঁড়া পাখনাও জোড়া দেওয়া যায় না। লোকটি বড়ই সরল। তাকে কিছুতেই বোঝাতে পারি নে, চিকিৎসার ডাক্তার এক প্রাণী, আমার ডক্টরেট ত্রিসংসারে কারো কোনো কাজে লাগে না। এ ধরনের গেরো আমার জীবনে আরো দু'দুবার হয়ে গিয়েছে।

ইতিমধ্যে জাহাজে নূতন চাঞ্চল্য। কোত্থেকে পাওয়া গেছে এক না-পাস কম্পাউণ্ডার। সে বোধ হয় 'শ্মশান-চিকিৎসাটা' করতে রাজী হয়েছে। তবে বলছে, একটি মেয়েছেলের সাহায্য পেলে ভালো হত।

তারপর যা দেখলুম, সে দৃশ্যটি আমার জীবনে ভুলবো না।

ঐ যে পূর্বে বলছিলুম, জাহাজে তখনকার দিনের কলেজের দু'পাঁচটা 'আধুনিকা' নিঃসঙ্কোচে ঘুরে বেড়াতো, তাদেরই একটি—লম্বা, ছিপছিপে শ্যামবর্ণ, পরনে সাদামাটা শাড়ি ব্লাউজ—গমগম করে কম্পাউণ্ডারের দিকে এগিয়ে গেল, দু হাত দিয়ে ভিড় ঠেলে ঠেলে। তখন চতুর্দিক থেকে উঠেছে তার দিকে 'ছ্যা ছ্যা ছি ছি' রব। সক্কলের টার্গেট তখন ঐ আসন্নপ্রসবা নয়—তখন এই ভদ্রকন্যা।

আমি জীবনে দু'জন পরমহংস দেখেছি।

আর এই দেখলুম, একটি পরমহংসী। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে নয়, সর্ব ধিক্কার, সব ব্যঙ্গ, সব বিদ্রূপ উপেক্ষা করে প্রসন্ন বদনে সে এগিয়ে যাচ্ছে !!

ফরাইজ্

'বাপের বাড়ি', 'শ্বশুরবাড়ি', 'পিতৃগৃহ', 'পতিগৃহ', 'মুখ্যগৃহ', 'গৌণ গৃহ' ইত্যাকার বহু প্রকার 'গৃহে'র নবীন নামকরণের প্রস্তাব পত্রান্তরে হয়ে যাচ্ছে। এই সুবাদে মুসলমানদের ভিতর কি রীতি প্রচলিত আছে সেটার উল্লেখ বোধ হয় সম্পূর্ণ অবান্তর হবে না। কারণ হিন্দু এবং মুসলমান ধর্মের লোকাচারে, বিষয়-সম্পত্তি বণ্টন বাবদে যতই পার্থক্য থাক না কেন, উভয় ধর্মাবলম্বীরই ভাষা বাঙলা এবং মুসলমান মেয়েও বলে 'বাপের বাড়ি' 'শ্বশুরবাড়ি'। তবু একটা ব্যাপারে সামান্য তফাত আছে।

অল্প হোক, বিস্তর হোক, পিতার মৃত্যুর পর মুসলমান মেয়ে বাপের সম্পত্তির কিছুটা হিস্যে পায়। অর্থাৎ পৈতৃক ভদ্রাসনেও তার আইনত অংশ বিদ্যমান থাকে। একেই বলে 'ফরাইজ্'।

কার্যত কিন্তু সে এ-ফরাইজ্ দাবি করে না। এমন কি পতিগৃহে তার লোভী স্বামী যদি তাকে ন্যায্য হক্ক পাওয়াব জন্য ক্রমাগত টুইয়ে দিতে থাকে তবু সে সেটার দাবি করে না, মোকদ্দমা করতেও রাজী হয় না—আর স্বামী নিজের থেকে কোনো দাবি-দাওয়া করতে পারে না, কারণ হক্ক তার স্ত্রীর, তার নয়।

বোন কেন মোকদ্দমা করে না, তার একাধিক কারণ আছে। লোকাচারে বাধে (এতে হয় তো কিছুটা প্রতিবেশী হিন্দুর প্রভাব আছে), এবং দ্বিতীয়ত তার অন্য স্বার্থ আছে। সে যদি তার ন্যায্য পাওনা নিয়ে নেয়, তবে সে অর্থ হয়তো খর্চা হয়ে যাবে, এবং স্বামীর মৃত্যুর পর সে যদি কোনো কারণে অসহায় হয়ে যায় —দেবর ভাশুর তাকে অবহেলা করে—তবে তার অন্য আশ্রয় থাকে না। পক্ষান্তরে সে যদি ফরাইজ্ না নেয়, তবে সে তারই হক্কের জোরে বাপের বাড়িতে এসে আশ্রয় নিতে পারে। এমন কি শ্বশুর ভাশুর স্বামীর জীবিতাবস্থায়ও যদি তার উপর অত্যধিক চোটপাট হয় তবে সে ফরাইজের হক্কে বাপের বা (বাপ মরে গিয়ে থাকলে) ভাইয়ের বাড়িতে এসে আশ্রয় নিতে পারে।

আরো একটা কারণ আছে। মুসলমান মেয়ে মাত্রই আশা করে, সে যেন বছরে অন্তত একবার তার বাপ-মা, ভাইবোন, ছেলেবেলার পাড়াপ্রতিবেশীকে দেখতে যেতে পায়। এস্থলে স্মরণ করিয়ে দি, বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান মেয়ের নাম পদবী বদলায় না। মুসলমান বিবাহ অনেকটা সিভিল ম্যারিজের মত কনট্রাক্ট ম্যারিজ—সেক্রেমেন্টাল নয়। অপরাধ যদি না নেন, তবে উল্লেখ করি, আমার পিতার নাম ছিল সৈয়দ সিকন্দর আলী। অথচ আমার মা চিরকালই নাম সই করেছেন, আমতুল মন্নান খাতুন চৌধুরী। মিসেস আলী, মিসেস সৈয়দ —বা বেগম আলী এসব হালে ইংরেজের অনুকরণে হয়েছে।

* *

এবারে গরীব দুঃখী চাষীবাসীদের একটি উদাহরণ দি। পূব বাঙলার।

মনে করুন চাষা কেরামতুল্লা মারা গেছে। তার মেয়ে জয়নবের বিয়ে হয়েছে বেশ দূরে ভিন্ গাঁয়ে। জয়নবের বাল্যাবস্থায় তার মা মারা যায় বলে কেরামতুল্লা দুসরা শাদী করেছিল। সে পক্ষের ছেলে আকরম বিধবা মাকে নিয়ে, বিয়ে করে মোটামুটি সুখে-স্বচ্ছন্দেই আছে। সৎ বোনকে আর স্মরণেই আনে না। তার মাও সতীনের মেয়ে জয়নবকে দু' চোখে দেখতে পায় না। অতএব জয়নব বেচারী বাপের বাড়ির মুখ দেখতে পায় না। জয়নবের শ্বশুরবাড়ির গাঁয়ের লোকে তাই নিয়ে ঠাট্টা-মস্করা করে। ওদিকে লোভী স্বামীও বলে, 'ফরাইজ্ চেয়ে নে।'

জয়নব বেচারী তখন যদি দৈবযোগে বাপের গাঁয়ের কাউকে পেয়ে যায় তখন তাকে দিয়ে ভাইকে খবর পাঠায় তাকে যেন এসে বাপের বাড়িতে কয়েকদিনের জন্য নিয়ে যায়—একেই বলে 'নাইওর' যাওয়া। ভাই খবর পেয়েও গা করে না —আর সৎমার তো কথাই নেই। বেচারী জয়নব একাধিকবার খবর পাঠিয়ে

হয়রান হয়ে গেল। ওদিকে বাপের গাঁয়ের লোক তো আর তার শ্বশুরের গাঁয়ে নিত্যি নিত্যি আসে না যে নিত্যি নিত্যি খবর পাঠাবে।

তখন সে ধরে অন্য পন্থা। নদীতে জল আনতে গিয়ে সুযোগ পেলেই সময় কাটায় বিস্তর। এবং স্বভাবতই তার গাঁয়ের সব মাঝিদের সে চেনে। তাদের কাউকে দেখতে পেলে পাড়ে বসেই চিৎকার করে তার ফরিয়াদটি জানিয়ে দেয়। সবিস্তারে বলতে হয় না—সবাই সব খবর জানে।

তাতেও যদি ওষুধ না ধরে, তখন সে ধরে রুদ্রমূর্তি।

শাসিয়ে দেয়, তাকে নাইওর না নিয়ে গেলে সে ফরাইজের মোকদ্দমা করবে

এইবার ভাইয়ের কানে কিঞ্চিৎ জল যায়। তাও পুরোমাত্রায় না। ইতিমধ্যে গাঁয়ের মুরুব্বীদের কানেও তাবৎ ফরিয়াদ পৌঁচেছে—বিশেষত সেই সব বৃদ্ধদের কানে যাঁরা বিয়ের ঘটকালি করেছিলেন। তাঁরা তখন ছোকরাকে বুঝিয়ে বলেন, 'তোর আছে কুল্লে আড়াই বিঘত জমি—আচ্ছা, তার না হয় কিছুটা গেল; কিন্তু তোর বসত-বাড়িতেও যে ছুঁড়ির হিস্সে রয়েছে। সেইটেও তুই লাটে তুলবি নাকি? যা, যা, বোনকে নিয়ে আয়।'

আমি এতক্ষণ যা বললুম, এসব পূব-বাঙলার লোকসঙ্গীতেও আছে। তারই একটির শেষ দুই লাইনে আছে,

"থাকো গো বোন, থাকো গো বোন,
কিলগুঁতা খাইয়া,
আষাঢ়[১] মাসে লইয়া যাইমু
পঙ্খীরাজ ওড়াইয়া॥"

ভাই নৌকা নিয়ে আসার খবর পাওয়া মাত্রই বোন লেগে যায় নানারকম মিষ্টি পিঠে বানাতে। শাশুড়ী গজর গজর করে, কিন্তু জা-রা তো একই গোয়ালের গাই তারা সাহায্য করে।

নৌকা এল। বোন সগর্বে হাঁড়ি-ভর্তি মিঠে পিঠে নিয়ে নৌকায় চাপলো। গাঁয়ের মেয়েরা এখন আর তাকে খোঁটা দিতে পারবে না। এ তো সতীর নিঃসঙ্গ হিমালয়-যাত্রা নয়।

* *

---

১ লেখকের মনে ঈষৎ সন্দেহ আছে, এস্থলে ভাই বোধ হয় বোনকে কিঞ্চিৎ ধাপ্পা দিচ্ছে। বোনকে সচরাচর নাইওর নেওয়া হয় অঘ্রান মাসে ধান কাটার পর। কিন্তু আমি সঠিক বলতে পারবো না। কারণ দেশ ছেড়েছি দুই যুগ পূর্বে।

বুদ্ধিমতী মেয়ে বলে বাপের বাড়ি গিয়ে জয়নব পাড়াময় চর্কিবাজি মেরে দিন কাটায় না। অবশ্য সর্বপ্রথম মিঠে পিঠে নিয়ে আত্মীয়-স্বজন, সইটইদের সঙ্গে দেখা করতে যায়, কিন্তু তারপরই লেগে যায় নূতন ধানচাল যা উঠেছে তার দুরুস্ত-ব্যবস্থা করতে। অবশ্য একথাও ঠিক, কেউ তা সে যে কোনো স্ত্রীপুরুষই হোক যদি সুবো-শাম বেঘোরে ঘুমোয় তবে লোকে প্রবাদটা বলে, 'দেখো খোদার খাসিটা ঘুমুচ্ছে যেন "নাইওরী-মাগীটার" মত !'

এই করে করে 'নাইওর' বাস যখন শেষ হয়, তখন বাপের বাড়িতে আবার মিঠে পিঠে তৈরী আরম্ভ হয়—এগুলো সে নিয়ে যাবে শ্বশুরবাড়িতে। ভাই অন্তত একখানা শাড়ি, একটি কুর্তা কিনে দেবে বোনকে—জামা-ফ্রক ভাগ্নেভাগ্নিকে!

জয়নব কিন্তু ধান ভানা কোটাতে এমনই সাহায্য করে যেন ভাই, সৎমা ফ্রী চীপ-লেবারের প্রলোভনে তাকে আসছে বছর নিজের থেকেই 'নাইওর' নিয়ে আসে—ফরাইজের মোকদ্দমার শাসানি যেন মাঝি-মাল্লা মারফত না পাঠাতে হয় শ্বশুরবাড়ি ফিরে জয়নব আবার দেমাক করে, 'আমি মাগনা খাই নে পরি নে। যদ্দিন ওখানে ছিলুম সৎমাকে কুটোটি পর্যন্ত কুড়োতে দি নি !'

* *

এতক্ষণ যা নিবেদন করলুম এটা হিন্দুদের বেলাও প্রযোজ্য। প্যাটার্ন মোটামুটি একই, তবে তফাৎটা কোথায় ?

তফাৎ ঐ ফরাইজের হক, ড্যুরেস, ব্ল্যাকমেল (অবশ্য বেআইনী নয়) দিয়ে সে বাপের বাড়ি যাবার হক আজীবন জিইয়ে রাখে। স্বামীর সঙ্গে না বনলে সেই হকের জোরে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বাপের বাড়ি চলে আসে। অবস্থা চরমে পৌঁছলে সেখানে বসে স্বামীর বিরুদ্ধে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ন্যায্য স্ত্রীধনের মোকদ্দমা লাগায়। কিংবা যদি স্বামীর মৃত্যুর পর ভাশুর-দেওর তাকে অসম্মান করে তবে সে চলে আসে বাপের বাড়িতে, ঠুকে দেয় ওদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা। এগুলোই আসল তত্ত্ব বলে পুনরাবৃত্তি করলুম।

* *

এ সব সম্ভব বাপের বাড়ির ফরাইজের জোরে।

তাই সেটি সে কখনো হাত-ছাড়া করে না। লোভী স্বামী যতই চোটপাট করুক না কেন।

হিন্দু মেয়েরা একটু চিন্তা করে দেখবেন॥

চোখের জলের লেখক

ইংরিজির শব্দভাণ্ডার অতুলনীয়। তন্মধ্যে একটি শব্দ 'গ্যাগা'—এর সঠিক উচ্চারণ না জানা থাকলেও ক্ষতি নেই। 'গ্যাগা' শব্দের অর্থ, লোকটার ব্রেন্-বক্সে যা আছে—যদি কিছু আদৌ থাকে—সেটা এমনই হযবরল গোবলেট পাকানোর জগা-খিচুড়ি যে কেউ কিছু বললে তার গলা দিয়ে যে ধ্বনি বেরয় সেটা 'গাগা', 'গ্যাগো' 'গ্যাগ্যা' গোঙরানো ঢপের—কাজেই শব্দটির যে কোনো উচ্চারণই মঞ্জুর। অর্থাৎ গাগার সঙ্গে ইম্‌বেসাইল, ইডিয়ট ('পন্টক' বললুম না, কারণ সুনীতিবাবুর শব্দটির কপি-রাইট মেরে দিয়ে সেটার পাইরেটিং সংস্করণ বের করার দরুন পাড়ার ছোঁড়ারা আমাকে 'কন্টক' থেকে 'কাঁটা', 'পন্টক' থেকে 'পাঁঠা' বের না করে আড়াল থেকে আমাকে 'পন্ঠক্' বলতে আরম্ভ করেছে) গোবর-গণেশ যে কারো সঙ্গে তুলনা করলে শেষোক্তদের অপমান করা হয়।

সেই গ্যাগাদের গ্যাগা—গ্যাগায়েস্টের মত আমি শুধু অর্থহীন কতকগুলো ধ্বনি বের করলুম যখন আমার এক নিত্যালাপী গুণী বললেন, জনৈক অধ্যাপক[১] নাকি প্রকাশ্য সভাস্থলে রায় প্রকাশ করেন, স্বর্গত, প্রাতঃস্মরণীয় শিল্পীরাজ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নাকি থাড্ডোকেলাস্ 'চোখের জলের লেখক'। আচ্ছা, পাঠক তুমিও কও, সেস্থলে তুমি কি করতে! শরৎচন্দ্র কাঁদিয়েছেন! শরৎচন্দ্র হাসান নি! সামাজিক নিষ্ঠুরতার কাঁটাবনের উপর দিয়ে আমাদের কান ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যান নি!—কাঁদাবার জন্য নয়, যন্ত্রণায় চিৎকার করার জন্য। ব্যঙ্গ, শ্লেষ, বিদ্রূপ-বাণে আমাদের জর্জরিত করেন নি?

এই পুণ্য বঙ্গভূমিতে শতাধিক বর্ষ ধরে দুটি দল আছে। রামমোহন বনাম সতীদাহের দল, বিদ্যাসাগর বনাম নিরম্বু উপবাসের দল, রবীন্দ্রনাথ বনাম—তা সে যাই হোক্। সেই দল চেষ্টা করেছিলেন শরৎচন্দ্রকে নেতা বানিয়ে রবীন্দ্রনাথকে অতিষ্ঠ করে তুলতে। তাঁরা মাথা পরিমাণ কৃতকার্য হয়েছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, শরৎচন্দ্র দলের বাইরে। শরৎচন্দ্র যেমন 'দত্তা'র 'রাসবিহারী' চরিত্র আঁকেন, ঠিক তেমনি 'নারীর মূল্য'ও লিখতে জানেন। (আশা করি বলার প্রয়োজন নেই যে শরৎচন্দ্র এই অমূল্য গ্রন্থ কাঁদাবার জন্য লেখেন নি; পাঠক, আপনি সে বই পড়ে কি ভেবেছেন সঠিক বলতে পারবো না; আমার মনে হয়েছে, আমি যেন দু গালে চড় খাচ্ছি এবং জানি যখন এ-ই আমার

---

১ যে-কোনো কারণেই হোক, বন্ধুবর নাম উল্লেখ করলেন না, আমিও শুধোই নি।

প্রাপ্য তাই আমি তখন কাঁদি নি—কারণ কাঁদবার হক্কও সঞ্চয় করতে হয়।)

এদিকে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'অন্ধভক্তে'র দল—ডেকে আন্ বললে যারা বেঁধে আনে—(যদিও আমি রবীন্দ্র-শিষ্য হিসেবে শপথ করে বলতে পারি, তিনি ডেকে আনতেও বলেন নি) লাগলেন শরৎচন্দ্রের পিছনে। তার জের আজও চলছে। অবশ্য এস্থলে আমি করজোড়ে ক্ষমা ভিক্ষাকরে নিবেদন করি, পূর্বোল্লিখিত অধ্যাপক এ-'দলে'র নাও হতে পারেন। তিনি হয়তো তাঁর স্বাধীন ধর্মবুদ্ধি অনুযায়ী তাঁর বক্তব্য বলেছেন।

কিন্তু এসব 'বৃথা বাক্য'। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ একটি 'তুলনাহীনা' কবিতা লিখতে লিখতে হঠাৎ লিখেছেন, 'বৃথা বাক্য থাক্'। গুরুবাক্য স্মরণে এবং সেই নীতি অনুযায়ী আমারও মন তাই এতক্ষণ ধরে বৃথা বাক্য ভুলে গিয়ে শুধু আঁকুবাঁকু করছে, মেজদার স্মরণে—যিনি দুর্দান্ত শীতের রাতে লেপের ভিতর কচ্ছপটির মত শুয়ে আছেন আর শ্রীকান্ত তাঁর জন্য পাতা উল্টে দিচ্ছেন, হঠাৎ ব্যাঘ্ররূপী 'বউরূপী'র আবির্ভাব, ভিরমি কাটলে পর মেজদা ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, 'দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার'—ইতিমধ্যে খড়ম পেটাতে পেটাতে (আহা, কী সুন্দর ছবিটি!) কটুবাক্য, 'খোট্টার ব্যাটারা কাঁঠাল পাকা দিয়া'—এবং সবশেষে পিসীমার সাত পাকের সোয়ামীর প্রতি অত্যন্ত প্র্যাকটিকাল সময়োপযোগী সদুপদেশ,—কাটা ন্যাজটি ভবিষ্যতের সুব্যবহারার্থে তরিবৎ করে তুলে রাখার জন্য—সেকালে বোধ হয় ভাগলপুরে ব্যাঙ্কে ভল্টের ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু সাবধান! আমাকে সর্বক্ষণ সচেতন হয়ে থাকতে হবে যেন ফাঁদে পা না দি;—শরৎচন্দ্র যে বাঙলা দেশকে হাসিয়েছেন তার উদ্ধৃতি দেবার প্রলোভন সম্বরণ না করলে বর্তমানে যাদের হাতে শরৎ-গ্রন্থাবলীর কপিরাইট তাঁরা আমাকে জেলে পুরবেন—পাতার পর পাতা নিছক পুনর্মুদ্রণ তাঁরা বরদাস্ত করবেন কেন? অথচ আমার বক্তব্য তো স্পষ্টতম হবে, যদি আমি একটি মাত্র বাক্যব্যয় না করে নিছক উদ্ধৃতির পর উদ্ধৃতি দিয়ে যাই।

তর্কস্থলে স্বীকার করছি কাঁদানো সহজ। হাসানো কঠিন। টেকো ভদ্রলোক তাঁর বাদবাকি কুল্লে আড়াইগাছা চুল দিয়ে মাথার সামনের দিকের চালটা যেন খড় দিয়ে ছাওয়ার নিষ্ফল প্রচেষ্টা করেছেন—তাই দেখে রকে বসে আমার তিন ভাগনে যে 'সেব্রামীয়' টিপ্পনী কাটলে সেটি অনায়াসে অলিম্পিকে পাঠানো যায় এবং সেটি আমি ঘরের ভিতর থেকে স্পষ্ট শুনতে পেলুম। কিন্তু, হায়, ওদের সঙ্গে যোগ দিতে পারলুম না, কারণ, সরলতম কারণ, আমার আপন টাকটি—থাক, 'বৃথা বাক্য থাক্'। কিন্তু ঠিক ঐ সময় অন্য একটি ভদ্রলোক রাস্তা দিয়ে যাবার সময় রক্ থেকে যদি শব্দ আসতো, 'আহা বেচারা, কাল রাত্রে তার ছেলেটি

—জানিস, কি হয়েছে?'—বাকিটা শুনতে পেলুম না বলে হেঁকে শুধালুম, 'কেন রে, কি হয়েছে?' 'টাইফয়েডে একটা চোখ গেছে।' আমি তখন রকেরই একজন হয়ে গেলুম।

কিংবা সরলতর উদাহরণ দি।

ঐ বৈঠকখানায়ই বসে আছি। বাড়ির বউঝিরা রান্নাঘরে ফিস ফিস করে গালগল্প করতে করতে—রাঁধে মেয়ে কি চুল বাঁধে না—হঠাৎ সবাই একসঙ্গে হেসে উঠলো। আমি যত গ্যাগা-ই হই না কেন, উঠে গিয়ে শুধবো না, 'হ্যাঁ বউমা, তোমরা হাসছিলে কেন?'

কিন্তু তারা যদি হঠাৎ একসঙ্গে ডুকরে কেঁদে ওঠে তবে আমি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গিয়ে জানতে চাইবো তারা এরকম ধারা হঠাৎ কেঁদে উঠলো কেন? অর্থাৎ হাসি একে অন্যের কাছ থেকে দূরে নিয়ে যায়, কান্না কাছে টেনে আনে।

* *

শরৎচন্দ্র 'চোখের জলের লেখক'? আর বিদ্যেসাগর? বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের সময় তিনি যে সব ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন, তখন আমরা ঠাঠা করে হেসেছি?—না? তাঁর 'শকুন্তলা' পড়তে পড়তে আমি তো হেসেই গড়াগড়ি! রবীন্দ্রনাথের হাস্যরস নিশ্চয়ই অত্যন্ত অপ্রচুর ছিল। নইলে তিনি লিখবেন কেন, 'কেহ দুঃখ পায় ইহা তিনি (শ্রীকণ্ঠবাবু) সহিতে পারিতেন না—ইহার কাহিনীও তাঁহার পক্ষে অসহ্য ছিল। এই বালকদের কেহ যখন কৌতুক করিয়া তাঁহাকে পীড়ন করিতে চাহিত তখন বিদ্যাসাগরের "সীতার বনবাস" বা "শকুন্তলা" হইতে কোনো একটা করুণ অংশ তাঁহাকে পড়িয়া শোনাইত, তিনি দুই হাত তুলিয়া নিষেধ করিয়া, অনুনয় করিয়া কোনো মতে থামাইয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন।'

আশ্চর্য! আমি তো গ্রন্থ দু'খানা পড়ে হেসেই কুটিকুটি। তবে হ্যাঁ, আমি পূর্বেই স্বীকার করেছি আমি গ্যাগা।

সাহিত্যিক বিদ্যাসাগর মশাইকে লোকে চেনে তাঁর 'চোখের জলে'র বইয়ের জন্য। অবতার বিদ্যাসাগরকে বাঙালী চেনে তিনি মানুষের চোখের জল মুছিয়ে দিতেন বলে। বিদ্যাসাগর মশাই দুটোই পারতেন। কিন্তু সবাই তো তা পারে না। সমাজের অত্যাচার অনাচার দেখে সত্য সাহিত্যিক মানুষকে কাঁদায়। তাঁদের ভিতরে যাঁরা সত্যকার মানুষ তখন তাঁদের অনেকেই সে-সব অনাচারের বিরুদ্ধে নাঙ্গা তলওয়ার নিয়ে জেহাদ ঘোষণা করে। কারণ আমাদের অধিকাংশই জড়। সাহিত্যিক স্পর্শকাতর। সে যখন করুণ বর্ণনা দিয়ে আমাদের কাঁদায়,

তখন আমাদেরই মত জড়ভরতদের কেউ কেউ ঐ সম্বন্ধে সচেতন হয়।[২]

ড্রাইফুসের প্রতি নষ্টাধম ফরাসী মিলিটারী মদমত্ত হয়ে যে অবিচার করে তার প্রতিকারের জন্য তাঁর সতীসাধ্বী স্ত্রী প্যারিসের বড় বড় রাজনৈতিক শক্তিধর শাসক সম্প্রদায়ের দ্বারে দ্বারে গিয়ে করুণ আর্তনাদ করেছে। কিন্তু সে বেচারী তো আমাদের 'তুলনাহীনা' লেখিকা আশাপূর্ণা নয়। শেষটায় চরম দীনজন যে রকম ভিক্ষুকের কাছে ভিক্ষা চায়, ঠিক সেই রকম সে গেল সাহিত্যিক এমিল জোলার কাছে। তাঁর তখন বয়স হয়ে গিয়েছে। তিনি মাফ চাইলেন। শেষটায় বেচারী তার কাগজপত্র জোলার টেবিলে ফেলে রেখে চলে গেল।

এই পৃথিবীর পরম সৌভাগ্য সেরাত্রে জোলার কোন কিছু করার ছিল না। এটা ওটা নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ সেই রমণীর কাগজপত্র চোখে পড়লো। অলস-ভরে পড়া আরম্ভ করে, বুড়া হঠাৎ সোজা হয়ে বসল—তারপর গেল ক্ষেপে। তখন লিখল জাক্যুজ (J'accuse) 'আই একুজ'। 'ফরাসী সরকারকে আমি একুজ করি'।

তারপর কি হল সেটা বলতে গেলে ঐ বইখানা ছাড়িয়ে আরো দুখানা বই লিখতে হয়।

মনে নেই, ক'বছর নির্বাসনের কারাযন্ত্রণা ভোগ করে 'কাঁদানো'র লেখক জোলার কৃপায় ড্রাইফুসের প্রতি সুবিচার হল।

শেষ কথা: বহু বহু প্রকৃত লেখক, 'চোখের জলের লেখক' নন কিংবা শুধু 'হাসাবার' লেখক নন। দুইই।

তবে কে কোথায় হাসবে, কে কোথায় কাঁদবে, বলা কঠিন। সেই "অরক্ষণীয়া" মেয়েটি যখন পড়ি-মরি হয়ে 'সেজেগুজে' কনে দেখবার পক্ষের সামনে বেরুতে যাচ্ছিল তখন একটি ছোট মেয়ে হাসি থামাতে না পেরে বলেছিল, পিসিমা সং সেজেছে।

আমি গ্যাগা। আমি ষোল বছর বয়সে কেঁদেছিলুম॥

৪।১২।৬৫

---

২ বিদ্যেসাগর ছদ্মনামে হাস্য—বরঞ্চ বলা উচিত—ব্যঙ্গরসও করে গেছেন। কিন্তু তাঁর খ্যাতি সেজন্য নয়। বস্তুত তাঁর সে সব ছদ্মনামে লেখা পুনরায় 'আবিষ্কৃত' হয় বছর বিশ-ত্রিশ পূর্বে।

ছাত্র বনাম পুলিশ

(১)

'দেখি! বের করো অভিজ্ঞান-পত্র—আইডেনটিফিকেশন কার্ড!'

কী আর করে বেচারী—দেখাতে হল কার্ডখানা। নামধাম ঠিকানা তো রয়েইছে, তদুপরি রয়েছে বেচারীর ফোটোগ্রাফ, তার নিচে ছোকরার দস্তখত, এবং দুটোর দু'কোণ জুড়ে য়ুনিভার্সিটির স্ট্যাম্প। হোমিওপ্যাথিক পাসপোর্ট আর কি!

হায় বেচারা! যখন য়ুনিভার্সিটিতে প্রবেশ করার ওক্তে সগর্বে কর্তৃপক্ষের সম্মুখে ফোটোগ্রাফের নিচে দস্তখত করেছিলে তখন কি জানতে এটা 'দস্তখত' নয়, এই 'কুকর্ম' করে তার 'দস্ত্' (হাত) 'ক্ষত' হয়েছিল—এ 'পান্'টি আমার নয়, বিদ্যেসাগর মশাইয়ের। তাঁর প্রোতেজে মাইকেল পান করতেন প্রচুর, স্বয়ং বিদ্যেসাগর 'পান্' করতেন অত্যল্পই!

প্রাগুক্ত সরস প্রেমালাপ হচ্ছিল জর্মানির কোন এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং পুলিশম্যানে (চলতি জর্মনে 'শুপো')। ছোকরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে রাত দুটোর সময় কাঁকর ছুঁড়ছিল একটি বিশেষ জানলার শার্সিকে নিশান করে, এবং যেহেতু তৎপূর্বে—অর্থাৎ শনির সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত দুটো অবধি চেন-স্মোকারদের মত এ্যাট্রুখানি, মানে ইয়ে, ঐ যাকে বলে বিয়ার—পান করেছিল বলে তাগটা স্বভাবতই টালমাটাল হয়ে পাশের যার-তার জানলার শার্সির উপর পড়ছিল। অবশ্য একথা অবিসম্বাদিত সত্য যে, সে কাপুরুষের মত শুপোর হাতে আত্মসমর্পণ করে নি—আপ্রাণ পলায়ন-প্রচেষ্টায় নিষ্ফল হয়ে তবে ধরা পড়ে।

ব্যাপারটা সবিস্তার কি?

অতি সরল। জর্মন ছাত্রছাত্রী ডিগ্রী লাভের পূর্বের তিন বৎসর ভূতের মত খাটে। কিন্তু শনির সন্ধ্যা থেকে রবির সকাল পর্যন্ত দল বেঁধে 'পাবে' ব'সে প্রেমসে বিয়ার পান করে। এবং যেহেতু বাড়াবাড়ি না করলে খৃষ্টধর্ম মদ্যপান সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করে না, তাই কোনো কোনো ধর্মানুরাগী ছেলে ভোর সাতটার 'মেস' (উপাসনায়) যোগ দিতে যায় 'পাব' থেকেই, সোজা গির্জার দিকে—শনির সন্ধ্যা থেকে রবির ভোর ছ'টা, সাড়ে ছ'টা অবধি বিয়ার পান করার পর। অবশ্যই মত্তাবস্থায় নয়—তবে ইংরিজীতে যাকে বলে ঈষৎ মডলিন।

তা সে যাক। এ লেখনের বিষয়বস্তু—পুলিশ বনাম স্টুডেন্ট ('স্টুডেন্ট' বলতে জর্মনে একমাত্র য়ুনিভার্সিটি স্টুডেন্টই বোঝায়—স্কুলবয়কে বলে 'শুলার')। এই দুই দলের মধ্যে হামেহাল—অবশ্য সাধারণত সন্ধ্যার পর থেকে ভোর পর্যন্ত

এবং বিশেষ করে শনির দিনগত রাতে—একটা অঘোষিত বৈরিতা বিরাজ করছে, য়ুনিভার্সিটি সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে। আমি যা নিবেদন করতে যাচ্ছি তার ঐতিহাসিক পটভূমিটি কিন্তু কিংবদন্তীমূলক, অর্থাৎ পুরাণ জাতীয়। সেইটুকু সয়ে নিন। তার পরই মাল।

আমরা সকলেই জানি কতকগুলো উপাধি মানুষের নামের অচ্ছেদ্য অংশ: যেমন (১) রেভারেণ্ড, (২) কর্নেল, বা (৩) ডক্টর (শুধু চিকিৎসক অর্থে নয়; যে কোনো বিষয়ে পি এচ ডি; ডি এস সি জাতীয় ডক্টরেট পাস করা থাকলে)। প্রথম শ্রেণীর উপাধিগুলো বিধিদত্ত, দ্বিতীয়গুলো রাজদত্ত এবং তৃতীয়গুলো য়ুনিভার্সিটি-দত্ত।

রাজাতে চার্চে লড়াই বহু যুগ ধরে চলেছে। এ-লড়াইয়ে শেষের দিকে এলেন য়ুনিভার্সিটি। তার পূর্বে শিক্ষা-দীক্ষার ভার ছিল প্রধানত পাদ্রীদের হাতে। কিন্তু মহামতি লুথারের আন্দোলনের ফলে বহু পিতা পুত্রকে আর 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন' যাজক সম্প্রদায়ের কাছে মানসিক, হার্দিক এমন কি আধিভৌতিক উন্নতির জন্য পাঠাতে চাইলেন না। এ ছাড়া আরো বিস্তর কারণ ছিল, কিন্তু সেগুলো এস্থলে অবান্তর না হলেও নীরস। মোদ্দা কথা, চার্চ ও রাজার লড়াইয়ের মধ্যিখানে য়ুনিভার্সিটিগুলো তক্কে তক্কে রইল আপন আপ- স্বয়ংসম্পূর্ণ-স্বাধীনতা-স্বরাজ লাভের জন্য। তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল লুথারপন্থী এবং তাদের মূল নীতি ছিল অনেকটা—'যখন পোপের "গুরু-বাদ" ত্যাগ করে স্বয়ং স্বাধীনভাবে বাইবেল পড়তে চাও, এবং তদ্দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে একমাত্র স্বাধীন চিন্তার উপর নির্ভর করে জীবন যাপন করতে চাও, তবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে দিতে হবে স্বয়ং-সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, (অটোনমাস ইণ্ডিপেনডেন্স)—নইলে তারা স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন বিচার-বিশ্লেষণ করবে কি প্রকারে?'

যে করেই হোক সে স্বাধীনতা য়ুনিভার্সিটি-টাউনগুলোর (অর্থাৎ যে শহরগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয়ই সর্বপ্রধান সর্বজনমান্য প্রতিষ্ঠান) রাস্তাঘাটেও সক্রিয় হয়ে উঠলো। অর্থাৎ নিতান্ত খুন, ধর্ষণ জাতীয় পাপাচার না করলে স্বয়ং বিশ্ববিদ্যালয়ই ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আপন জেলে (?) পুরে দিতো—বিচারের ভার নিতেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ল' বা আইন, জুরিসপ্রুডেন্সের প্রফেসরগণ—'ছাত্র আসামী' এঁদেরই একজন বা একাধিকজনকে আপন উকীল নিয়োগ করতো—এবং সবকুছ ফ্রী-গ্র্যাটিস-এ্যাণ্ড-ফর্-নাথিং!

সে-সব দিন গেছে। তবু শুনেছি, হাইডেলবের্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কিংবা অন্য কোনো একটা হতে পারে—আমার ঠিক মনে নেই—জেলখানাটি নাকি এখনো

মিউজিয়ামের মত বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। এবং সেটি নাকি সত্যই দ্রষ্টব্য বস্তু।

যে-পাঠক বাঙলা ভাষার অতুলনীয় (আমার মতে বাঙলা ভাষার 'অদ্বিতীয়) পুস্তক, উপেন বাঁড়ুয্যের 'নির্বাসিতের আত্মকথা' পড়েছেন, তিনি হয়তো স্মরণে আনতে পারবেন (আমিও স্মৃতির উপর নির্ভর করে বলছি ; তাই ভুলচুক হবে নিশ্চয়ই, এবং তার জন্য মাফ চাইছি) যে, যখন অরবিন্দ-বারীন-উল্লাস-উপেন-কানাই-সত্যেন এট আল্-এর বিরুদ্ধে আলীপুরে বোমার মামলা হয় তখন হাজতে থাকাকালীন ছোকরাদের মধ্যে যাদের অদম্য কবিত্বপ্রকাশব্যাধি ছিল তারা লেখনীমস্যাধারাভাবাৎ কাঠকয়লা দিয়ে দেয়ালে পদ্য লিখত। তারই একটি,

'ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে পাট শরীর হইল কাঠ
সোনার বরণ হৈল কালি
প্রহরী যতেক ব্যাটা বুদ্ধিতে তো বোকা-পাঁঠা
দিনরাত দেয় গালাগালি।'

যতদূর মনে পড়ছে, 'উপীন'বাবু যেন মুচকি হেসে মন্তব্য করছেন, আহা কী 'সোনার বরণ'ই না বঙ্গসন্তানের হয়!

তারপর যা লিখছেন তার সারমর্ম ; মাঝে মাঝে দু'একটি ভালো কবিতাও চোখে পড়ত। উদাহরণ-স্বরূপ দিয়েছেন,

'রাধার দুটি রাঙা পায়ে
অনন্ত পড়েছে ধরা,
ওঠে ভাসে কত বিশ্ব
চিদানন্দে মাতোয়ারা।'

এবারে তিনি যেন তাঁর চোখে একফোঁটা জল আসতে না আসতে দুঃখ করছেন, হায় রে মানুষের মন! কারাগারের পাষাণ-প্রাচীরের ভিতরেও রাধার দু'টি রাঙা পায়ের জন্য সে আছাড় খায়।[১]

* *

জর্মন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন যুগের আপন জেলখানার কথা হচ্ছিল। তার

১ অধীন পারতপক্ষে আপন বইয়ের বরাত দেয় না, কিন্তু এ-স্থলে নিতান্তই বাধ্য হয়ে নিবেদন, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'নির্বাসিতের আত্মকথা'র উপর মল্লিখিত প্রশস্তি ময়ূরকণ্ঠীতে পশ্য। তবে অনুরোধ এই, মূল বইখানা প্রথম পড়বেন। তারপর আমার বই পড়ার প্রয়োজন আশা করি আর হবে না।

অন্যতম প্রাচীনতমের নিঃসন্দেহ সর্বোৎকৃষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন মার্ক টুয়েন্। সে বর্ণনাটি এমনই সব-জাতের-বাড়া চৌম্বকীয় আকর্ষণীয় বর্ণনা যে তারই টানে আমারই চেনা এক সহযাত্রী জর্মন-সীমান্তে পৌঁছেই নাক-বরাবর চলে যান ঐ জেল দেখতে—সাঁ সুসি প্রাসাদ, ড্রেসডেনে সঞ্চিত রাফায়েলের মাদোন্না নস্যাৎ করে!

আলীপুরের যে সব 'কবিরা' প্রহরীকে পাঁঠা নাম দিয়েছেন, কিংবা চোখ বন্ধ করে রাধার দুটি রাঙা পায়ের ধ্যানে মজে গেছেন, তারা কিন্তু বিলক্ষণ জানতেন, তাঁদের জন্য মৃত্যু জেলের চতুর্দিকে ঘোরাফেরা করছে—শহীদ হওয়ার সম্ভাবনা কবি, অকবি সকলেরই প্রায় সমান। কিন্তু জর্মন-বিশ্ববিদ্যালয়-জেলে ছাত্রেরা যেত অল্প কয়েক দিনের জন্য, ফাঁসির তো কথাই ওঠে না। তাই মার্ক টুয়েনের পক্ষে সম্ভব হয়েছে অপূর্ব হাস্যরসে রঞ্জিত করে সেই জেলটির বর্ণনা দেবার। কাজেই উপস্থিত আলীপুরের কথা ভুলে যান।

* *

বিশ্ববিদ্যালয়ের জেলে ফাঁসি-কাঠ না থাকতে পারে, ক্যাবারে কাঁ কাঁ'র ব্যবস্থা না থাকতে পারে, কিন্তু লেখনী-মস্যাধারের অভাব!—এটা কল্পনাতীত। যদিস্যাৎ ঐ জর্মনীরই সর্বোৎকৃষ্ট দশ লিটার বিয়ার প্রসাদাৎ কল্পনাটা করেই ফেলি, তখন চোখের সামনে, বিকল্পে ভেসে উঠবে পেন্‌সিল্—এ-কথা তো ভুললে চলবে না, এদেশের কেতাবপত্রে মহামান্য কাইজারের (ভারতীয় কাইসর-ই-হিন্দ পদক, লাতিন সীজার ইত্যাদি) নাম পড়ার বহু পূর্বেই ভারতীয় ছেলেবুড়ো ব্যবহার করেছে, Koh-i-noor, made by L. & C. Hardmuth in Austria, graphite[২] drawing pencil, compressed lead.

তাই সেই পেনসিল অকৃপণ হস্তে ব্যবহৃত হয়েছে ছাত্র-'কয়েদী'র দল দ্বারা বংশপরম্পরায়—সাদা দেয়ালের উপর। শুধু কবিতা না বহুবিধ অন্যান্য চীজ্!

কিন্তু তৎপূর্বে তো জানতে হয়, এরা জেলে আসতো কোন্ কোন্ 'অপরাধ' করে। এর অনেকগুলোই আমি স্বচক্ষে দেখেছি, এবং সাতিশয় সন্তোষ

---

২ এসব বাবদে জর্মনী অস্ট্রিয়া একই ধরা হয়। হিটলার নিজে অস্ট্রিয়ান হয়েও জর্মনীর ফ্যুরার হয়েছিলেন, এ সব তো জানা কথা। উভয় দেশের ভাষাও এক।

সহকারে স্বীকার করছি, সবল সক্রিয় হিস্তেদারও হয়েছি বহু ক্ষেত্রে, অর্থাৎ শুপো-স্টুডেন্টেন, পুলিশ ভর্সস্ ছাত্র 'যুদ্ধে'—কিংবা যুদ্ধ আসন্ন দেখে দ্রুততম গতিতে পলায়নে। কিন্তু সেটা অন্য অধ্যায়।

॥ ২ ॥

'পাজীটা এখনো এল না যে, ব্যাপারটা কি? বলেছিল না, তাব কাকা আসছে ডান্‌ৎসিগ থেকে, ওর জন্য নিয়ে আসবে কয়েক বোতল অত্যুৎকৃষ্ট ডান্‌ৎসিগার গোল্ট্ ভাসার্ (ডান্‌ৎসিগের স্বর্ণবারি—সোমালী সোমরস), আমরা সবাই হিস্তে পাবো।'

'একটা ফোন করলে হয় না?'

'হুঁ! সেই আনন্দেই থাকো! টেলিফোন! বুড়ির বাড়িতে এখনো দড়ি টেনে ভিতরের ঘণ্টা বাজাতে হয়। ইলেকট্রিক বেল্ পর্যন্ত নেই। তবে, হ্যাঁ, গার্ল ফ্রেণ্ডদের যখন তখন আপন কামরায় নিয়ে যেতে দেয়। তদুপরি বুড়ি বদ্ধ কালা। শুনেছি, পায়ের উপর গরম ইস্ত্রিটা হঠাৎ হাত থেকে ফসকে পড়ে গিয়েছিল—শুনতে পায় নি!'

রসালাপ হচ্ছিল শনির সন্ধ্যায় 'পাব'-এ। জনসাতেক মেম্বর জমায়েৎ হয়ে একটা গোল টেবিল ঘিরে বিয়ার পান করছেন। সেটার উপর কোনো টেবিল-ক্লথ নেই। আছে গত একশ বছরের স্টুডেন্ট খদ্দেরদের নাম, যারা প্রতি শনিবারে এই টেবিলটা ঘিরে গুলতানি করেছে—ছুরি দিয়ে খোদাই করা। আমাদের পলের বাপ ভিল্ হেল্‌মের নামও এই টেবিলে আছে। সমস্ত টেবিলটা নামে নামে সম্পূর্ণ ভর্তি হয়ে গিয়েছে—আর নূতন নাম খোদাই করার উপায় নেই।

এদের গুলতানির বর্ণনা বা ইতিহাস দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। কারণ সবাই জানেন, সেই সোক্রাতেসের যুগ থেকে ইয়োরোপের গুণীজ্ঞানী থেকে চোরচোট্টা সবাই মদ্যালয়ে বসে বিশ্রম্ভালাপ করেছেন, এবং সহজেই অনুমেয়, চোরচোট্টারা প্লাতোর 'আইডিয়া'র সংজ্ঞা খুঁজতে গিয়ে ছোরাছুরি করে নি, আর সোক্রাতেস প্রতিবেশীর তালাটি কি প্রকারে নিঃশব্দে বে-কার করা যায় তাই নিয়ে মদ্যপান করতে করতে শিষ্যদের সঙ্গে কূট ষড়যন্ত্রে ত্রিযামা যামিনী যাপন করেন নি। অর্থাৎ যে যার বৈদগ্ধ্য, জ্ঞানবুদ্ধি, যাতে তার চিত্তাকর্ষণ তাই নিয়ে কথাবার্তা কইতে ভালোবাসে। তবে হ্যাঁ, মদ্যপানের মেকদার

বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আলোচনার বিষয়বস্তু যে ঈষৎ নিম্নস্তরে নেমে যায় সেটা অনেকেই লক্ষ্য করেছেন। জর্মনির স্টুডেন্টদের বেলায়ও তাই।

আমার ছিল মেজাজমর্জি অত্যন্ত খারাপ। ঠিক সেদিনই খবর পেয়েছি ইংরেজ গোল্ড স্ট্যাণ্ডার্ডকে তালাক দিয়েছে। তারই ফলে আমার কুল্লে বচ্ছরের খরচার জন্য ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকার এক-তৃতীয়াংশ (বেশী হতে পারে, কমও হতে পারে, এতকাল পর সঠিক বলা কঠিন) কর্পূর হয়ে গেল। অর্থাৎ এখন যে য়ুনিভার্সিটি রেস্তোরাঁর সবচেয়ে সস্তা ডিনারটি (সে যুগে দাম ছিল এদেশী পয়সায় কুল্লে বারো আনা) খাবো, তারো উপায় রইল না। কাল সন্ধ্যা থেকে রাত্তিরের খাওয়াটা নিজেকেই রাঁধতে হবে। ওদিকে দেশের ইয়াররা ভাবছেন, 'লেখাপড়ায় আস্ত একটা গর্দভ ঐ ছেলে জর্মনি গিয়ে ভোপা মজাটা লুটে নিলে, মাইরি!'

ইতিমধ্যে এসব 'পাবে' শনির সন্ধ্যায় যা-সব হয় সে-সবই হয়ে গেছে। ঠেলায় করে গরম গরম সসেজ এসেছে, দু'চারটে আনাড়ি বাজিয়ে ব্যাঞ্জোর উপর উৎপাত করে যৎসামান্য কামিয়ে গিয়েছে, পিকচার পোস্টকার্ড জুতোর ফিতে বিক্রির ছলে ভিখিরি তার রোঁদ মেরে গেল।

করে করে রাত একটা বাজলো। বিস্ময়বোধক চিহ্ন দেবার জন্য ঐ চিহ্নেরই বিন্দুটির বিন্দুবৎ প্রয়োজন নেই। শনির রাত্রি জর্মনিতে আরম্ভ হয় বারোটায় —যদ্যপি গ্রিনিজ ফয়তা ঝাড়ে ঐ সময়টায় নাকি তার পরের দিন আরম্ভ। কিন্তু রাত একটার পর সাধারণ মদ্যালয় বন্ধ। এর পর করা যায় কি? আমি বিশেষ করে তাদেরই কথা ভাবছি যাদের তখনো তেষ্টা মেটে নি—জর্মনদের বিশ্বাস তারা বিয়ার পান করে তৃষ্ণা নিবারণার্থে। সাধারণ মদ্যালয় যখন বন্ধ তখন খোলা রইল অসাধারণ মদ্যালয়। সেগুলো একটু ইয়ে অর্থাৎ বিশেষ শ্রেণীর মহিলায় ভর্তি আর কি। তবে স্টুডেন্টরা দল বেঁধে যখন সেখানে ঢুকে আপন গালগল্পে মত্ত হয় তখন ঐ পূর্বোক্ত 'ইয়েরা' ওদের জ্বালাতন দূরে থাক্ —ডিসটার্বও করে না। ওদের পকেটে আছেই বা কি?

ইতিমধ্যে সেই যে আমাদের টেওডর যাকে নিয়ে কাহিনী পত্তন করেছি, তার হঠাৎ পুনরায় শোক উথলে উঠলো ঐ ডান্‌ৎসিগ নগরীর প্রখ্যাত স্বর্ণবারির জন্য। বার বার বলে, 'দেখলে ব্যাটার কাণ্ডখানা। রাত একটা তক্ আমাদের বসিয়ে রাখলে একটা সুরালয়ে—যখন কিনা প্রত্যেক বাপের প্রত্যেক সুপুত্তুরের কর্তব্য আপন আপন সুনির্মিত স্নেহময় নীড়ে নিদ্রাদেবীর শান্ত্যঞ্চলে আশ্রয় নেওয়া।'

কে একজন বললে, 'এই খানিকক্ষণ আগেই না তুইই বললি, পেটারের

বাড়িটা আসলে অ্যাডাম এবং ঈভ তৈরী করেছিলেন ঝুরঝুরে থুরথুরে ?'

টেওডরের কিন্তু তখন কারো টিপ্পনীতে কান দেবার মত মরজি নয়—সে তখন মৌজে। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে, যেন এক নবীন রিলেটিভিটি আবিষ্কার করার উৎসাহ দেখিয়ে বললে, 'আর পেটার ব্যাটা নিশ্চয়ই আরামসে ঘুমুচ্ছে। চলো, ব্যাটাকে গিয়ে জাগানো যাক।'

এস্থলে কারো পক্ষে রণে ভঙ্গ দেওয়া জর্মন-স্টুডেন্ট-মনু-শাস্ত্রে গোমাংস ভক্ষণের চেয়েও গুরুতর পাপ। তুমি তা হলে আস্ত একটা কাপুরুষ। পুলিশকে —অর্থাৎ দুশমনকে—ডরাও। তোমার কলিজা বকৃরির, তোমার সীনা চিড়িয়ার। অতিষ্ঠ হয়ে আপনি শুধোবেন, 'রাত্রি একটাই হোক্, আর তিনটেই হোক্, কেউ কাকে জাগালে পুলিশের পূর্বতর অধস্তন চতুর্দশ পুরুষের কিবা ক্ষতিক্ষয়, জখম-লোকসান? ওদেশে কি রেতে-বেরেতে টেলিগ্রাফ পিয়ন আসে না?'

দাঁড়াও পাঠকবর, জন্ম যদি তব বঙ্গে, তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এসব ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

বলা বাহুল্য রাত তেরোটার সময়—গ্রিনিজ যদিও সেটাকে দিবাভাগ বলেন —আপনি যদি বাড়ির, অবশ্য অন্য বাড়ির, দোস্ত দুশমন—যে-ই হোক্ কাউকে জাগাবার চেষ্টা করেন, তা সে সীমেন-হালেস্কে-শুকের্টের নব্যতম বিজলি-বেল্ বাজিয়েই হোক্, আর পৌরাণিক যুগীয় ঘণ্টাকর্ণ কানে যে-ঘণ্টা ঝুলিয়ে রাখতো যাতে করে সে তার জন্মবৈরী শ্রীহরির নাম-কীর্তন শুনতে না পায়—সেই ঘণ্টাটিই বাজান, বাড়িউলী দরজা খুলে শনির রাতে ঐ জবাকুসুমসঙ্কাশ টেওডরের নয়নযুগল দেখতে পাবে—আমরা আর-সবাই না হয় পাশের গলিতে গা-ঢাকা দিয়েই রইলুম—তখন তার কণ্ঠ থেকে—ভুল বললুম, নাভিকুণ্ডলী থেকে যেসব মুরজ-মুরলীধ্বনি বেরুবে তার ঈষদ্ অংশ শুনতে পেলে, ঐ যে খানিকক্ষণ আগে কি-সব 'ইয়ে'দের কথা বলছিলুম তারা পর্যন্ত নোকের সামনে নজ্জা পাবে। অতএব ঐ কবোষ্ণ অন্ধকারেও আমাদের কাছে জাজ্বল্য-মান হল যে ফ্রন্টাল এটাকের স্ট্রাটেজি বিলকুল ঔট্ অব্ ডেট্।

আমাদের হৃস্তে তৎসত্ত্বেও আশার একটি ক্ষীণ প্রদীপ মিদির্ মিদির্ করছে। পেটারের কামরাটা দোতলায়, এবং একদম রাস্তার উপরে। অতএব আমরা সেদিক বাগে যেতে যেতে হেথাহোথা ক্ষুদ্রাকারের নুড়ি, কাঁকর, সোডার ছিপি ইত্যাকার মারণাস্ত্র কুড়িয়ে নিয়ে সুসজ্জিত হয়ে পৌঁছলুম পেটারালয়ে—বঙ্কিম সঙ্কীর্ণ পথ দুর্গম নির্জন পেরিয়ে।

পেটার থাকে মাউস ফাডে (সার্থক নাম, বাবা,—'ইঁদুরের পথ!')।

টেওডরই আমাদের হিণ্ডেনবুর্গ বলুন, লুডেনডর্ফ বলুন, আমাদের রাইখ মার্শাল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, যদিও সে পেটারের ঘরে আসে সপ্তাহে নিদেন দশ দিন, তবু তার জানলা যে ঠিক কোন্‌টা সেটা ঠাহর করতে পারছে না—আশা করি তার কারণ আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। অবশেষে হান্‌স্‌-ই লোকেট্ করলে জানলাটা। হান্‌স্‌ বটনির ছাত্র—পেটারের জন্মদিনে তাকে একটা অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ সাতিশয় বিরল ফণীমনসা উপহার দেয়। একটা জানলার বাইরের চৌকাঠ-পানা ফালি কাঠের উপর হান্‌স্‌ সেটি আবিষ্কার করলে—রাত্রের হিম খাওয়াবার জন্য পেটার সেটি ঐ সিল্‌ না লেজ্‌, কি যেন বলে ইংরিজীতে—তারই উপর রেখে দিয়েছিল। কালিদাসের যুগে দ্বারে আঁকা থাকতো ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন যেমন শঙ্খচক্র—হেথায় কেক্‌টাস্‌।

পয়লা রৌণ্ডে টেওডর ছুঁড়ে মারল সোডার ছিপি। লাগলো গিয়ে ডান-পাশের জানলাটায়। আমরা ফিসফিস করে পেটারকে সাবধান করতে কসুর করি নি, কিন্তু কেবা শোনে কার কথা, সে তখন জাঁদরেল জনরৈল সিং, আমরা নিতান্ত ডালভাত দাবাখেলার বড়ে-পেয়াদা। দুসরা রৌণ্ডেটেওডর বোধহয় 'ফইর' করেছিল একটা স্নো কৌটোর ঢাকনা। এটা ধন্‌-ন্‌-ন্‌ করে গিয়ে লাগলো বাঁ-পাশের জানলাটায়। আমরা তাকে কিছু বলতে যেতেই সে ধমক দিয়ে বললে, 'চোপ! এই হল আর্টিলারির আইন। প্রথম মারবে তাগের চেয়ে দূরে, তার পর তাগের চেয়ে কাছে, শেষটায় ম্যাথম্যাটিকলি মেজার করে ঠিক মধ্যিখানে।' হবেও বা। ও তো প্রাশান য়ুংকার ঘরের ছেলে—জানার কথা। এবং আমাদের তুলনায় তার পকেট-শস্ত্রাগার পরিপূর্ণ। কারণ আমরা জর্মনীর ধোপ-দুরস্ত রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছি কী ই বা এমন কামান-ট্যাঙ্ক। পক্ষান্তরে যুযুধান টেওডর খিনপিৎ উপেক্ষা করে 'পাবে'র সামনের 'বিন্‌' থেকে মেলা অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে এনেছে। তাই এবারে ছুঁড়লে ছোট্ট একটি মার্কিং ইঙ্কের খালি শিশি। লাগলো গিয়ে তেতলার একটা জানলায়। তখন বুঝতে পারলুম জর্মনী প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কেন জিততে পারে নি। দ্বিতীয়টা তখনো হয় নি। সে সময় হিট্‌লার যদি আমাকে কন্‌সল্ট করতো তবে আমি নিশ্চয়ই তাকে বারণ করে দিতুম—বিশেষত এই অভিজ্ঞতার পর।

তার চেয়েও পষ্ট বুঝতে পারছি, টেওডর এখন যে অবস্থায় পৌঁচেছে সেখানে আপন নাক চুলকোতে চাইলে গুত্তা মারবে পিঠে। কিন্তু সে-তত্ত্বটি তখন তাকে বলতে গেলে সেই সুপ্রাচীন জর্মন কাহিনীরই পুনরাবৃত্তি হবে মাত্র; এক মাতাল রাত চৌদ্দটায় বাড়ি ভুল করে বার বার চেষ্টা করছে চাবি দিয়ে সদর দরজা

খোলবার এবং সঙ্গে সঙ্গে কটুকাটব্য। সেই শব্দে শেষটায় দোতলায় একজনের ঘুম ভেঙে গেল। নিচের দিকে মাতালকে দেখে বললে, 'হেই, তুমি ভুল বাড়ির তালা খোলবার চেষ্টা করছো'। মাতাল উপরের দিকে তাকিয়ে একগাল হেসে বললে, 'হে হে হে হে। তুমিই ভুল বাড়িতে ঘুমুচ্ছো।'

এই একতরফা লড়াই—আইনে যাকে বলে ইন্ আবসেন্শিয়া—কিংবা বলতে পারেন ডন্ কুইক্সটের জল-যন্ত্র-আক্রমণ আধঘণ্টাটাক চলার পর টেওডর ছাড়লে—বলতে গেলে তার প্রায় শেষ সিক্স্ পৌণ্ডার—সার্ডিনমাছের খালি একটা টিন। ঝন্ ঝন্ করে শব্দ হল। কিন্তু পরে মনে হয়েছিল সে যেন ওস্তাদ এনায়েৎ খানের সেতার—কারণ সঙ্গে সঙ্গে সব-কিছু ছাপিয়ে কানে গেল পুলিশের ভারি ভারি বুটের শব্দ! এটা হল কি প্রকারে? সচরাচর শানবাঁধানো রাস্তার উপর রোঁদের পুলিশের বুটের শব্দ সেই নিঝুম নিশীথে অনেক দূরের থেকে শোনা যায়, এবং টেওডর ছাড়া আমাদের আর সকলের আধখানা কান খাড়া ছিল তারই আশঙ্কায়। অতএব দে ছুট, দে ছুট! কোন্ মূর্খ বলে যুদ্ধে পলায়ন কাপুরুষের কর্ম! ইংরেজ আফ্রিদীদের সঙ্গে যুদ্ধে পালালে পর এ-দেশের জোয়ানদের বুঝিয়ে বলতো, 'এর নাম বাহাদুরীকে সাথ্ পিছে হঠনা।'

কিন্তু ছুটতে ছুটতে আমি শুধু ভাবছি, এতগুলো বুটের শব্দ এক সঙ্গে হল কি করে? রোঁদে তো বেরোয় প্রতি মহল্লায় হার্টের, sorry, হার্টলেস্ সিংগ্‌ল্‌টন। তা সে যা-ই হোক, এখন তো প্রাণটা বাঁচাই।

পূর্বেই বলেছি, পেটারের গলিটার নাম মূষিকমার্গ। আসলে কিন্তু বন্ শহরের আঁকাবাঁকা হাঁসুলি বাঁকের মোড়, পায়ের 'বেঁকি'-গয়নার প্যাঁচ-খাওয়া আড়াই বিঘৎ চওড়া নিরানব্বুইটি 'রাস্তাকেই' মূষিকমার্গ বলা যেতে পারে—তার জন্য কল্পনাশক্তিটিকে বহু সুদূরে সম্প্রসারিত করতে হয় না।

কিন্তু একটি তত্ত্ব সর্বজনবিদিত। এই গলিঘুঁচি কোথায় যে হঠাৎ বেঁকে গেছে, কোথায় যে রাস্তার একপাশে বহু প্রাচীন কালেই পঞ্চত্বপ্রাপ্ত একটি কারখানার অন্ধকার অঙ্গনে অশরীরী হওয়া যায়, অর্থাৎ লুকানো যায় (হংসমিথুনের কথা অবশ্য আলাদা), কোথায় যে একটা গারাজের আংটাতে পা দিয়ে সামান্য তকলিফেই ছাতে ওঠা যায়, এ সব তথ্য পুলিশ যতখানি জানে আমরাও ঠিক ততখানিই জানি। এমন কি লেটেস্ট খবরও আমরা রাখি: অমুক দেউড়ির ঠিক সামনের রাস্তার বাতিটি বরবাদ হয়ে গিয়েছে, এখনো মেরামত হয় নি, কিংবা অমুক জায়গায় পরশুদিন থেকে এক ডাঁই পিপে জুটেছে—পিছনে দিব্য অন্ধকার। অর্থাৎ পুলিশ তার আপন হাতের তেলো যতখানি

চেনে, আমরাও আমাদের তেলো তত্ত্বখানিই চিনি।

মূষিকমার্গ ধরে খানিকটে এগোলেই সেখানে তেরাস্তা। আমাদের স্ট্র্যাটেজি অতি সনাতন, সুপ্রাচীন। সঙ্গে সঙ্গে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে দু'দিকে ছুট লাগালাম। আবার তেরাস্তা পেলে আবার দু' ভাগ হব। ধরা যদি পড়িই তবে দলসুদ্ধ ধরা পড়বো কেন? এবং যুদ্ধের নীতিও বটে, 'আক্রমণের সময় দল বেঁধে; পলায়নে একলা-একলি।' খুদে বন্ শহরে পুলিশ গিস্ গিস্ করে না— আর এই রাত চোদ্দটায় ফাঁড়ি-থানা ক'টাই বা স্পেয়ার করতে পারে? কাজেই প্রতি তেরাস্তায় তারা যদি আমাদেরই স্ট্র্যাটেজি অনুসরণ করে তবে যাদের 'মেন পাওয়ার' কম বলে, কয়েকটা রাস্তা ফোলো অপ্ করতে পারবে না বলে শেষ পর্যন্ত হয়ত কেউই ধরা পড়বে না। কিন্তু এই 'শুপো' নন্দনগণ ঘড়েল। এবম্প্রকার বহু যুদ্ধে তারা জয়ী এবং পরাজয়ী হয়ে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে সেটা তাদের শেখায় অন্য স্ট্র্যাটেজি।

পাঠক, তুমি কখনো পোষা চিতে বাঘ দিয়ে হরিণ-শিকার দেখেছ? না দেখারই সম্ভাবনা বেশী, কারণ সেই রাজারাজড়াদের আমলেও এ খেলাটি অস্মদ্দেশে ছিল বিরল। আমাকে দেখিয়েছিলেন বরোদার বুড়ো মহারাজ।

মহারাজার খাস রিজার্ভ ফরেস্টে ছিল বিস্তর হরিণ। তাদের পিছনে লেলিয়ে দেওয়া হত একটা পোষা, ট্রেন্‌ড্ চিতে বাঘ। বাঘ দেখা মাত্রই হরিণের পাল দে ছুট দে ছুট। এবং মাচাঙের উপর থেকে স্পষ্ট দেখতে পেলুম, একটু সুবিধা পাওয়া মাত্রই তারা দু' ভাগ হয়ে গেল, তার পর আবার দু' ভাগ, ফের দু' ভাগ—ক'রে ক'রে হরিণের পাল আর পাল রইল না, হয়ে গেলো চিত্তিরমিত্তির।

কিন্তু আমাদের নেকড়ে মহাশয়টিও অতিশয় সুবুদ্ধিমান। এ ভাগ, ও ভাগকে খামোখা তাড়া করে সে বর্বরস্য শক্তিক্ষয়.করলো না। সে প্রথম থেকেই তাগ করে নিয়েছে একটা বিশেষ হরিণ। প্রতিবারে পাল যখন দু' ভাগ হয়, তখন সে ঐ বিশেষ হরিণটার ভাগেরই পিছন নেয়। পরে চিতার ট্রেনার আমাকে বলেছিল, 'সব চেয়ে যে হরিণটা ধুমসো, চিতে সব সময়ই একমাত্র ঐটের পিছু নেয়—এদিক ওদিক ছোটাছুটি করে শক্তিক্ষয় করে না, কারণ চিতে জানে ঐটেই হাঁপিয়ে পড়বে সক্কলের পয়লা। ধরতে পারলে পারবে ঐটেকেই—সব সময় যে পারে তাও নয়।'

বন্ শহরের শুপো সম্প্রদায় ঠিক তাই করলে। আমাদের মধ্যে যে দুটি ছিল সব চেয়ে হোঁৎকা ওরা প্রতি দু' ভাগ হওয়ার সময় ওদেরই পিছু নিল। শেষটায়

ধরতে পেরেছিল অবশ্য একজনকে। সে কিন্তু টেওডর নয়, এবং জস্ট্ টু কীপ কম্পানি, ছুঁড়ে ছিল মাত্র নিতান্ত খুদে দু'চারটি কাঁকর। তার কথাই আপনাদের খেদমতে ইতিপূর্বে পেশ করেছি।

আগের জমানায় পুলিশ তাকে দিয়ে দিত য়ুনিভার্সিটির হাতে—সে যেত য়ুনিভার্সিটির জেলে। শুনেছি, এস্তেক স্বয়ং প্রিনস আউটো এডওয়ার্ড লেওপোল্ড ফন্ বিস্‌মার্ক অবধি গেছেন। এবং সে তখন জেলের দেয়ালের উপর পেন্সিলযোগে আপন জিঘাংসা, কিংবা অনুশোচনা, কিংবা মধ্যিখানে, কিংবা কটুবাক্য—যথা যার অভিরুচি—কভু গদ্যে কভু ছন্দে, সেও কী বিচিত্র, কখনো আলেক্‌জেন্‌ড্রিয়ান কখনো—সে কথা আরেক দিন না হয় হবে—লিখতো: আমার আমলে আমাদের যেতে হত শহরের জেলে—একদিনের তরে (সেও এক মাসের ভিতর দিনটা বাছাই করে নেওয়া 'আসামী'র এক্তেয়ারেই ছেড়ে দেওয়া হত, বাইরে থেকে আপন খানা আনানো যেত, এবং যেহেতু যেসব সহযুযুধানবর্গ সে যাত্রায় পালাতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁরা নেমকহারাম নন, তাঁরাই চাঁদা তুলে উত্তম লঞ্চ ডিনার বাইরে থেকে পাঠাতেন); কিংবা (ভারতীয় মুদ্রায়) সোয়া তিন টাকা জরিমানা দান—যথা অভিরুচি।

কিন্তু প্রশ্ন, এতগুলো পুলিশ সে রাত্রে হঠাৎ এক জোট হল কি করে?

খাঁটি বন্-বাসিন্দারা আমাদের যুদ্ধে নিরপেক্ষ। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট কাঁকর বা সোডার ছিপি যদি তার জানলায় লেগে গিয়ে তার নিদ্রাভঙ্গ করে তবে সে জানলা খুলে কটুবাক্য আরম্ভ করার পূর্বেই আমরা অকুস্থল ত্যাগ করি। কেউ কেউ আবার হঠাৎ এক ঝটকায় জানলা খুলে আমাদের মাথার উপর ঢেলে দেয় এক জাগ্ হিমশীতল জল। আমরা অবশ্য এজাতীয় অহেতুক উপদ্রবের জন্য সদাই সতর্ক থাকি।

কিন্তু আজ ছিল আমাদের পড়তা খারাপ। টেওডরের সক্কলের পয়লা বুলেট, বা সোডার ছিপি, যাই বলুন, পড়ে একদম পাশের ফ্ল্যাটে এক নবাগত বিদেশীর জানলায়—কেন যে বিদেশীগুলো বন-শহরটাকে বিষাক্ত করার জন্য আসে, আল্লায় মালুম—সে কিন্তু জানতো, বন্ শহরের খাস বাসিন্দারা এই (মোর্ দ্যান্) হান্‌ড্রেড্ ইয়ার ওয়ারে ভদ্র সুইটজারল্যাণ্ডের মত সেই যুদ্ধারম্ভের রাত্রি থেকেই নিরপেক্ষ, জোর কটুকাটব্য (অর্থাৎ ডিপ্লোমাটিক প্রটেস্ট)। কিংবা এক জাগ্ জল। তা সে এমন কীই বা অপকর্ম? ইউরোপীয়রা তো চান করে একমাত্র যখন জাহাজ-ডুবি হয়। জল ঢেলে সে তো পুণ্যসঞ্চয় করলো, ডাক্তারদের শ্রদ্ধাভাজন হল। কিন্তু আজকের এই বিদেশী পাপিষ্ঠটা কটুবাক্য করে নি, জল

চালে নি, করেছে কি, সে-ফ্ল্যাটে কোনছিল বলে চুপিসাড়ে ফাঁড়ি-থানাকে জানিয়ে দিয়েছে। ওদিকে আবার ইয়ার টেওডরের অগুনতি সখা এই শহরে। এবং বছর দুই ধরে সে প্রাগুক্ত পদ্ধতিতে শহরের এ-মহল্লায়, ও-মহল্লায় শনির রাতে—এবং সেটা যত গভীর হয় ততই উম্‌দা—আজ একে, পরের শনিতে অন্য কাউকে জাগাবার চেষ্টা করে যাচ্ছে। পুলিশ বিস্তর গবেষণার পর লক্ষ্য করলো যে সর্বত্রই ওয়ার্কিং মেথড বা মডুস অপেরাণ্ডি হুবহু এক—বড় বড় ব্যাঙ্ক-ডাকাতরা যে রকম পুলিশের এই জাতীয় গভীর গবেষণার ফলেই শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে। তাই তারা সেই ডেঞ্জরস্ ক্রিমিনাল টেওডরের প্রতীক্ষাতেই ছিল।

আর আপনাদের সেবক এই অধম? সে কি কখনো ধরা পড়েছিল?

॥ ৩ ॥

অধীর পাঠক! শান্ত হও, তোমার মনে কি কুচিন্তা সে আমি জানি; ইতিমধ্যে ঐ বাবদে দু'খানা চিঠিও পেয়েছি, আমার কিন্তু কিন্তু-কিন্তু ভাবটা যাচ্ছে না। আমি জানি, তোমার জ্ঞানতৃষ্ণা প্রবল, তাই জানতে চাও আমি কখনো ধরা পড়ে শ্রীঘরবাস করেছিলুম কিনা। আমার সে 'দুরাবস্থা'র[৩] বর্ণনা শুনে তোমার হৃদয়মনে কোন্ প্রতিক্রিয়া সৃষ্ট হবে সেই নিয়ে আমার দুর্ভাবনা। তাহলে একটি ছোট্ট কাহিনী দিয়ে আমার সঙ্কোচটা বোঝাই।

মাত্র কয়েকদিন আগে, এই ১৬ই অগ্রহায়ণ, আমরা স্বর্গত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুদিন পালন করলুম। এঁর বহু বহু সদ্‌গুণ ছিল, তার অন্যতম, তিনি নিজে সাহিত্য নাট্য সৃষ্টি করুন আর নাই করুন সে যুগের সবাই মেনে নিয়েছিলেন যে তাঁর মত শাস্ত্রজ্ঞ রসজ্ঞ জন বাঙলা দেশে বিরল—এবং শুদ্ধমাত্র রসজ্ঞ হিসাবে অদ্বিতীয়। তাই কাঁচা পাকা সর্ব লেখকই তাঁকে তাঁদের বই পাঠিয়ে মতামত জানতে চাইতেন। ওদিকে গুরুদাস ছিলেন কর্মব্যস্ত পুরুষ। সেই ডাঁই ডাঁই বই পড়ে স্বহস্তে উত্তর লেখার তাঁর সময় কই? তাই একখানা পোস্টকার্ডে যা ছাপিয়ে নিয়েছিলেন তার মোটামুটি মর্ম এই :—'মহাশয়, আপনার

৩ এ-যুগের ছেলে-ছোকরারা বিদ্যাসাগর পড়ে না ব'লে বলতে দোষ নেই যে একদা এক পিতা-পুত্র বিদ্যাসাগর মশায়ের কাছে তাদের দুঃখের কাহিনী শেষ করলে এই বলে, 'আমাদের দুরাবস্থাটা দেখুন।' বিদ্যাসাগর নাকি মুচকি হেসে বললেন, 'তা সেটা আকার (আ-কার) থেকেই বুঝতে পারছি।'

পাঠানো পুস্তকের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি উহা মনোযোগ সহকারে পড়িয়াছি। সত্য বলিতে কি পড়িতে পড়িতে—' এখানে এসে থাকতো একটা লম্বা লাইন, এবং তার উপরে ছাপা থাকতো, 'হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই' এবং লাইনের নিচে ছাপা থাকতো 'অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই।' তিনি নাকি পাঠানো বইখানা পড়ে যথোপযুক্তভাবে হয় লাইনের উপরের 'হাস্য সম্বরণ' বা নিচের 'অশ্রু সম্বরণ' কেটে দিতেন। তিনি ছিলেন অজাতশত্রু, তাই নিশ্চয়ই কোনো বদরসিক কাহিনীটির সঙ্গে আরো জুড়ে দিত যে, অধিকাংশ স্থলেই তিনি নিজে বইখানি পড়তেন না, তাঁর সেক্রেটারি সেটি পড়ে বা না পড়ে উপরের 'হাস্য' কিংবা নিচের 'অশ্রু' কেটে দিত।[৪]

তাই আমার কিন্তু-কিন্তু, তুমি লাইনের উপরের না নিচের, কোন্ বাক্যটি কাটবে—আমার কাহিনী শুনে। তা সে যাক্‌গে, বলেই ফেলি। কোন্ দিন আবার দুম করে মরে যাবো।

পূর্বেই নিবেদন করেছি, চিতে বাঘ হরিণের পালের গোদাটাকেই সব সময় ধরবার চেষ্টা করে তারই পিছনে ধাওয়া করে যখন সব কটা এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে—শহরের পুলিশও ঠিক সেই রকম আমাদের মত 'পিশাচ-সম্প্রদায়ে'র সব চেয়ে হোঁৎকাটাকেই ধরবার চেষ্টা করতো, আমরা যখন তাড়া খেয়ে হরিণের টেকনিকই অনুসরণ করে ইদিকের ওদিকের গলিতে ছড়িয়ে পড়তুম। কিন্তু কিছুদিন পরে আমরা লক্ষ্য করলুম, একই গোদাকে বার বার শিকার করে পুলিশ যেন আর খাঁটি স্পোর্টসম্যানের নির্দোষানন্দ লাভ করছে না। তখন তারা দুসরা কিংবা তেসরা মোট্‌কাটাকে ধরবার চেষ্টা করতে লাগলো। তাদেরও ট্রেনিং হচ্ছে, আম্মোগোরও। কখনো তারা জেতে, কখনো আমরা জিতি। সেই যে

৪ ভিক্টর য়্যুগো (Hugo) সম্বন্ধে বলা হয়, একবার এক অখ্যাতনামা কবি য়্যুগোকে তাঁর কবিতার বই পাঠিয়ে তাঁর মতামত জানতে চাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে য়্যুগোর সানন্দ অভিনন্দন এসে পৌঁছল সেই কবির হাতে, তাঁর কাব্যসৃষ্টির অজস্র প্রশংসাবাদ করে য়্যুগো শেষ করেছেন এই বলে, 'হে নবীন কবি, আমি তোমাকে সাদর আলিঙ্গন করে, ফ্রান্সের কবিচক্রের আমন্ত্রণ জানাই।' তিন দিন পরে বুক-পোস্টে পাঠানো কবির সেই কবিতার বই ফেরত এল তাঁর কাছে। উপরের পিঠে পোস্ট অফিসের রবর স্ট্যাম্পে ছাপ, 'যথেষ্ট টিকিট লাগানো হয় নি বলে গ্রহণকারী বেয়ারিং হারে কালতো পয়সা দিতে নারাজ অতএব প্রেরকের কাছে ফেরত পাঠানো হল।'

গুলিখোর শিকারী বয়ান দিচ্ছিল, 'তারপর আমি তো ফইর করলুম বন্দুক, আর কুত্তাকেও দিলুম শিকারের দিকে লেলিয়ে। তারপর বন্দুকের গুলি আর কুত্তাতে কী রেস্। কভী কুত্তা কভী গোলী, কভী গোলী কভী কুত্তা!' আমাদের বেলাও তাই, 'কভী ইস্টুডেন্ট কভী পুলিশ, কভী পুলিশ কভী ইস্টুডেন্ট!' আমার অবশ্য কোনই ডর ভয় ছিল না। কারণ আমি তখন এমনিতেই ছিলুম বেহদ্ রোগা টিঙটিঙে—পাঁচ ফুট সাড়ে ছ'ইঞ্চি নিয়ে একশ' পাঁচ পৌণ্ড ওজন—অর্থাৎ হোঁৎকা মোট্কা জর্মন সহপাঠীদের তুলনায় তো আধটিপ নস্যি! তদুপরি আমি সর্বদাই সুনির্মল বসুর সেই তিরস্কারটি মনে রাখি, 'বাঙালী হয়েছো, পালাতে শেখ নি!'

কিন্তু বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, এই রাত্রে দেখি, পুলিশ অন্য ব্যবস্থা করেছে। এতদিন যেই আমি একা হয়ে যেতুম, পিছনে আর বুটের শব্দ শুনতে পেতুম না। সেরাত্রে দেখি, পুলিশ নিতান্ত আমাকেই ধরবার জন্য যে মনস্থির করেছে তাই নয়, আগের থেকে, বেশ সুচিন্তিত ফাইভ ইয়ারস প্ল্যানিং করে যেন জাল পেতেছে। আমি তাড়া খেয়ে যেদিকেই যাই, পিছনে তো বুটের শব্দ শুনতে পাই-ই, তদুপরি দেখি, ঐ দূরে গলির মুখে আরেকটা পুলিশ দাঁড়িয়ে রয়েছে—যেন বিরহজর্জরিত ফিলমের নায়ক প্রোষিতভর্তৃকা নায়িকাকে আলিঙ্গনার্থে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু আমি মহাভারত পড়েছি, জানি, এ আলিঙ্গন হবে ধার্তরাষ্ট্র। অতএব মারি গুত্তা অন্য বাগে।

অনেকক্ষণ ধরে এই খেলা চললো। ইতিমধ্যে আমি কয়েক সেকেণ্ডের তরে সব পুলিশের দৃষ্টির বাইরে; এবং সঙ্গে সঙ্গে ঢুকলুম একটা 'পাবে'। ঝটকা মেরে 'বার' থেকে অন্য কারো অর্ডারী এক কাপ কফি যেন ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে বসলুম, 'পাব'-এর সুদূরতম প্রান্তে। সঙ্গে সঙ্গে ঢুকলো একটা পুলিশ।

খাইছে। এবারে এসে পাকড়াবে। বৈদ্যরাজ চরক বলেন, 'এ অবস্থায় হরিনামের বটিকা খেয়ে শুয়ে পড়বে!'

সে কিন্তু হাঁপাতে হাঁপাতে প্রথমটায় 'বার' কীপারের মুখোমুখি হয়ে, আমার দিকে পিছন ফিরে এক গেলাস বিয়ার কিনে একটা অতি দীর্ঘ চুমুক দিলে। আমি বুঝলুম, মাইকেল সত্যই বলেছেন, সীতাদেবীকে রাবণের রাক্ষসী প্রহরিণীরা কোনো গাছতলায় বসিয়ে বেপরোয়া ঘোরাঘুরি করতো,

'হীনপ্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী
নির্ভয় হৃদয়ে যথা ফেরে দূর বনে'

গদ্যময় ইংরিজীতে যাকে বলে নিতান্তই 'ক্যাট অ্যাণ্ড মাউস প্লে'। বরঞ্চ

রবীন্দ্রনাথেরটাই ভালো, 'এ যেন পাখি লয়ে বিবিধ ছলে শিকারী বিড়ালের খেলা'।

এবারে সে গেলাস হাতে করে 'বার'-এর দিকে পেছন ফিরে আমার দিকে মুখ করে তাকাল।

আমিও অলস কৌতূহলে একবার তার দিকে তাকালুম। 'পাব'-এ নূতন নিরীহ খদ্দের ঢুকলে যেরকম অন্য নিরীহ খদ্দের তার উপর একবার একটি নজর বুলিয়ে অন্য দিকে চোখ ফেরায়।

আমি যদিও তখন মাথা নিচু করে কাপের দিকে তাকিয়ে আছি—যেন মাইক্রোস্কোপ দিয়ে বৈজ্ঞানিক অণুপরমাণু পর্যবেক্ষণ করছেন—তবু স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, লোকটা কি ভাবছে। তারপর শুনলুম, 'গুটে নাখট্'। আমি মাথা তুলে দেখি পুলিশ তার বিয়ার শেষ করে 'পাব'ওলাকে 'গুড নাইট' জানিয়ে চলে যাচ্ছে। (জর্মনীর অলিখিত আইন, 'বিয়ার খাবে ঢক ঢক করে, ওয়াইন খাবে আ-স্তে, আ-স্তে।')

ঠিক বুঝতে পারলুম না কেন? তবু হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম বলি নি। এদের তো রাবণের গুষ্টি। এবার যিনি আসবেন, তিনি এঁয়ার মত বাপের সুপুত্তুর নাও হতে পারেন। আবার বাইরে যাবারও উপায় নেই। জাল গুটিয়ে সবাই চলে গেছেন, না ঘাপটি মেরে বসে আছেন, কে জানে?

ঘণ্টাখানেক পর যখন 'পাব' নিতান্তই বন্ধ হয়ে গেল, তখন দেখি সব ফাঁকা। তবু সাবধানের মার নেই। অকুস্থলের উল্টো মুখে রওয়ানা দিয়ে অনেকখানি চক্কর খেয়ে বাড়ি ফিরলুম 'তড়পত হুঁ জৈসে জলবিন মীন' হয়ে।

* *

তার দু-তিনদিন পর সকালবেলা যখন পাত্তাড়ি নিয়ে য়ুনি (ভার্সিটি) যাচ্ছি, তখন একজন পুলিশ হঠাৎ সামনে দাঁড়িয়ে বুটের গোড়ালি গোড়ালিতে ক্লিক্ করে আমাকে সেলুট দিলে। আমি হামেশাই পুলিশের সামনে ভারী সুবিনয়ী—বার তিনেক 'গুটেন মর্গেন গুটেন মর্গেন গুটেন মর্গেন' বললুম, যদ্যপি একবারই যথেষ্ট।

কোন প্রকারের লৌকিকতা না করে সোজা শুধোলে, 'তুমি ইণ্ডিয়ান?'

তালেবর পুলিশ মানতে হবে! বলেছে 'ইণ্ডার'। 'ইণ্ডিয়ানার' বা রেড ইণ্ডিয়ান বলে নি। এদেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকও সে পার্থক্যটি জানে না। বললুম, 'হ্যাঁ।'—

শুধোলে, 'এখান থেকে ইণ্ডিয়া কতদূর?'

আমি বললুম, 'এই হাজার পাঁচেক মাইল হবে। সঠিক জানি নে, তবে

জাহাজে যেতে ১২।১৩ দিন লাগে।'

বললে, 'বাপ-মা এই পাঁচ হাজার মাইল দূরে পাঠিয়েছে বাঁদরামি শেখবার জন্যে ?'

এতক্ষণে আমার কানে জল গেল। বুঝলুম, উইথ রেফারেন্‌স্‌ টু দি কনটেকস্‌ট যে, লোকটা সেই রাত্রের আমাদের দলের দুষ্কর্ম এবং পরবর্তী লুকোচুরির কথা পাড়ছে। আমি তবু নাক-টিপলে-দুধ-বেরোয়-না গোছ হয়ে বললুম, 'কিসের বাঁদরামি ?'

জর্মনে 'ন্যাকা' শব্দের ঠিক ঠিক প্রতিশব্দ নেই। কিন্তু যে কটি শব্দ পুলিশম্যান প্রয়োগ করলে তার অর্থ ঐ দাঁড়ায়। তারপর নামলো সম্মুখসমরে! বললে, 'সেরাত্রে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য চোখের আড়াল হয়ে যেতে পেরেছিলে বলে তোমাকে ধরি নি। এবারে কিন্তু ছাড়বো না।'

'অনেক ধন্যবাদ!' তারপর আমিও রণাঙ্গনে নেমে বেহায়ার মত বললুম, 'সে দেখা যাবে।'

যেন একটু দরদী গলায় বললে, 'কিন্তু কেন, কেন এসব করো ?'

আমিও তখন একটু নরম গলায় বললুম, 'এদেশে কি শুধু য়ুনিতে পড়তেই এসেছি ? ওদেশে বসেও তো এ-দেশের বই কিনে পড়া যায়। আমি এসেছি সব শিখতে, আর-সব স্টুডেন্টরা যা করে, তাই করি।'

'সব ছেলে এরকম বাঁদরামি করে ?'

আমাকে বাধ্য হয়ে স্বীকার করতে হল সবাই করে না।

'তবে ?'

তখন বললুম, 'ব্রাদার, শোনো। এই স্টুডেন্ট বনাম পুলিশ লড়াই সর্বপ্রথম আরম্ভ হয় চতুর্দশ শতাব্দীতে হাইডেলবের্গে। এখানে আরম্ভ হয় ১৭৮৬তে। তারপর কয়েক বছর য়ুনি বন্ধ ছিল—কেন, সঠিক জানি নে, বোধ হয় নেপোলিয়ন তার জন্য দায়ী—ফের য়ুনি খোলার সঙ্গে সঙ্গে ১৮১৮ থেকে। এবারে তুমিই কও, বুকে হাত দিয়ে, এই আমরা আজ যারা স্টুডেন্ট, আমরা যদি আজ লড়াই ক্ষান্ত দি তবে ভবিষ্যৎ-বংশীয় স্টুডেন্টরা ইতিহাসে লিখে রাখবে না "অতঃপর বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে এক দল কাপুরুষ ছাত্র আগমনের ফলে—তাহাদের মধ্যে একটা অপদার্থ ইণ্ডিয়ানও ছিল—সেই সংগ্রাম বন্ধ হইয়া যায়—স্টুডেন্টরা পরাজয় স্বীকার করিয়া লইল।" তারপর ভারতীয় নাটকীয় পদ্ধতিতে 'হা হতোস্মি হা হতোস্মি' করার পর বললুম, 'এই যে মহাকবি হাইনে, তিনি পর্যন্ত এখানে—'

এই করলুম ব্যাকরণে ভুল। বাধা দিয়ে শুধোলে, 'তুমি তার মত কবিতা লিখতে পারো ?'

নিশারণে সে জিতেছিল না আমি জিতেছিলুম, সেটা সমস্যাময়, সেটাকে 'ড্র' বললেও বলা যেতে পারে, কিন্তু দিবাভাগে এই তর্ক-যুদ্ধে আমি হার মেনে বললুম, 'বাকিটা আর একদিন হবে, ব্রাদার। এখন তোমার নামটা বলো। সেই শনির রাত্রে যেখানে আমাদের প্রথম চারি চক্ষুর মিলন হয়েছিল সেখানেই দেখা হবে। আমি ফোন করে ঠিক করে নেব। এখন চলি, আমার ক্লাস আছে।'

সে হেসে যা বললে সেটাকে বাঙলায় বলা চলে, 'ডুডু খাবে টামাকও ছাড়বে না।'

*   *

এবারে ধরতে পারলে ছাড়বে না—সে তো বুঝলুম। ওদিকে এক মাস পরে আমার পরীক্ষা। তিনটে ভাইভা। শনির রাত জেগে তামাম রব্বার শুধু মুখস্থ আর মুখস্থ। হাসি পায় যখন এদেশে শুনি, এখানে বড্ড বেশী মুখস্থ করানো হয় ; মুখস্থ না করে কে কবে কোন্ দেশে কোন্ পরীক্ষা পাশ করেছে। তা সে পেসতালদ্জির দেশেই হোক আর ফ্র্যোবেলের দেশ, এই জর্মনিতেই হোক। তাই আমাকে আর যুদ্ধে না ডেকে আমাদের ফীলড মার্শেল আমাকে রিজার্ভে রাখলেন। মাত্র এক রাত্রে ডাক পড়েছিল, তবে সেটা শহরের অন্য প্রান্তে। আর এক দিন, সেই দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ-পোটির সঙ্গেই একটা 'পাব'-এ বসে দু-দণ্ড রসালাপ করেছিলুম। লোকটি সত্যই অমায়িক।

*   *

এদেশে পরীক্ষার পূর্বে এত সাতায় রকমের কাগজপত্র মায় থীসিস্ ডীনের দফ্‌তরে জমা দিতে হয় যে, সবাই শরণ নেয় আন্‌কোরা হালের যে দু'দিন আগে পাস বা ফেল করেছে। তারাই শুধু এসব হাবিজাবির লেটেস্ট খবর রাখে। সে রকম দুজনা অনেকক্ষণ ধরে বসে, দফে দফে, একাধিক বার মিলিয়ে নিয়ে এক বাণ্ডিল কাগজ, ফর্ম, সার্টিফিকেট আমাকে দিয়ে বললে, 'এইবারে যাও বৎস, ডীনের দফ্‌তরে। সব মিলিয়ে দিয়েছি। আর, শোনো, সব কাগজের নিচে রাখবে একখানা পাঁচ মার্কের (তখনকার কালে পাঁচ টাকার একটু কম) নোট। এটা কেরানীর অন্যায্য প্রাপ্য—কিন্তু পূর্ণ শত বৎসরের ঐতিহ্য।'

দুরু দুরু বুকে—প্রায় নার্ভাস ব্রেক ডাউনের সীমান্তে পৌঁছে—দাঁড়ালুম গিয়ে ডীনের দফ্‌তরে, কাউন্টারের সামনে। পাঁচ টাকার চেয়ে বেশীই রেখেছিলুম।

যে কেরানী এসে সম্মুখে দাঁড়ালেন তাঁর এ্যাব্বড়া হিণ্ডেনবুর্গী গোঁফ, আর

বয়েসে বোধ হয় তিনি মুনির সমান। সাতিশয় গম্ভীর কণ্ঠে আমার গুড্ মর্নিঙের কি একটা বিড়বিড় করে উত্তর দিয়ে দফে দফে কাগজ গুনলেন, টাকাটা কি কায়দায় যে সরালেন ঠিক ঠাহর করতে পারলুম না। কিন্তু মুখে হাসি ফুটলো না। বরঞ্চ গম্ভীর কণ্ঠে গম্ভীরতর করে শুধোলেন, 'অমুক সার্টিফিকেটটা কই ?'

আমি তো সেই দুই যোগানদারদের উপর রেগে টঙ্! পই পই করে আমি শুধিয়েছি, ওরা আরো পই পই করে বলেছে, সব কাগজ ঠিকঠাক আছে, এখন এ কা গেরো রে বাবা! বুঝলুম, কি একটা সার্টিফিকেট আনা হয় নি। কিন্তু সে সার্টিফিকেট কিসের, কোনোই অনুমান করতে পারলুম না। যোগানদারদের মুখেও শুনি নি।

ভয়ে ভয়ে শুধালুম, 'কি বললেন, স্তর!'

এবার যেন নাভিকুণ্ডলি থেকে কৈয়াজখানি কণ্ঠে কি একটা বেরুলো।

গুরু-মুর্শীদ, ওস্তাদ-মুরুব্বীদের আশীর্বাদ-দোওয়া আমার উপর নিশ্চয়ই ছিল; হঠাৎ অর্থটা মাথার ভিতরে যেন বিদ্যুতের মত ঝিলিক মেরে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে আপন অজান্তে এক গাল হেসে বলে ফেলেছি, 'চেষ্টা তো দিয়েছি, স্তর, দু বচ্ছর ধরে প্রায় প্রতি শনির রাত্রে—মাফ করবেন স্তর—বলা উচিত রবির ভোরে। তা ওরা ধরতে না পারলে আমি কি করবো? বললে পেত্যয় যাবেন না, স্তর—'

ইতিমধ্যে বুড়ো হঠাৎ ঠাঠা করে হেসে উঠেছেন। যেমন তাঁর গাম্ভীর্য তেমন তাঁর হাসি। বিশেষ করে তাঁর বিরাট গোঁপ জোড়ার একটা দিক নেমে যায় নিচে, তো অন্যটা উঠে যায় উপরের দিকে। সে হাসি আর থামে না। ইতিমধ্যে ছোকরা কেরানীরাও হাসির রগড় দেখে তাঁর চতুর্দিকে এসে দাঁড়িয়েছে। এবারে থেমে বললেন, 'ধরা দেবার চেষ্টা করলে, আর ওরা ধরতে পারলো না, এটা কি রকম কথা?'

আমি বললুম, 'যে-পুলিশ আরেকটু হ'লে ধরতে পারতো, তাকে সাক্ষী স্বরূপ হাজির করতে পারি যে, আমি চেষ্টার ত্রুটি করি নি, এই জেলে যাবার সার্টিফিকেট যোগাড় করার।'

সংক্ষেপে বললেন, 'খুলে কও।'

আমি সেই প্রকৃতির লোক যারা নার্ভাস ব্রেকডাউনের ভাঙন থেকে পড়ি-পড়ি করতে করতে বেঁচে গিয়ে হঠাৎ নিষ্কৃতি পেয়ে হয়ে যায় অহেতুক বাচাল—সেও আরেক রকমের নার্ভাস্‌নেস্। গড় গড় করে বলে গেলুম, পুলিশের সেই জাল পাতার কাহিনী—বিশেষ করে আমার উপকারার্থে—'পাব'-এর ভিতরকার বয়ান

ও সর্বশেষে সেই পুলিশম্যানের সঙ্গে পথিমধ্যে আমার যম-নচিকেতা কথোপকথন। বক্তৃতা শেষ করলুম, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, 'এর পর এই পরীক্ষার পড়া নিয়ে বড্ড ব্যস্ত ছিলুম বলে সলিড্ কিছু করে উঠতে পারি নি, স্যর। শুধু ঐ যে, দিন পনেরো আগে হঠাৎ এক সকালে দেখা গেল লর্ড মেয়ারের বিরাট দফতরের উচ্চতম টাওয়ারে একটা ছেঁড়া ছাতা বাঁধা, বাতাসে পৎপৎ করছে, কায়ার ব্রিগেড পর্যন্ত নামাতে পারে নি, ঐ উপলক্ষে অধীন কিঞ্চিৎ, অতি যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করতে—'

একজন ছোকরা কেরানী আঁতকে উঠে বললে, 'সর্বনাশ! ওটার তালাশী যে এখনো শেষ হয় নি!'

বুড়ো বললেন, 'আমরা তো কিছু শুনছি না।'

বুড়োর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরুতে গেলে তিনি কাউণ্টারের ফ্ল্যাপ্টা তুলে আমার সঙ্গে দোর পর্যন্ত এলেন—পরে শুনলুম, এ-রকম বিরল সম্মান ইতি-পূর্বে নাকি মাত্র দু'একজন বিদেশীই পেয়েছেন। আমি কিছু শুধাবার পূর্বেই তিনি যেন বুঝতে পেরে তাঁর মাথাটি আমার কানের কাছে নিচু করে, এবং সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো আঙুলের ডগা বুকে ঠুকে ঠুকে ফিস ফিস করে বললেন, 'আমি তিনবার, আমি তিনবার।' তারপর অত্যন্ত সিরিয়াসলি শুধোলেন, 'বছর তিনেক পূর্বে এক ডাচ্ স্টুডেণ্ট বললে—বুঝতেই পারছো, এ রসিকতাটা আমি শুধু বিদেশী ছাত্রদের সঙ্গেই করে থাকি, সুদ্দু মাত্র জানবার জন্য, তারা কতখানি সত্যকার জর্মন ঐতিহ্যের য়ুনি ছাত্র হতে পেরেছে—স্টুডেণ্টরা নাকি ক্রমেই হারছে!' কণ্ঠে রীতিমত আশঙ্কার উৎপীড়ন।

আমি তাঁর প্রসারিত হাত ধরে হাণ্ডশেক করতে করতে বললুম, 'তিন বছর পূর্বে, ইয়া। কিন্তু তারপর জানেন তো, আমি আর আপনার মত মুরুব্বীকে কি বলবো, কৃষ্ণতম মেঘেরও রূপালী সীমন্তরেখা থাকে—এল জর্মনিতে অভূতপূর্ব বিরাট বেকার সমস্যা, যেটা এখনও চলছে। ফলে ছেলেরা ম্যাট্রিক পাস করে এদিক ওদিক কাজে ঢুকতে না পেরে বাধ্য হয়ে ঢুকছে য়ুনিতে, আগে যেখানে ঢুকতো একজন, এখন ঢোকে দশজন। ওদিকে সরকারের পয়সার অভাবে পুলিশের গুষ্টি না বেড়ে বরঞ্চ কমতির দিকে। আমরা এখন দলে ভারি। বস্তুতঃ আমরা এখন নিশাচরবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্বক দিবাভাগেই তাদের সম্মুখ-সমরে আহ্বান করতে পারি—করি না, শুধু শতাধিক বৎসরের ঐতিহ্য ভঙ্গ হবে বলে।' তারপর একটু থেমে গম্ভীরতর কণ্ঠে বললুম, 'আর যদি কখনো সে দুর্দিনের চিহ্ন দেখি, তবে সেই সুদূর ভারত থেকে ফিরে আসবো—আ মি। সামনের পরীক্ষায়

পাস করি আর ফেলই মারি, সেই পরাজয় প্রতিরোধ করার জন্য য়ুনিতে ঢুকে ছাত্র হব আবার—আ মি।'

'আম্মো।' ॥

রাসপুতিন

এক একটা দুঃখ মানুষ আমৃত্যু বয়ে চলে। আমার নিজের কথা যদি বলার অনুমতি দেন, তবে নিবেদন করি, অধ্যাপক বগ্‌দানফের আমাকে বলা তাঁর নিজের জীবনের কিছু কিছু অভিজ্ঞতা আমি যে কেন তখনই লিখে রাখি নি সেই নিয়ে আমার শোক, এবং এ-শোক আমার কখনো যাবে না। তারই একটি ১৯১৭-র কম্যুনিস্ট বিপ্লব। তিনি অকুস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং সমস্ত ঘটনাটি বর্ণন করতে তাঁর লেগেছিল পুরো ন'টি ঘণ্টা। শান্তিনিকেতনে আশ্রমের ইস্কুলের শোবার ঘণ্টা পড়ে রাত ন'টার সময়; আমি কলেজে পড়তুম বলে অধ্যাপকের ঘরে ঐ সময়ে যেতে কোনো বাধা ছিল না। পর পর তিন রাত্রি ধরে রাত বারোটা-একটা অবধি তিনি আমাকে সে ইতিহাস বলে যান। অবশ্য অনেকেই বলতে পারেন, ঐ যুগপরিবর্তনকারী আন্দোলন সম্বন্ধে বিস্তর প্রামাণিক পুস্তক লেখা হয়ে গিয়েছে এবং অধ্যাপক বগ্‌দানফের পাঠটা খোয়া গিয়ে থাকলে এমন 'কাই বা ক্ষতি। হয়তো সেটা সত্য, কিন্তু ঐ বিষয়ে আমি যে কটি সামান্য বই পড়েছি তার সব কটাই বড়ই পাণ্ডিত্যপূর্ণ, বৈজ্ঞানিক। বগ্‌দানফ তাঁর কাহিনী বলেছিলেন একটি ষোল বছরের ছোকরাকে—ঘটনার মাত্র চার-পাঁচ বৎসর পরে এবং সেটি তিনি তাই করেছিলেন সেই অনুযায়ী রসময়, অর্থাৎ সাহিত্যরসে পরিপূর্ণ। এস্থলে বলে রাখা প্রয়োজন মনে করি, অধ্যাপকের বর্ণনভঙ্গিটি ছিল অসাধারণ, তাই পরবর্তী যুগে তাঁর ইরান ও আফগানিস্থান (এ দুটি দেশে তিনি দীর্ঘকাল বাস করেন) সম্বন্ধে লিখিত গবেষণামূলক পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধরাজি পণ্ডিত-মণ্ডলীতে সাহিত্যিক খ্যাতিও পায়। মাতৃভাষা রাশানে তিনি লিখেছেন কমই—তাঁর পাণ্ডিত্যপ্রকাশ-যুগে রাশাতে এ ধরনের গবেষণার কোনোই মূল্য ছিল না বলে সেগুলো সেখানে ছাপানোই ছিল অসম্ভব। তিনি প্রধানত লেখেন ফরাসী ইংরাজী ও ফার্সীর মাধ্যমে। এবং সব চেয়ে বেশী সম্মান পান ফার্সী পণ্ডিতজন মধ্যে।[১]

১ এঁর উল্লেখ শ্রীযুত প্রভাত মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্র-জীবনীতে' করেছেন। আমিও 'দেশে-বিদেশে' বইয়ে অল্পবিস্তর আলোচনা করেছি

তিনি যে দ্বিতীয় কাহিনী বলেন, সেটি রাসপুতিন সম্বন্ধে। প্রথমটির তুলনায় এটি অনেক হ্রস্ব। রাসপুতিনকে নিহত করা হয়, পুরনো ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী ১৬ই ডিসেম্বর, নতুন ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী ৩০ ডিসেম্বর ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে। এর প্রায় কুড়ি বৎসর পর রাসপুতিনকে নিয়ে আমেরিকায় একটি ফিল্‌ম্ তৈরী হয় (এবং আমার যতদূর মনে পড়ে লায়োনেল বেরিমোর রাসপুতিনের অংশ কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করেন) এবং ঐ সময় রাসপুতিন-হন্তা রাশার শেষ জারের নিকটাত্মীয় গ্র্যাণ্ড ডিউক ইউসুপফ (আরবী হীব্রুতে ইউসুফ, ইংরিজীতে জোসেফ) ইয়োরোপে। ১৯১৭-র রুশ বিপ্লবের মধ্যে তিনি ও তাঁর স্ত্রী সেই সব ভাগ্যবানদের দুজনা, যাঁরা প্রাণ নিয়ে রাশা থেকে পালাতে সক্ষম হন। তিনি লণ্ডন আদালতে মোকদ্দমা করেন ফিল্‌ম্ নির্মাতাদের (বোধ হয় M G M) বিরুদ্ধে যে, তাঁরা যে ফিল্‌মে ইঙ্গিত দিয়েছেন, রাসপুতিন তাঁর অর্থাৎ ইউসুপফের স্ত্রীকে পর্যন্ত তাঁর কামানলের দিকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তিনি মোকদ্দমাটি হেরে যান বটে, কিন্তু ঐ মোকদ্দমাটি তখন এমনই cause celebre কজ্‌ সেলেব্র রূপে—যেমন আমাদের ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মোকদ্দমা—প্রখ্যাতি লাভ করে যে তার অল্প দু'এক বৎসর পর ঐ মোকদ্দমায় প্রধান অংশগ্রহণকারী একজন উকিল মোকদ্দমাটি সম্বন্ধে একটি প্রামাণিক—এবং আমি বলবো—সাহিত্যিক উচ্চপর্যায়ের প্রবন্ধ লেখেন। তিনি যদিও ইউসুপফের বিরুদ্ধ পক্ষের উকিল ছিলেন, তবু আদালতে ইউসুপফ দম্পতির খানদানী সৌম্য আচরণের অকৃপণ প্রশংসা করেন। তারপর হয়তো আরো অনেক কিছু ঘটেছিল কিন্তু তার খবর আমার কানে পৌঁছয় নি। হঠাৎ গত মাসের 'আনন্দবাজারে'র এক ইস্যুতে দেখি, ইউসুপফ ফের মোকদ্দমা করেছেন—এবার কিন্তু আমেরিকায়, কলাম্বিয়া বেতার প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে রাসপুতিন ও তাঁর জীবন নিয়ে নাট্যপ্রচার করার জন্য—এবং আবার মোকদ্দমা হেরেছেন। সেই সুবাদে আমার মনটা চলে গেল ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে, যখন অধ্যাপক বগ্‌দানফ রাসপুতিন-কাহিনী আমাকে ঘণ্টা তিনেক ধরে শোনান।

পরবর্তী যুগে ফিল্‌ম্ বেরুলো, তার পর লণ্ডনের উকিল তাঁর বক্তব্য বললেন, এবং 'আনন্দবাজার' বিদেশ থেকে যে সংবাদ পেয়েছেন, তা-ই প্রকাশ করেছেন। এদের ভিতর পরস্পর বিরোধ তো রয়েইছে, কিন্তু আমার পক্ষ থেকে এ-স্থলে আসল বক্তব্য এই যে, বগ্‌দানফ বলেছিলেন, সম্পূর্ণ না হোক্ অনেকখানি ভিন্ন কাহিনী। আমি আদৌ বলতে চাই নে, তাঁর বিবরণী, জবানী বা ভার্শন—যাই বলুন—সেইটেই নির্ভুল আপ্তবাক্য; বস্তুত তিনি নিজেই আমাকে বার বার

বলেছিলেন, 'মাই বয়্! সেন্ট পেটেরসবুর্গে তখন এত হাজারো রকমের গুজোব নিত্য নিত্য ডিউক সম্প্রদায় থেকে আস্তাবলের ছোকরাটা পর্যন্ত গরমাগরম এ-মুখ থেকে ও-মুখ হয়ে রাশার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে যে আমারটাই যে অভ্রান্ত সেই বা বলি কোন্ সাহসে? তবে এটা সত্য আমার জীবনের সর্বপ্রধান কাজ "টেক্স্ট্-ক্রিটিসিজ্ম্"—তখনো ছিল, এখনো আছে—অর্থাৎ কোনো পুস্তকের পেলুম তিনখানি পাণ্ডুলিপি, তাতে একাধিক জায়গায় লেখক বলেছেন পরস্পরবিরোধী তিনরকম কথা। আমার কাজ, যাচাই করে সত্য নিরূপণ করা, কিংবা সত্যের যতদূর কাছে যাওয়া যায় তারই চেষ্টা দেওয়া। অতএব, বুঝতেই পারছো, রাসপুতিন সম্বন্ধে গুজোবগুলো আমি সরলচিত্তে গোগ্রাসে গিলি নি, আমার বুদ্ধিবিবেচনা প্রয়োগ করে যেটা সর্বাপেক্ষা সত্যের নিকটতম সেইটেই বলছি।'

অধ্যাপক রাসপুতিনের প্রথম জীবনাংশ সংক্ষেপে সারেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে এই চাষী পরিবারের ছেলে রাসপুতিনের জন্ম সাইবেরিয়াতে। 'রাসপুতিন' তাঁর আসল নাম নয়—সেটা পরে অন্য লোকে তাঁর উচ্ছৃঙ্খল আচরণ, বিশেষ করে কামাদি ব্যাপারে, জানতে পেরে তাঁর উপর চাপায়। লেখাপড়ার চেষ্টা তিনি ছেলেবেলায় কিছুটা দিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু সেদিকে ছিলেন, ক্লাসের মামুলী চাষার ছেলেরও অনেক নিকৃষ্ট। এর পর তিনি তাঁর সমাজের ভদ্রঘরেই বিয়ে করেন—আর পাঁচটা ছেলের মত। কিন্তু তার কিছুকাল পরেই হঠাৎ তাঁর ঝোঁক গেল 'ধর্মে'র দিকে, কিন্তু প্রচলিতার্থে আমরা ধর্মাচরণ বলতে যা বুঝি সেদিকে নয়। হিন্দু ধর্মে যে-রকম একাধিক মতবাদ, শাখা-প্রশাখা—রুশের প্রচলিত (অর্থডক্স) সনাতন খৃষ্টধর্মেও তাই। তারই একটার দিকে আকৃষ্ট হলেন গ্রেগরি (রাসপুতিন)। এস্থলে উল্লেখ প্রয়োজন বলে মনে করি, অধ্যাপক বগ্দানফ ছিলেন অতিশয় 'গোঁড়া'—আমি সজ্ঞানে শব্দটি ব্যবহার করছি—রাশার সরকারী ধর্ম 'গ্রীক অর্থডক্স' চার্চে বিশ্বাসী এবং আচারনিষ্ঠ খৃষ্টান। শান্তিনিকেতনে তাঁর কামরায় (তখনকার দিনের অতিথিশালা, এখন বোধ হয় 'দর্শন-ভবন') দেয়ালে ছিল ইকন এবং তার নিচে অষ্টপ্রহর জ্বলতো মঙ্গলপ্রদীপ এবং তারই নিচে তিনি অহরহ দাঁড়িয়ে স্বদেহে আঙুল দিয়ে ক্রুশ চিহ্ন অঙ্কিত করতে করতে—ঠিক আমাদের বুড়িদের মত—বিড়বিড় করে দ্রুতগতিতে মন্ত্রোচ্চারণ করতেন। বলা বাহুল্য রাসপুতিন যে খ্লিস্তি (khlisti) সম্প্রদায়ে প্রবেশ করলেন সেটাকে অধ্যাপক অপছন্দ করতেন। এ সম্প্রদায় উন্মত্ত নৃত্য, সংগীত (এবং লোকে বলে যৌনাভিচার) ইত্যাদির মাধ্যমে পরমাত্মাকে মানবাত্মায় অবতীর্ণ করিয়ে স্বয়ং পরমাত্মায় পরিবর্তিত হওয়ার চেষ্টা

করে। এ মার্গ বিশ্বসংসারে কিছু আজগুবী নূতন চীজ নয়। তবে এঁরা বলতে কসুর করতেন না যে, স্ত্রী পুরুষের যৌনসম্পর্ক সম্বন্ধে এঁরা উদাসীন, অর্থাৎ এ বাবদে কে কি করে সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। রাসপুতিন এটাকে নিয়ে গেলেন তার চরমে। তিনি প্রচার করতে লাগলেন, 'পাপ না করলে ভগবানের ক্ষমা পাবে কি করে? অতএব পাপ করো!' এ ছাড়া তাঁর আরেকটি বক্তব্য ছিল, তিনি পরমাত্মার অংশাবতার, এবং তাঁর সঙ্গে দেহে মনে আত্মায় আত্মায় যে কেউ সম্মিলিত হবে তারই চরম মোক্ষ তদ্দণ্ডেই। তাঁর শিষ্যাগণের সঙ্গে তাঁর সেই সম্মিলিত হওয়াটা কোন্ পদ্ধতিতে হতো সেটা বলতে শ্লীলতায় বাধে, এবং একথা প্রায় সর্ববাদিসম্মত যে তিনি তাঁর শিষ্য-শিষ্যাগণকে নিয়ে একই কামরায় যে সব 'সম্মেলন' ঘটাতেন সেটা শুধু তিনি নিজেতেই সীমাবদ্ধ রাখতেন না, শিষ্য-শিষ্যাগণ নিজেদের মধ্যেও সম্মিলিত হতেন। ইংরিজীতে একেই 'অর্জি' 'সেটারনেলিয়া' ইত্যাদি বলে থাকে।

এটা সত্য, রাসপুতিনের কথা আমিই উত্থাপন করেছিলুম এবং অধ্যাপকও রাসপুতিন সম্বন্ধে তাঁর যা জানা ছিল সেটি সবিস্তর বলেছিলেন, কিন্তু তিনি রাসপুতিনের ধর্মসম্প্রদায় সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তাঁর পূর্ণ বক্তব্যের প্রায় অর্ধাংশ ব্যয় করেন ঐ সম্প্রদায় নিয়ে, এবং বিশ্বের অন্যান্য ধর্মে কোথায় কোথায় এ-প্রকারের 'অর্জি' স্বীকৃত এবং কার্যে পরিণত হয়েছে তাই নিয়ে। এ বাবদে তাঁর শেষ বক্তব্য আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে: ধর্মের নামে এ ধরনের অনাচার কেন যুগে যুগে হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, কিংবা গোপনে গোপনে বিশেষ কয়েকটি পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে প্রাচীন ধারাটি অক্ষুণ্ণ রাখে, এ তত্ত্বটি সাতিশয় গুরুত্ব ধারণ করে এবং এর অধ্যয়ন প্রচলিত ভিন্ন ভিন্ন ধর্মশাস্ত্রীয় পুস্তক অধ্যয়ন করে হয় না, এর জন্য প্রথমত প্রয়োজন নৃতত্ত্ব এবং পরে সমাজতত্ত্বের গভীর অধ্যয়ন (এর পূর্বে Anthropology ও Sociology এ দুটো শব্দ আমি কখনো শুনিই নি)।

আমি তখন বুঝতে পারি নি, পরে পারি যে আর পাঁচজনের মত তিনিও রাসপুতিনের রগরগে কাহিনী কীর্তন করতে প্রস্তুত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল ওরই মাধ্যমে—ফাঁকি দিয়ে শটকে শেখানোর মত—আমাকে সাধারণ ভারতীয় ছাত্রের পাঠ্যবস্তুর গণ্ডি থেকে বের করে পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে প্রথম পরিচয় করিয়ে দেওয়া। বলা বাহুল্য, এসব আমার সম্বন্ধে নিছক ব্যক্তিগত কথা হলে আমি এগুলো উল্লেখ করতুম না, আমার অন্যতম উদ্দেশ্য, এই সুবাদে তখনকার দিনের স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ-চালিত বিশ্বভারতীর (স্কুল ও কলেজ—যথাক্রমে 'পূর্ব' ও 'উত্তর বিভাগ') অধ্যাপকগণ

কি প্রকৃতি ধারণ করতেন তারই যৎকিঞ্চিৎ বর্ণন।

অধ্যাপক বলেছিলেন, এ ধরনের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ অবাধে করা যাচ্ছে এবং তদুপরি সেটা ধর্ম নামে প্রচারিত হচ্ছে, এটা যে জনপ্রিয় হবে—অন্তত জনগণের অংশবিশেষে—সেটা তো অতিশয় স্বাভাবিক। কিন্তু এই যে এক অজানা-অচেনা অর্ধলুপ্ত খ্লিস্তি সম্প্রদায় হঠাৎ নবজীবন লাভ করে খুদ জারের প্রাসাদ পর্যন্ত পৌঁছে গেল, এটা তো আর একটা আকস্মিক অকারণ কর্তাবিহীন কর্ম নয়। এরকম একটা নবআন্দোলন আনয়নকারী পুরুষের কোনো-না-কোনো অসাধারণ গুণ, আকর্ষণ বা সম্মোহনশক্তি থাকা নিশ্চয়ই প্রয়োজন।

পূর্বেই বলেছি, অধ্যাপক ছিলেন কট্টর 'অর্থডক্স্ গ্রীক চার্চ'-এর অন্ধ ভক্ত। কিন্তু এস্থলে এসে তিনিও স্বীকার করলেন, রাসপুতিন একাধিক অলৌকিক শক্তি ধারণ করতেন। তিনি যে কঠিন কঠিন দুরারোগ্য রোগ, কোনো প্রকারের ঔষধ প্রয়োগ না করে প্রশম করতে পারতেন সেটারও উল্লেখ করলেন। কি প্রকারে? কেউ জানে না।

ইতিমধ্যে জার-প্রাসাদের উপর মৃত্যু যেন তার করাল ছায়া বিস্তার করেছে। হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে বালক যুবরাজ আহত হন। তাঁর রক্তক্ষরণ আর কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না। ভিয়েনা বার্লিন থেকে বড় বড় চিকিৎসক এসেছেন। আমি অধ্যাপককে শুধিয়েছিলুম, 'চিকিৎসা শাস্ত্রে কি রাশা তখনো এতই পশ্চাৎপদ?' তিনি বলেছিলেন, 'বলা শক্ত। তবে সাহিত্যের বেলা চেখফ্ যা বলেছেন এস্থলেও হয়তো সেটা প্রযোজ্য: তোমার প্রিয় লেখক চেখফ্ বলেছেন, "হ্যাঁ, আলবৎ আমরা রুশ সাহিত্য পড়ি। কিন্তু সেটা ঐ যেরকম আমরা 'কুটির শিল্প'কে মেহেরবানী করে সাহায্য করি। আসল মালের জন্য যাই ফরাসী সাহিত্যে।" হয়তো চিকিৎসার বেলাও তখন তাই ছিল।'

·

দাসী না ডাচেস্—সমাজের দুই প্রান্তের দুজনা—কে প্রথম রাসপুতিনকে নিয়ে গেল জারের রাজপ্রাসাদে?

সে কি? যুবরাজ মৃত্যুশয্যায়, আপন 'কটেজ ইনডাসট্রি'র রাশান ডাক্তাররা তো হার মেনেছেনই, ভিয়েনা-বার্লিনের রাজ-বৈদ্যরাও, যাঁরা কি না কাইজারের, এমপেরার ফ্রানৎস যোজেফের প্রাসাদের গণ্যমান্যদের চিকিৎসা করে করে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন তাঁরা পর্যন্ত রাশা ছেড়ে পালাতে পারলে বাঁচেন। কারণ রুশ যুবরাজের যে রোগ হয়েছে সেটার নাম হ্যামোফিলিয়া – আমরা গরীবদের, না জানি কোন্ পুণ্যের ফলে, আমাদের হয় না – ব্যামোটা শব্দার্থেই রাজসিক, শুধু রাজা-

রাজড়াদের ভিতরেই সীমাবদ্ধ। পূর্বে ছিল এই বিশ্বাস ; পরে দেখা গেল, গরীবদেরও হয়। আমরা বললুম, 'সেই কথাই কও। ভগবান যে হঠাৎ খামোখা এহেন দুরারোগ্য ব্যাধি শুধু বড়লোকদের জন্যই রিজার্ভ করে রেখে দেবেন, এটা তো অকল্পনীয়। ব্যামোগুলো তো আমাদের মতন গরীবদের জন্যই তৈরি হয়েছে। ভগবান স্বয়ং তো রাজাদের দলে। কিংডম অব্ দি হেভ্‌ন্ বা স্বর্গরাজ্যে যাঁর বাস তিনি তো ফেভার করবেন তাঁর জাতভাই তাঁদেরই, যাঁদের কিংডম্ অব্ দি আর্থ বা পৃথ্বীরাজ্য আছে।[২] তাই যদি হয়, তবে স্বর্গরাজ্যই হোক, আর ভূস্বর্গই হোক, ভিয়েনা-বার্লিনের অশ্বিনীকুমারদ্বয় যেখানে রুগীকে হরি নামের গুলি দিয়ে তাড়াতাড়ি কেটে পড়ার তালে, সেখানে দাসী 'ফার্সী পড়বে' ? হয়তো ঠিক সেইখানেই, কিন্তু অন্য কারণও আছে।

আমরা এ-দেশে যত কুসংস্কারাচ্ছন্নই হই না কেন, একাধিক বাবদে অন্তত সে যুগে, অর্থাৎ এ-শতাব্দীর প্রারম্ভে জারের রাশা আমাদের অনায়াসে হার মানাতে পারতো। সে রাশার গ্রীক অর্থডক্‌স্ চার্চ ছিল শব্দার্থেই অর্থডক্‌স্ গোঁড়া, কট্টর, কুসংস্কারাচ্ছন্ন। আর চাষাভুষোদের তো কথাই নেই। তন্ত্রমন্ত্র, জড়িবড়ি, মাদুলী-কবচ থেকে আরম্ভ করে নিরপরাধ 'প্রভু যীশুর হত্যাকারী' ইহুদিদের সুযোগ পেলেই বেধড়ক মার, এবং সেখানেই শেষ নয়—আপন রক্তের, আপন ধর্মের জাতভাই যারা এসব কুসংস্কার থেকে একটুখানি মুক্ত হয়ে, অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ স্বাধীনভাবে প্রভু যীশুর বাণী জীবন দিয়ে গ্রহণ করার চেষ্টা করতো যেমন 'দুখবর', 'স্তান্দিস্ত' সম্প্রদায়—তাদের উপর কী বীভৎস অত্যাচার।[৩] এবং চাষাভুষোদের এই অত্যাচার-ইন্ধনে কাষ্ঠ সরবরাহ করতেন জার-সম্প্রদায় এবং তাঁদের অনুগ্রহে লালিত-পালিত বিলাস-ব্যসনে গোপন পাপাচারে আকণ্ঠ-নিমগ্ন অর্থডক্‌স্ চার্চ তার আপন 'পোপ'—হোলি সিনড্‌কে নিয়ে। যে ইউসুপফ এর

---

২ স্বয়ং স্বামীজী নাকি বলেছেন, 'যে ভগবান আমাকে এ-দুনিয়ায় এক মুঠো ভাত দেয় না, সে নাকি মৃত্যুর পর আমাকে স্বর্গরাজ্য দেবে—why, even an imbecile would not believe it ; much less I !' তবে এটা প্রক্ষিপ্তও হতে পারে। তবু এ-কথা অতিশয় সত্য, তিনি এই পৃথিবীতেই স্বর্গরাজ্য স্থাপনা করতে চেয়েছিলেন। বঙ্কিম নাকি বলতেন, মানুষকে ভগবান হতে হবে, আর তিনি নাকি বলতেন, মানুষকে মানুষ হতে হবে।

৩ সে অত্যাচার-সংবাদে কাতর হয়ে তলস্তয় 'রেসারেক্‌শন' বই লিখে, টাকা তুলে এদের অনেককে কানাডা পাঠিয়ে দেন।

কয়েক বৎসর পর রাসপুতিনের ভবলীলা সাঙ্গ করেন, তিনি বা তাঁর ভাই, আরেক গ্র্যাণ্ড ডিউক প্রকাশ্য 'ডুমা' বা মন্ত্রণাসভায় প্রস্তাব করেন এবং বহু বিনিদ্র যামিনী যাপন করে স্বহস্তে নির্মিত পরিকল্পনা সঙ্গে সঙ্গে পেশ করেন, ইহুদিদের সবংশে বিনাশ করার জন্য কি প্রকারে, স্তরে স্তরে, শল্য প্রয়োগদ্বারা তাদের পুরুষদের সন্তান প্রজনন ক্ষমতা হরণ করা যায়? বগ্‌দানফ সাহেব বলেছিলেন, 'মাই বয়, হি সাব্‌মিটেড্‌ ইট ইন্‌ অল্‌ সিরিয়াসনেস্‌!' অবশ্য তৎসত্ত্বেও মার্জিত রুচিসম্পন্ন ভদ্রসন্তান অধ্যাপক বগ্‌দানফ ইহুদিদের ঘৃণা করতেন—হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে, ঐ জাতীয় আর পাঁচটা বর্বর রুশের মত। বিশ্বভারতীতে তখন একটি সুন্দরী, বিদেশিনী, ইহুদি অধ্যাপিকা ছিলেন; কি প্রসঙ্গে তাঁর কথা উঠতে বগ্‌দানফ তিক্ত অবজ্ঞায় মুখ বিকৃত করে বললেন, 'আই উড্‌ নট্‌ টাচ হার উইথ এ পেয়ার অব টংস!'—সাঁড়াশি দিয়েও তিনি তাঁকে স্পর্শ করতে রাজী হবেন না।

এ কথা সবাই বলেছেন, রাজধানী সেণ্ট পেটের্‌স্‌বুর্গে (তখন অবশ্য রাশা জর্মনীর সঙ্গে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে লিপ্ত বলে তাদের সভ্যতায় জর্মনদের যে শতকরা আশী ভাগ অবদান, যায় তাদের ভাষায় প্রবেশপ্রাপ্ত জর্মন শব্দ, যেমন সেণ্ট পেটের্‌স্‌বর্গের জর্মন অংশ 'বুর্গ'—'প্রাসাদ', 'কাস্‌ল্‌'—সমূলে উৎপাটিত করে নামকরণ করেছে 'পেত্রোগ্রাদ'। সর্বশেষে এর নামকরণ হয় 'লেনিনগ্রাদ', কিন্তু ততদিনে রাজধানী চলে গেছে মস্কোতে। জারের 'উইণ্টার পেলেস' প্রাসাদে বিরাজ করতো কেমন যেন এক অদ্ভুত রহস্যময় (প্রধানত ধার্মিক—mysticism) বাতাবরণ। সম্রাজ্ঞী—জারিনা—ছিলেন অতিশয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন, আচার-অনুষ্ঠানে সদালিপ্ত, প্রতি মুহূর্তে পুত্রের পুনর্বার রক্তক্ষরণ রোগে আক্রান্ত হবার ভয়ে উদয়াস্ত সশঙ্কিত; বিশেষ করে যখন হৃদয়ঙ্গম করলেন যে, প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতি এই কঠিন পীড়ার সম্মুখে সম্পূর্ণ পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছে, তখন যে তিনি পাগলিনীর মত রাজ্যের যত প্রকারের টোটকামোটকা, তাবিজমাদুলীর সন্ধানে লেগে যাবেন সেটা অবাঞ্ছনীয় হলেও অবোধ্য নয়—এমন কি কট্টর বৈজ্ঞানিকও সেখানে সহানুভূতি দেখাবে। একেই তো শীত-প্রাসাদে বিরাজ করতো রহস্যময় বাতাবরণ, যেন সেখানে যে-কোনো মুহূর্তে যে-কোনো প্রকারের অলৌকিক কাণ্ড ঘটে যেতে পারে, তদুপরি নানাশ্রেণীর কুটিল ভাগ্যান্বেষী সেই প্রাসাদে কোনো প্রকারের চতুরতা দ্বারা অর্থ সঞ্চয়ের জন্য গমনাগমন করছে, সেখানে যদি নিত্যসঙ্গিনী দাসীটিও যদি বলে যে, সে একজন 'হোলিম্যান', 'সাধুতপস্বী'কে চেনে যাঁর হৃদয়ে প্রভু যীশুর সামান্যাংশ প্রবেশ করার ফলে (' সেই শাশ্বত সত্তার একটি কণা আমাতে অবতার রূপে অবতীর্ণ হয়েছে'—রাসপুতিনের

আপন ভাষায়) তিনি প্রভুরই মত বহু দুরারোগ্য ব্যাধি, কোনো ঔষধ প্রয়োগ না করে অবলীলাক্রমে আরোগ্য করতে পারেন, তবে মহারানী যে নিমজ্জমানার ন্যায় সেই তৃণখণ্ডকেও দৃঢ়হস্তে ধারণ করবেন সেটা তো তেমন-কিছু অসম্ভব আচরণ নয়।

অন্যপক্ষ বলেন, দাসী নয় ডিউক।

রাসপুতিন দিগ্বিজয় করতে করতে পেত্রোগ্রাদ—সম্ভব হলে রাজপ্রাসাদ—জয় করবেন বলে মনস্থির করেছেন। এদিকে সেখানকার যাজক সম্প্রদায়ের কেউ বা তাঁর জনপ্রিয়তার সংবাদ শুনে, কেউ বা তাঁর ধর্মের নবজাগরণ প্রচেষ্টার খ্যাতি শুনে, কেউ বা তাঁর অলৌকিক কর্মক্ষমতার জনরবে আকৃষ্ট হয়ে সেটা সচক্ষে প্রত্যক্ষ করার জন্য, এক কথায় অনেকেই অনেক কারণে তাঁর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনা করতে উদ্‌গ্রীব। রাসপুতিন সশিষ্য শিষ্যা পেত্রোগ্রাদে প্রবেশ করে—সে প্রবেশ প্রায় খৃষ্টের পূতপবিত্র জেরুজালেমের পুণ্যভূমিতে প্রবেশ করার সমতুল—সাড়ম্বরে প্রতিষ্ঠিত হলেন এক প্রভাবশালী শিষ্যের গৃহে। শীঘ্রই যোগসূত্র স্থাপিত হল পেত্রোগ্রাদের সর্বোৎকৃষ্ট ধর্মশিক্ষাশালার সুপণ্ডিত অধ্যক্ষের সঙ্গে। ইনি আবার মহারানীর আপন ব্যক্তিগত পুরোহিত—অর্থাৎ এঁরই সামনে মহারানী প্রতি সপ্তাহে একবার 'কনফেস্' করেন, ঐ সপ্তাহে তিনি যে সব পাপচিন্তা করেছেন, কর্মে সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন সেগুলি স্বীকার করে শাস্ত্রাদেশ অনুযায়ী প্রায়শ্চিত্তাদেশ গ্রহণ করেন—প্রায়শ্চিত্ত সাধারণতঃ উপবাস ও মালাজপের গণ্ডিতেই আবদ্ধ থাকে।[৪] এই কনফেশন গ্রহণ করে যে পুরোহিত প্রায়শ্চিত্তাদেশ প্রদান করেন তাঁর পদটি স্বভাবতই সাতিশয় গাম্ভীর্য ও গুরুত্ব ধারণ করে। তিনি সম্রাজ্ঞী-

---

৪ এই কনফেশন বা পদস্খলন স্বীকারোক্তি একাধিক ধর্মে প্রচলিত আছে। এদেশে জৈনদের ভিতর সেটি নিষ্ঠা সহকারে মানা হয়, এবং এরই নাম 'পর্যুষণ'। তবে আমাদের যতদূর জানা, পর্যুষণ বৎসরে মাত্র একবার হয় এবং সম্প্রদায়ের সকলেই সেটা একই সময়ে করেন বলে বর্ষার শেষে সেটা পর্বদিবস রূপে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। বৌদ্ধশ্রমণরাও বর্ষাকালে পর্যটন নিষিদ্ধ বলে কোনো সংঘে আশ্রয় নিয়ে বর্ষাযাপন-শেষে পাপ স্বীকারোক্তি করে পুনরায় পর্যটনে নেমে পড়েন। মুসলমানরা হজের সময় করে থাকেন, এবং মৃত্যু আসন্ন হলে 'তওবা' করেন। 'তওবা' শব্দার্থে 'প্রত্যাবর্তন'। অর্থাৎ তওবাকারী আপন পাপ সম্বন্ধে অনুশোচনা করে ধর্মমার্গে প্রত্যাবর্তন করলো।

হৃদয়-কন্দরের অন্তরতম রহস্য জানেন বলেন—এমন কি স্বীকারোক্তির সময় তিনি প্রশ্ন জিজ্ঞাসার অধিকারও ধরেন—তাঁকে থাকতে হয় অতি সাবধানে।

তাঁর প্রধান কৌতূহল রাসপুতিন কোন্ কোন্ কারণে কি ভাবে হৃদয়ে ভগবানের প্রত্যাদেশ পেয়ে সমস্ত জীবনধারা পরিবর্তিত করে 'নবজন্ম' পেলেন। গ্রীক অর্থডক্স্ চার্চ, ক্যাথলিক তথা অন্যান্য সম্প্রদায়ের ইতিহাসে এই 'নব-জীবন' লাভ, গৃহী খৃষ্টানের সন্ন্যাস-গ্রহণের জন্য এই কনভার্সনের উপ-ইতিহাস এক বিরাট অংশগ্রহণ করে আছে। খৃষ্ট সাধু মাত্রই এটি মনোযোগ সহকারে বারংবার পাঠ করে তার থেকে প্রতিদিন নবীন উৎসাহ, তেজস্বী অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করেন। মহারানীর আপন যাজক ধর্ম-একাডেমির অধ্যক্ষরূপে এই উপ-ইতিহাসে অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন, সেই পুস্তক তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর সম্মুখে সটীক প্রতিদিন পড়িয়ে শোনাতেন এবং স্বভাবতই সেই পুস্তকের ভিন্ন ভিন্ন সাধুসন্তদের নিয়ে গভীর এবং সূক্ষ্ম আলোচনা করতেন। কিন্তু কোনো পাপাত্মা কি ভাবে অকস্মাৎ দৈবাদেশ পেয়ে সর্বস্ব ত্যাগ করে ধর্মসংঘে প্রবেশ করে, কিংবা জনসেবায় আত্মনিয়োগ করে, অথবা পাণ্ডিত্য থাকলে সংঘে প্রবেশ ক'রে নির্জনে নিভৃতে বাইবেল বা অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থের এক নবীন টীকা নির্মাণে বাকী জীবন কাটিয়ে দেয় এ সম্বন্ধে তাঁর কোন ব্যক্তিগত অপরোক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না, এবং অতি সহজেই অনুমান করা যায় যে, এ রকম একটা আধ্যাত্মিক 'কনভার্সনে'র নায়ক যদি তাঁর আপন কর্মস্থলে হঠাৎ এসে পৌঁছন তবে তিনি তৎক্ষণাৎ তার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনা করবেন। পূর্বেই বলেছি, রাসপুতিনের ভিতর যেমন যেন একটা বৈদ্যুতিক আকর্ষণী শক্তি ছিল, তাঁর স্বাভাবিক অবস্থায়ও তিনি সাধারণ কেন, অসাধারণ জনকেও মন্ত্রমুগ্ধবৎ মোহাচ্ছন্ন করতে পারতেন। খৃষ্টধর্মশাস্ত্রে তাঁর শিক্ষাদীক্ষা জ্ঞান-প্রজ্ঞা ছিল অতিশয় সীমিত, কিন্তু প্রভু যীশুর যে কটি সরল উপদেশ তিনি বহু কষ্টে কণ্ঠস্থ করতে পেরেছিলেন সেগুলি তিনি অতিশয় দৃঢ়-বিশ্বাসের বীর্যশীল সরলতায় প্রকাশ করতে পারতেন। সঙ্গে সঙ্গে এ সত্যটিও নিবেদন করা উচিত যে, রাশায় ধর্মশিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে যে পণ্ডিতকুলমান্য সর্বোত্তম শাস্ত্রজ্ঞ অধ্যয়ন অধ্যাপনা করেন তিনি এই অশিক্ষিত হলধরসন্তানের কাছে আসবেন না শাস্ত্রের টীকাটিপ্পনি' শ্রবণার্থে! তিনি আসবেন অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে। এ স্থলেও প্রভু যীশুর সঙ্গে রাসপুতিনের সাদৃশ্য আছে। ইসরায়েলের স্মার্তপণ্ডিতরা যখন প্রভু যীশুর সঙ্গে তর্কযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত তখন তিনি যেন তাচ্ছিল্যভরে বলেছিলেন, আমি শাস্ত্রকে কার্যে পরিপূর্ণ ভাবে দেখাবো।

এসব কারণ অনুসন্ধান অপ্রয়োজনীয়। যা বাস্তবে ঘটে সেটা সর্ব তর্কের

অবসান এনে দেয়। পণ্ডিতের পণ্ডিত রাসপুতিনকে দেখে, তাঁর আচার-ব্যবহার, তাঁর প্রতি শিষ্য-শিষ্যাদের সহজ ভক্তি ও সুদৃঢ় বিশ্বাস ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে বিস্মিত হলেন, কিন্তু মুগ্ধ হলেন যখন রাসপুতিনের কাছ থেকে শুনলেন, তাঁর আবেগভরা কণ্ঠে তিনি বলে যেতে লাগলেন, কি ভাবে এক দৈবজ্যোতি তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হল আর তিনি ক্ষণমাত্র চিন্তা না করে স্বর্গীয় প্রভুর পদপ্রান্তে আত্মসমর্পণ করলেন।

এ প্রকারের আকস্মিক পরিবর্তন ইতিহাস শাস্ত্রজ্ঞ অধ্যক্ষ পড়েছেন, পড়িয়েছেন প্রচুর কিন্তু এ-জাতীয় পরিবর্তনের একটি সরল সজীব দৃষ্টান্ত স্বচক্ষে দেখা, স্বকর্ণে শোনা সে যে এক সম্পূর্ণ ভিন্ন, অভিনব, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। যে-কোনো অধ্যাপক, যে-কোন শিক্ষক এ প্রকারের অভিজ্ঞতাকে অসীম মূল্য দেন, কারণ পরের দিন থেকেই ছাত্রমণ্ডলীতে বেষ্টিতাবস্থায় তিনি অর্ধবিশ্বাসী তর্কবাগীশদের উদ্দেশে সবল, আত্মপ্রত্যয়জাত সুদৃঢ় কণ্ঠে বলতে পারেন, 'পবিত্র রুশ দেশের পবিত্রতর সন্তদের যে অলৌকিক পরিবর্তনের কথা তোমরা পড়ছো, সেগুলো কাহিনী নয়, ইতিহাস, এবং শুষ্ক পত্রে লিখিত জীর্ণ ইতিহাস নয়, নিত্য-দিনের বাস্তব প্রত্যক্ষ সত্য; সে জিনিস ভাগ্যবান চক্ষুষ্মান দেখতে পায়!' অস্মদ্দেশীয় প্রচলিত নীতিবাক্য আছে :

"অদ্যাপিও সেই লীলা খেলে গোরা রায়।
মধ্যে মধ্যে ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"

এবং তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন, এই সাধুপুরুষকে তিনি রাজপ্রাসাদে নিয়ে গিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত সম্রাজ্ঞীর সম্মুখীন করবেন। সর্ব ধর্মের সর্ব ইতিহাস বলে, সাধুজনের পক্ষে অসম্ভব কিছুই নেই। সম্রাজ্ঞীকে এই সাধু তাঁর অলৌকিক শক্তি প্রয়োগ করে এনে দেবেন সান্ত্বনা, আত্মপ্রত্যয় এবং ধর্মবিশ্বাস স্থাপন করবেন দৃঢ়তর ভূমিতে।

অতি সহজেই তিনি রাসপুতিনের গুণমুগ্ধ রাজপরিবারের একাধিক নিকটতম আত্মীয়-আত্মীয়ার সহানুভূতি ও সহযোগ পেলেন। রাসপুতিন রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন।

কেউ কেউ বলেন, সেটা ছিল আকস্মিক যোগাযোগ। অধিকতর বিশ্বাসীরা বলেন, 'না, যুবরাজের কঠিনতম সঙ্কটময় অবস্থান, যখন রাজবৈদ্যগণ তাঁর জীবন রক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ হতাশ্বাস, তখন রাসপুতিন তাঁকে অনুরোধ করার পূর্বেই স্বতঃ-প্রবৃত্ত হয়ে শিষ্যগণকে প্রত্যয় দেন, তিনি যুবরাজকে সম্পূর্ণ নিরাময় করতে পারবেন।

এ তো কোনো হাস্যকর আত্মপ্রত্যয় নয়। অভিজ্ঞতম প্রবীণ চিকিৎসকও বার বার মস্তকান্দোলন করে স্বীকার করেন, কত অগুণিত রোগী যমদূতের দক্ষিণহস্ত ধরে যখন পরপারে যাত্রার জন্য প্রথম পদক্ষেপ করেছে, রূঢ় সরল ভাষায় ঐ সব রোগীদের সম্বন্ধে যখন বহু পূর্বেই সর্ব বিশেষজ্ঞ একই বাক্যে আপন দৃঢ় নৈরাশ্য প্রকাশ করেছেন, ঠিক সেই সময় হঠাৎ অকারণে, চিকিৎসকের কোন প্রকারের সাহায্য না নিয়ে সেই জীবন্মৃত ব্যক্তি শ্মশান-সঙ্কট উত্তীর্ণ হয়ে ধীরে ধীরে পুনরায় লুপ্ত স্বাস্থ্য ফিরে পায়।

* *

সম্রাট এবং মহিষী উভয়েই নাকি সাধুর প্রথম দর্শন লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে মুগ্ধ হয়ে যান। বিশেষ করে রাজমহিষী।

অধ্যাপক বগ্‌দানফের মতে, অর্থাৎ তিনি যে জনরব সর্বাপেক্ষা নির্ভরশীল বলে গ্রহণ করেছিলেন সেই অনুযায়ী রাসপুতিন নাকি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মহারানীকে আশ্বাস দেন, যুবরাজ রোগমুক্ত হবেন, এবং তিনিই তাঁকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন। রাজমহিষী স্বয়ং তাঁকে নিয়ে রুগীর কক্ষের দিকে অগ্রসর হলেন। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ উচ্চকণ্ঠে, তারস্বরে প্রতিবাদ জানালেন। যে-ব্যক্তিকে সম্রাজ্ঞী নিয়ে যাচ্ছেন সে-ব্যক্তি যে চিকিৎসাশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং অনভিজ্ঞ, সে-কথা সে-ই একাধিকবার স্বীকার করেছে, এমতাবস্থায় যখন তাঁরা আশা করছেন যে, যে-কোন মনুষ্য বা ইতর প্রাণীর ন্যায় যুবরাজও প্রকৃতিদত্ত শক্তিবলে—যে শক্তি সর্বজনের অলক্ষিতে জীবদেহে বেঁচে থাকার জন্য সর্বব্যাধির বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম দ্বারা আপন কর্তব্য করে যায়—হয়তো নিরাময় হয়ে যেতে পারেন সেই সঙ্কটজনক অবস্থায় এই নবাগত হয়তো আপন অজ্ঞতাবশত সেই শক্তির প্রতিবন্ধক হয়ে তার কর্মক্ষমতা নষ্ট করে দিতে পারে।

তৎসত্ত্বেও মহারাণী রাসপুতিনকে রোগীর কক্ষে নিয়ে গেলেন।

চিকিৎসকরাও সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করলেন। রাসপুতিন বললেন, তিনি কোনো তৃতীয় ব্যক্তির সম্মুখে চিকিৎসা করবেন না। তৃতীয় বলতে সম্রাজ্ঞীকেও বোঝায়, তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে দৃঢ় পদক্ষেপে দেহলীপ্রান্ত উত্তীর্ণ হলেন।

অতি অল্পক্ষণ পরেই রাসপুতিন দোর খুলে রানীর দিকে সহাস্য ইঙ্গিত করলেন। রানীমা কক্ষে প্রবেশ করে স্তম্ভিত। যেন কত যুগ পরে তিনি দেখলেন রাসপুতিনের দেওয়া কি যেন একটা জিনিস হাতে নিয়ে যে কোনো সুস্থ বালকের মত যুবরাজ খেলা করছেন।

রাসপুতিন প্রকৃতই যুবরাজকে তাঁর রক্তমোক্ষণ রোগ থেকে নিরাময়

করেছিলেন কি না সে-বিষয়ে মতানৈক্য আছে—তবে এটাও স্মরণে আনা কর্তব্য বিবেচনা করি যে, এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে গবেষণা, পাণ্ডিত্য, সত্যানুসন্ধান বললেই বোঝাতো—অবিশ্বাস। এই মূলমন্ত্র ঐ সময়ে এমনই সুদূরপ্রসারী হয় যে, তৎকালীন লিখিত পুস্তক, এনসাইক্লোপীডিয়াতে একাধিক যশস্বী লেখক স্বয়ং বুদ্ধ, মহাবীর, এমন কি তাঁদের আপন খৃষ্টের অস্তিত্ব পর্যন্ত সন্দেহাতীতরূপে সপ্রমাণ না হওয়ায় (দু' হাজার, আড়াই হাজার বৎসরের পরের একতরফা বা 'একস্‌পার্টে' তদন্তে!) তাঁদের জীবনী এবং বাণীকে কাল্পনিক কিংবদন্তী আখ্যা দিয়েছেন, এবং কেউ কেউ তাঁদের অস্তিত্ব পর্যন্ত সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করেছেন। অতএব সে যুগের পুস্তক যে রাসপুতিনের মত চিকিৎসানভিজ্ঞজন যুবরাজকে রোগমুক্ত করেছেন সে কথা হয় অস্বীকার করে, কিংবা নীরব থাকে। তবে এ কথা সকলেই স্বীকার করেছেন, রাসপুতিনের প্রাসাদ গমনাগমনের পর থেকেই যুবরাজের স্বাস্থ্যোন্নতি দিনে দিনে সুস্পষ্টরূপে লক্ষিত হয়।

আর সে যুগের সম্রাজ্ঞীদের ভিতর ধনে-ঐশ্বর্যে খ্যাতি-প্রতিপত্তিতে নিঃসন্দেহে সর্বাগ্রগণ্যা না হলেও যাঁকে ইয়োরোপের রাজন্যবর্গ রাজপরিবার সর্বাপেক্ষা সম্ভ্রমের চক্ষে দেখতেন সেই জারিনা? তিনি তো কৃতজ্ঞতার প্রতিদানস্বরূপ রাসপুতিনের পদপ্রান্তে কী যে রাখবেন তার সন্ধানই পাচ্ছেন না, কারণ সাধারণজনের মত ভবন-যানবাহন রজতকাঞ্চনে তাঁর লোভ ছিল না—তাঁর আসক্তি কিসে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন—ওদিকে জারিনা আবার জাতমিষ্টিক, অলৌকিক ক্রিয়াকর্মে তিনি বিশ্বাস করেন এবং যাঁদের এসব মিরাকল দেখাবার শক্তি আছে বলে তিনি বিশ্বাস করেন তাঁদের কাছে তিনি তাঁর দেহ-মন-আত্মা সর্বস্ব নিয়ে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তুত।

জিতেন্দ্রিয় পরোপকারী সাধুসজ্জনদেরই না কত প্রকারের কুৎসা রটে—দু' হাজার বৎসর হয়ে গেল এখনো খৃষ্টবৈরীরা বলে, তিনি নাকি অসচ্চরিত্রা যুবতীদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন ও মদ্যপানে তাঁর আসক্তি ছিল ঈষৎ মাত্রাধিক—সে-স্থলে রাসপুতিন! যিনি কিনা, তাঁর কামানল নির্বাপিত করার চেষ্টা তো করেনই না, তদুপরি ঐ বিশেষ রিপুর চরিতার্থতাকে তুলে ধরেছেন সর্বোচ্চ ধর্মের পর্যায়ে এবং ফলে শিষ্যশিষ্যাগণসহ বহুবিধ অনাচারে লিপ্ত হন—এসব 'অর্জি' 'সেটারনেলিয়া'র উল্লেখ আমরা পূর্বেই করেছি—তাঁর পূর্ববর্তী মফস্বল-জীবনের তুলনায় রাজধানীতে তাঁর বর্তমান কেলেঙ্কারির বিবরণ তথা পল্লবিত জনরব চতুর্দিকে যে অধিকতর ছড়িয়ে পড়বে তাতে আর কী সন্দেহ! কিন্তু ক্রমে ক্রমে মোক্ষমতর মারাত্মক কলঙ্ককাহিনী রটতে আরম্ভ করলো চতুর্দিকে; এসব

দলবদ্ধভাবে কৃত দুষ্কর্মের 'অর্জি' এখন নাকি রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে– এবং সেখানে তো সব-কিছুই নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়—পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে! সম্ভ্রান্ততম ডিউক ডাচেস, অর্থাৎ সম্রাটের নিকটতম আত্মীয়-আত্মীয়ারাও নাকি এই সব অনাচারে অংশ নিচ্ছেন। এবং সর্বশেষে যে কলঙ্ককাহিনী পেত্রোগ্রাদে জন্মলাভ করে সর্ব রুশের সর্ব সমাজের উচ্চতম থেকে অধস্তন শ্রেণী পর্যন্ত প্রচারিত হয়ে আপামর জনসাধারণকে দিল রূঢ়তম পদাঘাত সেটি আর কিছু নয়, স্বয়ং জারিনা তাঁর দেহ সমর্পণ করেছেন রাসপুতিনকে। অন্যান্য সম্ভ্রান্ত মহিলাদের তো কথাই নেই।

গ্র্যাণ্ড ডিউক ইউসপফের দু'টি মোকদ্দমাই ছিল এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে। এই সব কলঙ্ককাহিনীর সঙ্গে তাঁর স্ত্রীকে জড়িয়ে প্রথমে ফিল্ম তৈরি করা হয়েছে, পরে টেলিভিশনে দেখানো হয়েছে, অথচ তাঁর মতে, তাঁর সতীসাধ্বী স্ত্রী পূর্বোল্লিখিত পাপানুষ্ঠানের সঙ্গে মো.টই বিজড়িত ছিলেন না। সে কথা পরে হবে।

আমি এতক্ষণ আপ্রাণ চেষ্টা দিয়ে রুশ রাজনীতি এড়িয়ে গিয়েছি কিন্তু এখন থেকে আর সেটা সম্ভবপর হবে না, কারণ, এই সময়েই কূটরাজনৈতিক ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হলধর-সন্তান রাসপুতিন হিস্তে নিতে আরম্ভ করেছেন দেশ-বিদেশের গুরুত্বপূর্ণ কঠিন কঠিন সংকটসমস্যায়। ইতিমধ্যে যে সব সরল ধর্মযাজকগণ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তাঁরা ধীরে ধীরে বিশ্বস্ততম সূত্রে তাঁর 'কীর্তিকলাপে'র সম্পূর্ণ বিবরণ অবগত হয়ে তাঁর সঙ্গে সর্ব সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেছেন। কিন্তু স্বয়ং জারিনা এবং রাশার 'পোপ' হোলি সিনড যতক্ষণ তাঁর সম্মোহন-ক্ষমতায় অর্ধচেতন ততক্ষণ তাঁকে তো মুহূর্তেক তরে দুশ্চিন্তা করতে হবে না। পাঠক, স্মরণ করুন সেই সুপ্রাচীন আরবী প্রবাদ: 'কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে, কিন্তু কাফেলা (ক্যারাভান) চলে এগিয়ে!' রাসপুতিন এই কুকুরগুলোর ঘেউ ঘেউকে থোড়াই পরোয়া করেন।

কিন্তু রাসপুতিন কি করে এরকম নির্বিকারচিত্তে উপেক্ষা করলেন রুশ দেশের জনগণের রাজনৈতিক নবজাগরণকে! জার দ্বিতীয় নিকলাস যত না রক্ষণশীল, সম্রাটের সার্বভৌমিকত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, তাঁর চেয়ে শতগুণ স্থবির জড়ভরত ছিলেন তাঁর আমির-ওমরাহ। ওদিকে রুশ-সিংহ যখন সদম্ভে মূষিক জাপানের সঙ্গে সংগ্রাম করতে গিয়ে তার কাছে অপ্রত্যাশিতভাবে নির্মমরূপে পরাজিত হল, তখন আর 'হোলি' রাশার অন্তঃসারশূন্যতা গোপন রাখা সম্ভব হল না। জনমত নির্ভয়কণ্ঠে জারের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে স্বায়ত্তশাসন দাবি করলো। ১৯০৪-

খৃষ্টাব্দে যে বৎসর রাসপুতিন সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন, ঠিক সেই বৎসরেই জার প্রথম 'বিধানসভা' (এরই নাম পূর্বোল্লিখিত 'ডুমা') নির্মাণের অনুমতি দিলেন। সে এক সত্যকার সার্কাস—নইলে তার কোন সম্মানিত সদস্য সেখানে অস্ত্রোপচার দ্বারা ইহুদিকুলকে শিখণ্ডীরূপে পরিণত করবার প্রস্তাব গুরুত্বপূর্ণ গাম্ভীর্যমণ্ডিত পদ্ধতিতে পেশ করতে পারেন ?

কিন্তু 'ডুমা' প্রতিষ্ঠান বন্ধ্যা হয়ে রইল কি না রইল সে তত্ত্ব রাসপুতিন-জীবনকে স্পর্শ করতে পারে নি যতদিন না রাজপ্রাসাদচক্রের দু-একজন ধুরন্ধর অতিশয় রক্ষণশীল রাজনৈতিক মনস্থির করলেন যে, রাসপুতিনকে দিয়ে তাঁরা এমন সব রাজকর্মচারী নিযুক্ত করিয়ে নেবেন, যারা ডুমার প্রতি পদক্ষেপের পথে লৌহপ্রাচীরবৎ দণ্ডায়মান হয়ে থাকবে। কূটনীতিতে আনাড়ি রাসপুতিনের হাত দিয়ে তামাক খাওয়াটা কিছুমাত্র দুঃসাধ্য হল না, কিন্তু এসব অপদার্থ নিয়োগের পশ্চাতে কে, সে তথ্যটিও গোপন রইল না। বস্তুত স্বয়ং রাসপুতিন প্রত্যেক পার্টিতে জালা জালা মদ আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সুমিষ্ট কেকৃখণ্ড (তাঁর জন্য বিশেষ করে কেকে তিন ডবল চিনি দেওয়া হত—এ বাবদে হিটলারের সঙ্গে তাঁর সম্পূর্ণ মিল) চাষাড়ে পদ্ধতিতে প্রচুর শব্দ আর বিরাট আস্তব্যাদানসহ চিবুতে চিবুতে দম্ভ করতেন, 'এই যে দেখছো স্কার্ফখানা, এটি আপন হাতে বুনেছেন স্বয়ং জারিনা, (কিংবা হয়তো তাঁর আদরের ডাকনাম সোহাগভরে উল্লেখ করতেন—আমার যেন মনে পড়ছে, তাই ', কিংবা 'জানো হে, ভরনাভাকে পাঠালুম তবল্‌স্কের বিশপ করে।' প্রভু রাসপুতিনের অন্ধভক্ত, অত্যধিক মদ্যপানবশত অর্ধমত্ত শিষ্যেরাও নাকি দ্বিতীয় সংবাদটি শুনে অচৈতন্য হবার উপক্রম! কারণ প্রভুর নিত্যসঙ্গী ঐ ভরনাভা যে একেবারে আকাট নিরক্ষর! সে হবে বিশপ!

মরীয়া হয়ে অন্যতম প্রধান পাদ্রী নিযুক্ত করলেন গুপ্তঘাতক। রাসপুতিন শুধু যে অনায়াসে সংকট অতিক্রম করলেন তাই নয়, এ 'সুবাদে' রাজপ্রাসাদে তাঁর প্রভাব এমনই নিরঙ্কুশ হয়ে গেল যে, স্বয়ং জার পর্যন্ত আর এখন উচ্চবাচ্য করেন না। অবশ্য সমস্ত ইয়োরোপই বিলক্ষণ অবগত ছিল যে, জার অতিশয় দুর্বল চরিত্রের 'যাকৃগে, যেতে দাও না'—ধরনের নির্বীর্য 'শাসক'। কার্যত তাঁকে শাসন করেন জারিনা। এবং তাঁর সম্মুখে রাসপুতিনের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করার মত সাহস তখন কারো ছিল না।

রাসপুতিনকে হত্যা করার চেষ্টা নিষ্ফল হওয়ার পরই তিনি জারিনাকে সর্বজনসমক্ষে গম্ভীর প্যাকস্বরীকণ্ঠে ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেন (বা শাসান), 'আমার মৃত্যুর এক বৎসরের মধ্যে গোষ্ঠীসুদ্ধ রমানফ পরিবার (অর্থাৎ সপরিবারে

তখনকার জার) নিহত হবে।' নিহত তাঁরা হয়েছিলেন, এবং অতিশয় নিষ্ঠুর পদ্ধতিতেই, কিন্তু সেটা ঠিক এক বৎসরের ভিতরই কিনা, বলতে পারবো না, দু' বৎসরও হতে পারে।

কিন্তু জারিনা? তাঁর শোচনীয় অবস্থা তখন দেখে কে? কুসংস্কারাচ্ছন্ন অতিপ্রাকৃতে অন্ধবিশ্বাসী এই মূঢ় রমণীর যত দোষই থাক, একটা কথা অতিশয় সত্য, তিনি তাঁর পুত্রকন্যাকে বুকে চেপে ধরে রেখেছিলেন পাগলিনী-পারা। উদয়াস্ত তাঁর আর্ত সশঙ্ক দৃষ্টি, না জানি কোন্ অজানা অন্ধকার অন্তরাল থেকে কোন্ অজানা এক নূতন সংকট অকস্মাৎ এসে উপস্থিত হবে, তাঁর কোনো একটি বৎসকে ছিনিয়ে নেবার জন্য।

অতএব প্রাণপণ প্রহরা দাও রাসপুতিনের চতুর্দিকে। তিনিই একমাত্র মুশ্‌কিল্-আসান্। এই 'হোলিম্যান' আততায়ীর হস্তে নিহত হলে সর্বলোকে সর্বনাশ!

কিন্তু বিশ্বসংসারের সকলেই রাসপুতিনের সাবধানবাণী বা শাসানোতে বিশ্বাস করেন নি এবং ভয়ও পান নি। বিশেষ করে রাজপ্রাসাদের সর্বোচ্চস্তরের রাজরক্তধারী একাধিক ব্যক্তি। এঁরা ক্রমাগত জার-জারিনাকে রাসপুতিন সম্বন্ধে সাবধান হতে বলেছেন, এবং ফলে তাঁদের প্রতি বর্ষিত অপমানসূচক কটুবাক্য মাত্রায় বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রতিদিন। রাজপ্রাসাদে এঁরা হচ্ছেন অপমানিত—অথচ রাসপুতিনের 'শুভাগমনে'র পূর্বে এঁরাই ছিলেন সেখানে প্রধান মন্ত্রণাদাতা। এখন তাঁদের এমনই অবস্থা যে, বাইরের সমাজে তাঁরা আর মুখ দেখাতে পারেন না। তাঁদের পদমর্যাদা, অভিজাত রক্ত প্রকাশ্য ব্যঙ্গবিদ্রূপ থেকে তাঁদের বাঁচিয়ে রেখেছে সত্য, কিন্তু ভিতরে বাইরে, স্ফুট-অস্ফুট নিত্যদিনের এ অপমান আর কাঁহাতক সহ্য করা যায়! ওদিকে 'হোলি রাশা' যে কোন্ জাহান্নমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন কে জানে!

অপমানিত সর্বোচ্চ অভিজাতবংশজাত তিনজন বসলেন মন্ত্রণাসভায়।

স্থির হল, ইউসুপফই হত্যা করবেন রাসপুতিনকে। তাই আজও লোকে বলে, 'তোমার স্ত্রীকে রাসপুতিন ধর্ষণ করেছিল বলেই তো তুমি প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলে, নইলে রাশাতে কি আর অন্য লোক ছিল না?' ইউসুপফ এটা অস্বীকার করেন। আবার কেউ কেউ বলেন, প্রধানদের আদেশানুযায়ীই তিনি ঐ কর্মে লিপ্ত হন, আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় নিজকে ভলন্টিয়ার করেন যদিও তাঁর স্ত্রী ধর্ষিতা হন নি। এ সম্বন্ধে ইউসুপফের আপন জবানী পাঠক বিশ্বাস করতে পারেন, নাও করতে পারেন; আমি শুধু বগ্‌দানফ

সাহেবের জবানীটি পেশ করছি। না হয় সেটা ভ্রান্তই হল, তাতেই বা কি? তদুপরি আমার স্মৃতিশক্তি আমার কলম নিয়ে কি যে খেলা খেলছে, জানবো কি করে?

এবং আশ্চর্য! হত্যা করবেন আপন বাড়িতেই তাঁকে সসম্মান নিমন্ত্রণ করে! পুলিসকে ভয় করতেন এঁরা থোড়াই। কিন্তু জারিনা? তিনি যে শেষ পর্যন্ত হত্যাকারী কে, সে খবরটা প্রায় নিশ্চয়ই জেনে যাবেন, এবং তার ফলাফল কি হতে পারে, না পারে, সে নিয়েও বিস্তর আলোচনা হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল এ ছাড়া গত্যন্তর নেই —নান্য পন্থা বিদ্যতে।

ইউসুপফ পক্ষ যে রাসপুতিনের শত্রু তিনি এটা জেনেশুনেও ইউসুপফের বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে এলেন কেন? কেউ বলে, ইউসুপফের সুন্দরী স্ত্রী ইরেনে তাঁকে 'বিশেষ' প্রলোভন দেখিয়ে ফাঁদে ফেলেন, কেউ বলে, রাসপুতিন সত্যই আশা করেছিলেন, মুখোমুখি আলাপ-আলোচনার ফলে হয়তো প্রাসাদের এই শত্রুপক্ষের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপিত হতে পারে, কেউ বলে, রাসপুতিন প্রাসাদ জয় করেছিলেন বটে কিন্তু ইউসুপফের মত অভিজাতবংশের কেউ কখনো তাঁকে নিমন্ত্রণ করা দূরে থাক, বাড়িতে পর্যন্ত ঢুকতে দিতেন না। ইউসুপফ জয় অর্থই পেত্রোগ্রাদ-অভিজাতকুল জয়। তার অর্থ, নূতন শিষ্যা, নূতন ··একটা সম্পূর্ণ নূতন ভাণ্ডার!

প্রায় সবাই বলেছেন, মদে দেওয়া হয়েছিল প্রচুর পটাসিয়াম সায়েনাইড, কিন্তু অধ্যাপক বলেছিলেন, মধুভরা বিরাট কেকের সঙ্গে মিশিয়ে। আমার মনে হয় দ্বিতীয় পন্থাতেই আততায়ীর ধরা পড়ার সম্ভাবনা কম। মহামান্য অতিথি রাসপুতিনকে অবশ্যই দিতে হত বংশানুক্রমে সযত্নে রক্ষিত অত্যুৎকৃষ্ট খানদানী মদ্য; এবং ভদ্রতা রক্ষার জন্য অতিথি-সেবককেও নিতে হত সেই বোতল থেকেই। এইটেই সাধারণ রীতি। কিন্তু পার্টিতে সবাই তো আর কেক খায় না—তাও আবার তিন-ডবল মধুভর্তি স্পেশাল 'রাসপুতিন কেক্'—তদুপরি, বিরাট কেকের দু-আধা দুই পদ্ধতিতে নির্মাণ করে জোড়া দেওয়া অতি সহজ।

তা সে কেক্ই হোক্ আর খানদানী মদই হোক্—রাসপুতিন তাঁর বীভৎস অভ্যাসমত সে-বস্তু খেয়ে গেলেন প্রচুরতম পরিমাণে, এবং তাজ্জব কী বাৎ! তাঁর কিছুই হল না। চোখের পাতাটি পর্যন্ত নড়লো না। আমার সুস্পষ্ট মনে আছে এস্থলে অধ্যাপকও আপন বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'মাই বয়! দেয়ার উয়োজ ইনাফ পয়জন টু নক্ অফ্ সিক্স্ বুল্জ।' অর্থাৎ ঐ বিষে ছ'টা আস্ত বলদ ঘায়েল হয়! কিন্তু রাসপুতিন নির্বিকার! ইউসুপফরা

জানতেন না, রাসপুতিনকে ইতিপূর্বে একাধিকবার বিষপ্রয়োগে হত্যা করার চেষ্টা নিষ্ফল হয়। ম্যাজিশিয়ানরা যে রকম ব্লেড খায়, রাসপুতিন ঠিক সেই রকম হরেক জাতের বিষ খেতে তো পারতেনই, হজমও করতেন অক্লেশে।

ষড়যন্ত্রকারীরা পড়লেন মহা ধন্দে। তাঁদের সব প্ল্যান ভণ্ডুল।

তখন ইউসুপফ অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীদের ফিস ফিস করে বললেন, 'এ রকম সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। আমি ওকে গুলি করে মারবো।'

পিছন থেকে ঠিক ঘাড়ের উপর, অর্থাৎ সবচেয়ে মারাত্মক জায়গায়, এক্কেবারে কাছে এসে ইউসুপফ গুলি ছুঁড়লেন। রাসপুতিন রক্তাক্ত দেহে অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়লেন।

সে তো হল। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীরা এখন সম্মুখীন হলেন এক সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত নূতন সমস্যার। জখমহীন মৃতদেহ যত সহজে হস্তান্তর করা যায়, রক্তাক্ত দেহ নিয়ে কর্মটা তো অত সহজ নয়। এখন কি করা কর্তব্য সেটা স্থির করার জন্য দলের আর যাঁরা সন্দেহ না জাগাবার জন্য পার্টিতে যোগ না দিয়ে উপরের তলায় অপেক্ষা করছিলেন তাঁদের সঙ্গে ইউসুপফাদি যোগ দিলেন। তার পূর্বে তিনি লাশটা টেনে টেনে সেলারে (মাটির নিচে কয়লা এবং আর-পাঁচটা বাজে জিনিস রাখার গুদোম) রেখে এলেন। পাছে হঠাৎ কেউ ডাইনিংরুমে ঢুকে লাশটা আবিষ্কার করে ফেলে।

, স্থির হল, রাসপুতিনের লাশ ইউসুপফের বাড়ির কাছে নেভা নদীতে ডুবিয়ে দেওয়া হবে। সেটা ডিসেম্বর মাস।[৫] নেভার উপরকার জল জমে বরফ হয়ে গিয়েছে। সেইটে ভেঙে লাশ ভিতরে ঢুকিয়ে গায়েব করে দেওয়া কঠিন কর্ম নয়।

এইবার সবাই হলেন—যাকে বলে বজ্রাহত! এবং ভুলবেন না, এঁদের অধিকাংশই ফৌজের আপিসার। এঁদের কাউকে হকৃচকাতে হলে রীতিমত কষ্ট করতে হয়, আর মৃত্যুভয়? ছোঃ![৬]

৫ রাসপুতিনের মৃত্যুদিবস ১৫।১৬ ডিসেম্বর ১৯১৬ বলা হয়, আবার ৩০ ডিসেম্বরও বলা হয়। তার কারণ অর্থডক্স রুশ ক্যালেণ্ডার ও কন্টিনেন্টের প্রাচীন ক্যালেণ্ডারে ১৩।১৪ দিনের পার্থক্য।

৬ অধ্যাপক আমাকে গল্পচ্ছলে একদা বলেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে রাশান অফিসারদের সবচেয়ে প্রিয় খেলা (প্যাস্টাইম) ছিল প্রচুর মদ্যপানের পর লটারিযোগে দুজন অফিসারের নাম স্থির করা। তারপর একজন একটা ঘরে

তা নয়! সবাই সেলারে ঢুকে দেখেন, রাসপুতিনের লাশ উধাও! ঘাড়ের সবচেয়ে মারাত্মক জায়গায় গুলি খেয়ে যে-লোকটা পড়ে গিয়ে 'মরলো', সে যে শুধু আবার বেঁচে উঠলো তাই নয়, আপন পায়ে হেঁটে বাড়ি ছেড়ে উধাও হয়ে গেল।

অবশ্য এ-কথা ঠিক, ইউসুপফ সেলারের দরজা বাইরের থেকে তালাবন্ধ করেন নি, এবং খামোকা বেশী লোক যাতে না জানতে পারে তাই সে রাত্রে অধিকাংশ চাকর-বাকরকে ছুটি দিয়ে রেখেছিলেন।

রাসপুতিন যদি এখন কোনো গতিকে জারিনার কাছে পৌছে সব বর্ণনা দেন—এবং নিশ্চয়ই তিনি করবেন তবে ইউসুপফের অবস্থাটা হবে কি?

কিন্তু তিনি অতশত ভাবেন নি—অন্যান্যদের জবানী তাই। তাঁরা বলেন, তিনি পাগলের মত পিস্তল হাতে নির্জন রাস্তায় ছুটতে ছুটতে হঠাৎ দেখেন, চতুর্দিকের সেই শুভ্র শুভ্রতাময় বরফের ভিতর দিয়ে টলতে টলতে রাসপুতিন এগিয়ে যাচ্ছেন। রক্তক্ষরণও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এবারে ইউসুপফ আর কোনো চান্‌স্ নিলেন না। পিস্তলে যে কটা গুলি ছিল সব কটা ছুঁড়লেন তাঁর ঘাড়ের উপর। তারপর সবাই মিলে তাঁকে টেনে নিয়ে, নেভা নদীর উপরকার জমে-যাওয়া বরফ ভেঙে লাশটা ঢুকিয়ে ঠেলে দিলেন ভাটির দিকে।

কিন্তু জারিনা সে-দেহ উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। চার্চেরই মত একটি বিশেষ উপাসনাগারসহ নির্মিত চেপলে তাঁর দেহ সযত্নে গোর দেওয়া হল একটি রমণীয় পার্কের ভিতর। মহারাণী প্রতি রাত্রে যেতেন সেই গোরের পাশে, নীরবে অঝোরে অশ্রুবর্ষণ করার জন্য, রাসপুতিনের আত্মার সদ্‌গতি কামনা করে॥

২২।১।৬৬॥

ঢুকে সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয় স্থান বেছে নিয়ে ঘরের সব আলো নিবিয়ে দেবে; সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকবে অন্য অফিসার, হাতে সবচেয়ে ছোট সাইজের পিস্তল নিয়ে। প্রথম অফিসার আশ্রয়স্থল থেকে কোকিলের মত ডাক ছাড়বে, "কু"; অন্যজন সঙ্গে সঙ্গে সেই অন্ধকারে শুদ্ধমাত্র ধ্বনির উপর নির্ভর করে পিস্তল মারবে। তখন সেই অন্ধকারে 'শিকার' জায়গা বদলাবে, কিন্তু "কু" ডাক না ছাড়া পর্যন্ত পিস্তল মারা বারণ। কতক্ষণ পরে দু'জনের পার্ট বদলায়, আমার মনে নেই।

বিষ্ণুশর্মা

মিশরের পসারী—গন্ধবণিক—যে রকম ভারতের শঙ্খচূর্ণ[১] এবং অগুরু আতর বিক্রি করে, ঠিক তেমনি কাইরোর পুস্তক-বিক্রেতা বিষ্ণুশর্মার 'পঞ্চতন্ত্র' ও 'বুদ্ধজীবনী' বিক্রি করে। কিন্তু সে 'বুদ্ধজীবনী' কে লিখেছেন, কেউ জানে না।

অবশ্য পঞ্চতন্ত্র সেখানে অন্য নামে পরিচিত। আরবীতে বলে 'কলীলা ওয়া[২] দিম্‌না'। এ দুটি—কলীলা ও দিম্‌না—দুই শৃগালের নাম। সংস্কৃতে করটক ও দমনক। কোনো কোনো পণ্ডিত বলেন, গোড়াতে পঞ্চতন্ত্রের ঐ নামই ছিল। পরবর্তী যুগে ওটিকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করে পঞ্চতন্ত্র নাম দেওয়া হয়। পাঁচ সংখ্যায় কেমন যেন একটা ম্যাজিক আছে কিংবা চোখের সামনে আপন হাতের পাঁচটা আঙুল যেন কোনো ইতস্তত প্রক্ষিপ্ত তথ্য, গল্প, প্রবাদ-সমষ্টিকে পাঁচের কোটায় ফেলতে চায়। বাইবেলের 'প্রাচীন নিয়মে' (ওল্‌ড টেস্টামেন্ট) হয়তো এই কারণই 'পেন্টাটয়েশ'='পঞ্চগ্রন্থ' আছে। এদানিং আমরা পাঁচ-শালার পরিকল্পনা করি।

তা সে যাই হোক, আমাদের এই তৃতীয়/দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত পঞ্চতন্ত্র ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাচীন ইরানে পেহ্‌লেভি (সংস্কৃতে পহ্‌লভী) ভাষাতে অনূদিত হয়। তার একটা বাইরের কারণও ছিল। প্রাচীন ইরানের সঙ্গে প্রাচীন গ্রীস রোমের সম্পর্ক বহুকালের। কখনো যুদ্ধের মারফতে, কখনো শান্তির। শান্তির সময় উভয়ে একে অন্যের উপর সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু দ্বিতীয়/তৃতীয় শতাব্দীতে ইরানীরা গ্রীসের উপর বিরক্ত হয়ে (ফেড্‌ অপ্‌) পূবের দিকে মুখ

১ এই শঙ্খচূর্ণ নিয়ে কয়েক বৎসর পূর্বে এদেশে একটা 'কেলেঙ্কারি' হয়ে যায়। যেসব শাঁখারী পূর্ব বাঙলা থেকে এসে পশ্চিম বাঙলায় আশ্রয় নিয়েছে তাদের দরকার শঙ্খের। শঙ্খ প্রধানত বিক্রি হয় মাদ্রাজ অঞ্চলে এবং তার অন্যান্য খরিদ্দার আরব দেশ, মিশর ইত্যাদি। তারা শাঁখ গুঁড়ো করে ওষুধ বানায়। আমাদের গরীব শাঁখারীরা যে দাম দিতে প্রস্তুত ছিল (সোজাসুজি, না পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মারফৎ, আমার ঠিক মনে নেই) আরবরা তার কিঞ্চিৎ বেশী দাম দিতে রাজী ছিল বলে মাদ্রাজ তাবৎ শঙ্খ বিক্রি করে দেয় ওদের। ফলে বহু শাঁখারী বেকার হয়ে যায়।

২ কোনো কোনো পণ্ডিতের ধারণা আরবীর এই 'ওয়া'='অ্যাণ্ড'=এবং থেকে বাঙলা 'ও' এসেছে।

ফেরালে। ফলে ষষ্ঠ শতাব্দীতে পঞ্চতন্ত্র রাজা খুসরৌ অনুশিরওয়ানের[৩] আমলে পহ্লভীতে এবং অল্পকালের ভিতরই পহ্লভী থেকে সিরিয়াকে অনূদিত হল।

এই প্রথম—সর্বপ্রথম কিনা বলা কঠিন—একখানা আর্য ভাষায় লিখিত পুস্তক আর্যেতর ভাষায় অনূদিত হল,[৪] কারণ সিরিয়াক ভাষা হীব্রু, আরামায়িক ও আরবীর মত সেমিতি ভাষা। ইরাক সিরিয়া অঞ্চলে প্রচলিত এই সিরিয়াক ভাষা ও সাহিত্য (৩য় থেকে ১৪ শতাব্দী পর্যন্ত এর আয়ু) বরাবরই ইরানের সঙ্গে লেনদেন রাখতো বলে পহ্লভীতে কোনো উত্তম গ্রন্থ অনূদিত হলে সেটি সিরিয়াকেও অনূদিত হত। (পঞ্চতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে আরেকখানি ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ বা গ্রন্থাংশ পহ্লভী হয়ে সিরিয়াকে অনূদিত হয়, এর পরবর্তী যুগে মধ্যপ্রাচ্য ও ইয়োরোপে পঞ্চতন্ত্রের চেয়ে ঢের বেশী সম্মান পায়—তার কথা পরে হবে।)

বিষ্ণুশর্মা রচিত পঞ্চতন্ত্রের কপাল ভালো। পহ্লভীতে যিনি এ পুস্তক অনুবাদ করেন তিনি ছিলেন রাজ-বৈদ্য, অতএব সুপণ্ডিত। সিরিয়াকে যিনি তস্যানুবাদ করেন তিনিও জ্ঞানীজন, কারণ এ গ্রন্থ অনুবাদ করার পূর্বেই তিনি কিয়ৎপরিমাণ গ্রীক দর্শনও কৃতিত্বসহ সিরিয়াকে অনুবাদ করেছিলেন।

পহ্লভী অনুবাদটি লোপ পেয়েছে, কিন্তু ষষ্ঠ শতাব্দীতে অনূদিত সিরিয়াক অনুবাদটি ("কলিলগ্ ও দমনগ্") এখনো পাওয়া যায়।

এর প্রায় দু'শ বৎসর পর—মোটামুটি হজরৎ মুহম্মদের জন্মের দেড় শ' বৎসর পর—জনৈক আরব আলঙ্কারিক পঞ্চতন্ত্র আরবীতে অনুবাদ করেন। আরবী সাহিত্যের তখন কৈশোরকাল। এই পুস্তক অনুবাদ করার সময় অনুবাদক আব্দুল্লা ইব্‌ন্ অল্-মুকাফ্ফার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তরুণ আরব সাহিত্যিকদের

৩ এই খুসরৌর আমলেই চতুরঙ্গ খেলা ভারত থেকে ইরানে যায়।

৪ তার অর্থ অবশ্য এ নয় যে, এই সর্বপ্রথম সেমিতি জগতে ভারতীয় সাহিত্য পরিচিত হল। বস্তুত এর অনেক পূর্বেই জাতকের বহু গল্প কাফেলা [ক্যারাভান] ও চট্টির কথকদের [স্টরি-টেলার] মারফতে গ্রীস রোম পর্যন্ত চলে গিয়েছে। বৌদ্ধ শ্রমণরা খৃষ্টজন্মের পূর্বেই মধ্যপ্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। তারও পূর্বে লোহিত সমুদ্রের কূল ধরে ধরে মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে; এমন কি প্রাচীনতম মোনজোদড়োর সঙ্গে ইরাকের সম্পর্ক ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু উপস্থিত এগুলো আমাদের আলোচনার বাইরে। এবং বৌদ্ধধর্ম চীনে প্রবেশ করলে যে সব গ্রন্থ অনূদিত হয় সেও এ আলোচনার বাইরে।

শলী বৌ স্টাইল শেখানো—বিশেষ করে যারা 'ব্যাল-ল্যাৎর্' বা রম্যরচনায় হাত পাকাতে চান।[৫] পহ্লভী সিরিয়াক হয়ে আরবীতে পৌঁছতে গিয়ে বিষ্ণুশর্মা নামটি কিন্তু এমনই রূপান্তরিত হয়ে যায় যে আরবরা ভাবে, ইনি বিদ্যাপতি, এবং সেই অনুসারে তাঁর নাম লেখা হয় বীদ্বা বীদপা বীদপাই (আরবীতে 'প' অক্ষর নেই, কিন্তু মাঝে মাঝে কাছাকাছি অন্য দুই অক্ষর দিয়ে 'প' ও 'চ' বোঝাবার চেষ্টা করা হয়)। আরবী অনুবাদ হয় অষ্টম শতাব্দীতে এবং তার হীব্রূ অনুবাদ দ্বাদশ শতকে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জনৈক ক্যাথলিক কার্ডিনালের জন্য এটি লাতিনে 'ডিরেক্টরিয়ুম ভিটেয় হুমান্তে' (অর্থাৎ মোটামুটি 'মানব-জীবনের জন্য হিতোপদেশ'—'পঞ্চতন্ত্র' ও 'হিতোপদেশ' যে সংশ্লিষ্ট সে কথা মধ্যপ্রাচ্যে জানা ছিল) নাম নিয়ে ইয়োরোপে প্রচারিত হয়, এবং এই অনুবাদের উপর নির্ভর করে পরবর্তী কালে ইয়োরোপের প্রায় তাবৎ অর্বাচীন ভাষাতে 'বীদপাই-এর নীতিগল্প' বা 'কলীলা ও দিম্না' রূপে অনূদিত হয়ে প্রখ্যাতি লাভ করে।

'জাতক', 'পঞ্চতন্ত্র' 'হিতোপদেশে'র বিজয়-যাত্রা সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করছেন স্বর্গত ঈশান ঘোষ। তাঁর অতুলনীয় জাতক অনুবাদের ভূমিকায় তিনি লেখেন, 'পঞ্চতন্ত্রের কথাগুলি পৃথকভাবে কথিত নহে। এক একটি তন্ত্রে এক একটি কথাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া তাহার আশেপাশে অন্য বহু কথা সংযোজিত হইয়াছে। উত্তরকালে অস্মদ্দেশে বেতাল পঞ্চবিংশতি ও হিতোপদেশ প্রভৃতি আরবে নৈশোপাখ্যানমালা এবং য়ুরোপে Decameron, Pentameron, Heptameron, Canterbury Tales প্রভৃতি গ্রন্থের রচনাতেই এই পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে। পঞ্চতন্ত্রের কথাগুলি উক্তরূপে এক সূত্রে নিবদ্ধ না থাকিলে বোধ হয় দেশদেশান্তরে ভ্রমণের সময় ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইত।' এ অনুচ্ছেদ ঈশান

৫ অধীন এই উদ্দেশ্য নিয়েই বছর যোল পূর্বে 'পঞ্চতন্ত্র' সিরিজ 'দেশ' পত্রিকায় আরম্ভ করে। নইলে বিষ্ণুশর্মার অনুকরণ করার মত দম্ভ আমার কখনো ছিল না। এর অল্প পরেই Indian Council for Cultural Relations-এর সঙ্গে সংযুক্ত থাকাকালীন মরহুম মৌলানা আজাদের নেতৃত্বে আমরা একখানা আরবী ত্রৈমাসিক ('সকাফৎ-উল-হিন্দ,' 'ভারতীয় সংস্কৃতি') প্রকাশ করি ও ঐ সময় মিশরাদি একাধিক দেশ থেকে অনুরোধ আসে যে, যেহেতু অদ্যকার 'কলীলা ওয়া দিমনা' ও 'পঞ্চতন্ত্রে' প্রচুর তফাৎ, অতএব আমরা যেন একখানি নূতন অনুবাদ প্রকাশ করি। আমরা সে কাজ সানন্দে প্রাগুক্ত পত্রিকায় আরম্ভ করি।

ঘোষ শেষ করেছেন, এই বলে—'হিন্দুই হউন, বৌদ্ধই হউন, পঞ্চতন্ত্রকার অতি শুভক্ষণে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। লোকমুখে বা গ্রন্থাকারে তাঁহার কথাগুলি সভ্য অসভ্য সর্ব দেশে যেরূপভাবে পরিজ্ঞাত হইয়াছে, পৃথিবীতে অন্য কোনো পুস্তকের ভাগ্যে সেরূপ ঘটে নাই।'[৬]

অজহর বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চলে যে পুস্তক-বিক্রেতা আমাকে 'কলীলা ওয়া দিম্না' বিক্রি করে, সে ইঙ্গিত দেয়, আরেকখানি ভারতীয় পুস্তক কপ্ট খৃষ্টানরা (এঁরা নিজেদের ফারাওয়ের বংশধর বলে দাবি করেন) কিছুদিন পূর্বে আরবীতে পুনঃপ্রকাশ করেছেন।

তখন কপ্ট বন্ধুদের কাছে অনুসন্ধান করে জানতে পারি, এর আরবী নাম 'সুৎরহ বার্লাম ওয়া য়ুআসফ'। এ পুস্তকের প্রধান নায়ক দু'জন খৃষ্টধর্মে সেণ্টরূপে স্বীকৃত হয়েছেন—ক্যাথলিক উভয়কে স্মরণ করেন ২৭ নভেম্বর ও য়ুআসফকে গ্রীক চার্চ স্মরণ করেন ২৬ অগস্ট (সেণ্টস্ ডে)।

তখন অনুসন্ধান করে দেখি, 'য়ুআসফ' নাম এসেছে 'বোধিসত্ত্ব' থেকে ও 'বার্লাম' এসেছে 'বুদ্ধ ভগবান'-এর 'ভগবান্' থেকে!

এ পুস্তকের কাহিনী পঞ্চতন্ত্রের চেয়েও বিস্ময়জনক ॥

২।৪।৬৬

---

৬ ঈশান ঘোষের বাঙলা জাতক কী জর্মন, কী ইংরিজি, কী হিন্দী সব জাতকানুবাদের চেয়ে শত গুণে শ্রেষ্ঠ। অসাধারণ পরিশ্রম ও অতুলনীয় পাণ্ডিত্যের সঙ্গে ঈশান এই অনুবাদ সম্পন্ন করে বঙ্গবাসীকে চিরঋণে আবদ্ধ করে গেছেন। এ অনুবাদ প্রকাশিত হলে পর পালিপাণ্ডিত্যে আরেক ধনুর্ধর বিশ্বভারতীর অধ্যক্ষ বিধুশেখর শাস্ত্রী এর সমালোচনা করেন। পরম লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় ঈশানের অনুবাদ বহু বৎসর পূর্বে নিঃশেষ হওয়া সত্ত্বেও এর পুনর্মুদ্রণ হয় নি। শুনতে পাই, সাহিত্য আকাদেমি স্বর্গত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙলা কোষ পুনর্মুদ্রণ করেছেন। তাঁরা যদি (বিধুশেখরের আলোচনা সহ) এই গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণে সহায়তা করেন তবে গৌড়জন তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

বার্লাম ও য়োসাফট্

ইয়োরোপীয় ও মধ্যপ্রাচ্যের চার-পাঁচটি ভাষা নিয়ে প্রায় ষাটটি ভাষায় অনূদিত 'বার্লাম ও য়োসাফট্' ইয়োরোপে ষষ্ঠ শতাব্দীর গোড়া থেকে খৃষ্টান মঠে তথা সাধুসন্ত ও পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে সমাদৃত হয়ে ক্রমে ক্রমে অসাধারণ জনপ্রিয় হয়ে দাঁড়ায়। তার প্রধান কারণ, অতি সুমধুর সরল গল্পচ্ছলে এই পুস্তকে বর্ণিত খৃষ্টধর্মের মাহাত্ম্য ও প্রাধান্য ইতিপূর্বে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের কোনো ভাষাতেই রচিত হয় নি—এমন কি, খৃষ্টধর্মের প্রাচীনতম প্রধান বাহক গ্রীক, লাতিন এবং হীব্রুতেও না। তাই দেখতে পাই, ইংলণ্ডে ছাপাখানা নির্মিত হওয়ার পর উইলিয়াম ক্যাকস্টন যে-সব পুস্তক ছাপান, তার মধ্যে এই পুস্তকটিও ১৪৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজী অনুবাদে আছে। অবতরণিকারূপে এখানে এ-পুস্তক সম্বন্ধে আরো বহু বিস্তর চিত্তাকর্ষক ও মূল্যবান তত্ত্ব তথ্য নিবেদন করা যায়, কিন্তু আমাদের ধারণা, পুস্তকের উপাখ্যানটি এস্থলে অতিশয়তম সংক্ষেপে বর্ণনা করে নিলেই সর্বোত্তম পন্থা অবলম্বন করা হবে—পাঠক নিজের থেকেই অনেক-কিছু কল্পনা করে নিতে পারবেন।

ভারতবর্ষে এক পরাক্রমশালী নরপতি পুত্রহীন অবস্থায় অতিশয় মনোকষ্টে দীর্ঘকাল জীবনযাপন করার পর এক অভূতপূর্ব সর্বসুলক্ষণসম্পন্ন পুত্রসন্তান লাভ করেন। মহাসমারোহে তাঁর নামকরণ করা হল য়োসাফট্ (গ্রীক অনুবাদে Josaphat) এবং রাজা সে-যুগের শ্রেষ্ঠতম খালডীয় (Chaldaean) জ্যোতিষীদের নিমন্ত্রণ ক'রে রাজপুত্রের জন্মকুণ্ডলী নির্মাণ করার আদেশ দিলেন। তাঁরা সবাই একবাক্যে রাজাকে জানালেন, নবজাত কুমারের ভবিষ্যৎ সর্ব গৌরব ধারণ করে এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে তিনি হবেন বিরলতম মহাত্মাদের মধ্যে বিরল, কিন্তু তিনি পিতৃ-পিতামহের সনাতন ধর্ম পরিত্যাগ করে সত্যধর্মের সন্ধানে গৃহত্যাগ করবেন। বলা বাহুল্য, নৃপতি নিতান্ত ক্ষুব্ধ হলেন এবং এই মর্মন্তুদ ভবিষ্যদ্বাণী যাতে সফল না হয়, তার জন্য মন্ত্রণা গ্রহণ করে আদেশ দিলেন, রাজ-পুত্রকে যেন পরম রমণীয় এক রাজপ্রাসাদের ভিতর চিত্তাকর্ষণীয় সদানন্দময় পরিবেশে রাখা হয়। প্রাসাদ থেকে বাইরে এসে তিনি যেন কোনো অবস্থাতেই জরামৃত্যুর (ইংরেজী অনুবাদ আছে misery and death, জর্মনে আছে ঐ একই—Elend und Tod, খুব সম্ভব জরার প্রকৃত প্রতিশব্দ ইয়োরোপীয় কোনো ভাষাতেই নেই বলে তৎপরিবর্তে 'মিজরি' ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়েছে) সংস্পর্শে না আসতে পারেন; রাজা অনুমান করে নিয়েছিলেন, সদাসুখীজন যে

পরিবেশে আনন্দ লাভ করেছে, সেটা পরিবর্তন করে সে অন্য পরিবেশের সন্ধানে যাবে 'কোন্ দুঃখে' ?

কাহিনীর এই অংশটুকু শোনামাত্রই যে-কোনো ভারতীয়, সিংহলী, তিব্বত-চীন-জাপান-শ্যামবাসীর মনে উদয় হবে, এ-যেন বড় চেনা-চেনা ঠেকছে, এ কি যুবরাজ সিদ্ধার্থের জীবনী নয় ? তাই যদি হয়, তবে সে-কাহিনী সর্বধর্মের সর্ব-সজ্জনকে উৎসাহ এবং আনন্দ দান করলেও সেটি খৃষ্টধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থরূপে সম্মানিত হবে কি প্রকারে ? কাহিনীর পরের অংশটুকু শুনলেই সেটা আস্তে আস্তে পরিষ্কার হবে। কিছুটা আগেও বলা হয়েছে, সেটা আমি ইচ্ছে করেই আগে বলি নি, কারণ, তা হলে সিদ্ধার্থকে চিনতে পাঠকের অসুবিধা হত।

কাহিনীতে আছে, রাজপুত্র জন্মগ্রহণ করার পূর্বেই ভারতবর্ষে খৃষ্টধর্ম ছড়িয়ে পড়েছিল (এটা অবশ্যই সত্য নয়, এবং এরকম আরো পরিবর্তন পরিবর্ধন পাঠক পাবেন ; কি উদ্দেশ্য নিয়ে সেগুলো করা হয়েছিল, পাঠক ক্রমশ বুঝতে পারবেন)[১] কিন্তু যুবরাজের পিতা সে ধর্মের ঘোরতর শত্রু ছিলেন এবং রাজ্যে তার প্রসার বেড়ে যাচ্ছে দেখে রাজাদেশ প্রচারিত করেন যে প্রজাসাধারণ, পাত্র-অমাত্য যে কেউ এই নবীন ধর্ম গ্রহণ প্রচার প্রসার করবে, সে দণ্ডনীয় হবে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও রাজারই এক অন্তরঙ্গ সখা এবং মন্ত্রী খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে নির্জনে ধ্যান-ধারণা করার জন্য মরুভূমিতে চলে যান (মিশরের খৃষ্টান সাধুরা দ্বিতীয় তৃতীয় শতাব্দীতে প্রায়শ লীবিয়া-মরুভূমিতে অন্তর্ধান করতেন)। রাজাদেশে তাঁকে খুঁজে মরুভূমি থেকে ফিরিয়ে আনালে পর তিনি রাজসভায় তাঁর আচরণ বোঝাতে চেষ্টা করেন ও ক্ষমাভিক্ষাও করেন। রাজা আরো ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে নিজ রাজ্য থেকে নির্বাসিত করেন।

এদিকে রাজপুত্র যৌবনে পদার্পণ করে আর প্রাসাদে বন্দী হয়ে থাকতে

১ ধর্মের ইতিহাসে এটা কিছু নূতন নয়। কাঠিয়াওয়াড়ের হিন্দু লোহানা রাজপুতদের ইসমাঈলীয়া (ইসলামেরই এক) সম্প্রদায়ের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য কাহিনী নির্মিত হয় যে, হিন্দুদের যে কল্কি অবতারের আবির্ভূত হওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, ইতিমধ্যে মক্কা নগরে হজরৎ আলীরূপে তিনি অবতীর্ণ হয়ে গেছেন। সত্যপীরও তুলনীয়।

কয়েক সপ্তাহ পূর্বে যে ফন হফমান্‌স্‌টালের কবিতার বাংলা অনুবাদ নিয়ে আলোচনা হয় তিনিও এই গ্রন্থের গল্প মূলসূত্ররূপে নিয়ে তাঁর সৃজনীশক্তির প্রকাশ দেখিয়েছেন। নাম 'ইয়েডেরমান'='এভরিবডি'।

চাইলেন না; তাঁর ইচ্ছা, তিনি বাইরের বিশাল জগতে বেরিয়ে গিয়ে সেখানে নব নব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন এবং সেই মর্মে পিতার অনুমতি ভিক্ষা করলেন। অতিশয় অনিচ্ছায় তিনি সম্মত হলেন। ফলে রাজপুত্র ক্রমে ক্রমে এক এক জন করে অন্ধ, কুষ্ঠরোগী, জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ ও সর্বশেষে একটা মৃতদেহ দেখতে পেয়ে ব্যথাতুর হয়ে এর কারণ সম্বন্ধে কাতর প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে থাকেন এবং উত্তরে শুনতে পান, এসব দুঃখ-দুর্দৈব মানুষমাত্রেরই ললাটে লেখা আছে। অত্যন্ত বিচলিত ও অভিভূত হয়ে তিনি অনুসন্ধানের ফলে আরো জানতে পান, এসব দুঃখ-দুর্দৈব থেকে চিরতরে নিষ্কৃতি পাবার পন্থা জানেন শুধু এক শ্রেণীর সাধুসন্ত—তাঁরা সংসার ত্যাগ করে নির্জনে ধ্যান-ধারণায় মগ্ন থাকেন। রাজপুত্রের প্রবল ইচ্ছা হল, এঁদেরই মুখ থেকে তিনি তত্ত্বকথা শুনবেন, কিন্তু তাঁর সে-ইচ্ছা পূর্ণ করা অসম্ভব, কারণ তাবৎ সাধুসন্তকে রাজাদেশে দেশ থেকে নির্বাসিত করে দেওয়া হয়েছে।

ইতিমধ্যে এক অতিশয় পূতপবিত্র তথা ধর্মজ্ঞ সাধু মণিকারের ছদ্মবেশ পরে রাজসভায় আবির্ভূত হলেন এবং রাজপুত্রের সঙ্গে একাধিকবার সাক্ষাৎ করে ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বকথা তাঁকে বোঝাতে লাগলেন। সে সময় তিনি নানা গল্প, নানা কাহিনী কীর্তন করে সংসারের অসারতা ও প্রকৃতধর্ম কি, সে-সব সপ্রমাণ করেন।

(এই গল্পগুলো গ্রন্থের চিত্তাকর্ষক অংশ গ্রহণ করে আছে। এগুলোর অধিকাংশেরই উৎপত্তিস্থল যে ভারতবর্ষ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই; কিন্তু যদিও ঊনবিংশ শতাব্দীতে সে নিয়ে ইউরোপে প্রচুর গবেষণা করা হয় তবু সবগুলোর মূল তখনো খুঁজে পাওয়া যায় নি, হয়তো কখনো পাওয়া যাবে না। তবে কয়েকটি নিঃসন্দেহে জাতক থেকে নেওয়া হয়েছে [আশ্চর্য। স্বয়ং বোধিসত্ত্ব যে-সব গল্প জাতকে বলে গেলেন, য়োসাফট্‌রূপে তাঁকে আবার সেগুলোই উপদেশ-রূপে শুনতে হল।] এবং কিছু মহাভারত থেকেও। এদেশে কোথায় কি পরিমাণ গবেষণা হয়েছে সেকথা বলা কঠিন—এই গ্রন্থ নিয়ে কোনো গবেষণা আমার চোখে পড়ে নি। এ কর্ম করার সর্বাপেক্ষা শাস্ত্রাধিকার ছিল স্বর্গত ঈশান ঘোষের। তিনি তাঁর জাতক-অনুবাদের উপক্রমণিকায় এ পুস্তক নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেছেন, কিন্তু সেখানে স্থান সংকীর্ণ এবং এর গল্পগুলো ইয়োরোপের ভিন্ন ভিন্ন পাঠে বড়ই ভিন্ন ভিন্ন—এমন কি জাপানী 'শক জিৎসু-রকু'ও যে এ-আলোচনায় স্থান পায় সে তত্ত্ব কয়েক বৎসর পূর্বে জর্মন গবেষক-গোষ্ঠী উল্লেখ করে গেছেন এবং এ দেশে বসে সেগুলো সংগ্রহ করা অসম্ভব না

হলেও সুকঠিন।)

যে-মণিকার রাজপুত্রকে উপদেশ দিলেন তিনিই এ গ্রন্থের বার্লাম। রাজপুত্র মনস্থির করলেন, তিনি বার্লামের শিষ্যত্ব গ্রহণ করবেন। এ সংবাদ শুনে রাজা ক্ষোভে ক্রোধে উন্মত্তপ্রায়। সর্ব প্রথমেই তিনি বার্লামকে বন্দী করবার আদেশ দিলেন, কিন্তু তিনি ততক্ষণে নগর ত্যাগ করেছেন। রাজা যখন দেখলেন পুত্র কিছুতেই সংকল্প ত্যাগ করবেন না তখন তিনি ধূর্ত পন্থা অবলম্বন করলেন। নাকোর নামক এক অচেনা জনকে তিনি নিযুক্ত করলেন, সে এসে সভাস্থলে খৃষ্টধর্মের স্বপক্ষে দুর্বল, ভ্রমাত্মক যুক্তি প্রয়োগ করে তর্কযুদ্ধে সভা-পণ্ডিতদের কাছে হেরে যাবে; এই করে খৃষ্টধর্ম সর্বজনসমক্ষে লাঞ্ছিত হলে যুবরাজ নিশ্চয়ই বার্লামের অনুসরণ করার ব্যর্থতা বুঝতে পারবেন। কিন্তু রাজপুত্র সংবাদ পেয়ে গোপনে নাকোরকে এমনই তিরস্কার করলেন যে, সে শেষ পর্যন্ত রাজসভায় বাগ্মিতাসহ অব্যর্থ যুক্তিজাল বিস্তার করে প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করল। এর পর নাকোরও খৃষ্ট সাধুরূপে নির্জন ভূমিতে অন্তর্ধান করে। রাজা তখন জাদুকরের শরণাপন্ন হলেন। সে তখন পার্থিব ভোগ-বিলাসের মায়াজাল বিস্তার করে যুবরাজকে প্রলোভিত করার চেষ্টা দিয়ে নিষ্ফল তো হলই পক্ষান্তরে যুবরাজ তাঁকে একটি কাহিনী বলে স্বধর্মে দীক্ষিত করলেন। এর সঙ্গে মার-এর মিল দেখা যাচ্ছে, তবে বৌদ্ধশাস্ত্রে সে ধ্যানী বোধিসত্ত্বকে প্রচুর মারণাস্ত্র দিয়ে ভয়ও দেখায়।

সর্বশেষে রাজপুত্র বোধিসত্ত্ব বা য়োসাফট্‌রূপে রাজপুরী ত্যাগ করে বার্লামকে খুঁজে পেলেন। তাঁকে সখা ও সঙ্গীরূপে গ্রহণ করে উভয়ে ধ্যান-ধারণায় নিমজ্জিত হলেন।

* *

এ গ্রন্থে বৌদ্ধধর্মের কাহিনী নিয়ে তার সঙ্গে খৃষ্টধর্ম জুড়ে দিয়ে সে ধর্মের যে জয়জয়কার করা হল তার প্রণেতা কে জানবার উপায় নেই। পঞ্চতন্ত্রের মত এ-গ্রন্থও রাজা খুসরৌর আমলে পহ্‌লবীতে অনূদিত হয় এবং ওরই মত, তারপর, সীরিয়াকে। তার থেকে হয় গ্রীক অনুবাদ এবং উপক্রমণিকায় বলা হয় 'একটি উপকারী কাহিনী···আবিসিনিয়ার প্রত্যন্ত প্রদেশ—যার নাম ভারতবর্ষ (!)—সেখান থেকে এটি আনয়ন করেন সাধু জন্।' ওদিকে আরবী অনুবাদও হয়ে গিয়েছে এবং সেখানে গ্রীক অনুবাদের চেয়েও স্পষ্টতররূপে ধরা পড়ে যে এর মূল ভারতে ও বৌদ্ধধর্মে। এর পর লাতিন অনুবাদ এবং তার থেকে ইয়োরোপীয় সর্বভাষায়।

'বিষ্ণুশর্মা' প্রসঙ্গে নিবেদন করছি য়োসাফট্ এসেছে 'বোধিসত্ত্ব' থেকে (আরবীতে আগ্যস্থলে 'ব' ও 'য়'-তে মাত্র একটি বিন্দুর পার্থক্য আছে বলে হয়ে যায় য়োদাসাফ) এবং বার্লাম (বুদ্ধ) 'ভগবান' থেকে।

অতএব এক বুদ্ধদেব যদি দুই মূর্তি ধাবণ করে খৃষ্টধর্মে সেণ্ট বা সন্তরূপে পূজা পান তবে নিশ্চয়ই আমাদের আনন্দের কথা ॥

৯।৪।৬৬

রবি-মোহন-এন্‌ড্রুজ

কয়েক দিন পূর্বে একখানা চটি বইয়ে রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মাজী ও এন্‌ড্রুজ সম্বন্ধে একটি বিবরণীতে দেখি, আর সবই আছে, নেই শুধু একটি কথা:—এন্‌ড্রুজের পরলোকগমনের পর তাঁর স্মৃতিরক্ষা সম্বন্ধে সচেতন হলেন কে, এবং সেই মহৎ চিন্তা মৃন্ময়রূপ দেবার জন্য সর্বপ্রথম উদ্যোগী হলেন কে,. এবং এন্‌ড্রুজ ফাণ্ডের আজো সামান্য যেটুকু অবশিষ্ট আছে—যদি আদৌ থাকে—তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাবো কাকে ?

অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ[১] হয় যে সময়, তখন রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমে। শুনেছি, সে-সময় তিনি নাকি সে-আন্দোলনের প্রশংসাই করেছিলেন। ফেরার সময় বোম্বায়ে নেমে তাঁর মত পরিবর্তন হয়, এবং আন্দোলনের বিরুদ্ধে স্পষ্ট ভাষায় একাধিক প্রবন্ধে আপন মতামত ব্যক্ত করেন (দ্বিজেন্দ্রনাথ কিন্তু বরাবরই গাঁধীকে উৎসাহ-হিম্মৎ যুগিয়ে যান)। এন্‌ড্রুজ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও গাঁধীর

---

১ 'গুরুচণ্ডালী' নিয়ে আলোচনা একাধিক স্থলে দেখেছি। চলতি ভাষা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে এটাকে অমার্জনীয় অপরাধের অনুশাসনরূপে সম্মান করা হত— যদিও যে দ্বিজেন্দ্রনাথকে কবি রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞরূপে সশ্রদ্ধ সম্মান জানাতেন, তিনি স্বয়ং সে অনুশাসন তাঁর কঠিনতম সংস্কৃত শব্দে পরিপূর্ণ বাংলা দর্শনগ্রন্থে পদে পদে লঙ্ঘন করতেন, এবং সকলকেই সে উপদেশ দিতেন। চলতি ভাষা চালু হওয়ার পর, পরলোকগমনের মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও লেখেন 'গুরুচণ্ডালী এখন আর অপরাধ নয় ('বাংলা-অলঙ্কারের পিনাল-কোড থেকে গুরুচণ্ডালী সরিয়ে দেওয়া হল'—ধরনের অভিব্যক্তি)। অবীন দ্বিজেন্দ্রনাথের আদেশ বাল্যাবস্থা থেকেই মেনে নিয়েছে, যদ্যপি সে সদাই 'লড়াই শুরু হল' এবং 'যুদ্ধ আরম্ভ হল' তথা 'মোকদ্দমা শুরু হল' এবং 'তর্কবিতর্ক আরম্ভ হল' এ'দুয়ে পার্থক্য মেনে চলেছে।

উভয়েরই অতিশয় অন্তরঙ্গ বন্ধু—(এবং দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা সহকর্মী বিধুশেখর বা ক্ষিতিমোহনের মতো তো ছিল বটেই, বেশী বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না)—তাই অনেকেই তাঁকে 'শান্তিনিকেতন-সাবরমতী-সেতু' নাম ধরে উল্লেখ করতেন।

এনড্রুজের ধর্ম ছিল দীননারায়ণের সেবা। ধর্মসঙ্গত রাজনৈতিক আন্দোলন-বিবর্তন সর্বদাই দীনের উদ্দেশে নিয়োজিত হয় ; তাই সাক্ষাৎ রাজনীতি এড়িয়ে চললেও এনড্রুজ গাঁধী-আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাই এই মহান আন্দোলনের ব্যাপারে ভারতবর্ষের দুই মনীষীর মধ্যে মতানৈক্য যে সর্ব-প্রকারের ক্ষতিসাধন করতে পারে, সে-বিষয়ে তিনি সচেতন হন ; তিনি মন স্থির করলেন, পত্র-পত্রিকার মারফৎ উভয়ের মধ্যে যে বাদানুবাদ হচ্ছে, তার চেয়ে অনেক ভালো হয়, উভয়ে একসঙ্গে মিলিত হয়ে যদি ভাবের আদান-প্রদান করেন। বলা বাহুল্য গাঁধী-রবীন্দ্রনাথের সৌহার্দ্য জন্মায়, যখন গাঁধী এর কয়েক বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথের সহৃদয় আমন্ত্রণে আফ্রিকা ত্যাগ করে সদলবলে শান্তিনিকেতন আশ্রমে যোগ দেন ও স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে সেখানে ছয় মাস থাকেন (তখনো কলেজ-বিভাগ বা বিশ্বভারতীর জন্ম হয় নি)।

এ-আলোচনা হয় কলকাতায়, এবং এক এনড্রুজ ছাড়া সেখানে চতুর্থ ব্যক্তি ছিলেন না।

কিন্তু কবির মত চিত্রকরও শুধু যে নব নব সৃজন কর্মে লিপ্ত থাকেন তাই নয়, নব নব গোপন তত্ত্ব, সৌন্দর্য আবিষ্কার করে রসিকজনের সম্মুখে রাখতে চান। কবি রবির ভ্রাতুষ্পুত্র 'ছবি-রবি' অবন ঠাকুর তাই মনে মনে ভাবলেন, রবীন্দ্রনাথ ও গাঁধীর মত মনীষী এ দেশে নিত্যি নিত্যি জন্মায় না ; নিভৃতে এ দোঁহার মিলনের অন্তত সামান্য কিছুটাও যদি না দেখতে পেলুম, তবে এ-জীবনে দেখলুমটা কি ? কথাটা ঠিক ; হিমালয় আল্‌প্‌সে মিলন হয় না,—কিন্তু এ-মিলন তো তারো বড়ো।

উপযুক্ত তাবৎ কাহিনী আমি অন্যত্র সবিস্তর দিয়েছি বলে এস্থলে সংক্ষেপে সারি, কারণ অন্যকার কীর্তন ভিন্ন। 'অবন-ঠাকুর' চুপসে দরজার চাবির ফুটো দিয়ে এক লহমার তরে স্থিরদৃষ্টিতে দেখে নিলেন ভিতরকার 'ছবিটি'। সেইটেই তিনি এঁকে পাঠিয়ে দিলেন শান্তিনিকেতনের কলাভবনে—যেখানে ঐ তিনজনের দুজনা, অর্থাৎ কবি ও এনড্রুজ স্থায়ীভাবে বাস করেন।

কিন্তু মূল কথায় ফিরে যাই—এটুকু শুদ্ধমাত্র এ-তিন মহাপুরুষের অন্তরঙ্গতা বোঝাবার জন্য পটভূমি নির্মাণ।

* *

১৯৪২ খৃষ্টাব্দে (খুব সম্ভব) গ্রীষ্মকালে অকস্মাৎ মহাত্মাজী অবতীর্ণ হলেন বোম্বাইয়ের জুহুবীচে। যুদ্ধ এবং জনরবে ভারতবর্ষ তথা তাবৎ পৃথিবী তখন গমগম করছে। প্রায় সম্পূর্ণ পূর্ব ও উত্তর ইয়োরোপ জয় করার পর হিটলার তখন সদর্পে ককেশাসের তেল পানে ধাওয়া করবেন বা করেছেন—এমন সময় টলটলায়মান ইংরেজের চরম দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে ডমিনিয়ন বিয়ণ্ড দি সীজ-এর অন্যতম ভারতবর্ষ আরেকটা স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ করবে কি? এই ছিল তখন দেশবিদেশে সর্বমুখে একমাত্র প্রশ্ন।

এমন সময় গাঁধী নামলেন জুহুবীচে। এবং তার চেয়েও বিস্ময়জনক ব্যাপার ;—যে গাঁধীকে আপাতদৃষ্টিতে সরল, ভালোমানুষ বলে মনে হয়, তিনি যে সাংবাদিকদের এড়াবার জন্য কত হুন্নর-হেকমৎ রপ্ত করে বসে আছেন, সে তত্ত্বটি হাড়ে হাড়ে বিলক্ষণ জানে ভুক্তভোগী সাংবাদিকরা—সেই গাঁধীই ডেকে পাঠিয়েছেন, নিজে যেচে, প্রেস-কনফারেন্স্। তিনি নাকি সর্বপ্রশ্নের উত্তর দেবেন।

এদিকে তিনি জুহুবীচে নেমেই খবর পাঠিয়েছেন বোম্বায়ের আশ্রমিক সঙ্ঘকে। তিনি রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুনবেন।

বোম্বায়ে বিস্তর শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী আছে—তাঁদের প্রায় সবাই গুরুদেবের দু'দশটা গান গাইতে পারে, আর মহারাষ্ট্রবাসী হলে তো কথাই নেই, তারা গুরুদেবের কালোয়াতী গান পর্যন্ত গাইতে পারে, দু'একজন নিধুবাবু ঢঙে গুরুদেবের টপ্পা তক দখল করে বসে আছে। কিন্তু সব সময় সবাই তো আর বোম্বায়ে থাকে না। তবু ছিলেন সর্বাধিকারী স্বর্গত বচুভাই শুক্ল ; ইনি শান্তিনিকেতনে প্রচলিত—অর্থাৎ সেখানে 'দৈনন্দিন এবং পালপরবে গীত—সব কটার এবং আরো প্রচুর অচলিত সুর আপন বিরাট দিলরুবাতে বাজাতে পারতেন। তারপর ছিলেন পিনাকিন ত্রিবেদী, গোবর্ধন মপারা, সুশীলা আসর ইত্যাদি। আমিও ছিলুম বচুভাইয়ের অতিথিরূপে। কিন্তু সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। কারণ আমার মত 'বেতালাকে' কাবু করতে পারেন এমন বেতাল-সিদ্ধ এখনো জন্মান নি!

আশ্রমিক সঙ্ঘ, এবং অধিনায়করূপে বচুভাই পড়লেন দুশ্চিন্তায়। গাঁধীজী কোন্ কোন্ গান শুনতে চাইবেন, বা কেউ গাইলে শুনতে ভালোবাসবেন সে

সম্বন্ধে কারোরই কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা বা আপন ধারণা নেই—বস্তুত শান্তিনিকেতনে বাসকালীন এবং বিশেষ করে সে-স্থল ছাড়ার এত যুগ পরেও যে তাঁর রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ রয়েছে সে-তত্ত্ব প্রাক্তন ছাত্রদের প্রায় কেউই জানতো না। অবশ্য অনেকেই জানতো 'জীবন যখন শুকায়ে যায়—' গানটি তাঁর বড়ই প্রিয় (এবং সেই কারণেই নিউমেনের 'লীড কাইনড্‌লি লাইট এমিড্‌স্ট্‌ দি এন্‌সার্‌ক্লিং গ্লুম।')।

আমি বললুম, 'এটা তো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, গাঁধীজী যে-সময়টা আশ্রমে কাটান, ঠিক সেই সময়ে রচিত রবীন্দ্রসঙ্গীতই পাবে পয়লা নম্বর—বা ফার্স্ট প্রেফারেন্‌স্ তারপর নিশ্চয়ই স্বদেশী গান (এখন যাকে গাল-ভরা নামে ডাকা হয় 'দেশাত্মমূলক সঙ্গীত'), তার পর মন্দিরে উপাসনার সময় যে কটি ব্রহ্মসঙ্গীত গাওয়া হয়। এর পরও আছে—কিন্তু অদ্দূর আমার এলেম যায় না, যেমন মনে করো গুরুদেব তাঁর আপন পছন্দের যে-সব গান বাছাই করে তাঁকে শুনিয়েছেন তাঁর হদীস পাবো কোথায়!' সবাই এক বাক্যে আমার বক্তব্য স্বীকার করে বললে, 'এই তিন দফেতে যে-সব গান পড়ে তারই সব কটা এত অল্প সময়ে কোরাসে তৈরি করা প্রায় অসম্ভব। অতএব এই নিয়েই উপস্থিত সন্তুষ্ট থাকা যাক।' আমি তখন স্কেল টি-স্কোয়ার সেট-স্কোয়ারসহ—কথার কথা কইছি—লেগে গেলুম জরিপ করতে, মহাত্মাজী যে-সময়টায় শান্তিনিকেতনে ছিলেন ঠিক সেই সময়ে গুরুদেব কোন্ কোন্ গান রচেছিলেন (এস্থলে একটি ফরিয়াদ জানিয়ে রাখি : যাঁরাই গুরুদেব নিয়ে কোনো কাজ করতে চান, তাঁরাই চান, গুরুদেবের কবিতা যে রকম কালানুক্রমিক পাওয়া যায়, গানের বেলাও ঠিক সেই রকম হওয়া উচিত, বরঞ্চ বেশী উচিত। আমার এক মিত্র 'রবীন্দ্রনাথের ধর্ম' নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে এরই অভাবে দিশেহারা হয়ে এগুতে পারছেন না। তাঁর মূল প্রশ্ন, একটা বিশেষ সময়ের পর—মোটামুটি ১৯১৮—রবীন্দ্রনাথ কি একেবারেই আর কোন ধর্মসঙ্গীত রচনা করেন নি? করে থাকলে কটি?) অবশেষে কষ্টেশ্রেষ্ঠে মোটামুটি একটি ফিরিস্তি তৈরি হল। বেশীর ভাগ গায়কই গুজরাতী ; তাদের পছন্দের ধর্মসঙ্গীত—যেগুলো কারো না কারো ভালো করে জানা ছিল—সেগুলোও কোরাসে শিখে নেওয়া হল। সক্কলেরই এক ভরসা—গাঁধীজীর সুরজ্ঞান খুব একটা টনটনে নয়, মহারাষ্ট্রের মত গাঁধীর জন্মভূমি কাঠিওয়াড়-গুজরাতে গান-বাজনার প্রাচীন সর্বব্যাপী কোনো ঐতিহ্য নেই।

"শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর" শেষটায় এল। ওরা ধরে নিয়েছিল আমি সঙ্গে যাব। আমার এক কথা 'ক্ষেপেছ! আমি না পারি গাইতে, না জানি

বাজাতে। আমাদ্বারা কোনোপ্রকারের শোভাবর্ধনই হবে না—"শোভা" জিনিসটাই গাঁধীজী আদৌ পছন্দ করেন না।'

* *

মহাত্মাজী বললেন, 'গাও!'

ওরা কাঁচুমাচু হয়ে বললে, 'কি গান…?'

'তোমাদের যা জানা আছে।'

এসব আমার শোনা কথা। তার উপর ইতিমধ্যে দীর্ঘকাল কেটে গিয়েছে। সঠিক মনে নেই, প্রাক্তনদল সক্কলের পয়লাই রঙের টেক্কা, অর্থাৎ 'জীবন যখন শুকায়ে যায়—' মেরেছিল, না সেটাকে তাঁর আদেশের জন্য জীইয়ে রেখেছিল। কিন্তু মোদ্দা, তারা এক একটা গান শেষ হলে যখন থামে, তখন তিনি মাথা নেড়ে সম্মতি জানান, এবং আরো গাইবার ইঙ্গিত করেন। তারা দু'একবার চেষ্টা দিয়েছিল গাঁধীজীর আপন পছন্দ জানাবার জন্য—ফলোদয় হয় নি।

সর্বশেষে মহাত্মাজী দু'একটি প্রশ্ন শুধোন। কেউ উত্তর দিতে পারে নি। মারাঠী মপারা বাড়ি ফিরে তো আমাকে এই মারে কি তেঁই মারে! আমি থাকলে নাকি চটপট উত্তর দিয়ে দিতুম। আমি বললুম, 'এগুলোর উত্তর তো বচুভাইও জানে, তদুপরি সে ওয়াডওয়ান অর্থাৎ গাঁধীজীর মতই কাঠিওয়াড়ের লোক—গুজরাতী—না, খাস কাঠিওয়াড়িতেই উত্তর দিয়ে তাঁর জান ঠাণ্ডা করে দিতে পারতো!' সে নাকি নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল। 'আমি হতুম না, কি করে জানলে! ঐ সিংগির সামনে!'

কিন্তু এত বাহ্য!

আসলে পূর্বোল্লিখিত প্রেস-কন্‌ফারেন্স্ গাঁধীজী ডাকিয়েছিলেন ঐ দিনই, ঐ সময়ই, ঐ স্থলেই।

এখন আমি যা নিবেদন করবো, সেটা ঐ সময়কার খবরের কাগজ নিয়ে চেক্ অপ্ করে সন্দেহ-পিচেশ তথা গবেষক-পাঠক ধরে ফেলতে পারবেন, আমি কী "দারুণ" "গুল্‌মগীর"! আলঙ্কারিকার্থে কিন্তু আমি "যদু" পতি বা "রাখাল" রাজা হওয়ার মত তাদের লক্ষাংশের একাংশ শক্তি ধরি নে বলে আমি নাচার; বেচারার পক্ষে গুল্ মারাই একমাত্র চারাহ্!

যতদূর মনে পড়ে সেই এণ্ডেমণ্ডে বিজড়িত ভারতের সর্বজাতের সাংবাদিক-গণই সেদিন রবীন্দ্র-সঙ্গীত শোনবার সৌভাগ্য লাভ করেছিল।

গান শেষ হলে মহাত্মাজী ওঁদের বললেন, 'তোমাদের কি কি প্রশ্ন আছে,

শুধোও।' আর যায় কোথায়। ছুনিয়ার যত রকম প্রশ্ন; আবার নূতন করে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হবে কি, এই কি তার জন্য উৎকৃষ্টতম মোকা নয়—মিত্রপক্ষ চতুর্দিকে বেধড়ক মার খাচ্ছে, আরম্ভ হলে কি প্রকারে হবে, ট্যাক্স বন্ধ করে না নয়া কোনো টেকনীকে, ১৯২০-এর মত ছাত্রদের ডাকা হবে কি না, ইত্যাদি ইত্যাদি ?

গাঁধীজী তাঁর চিরাচরিত ধৈর্যসহ উত্তর দিয়ে যেতে লাগলেন—যত্থপি আমার মনের উপর তখনকার, অর্থাৎ পরের দিনের খবরের কাগজ পড়ার পর যে দাগ পড়েছিল সেটা বোধ হয় এই যে, মোক্ষম প্রশ্নগুলো মহাত্মাজী এড়িয়ে গিয়েছিলেন। অবশ্য ঐ সময়ে ভবিষ্যতের তাবৎ প্ল্যান ফাঁস করে দেওয়া যে সদ্বুদ্ধির কর্ম হত না, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

হঠাৎ মহাত্মাজী দু হাত তুলে প্রশ্নধারা নিরুদ্ধ করে বললেন, 'আমি বেনে। বেনে কাউকে কোনো জিনিস মুফতে দেয় না। আমিও খয়রাৎ করার জন্য তোমাদের ডাকি নি। রবীন্দ্র-সঙ্গীত তো শুনলে। এবার আমার কথা শোনো। পোয়েট গত হওয়ার পূর্বে (তখনো বোধ হয় এক বছর পূর্ণ হয় নি) আমাকে আদেশ করেন, আমাদের উভয়ের বন্ধু এনড্রুজের স্মৃতিরক্ষার্থে যা কর্তব্য তা যেন আমি আপন কাঁধে তুলে নি। এখন দেখতে পারছি, আসন্ন ভবিষ্যৎ বড়ই অনিশ্চিত। তাই আজই আমি "এনড্রুজ মেমোরিয়াল ফাণ্ড"-এর জন্য অর্থসঞ্চয় আরম্ভ করলুম। দাও।'

মপারা রিপোর্ট দিতে গিয়ে আমায় বলেছিল, 'গাঁধীজী অনেকক্ষণ ধরে এনড্রুজ সম্বন্ধে বলেছিলেন, in a very touching manner। আর তার পর মহাত্মাজীর সামনে পড়তে লাগল, টাকা, পুরো মনিব্যাগ, গয়না, রিস্টওয়াচ, আংটি, কত কী! যেন বানের জলে ভেসে আসছে দুনিয়ার কুল্লে মূল্যবান জিনিস। অনেকে এমনই যথাসর্বস্ব দিয়ে ফেলেছিল যে, বোম্বায়ে ফেরার জন্য টিকিট কাটার পয়সা পর্যন্ত তাদের কাছে অবশিষ্ট ছিল না। কিন্তু জানেন তো, রেলও এখন আর পুরোপুরি ইংরেজের নয়। ভিলেপার্লে থেকে চার্চ গেট স্টেশন—সবাই জানে, কেন এদের টিকিট নেই।'

ফাণ্ডের টাকা যখন জমে উঠছে, তখন কে একজন বললে, 'মহাত্মাজী, এখন এসব কেন? স্বরাজ পাওয়ার পর এসব কাজ তো রাতারাতি হয়ে যাবে।'

আজ সত্যই আমার হাসিকান্নায় মেশানো চোখের জল নেমে আসে—এই ব্যক্তিটির ঐ মন্তব্যটির স্মরণে। তারই মত আমরা সবাই তখন ভাবতুম,

ইংরেজই সর্ব নষ্টের মূল। বিহারে ভূমিকম্প হলে ইংরেজই দায়ী, মেদিনীপুরে সাগর জাগলে ওটা ঐ ইংরেজেরই দুষ্কর্ম। ইংরেজকে খেদিয়ে দিয়ে স্বাধীন হওয়া মাত্রই—

When we shall have attained liberty, all those will be mere trifles!

গাঁধীজী সঙ্গে সঙ্গে মোক্ষম গরম, কড়া গলায় জবাব দেন, 'But Tagore did not wait to be born till India has attained her liberty!'

পরাধীন ভারতে যদি কবি জন্ম নেন, তবে তাঁর সখার স্মৃতিরক্ষার ভার পরাধীন ভারতের স্কন্ধেই!

তাই বলছিলুম, হাসি পায়, কান্নাও পায়—তখন আমরা কী naif (প্রায় 'ন্যাকার' মত)-ই না ছিলুম, যে বিশ্বাস করতুম—স্বরাজ পাওয়ার পরই 'পাঁচ আঙুল ঘিয়ে' আর 'ডেগ-এর ভিতর গর্দান ঢুকিয়ে ভোজন!'

তাই কি রবীন্দ্রনাথ সাবধানবাণী বলেছিলেন, (উদ্ধৃতিতে ভুল থাকলে ক্ষমা চাইছি) 'একদিন (স্বরাজ লাভের পর) যেন না বলতে হয়, ইংরেজই ছিল ভালো!'

* *

কিন্তু কোথায় গেল সেই 'এনড্রুজ ফাণ্ড' যার মোটা টাকাটা তুলেছিলেন গাঁধীজী?

তা সেটা যেখানে যাক, যাক! দুঃখ এই, সেই চটি বইয়ে এবং অন্যত্র 'এ্যানড্রুজ ফাণ্ডে'র কথা উঠলে কেউ আর গাঁধীকে স্মরণ করে না, তিনি যে সেই সুদূর বোম্বায়ে রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুনিয়ে ফাণ্ডের গোড়াপত্তন করেছিলেন সেটা সবাই ভুলে গেছে!!

'ইজরায়েল বিশ্বের প্রবাদ-সত্য রূপে গণ্য হবে'

—বাইবেল

ঘরে ঢুকতেই বললেন, এদিকে এসো। অসাধারণ পণ্ডিত লোক। আমি তাঁকে বড্ডই শ্রদ্ধা করি, বলতে কি, ভালোবাসি। তিনিও আমাকে স্নেহ করেন। সত্যকার পণ্ডিত কখনোই মূর্খকে অবহেলা করে না।

ঘরে আর কেউ নেই। তবু তিনি ফিসফিস ক'রে বললেন, 'তোমরা কাল বৌদ্ধধর্মের সৃষ্টিরহস্য নিয়ে আলোচনা করছিলে না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তা তোমার আটকাচ্ছিল কোথায়?'

'আজ্ঞে, আমি শুধাচ্ছিলুম, আল্লা যদি না-ই থাকবেন তবে এই দুনিয়াটা পয়দা করলে কে? আপনারাও তো—'

বাধা দিয়ে বললেন, 'আমাদের কথা বাদ দাও—তোমার মুশ্‌কিলটা কোথায় সেইটে খুলে কও।'

'শরণঙ্করসাধু' হীনযানপন্থী বৌদ্ধ: সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। তিনি বলছিলেন, সৃষ্টির আদিও নেই অন্তও নেই। অতএব সৃষ্টিকর্তারও প্রয়োজন নেই। তারপর বললেন, যদি তর্কস্থলে ধরেও নেওয়া হয় সৃষ্টিকর্তা আছেন, তবুও তো শেষ-সমস্যার সমাধান হয় না। প্রশ্ন উঠবে, সৃষ্টিকর্তাকে সৃষ্টি করলেন কে? শুনুন আজগুবী কথা! তারপর তিনি তাঁর গেরুয়া আলখাল্লার ভিতর থেকে নোটবুক বের করে আঁকলেন একটা চক্কর—সার্কল। বললেন এই সার্কলের যেমন কোনো জায়গায় আরম্ভও নেই, শেষও নেই, সৃষ্টিও হুবহু তেমনি। তারপর আপনি ঘরে ঢুকলেন। পাছে আপনাকে ডিসটার্ব করা হয় তাই আমরা আরো খানিকক্ষণ ফিসফিস করে কথা বলার পর উনি চলে গেলেন।

ওরিয়েন্টাল সেমিনারি অর্থাৎ প্রাচ্য-বিদ্যায়তন। তারই একটা কামরায় আমরা তিনজনা কাজ করি। একজনের বিষয়বস্তু ইরানী ফাইয়াঁস-পর্সেলিন—বিশ্বকলাসৃষ্টিতে তার স্থান। অন্যজন বাইবেলের ওল্ড-টেস্টামেন্টের হীব্রু পাঠের নয়া সম্পাদনা করছেন। আর আমি—তা সে যাক্‌গে। দু'জনাই বছর দশেক পূর্বে সর্বোত্তম শ্রেণীর ডক্টরেট নিয়েছেন; একজন আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক।

শুধোলেন, 'চক্কর এঁকে সাধু বললেন সৃষ্টি এরই মত আদিঅন্তহীন। তা, এতে আবার দুর্বোধ্য কি আছে? তবে হ্যাঁ, আরো সোজা করে বলা যেতে

পারতো। আচ্ছা, স্কচদের বিশেষত্ব কি—অন্তত তাদের কোন্ বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিশ্বের লোক হাসিঠাট্টা করে ?'

এক গাল হেসে বললুম, 'সে আর বলতে! কিপ্টেমী !'

'বিলক্ষণ! সেই গল্পটা জান তো—লণ্ডনের এক ইংরেজ কোম্পানি স্কটল্যাণ্ডের এবার্ডীন শহরে খুললে ট্রামওয়ে। হাড়কিপ্টে স্কচরা ট্রাম চড়বে না, কিছুতেই। কোম্পানি লাটে ওঠার উপক্রম। তখন লণ্ডন থেকে পাঠানো হল স্পেশালিস্ট—তাঁকে বের করতে হবে দাওয়াই, স্কচকে কি প্রকারে ট্রামে ঢোকানো যায়। তিনি এবার্ডীনে এসেই ট্রাম ভাড়া থ্রূপেন্স থেকে এক ঝটকায় এক পেনি কমিয়ে করে দিলেন টাপেন্স। পরের দিন তাঁর আপিসের সামনে মহাপ্রলয়ের ভিড়। তিনি তো ড্যাম্ গ্লাড্—নিশ্চয়ই তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছে, ভাড়া কমিয়ে দেবার জন্য। ইয়াল্লা, তওবা, তওবা! এরা যে তাঁরই জানলা তাগ করে পচা ডিম হাজা টমাটো ছুঁড়ছে আর চিৎকার করছে, "কোত্থেকে এসেছে এই নচ্ছার! আগে আমরা পায়ে হেঁটে, ট্রাম ভাড়ার তিন পেনি বাঁচাতে পারতুম, এখন কুল্লে দু'পেনি! নিকালো রাস্কেলকো এবার্ডীনসে।" আচ্ছা, হলো। এবার বলো তো ইহুদিদের বৈশিষ্ট্য কি ? পারলে না ? আমিই বলছি, হুবহু একই গাধার এ-কান ও-কান। কিপ্টেমীতে।'

ইহুদিদের কিপ্টেমী সম্বন্ধে আমি কোনো গল্পই জানি নে, অতখানি বে-খবর বেরসিক আমি নই, কিন্তু বিশেষ কারণে আমি চুপ করে রইলুম। সে-কারণ একটু পরে পাঠক নিজের থেকেই বুঝে যাবেন।

তিনি বলে যেতে লাগলেন, 'একবার এক ইহুদি আর স্কচে ঝগড়া লেগেছে, কে কতক্ষণ ধরে ডুবসাঁতার দিতে পারে—দু'জনা দুই সুইমিং পুলে কাজ করতো আর দুই পুলের মধ্যে ছিল উৎকট রেষারেষি। শেষ পর্যন্ত বাজি ধরা হল এক শিলিঙ। বাজে লোকের কৌতূহল এড়াবার জন্য তারা নদীর এক নিভৃত জায়গায় দিল ডুব।'

তিনি চুপ মারলেন। আমি ভাবলুম, ওস্তাদ কথকের মত তিনি পজ্ দিয়েছেন আমার মনের উপর গল্পটা কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে সেইটে দেখবার জন্য। কিন্তু কই ? তা তো নয়। তিনি দেখি, পকেট থেকে ছুরি বের করে আপন মনে দিব্য পেনসিল কাটতে আরম্ভ করেছেন। তখন থাকতে না পেরে আমি শুধালুম, 'তারপর ?'

উদাস সুরে বললেন, 'কি করে বলবো ভাই কও। দু'জনার কেউই তো উঠলো না জলের তলা থেকে।' তারপর হন্তদন্ত হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, বলতে ভুলে

গিয়েছিলুম, ভাগ্যিস্, তারা বাড়িটা পাকাপোক্ত করার জন্য তাদের এক উকীল বন্ধুর কাছে কাগজ-কলমে লিখিয়ে নিয়ে—অবশ্য সবকুছ মুফতমে—তারই জিম্মায় রেখে এসেছিল ; নইলে শহরের লোক কস্মিনকালেও জানতে পেতো না, এ দুটো শান্ত, অজাতশত্রু লোক হঠাৎ ইহসংসার থেকে কি করে কর্পূর হয়ে গেল। হুঁ! এক শিলিঙ—বাপ্‌রে! চাট্টিখানি কথা!'

'কিন্তু—'

'এর মধ্যে "কিন্তু" "but" "mais" "aber" কিছুই নেই, ভাই। কিন্তু সেই যে, অন্তহীন চিরচক্রের দৃষ্টান্ত দিলেন সিংহলের মহাস্থবির, বলছিলুম কিনা, সেটা আরো সোজা করে বলা যেতে পারতো। তাই তোমাকে পয়লা বাজিয়ে নিলুম, তুমি ইহুদি স্কচ সম্বন্ধে চালু গল্পগুলোর খবর রাখো কিনা। সবাই বলে, ওরিয়েন্টালরা—এবং বিশেষ করে ইণ্ডিয়ানরা—নাকি সর্বক্ষণ মুখ গুমড়ো করে, নাসিকাগ্রে মনোনিবেশ করে আত্মচিন্তায় মগ্ন, রসকষের বালাই নেই। যতো সব! হ্যাঁ, অন্তহীন চিরচক্র সহজ করে বোঝাতে হলে বলতে হয়—স্কচ বিল শোধ করবে না আর পাওনাদার ইহুদিও তাকে ছাড়বে না। সে ধাওয়া করেছে স্কচের পিছনে। শহরটাও ছোট। তখন কি হয়? অন্তহীন চিরচক্র। এখনো যদি না বুঝে থাকো তবে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে কোনো ইহুদির দোকানে এপ্রেন্টিসি করগে।'

আমি বললুম, 'একটি কথা শুধোতে পারি—অপরাধ যদি না নেন, ব্যক্তিগত কথা।'

তিনি বললেন, 'মাই লাইফ ইজ এন ওপ্‌ন্ বুক। যা-খুশি শুধোতে পারো।'

'আচ্ছা, আপনি তো, বোধ হয় ইজরায়েলাইট—'

বাধা দিয়ে মৃদু হাসি হেসে বললেন, 'অত ভদ্রতা করে, অন্য লোক হলে বলতুম ভণ্ডামি করে, ইজরায়েলাইট না বলে য়ুডে (Jude = ইহুদি) বলতে পারো, তার চেয়েও অবজ্ঞাসূচক Jut বলতে পারো, এমন কি পাঁচজন জর্মন আড়ালে যে "ফীজার য়োট" (মোটামুটি, "ঘৃণ্য ইহুদির বাচ্চা") ব্যবহার করে সেও করতে পারো। আমি নির্বিকার।'

আমি জিভ কেটে বললুম, 'ছি ছি, কি যে বলেন—'

ফের বাধা দিয়ে বললেন,, 'শোনো, ভদ্র! তুমি কি বললে, কি না বললে কিচ্ছুটি এসে যায় না। এই দেখ আমার নাকটা—কি রকম বেঁকে গিয়ে হুকের মত ঝুলে আছে, তারপর আমার কান দু'খানা—মাথার সঙ্গে লেপটে না গিয়ে একটা ডান দিকে আরেকটা বাঁ দিকে যেন উড়ে যাবার পণ করেছে, দাঁড়াও,

তোমাদের দেশের হাতীর বোধ হয় এ রকম কান হয়, তারপর আমার চুল—কানের কাছে কি রকম যেন কোঁকড়া কোঁকড়া, নিগ্রোদের মত, আমাদের মিশর-বাসের সামান্য অবশিষ্ট—'

'থাক না। প্লীজ।'

একটু হাসলেন, তাতে কোনো তিক্ততা ছিল না। বললেন, 'এক ফার্লং দূরের থেকে লোক চিনতে পারে, ঐ আরেক ব্যাটা ইহুদি আসছে। তুমি ইজরায়েলাইট বললে, না য়ুডে বললে তাতে কি যায় আসে? তা সে যাক্ গে। তুমি কি যেন শুধোচ্ছিলে?'

'আপনি তো ইহুদি—'

'বলে ইহুদি! রীতিমত খানদানী মনিষ্যি আমি। কেন, নাম থেকে বুঝতে পারছো না? তোমাদের কুরান শরীফেও যে প্রফেট ইয়াকুবের (জেকব্) উল্লেখ আছে তাঁর তৃতীয় পুত্রের নাম লেভি। কিংবা বাইবেলের প্রথম অধ্যায়, জেনেসিসেও পাবে এ-গোষ্ঠীর খবর। কিন্তু থাক্, প্রপিতামহের শুকনো হাড় চিবিয়ে বেঁচে থাকা যায় না। তবে এ-কথা ঠিক, আমাদের পরিবারের বংশানুক্রমে ইহুদি ধর্ম ও হীব্রুসাহিত্যের চর্চা আছে।'

'তা হলে আপনি ইহুদিদের কঞ্জুসী নিয়ে, আপন চেহারার ইহুদিলক্ষণ নিয়ে অত ঠাট্টা-মস্করা করেন কি করে?'

মিটমিট করে হেসে বললেন, 'কেন, শোন নি, স্কচদের সম্বন্ধে যে-সব নূতন নূতন গল্প বেরোয় তার অধিকাংশের জন্মস্থল এবারডান, জনক স্কচরা স্বয়ং? তত্ত্বটার সত্যি মিথ্যে জানি নে, কিন্তু ইহুদির কঞ্জুসী, সে নোংরা—স্নান করে না, যে-দেশে বাস করে সেটাকে মাতৃভূমিরূপে স্বীকার করে না, আরো কত কী—এসব নিয়ে যে-সব গল্প আছে তার একটা বিরাট ভাণ্ডার আছে আমার কাছে। পেয়েছি উত্তরাধিকারসূত্রে ঠাকুর্দার কাছ থেকে এবং এর অধিকাংশই ইহুদিদের তৈরি—কোনো সন্দেহ নেই সে-বিষয়ে। বাবার এসবেতে শখ নেই। তিনি পড়ে আছেন হীব্রুশাস্ত্র নিয়ে, আর অবসর সময়ে ঐ একই অভিনিবেশ সহকারে, জর্মন সাহিত্যচর্চা। কারো সঙ্গে মেশেন না বড় একটা, কিন্তু তোমাকে যতটুকু চিনতে পেরেছি তার থেকে মনে হয়, তোমাকে বাড়ি নিয়ে গেলে তিনি খুশী হবেন। প্রাণ ভরে তাঁর কাছ থেকে জর্মন সাহিত্যের খুঁটিনাটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বের করতে পারবে। আসবে একদিন ডিনারে? বেশ। মাকে শুধিয়ে দিন ঠিক করে তোমাকে বলবো।'

'আচ্ছা, বলুন তো, এদেশে নাকি একটা পোলিটিকাল পার্টি দিন দিন শক্তি

সঞ্চয় করে চলেছে, আর তারা নাকি নির্বিচারে সব ইহুদিদের এ-দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে চায়—যারা পাচ শ' সাত শ' বছর ধরে জর্মনিতে আছে তাদেরও, যারা এক বর্ণ হীব্রু জানে না, সিনাগগে যায় না, নাস্তিক্যবাদের পক্ষ সমর্থন করে প্রামাণিক গ্রন্থ লিখেছে তাদেরও। দোষটা কি ওদের ?'

এই তার মুখ একটুখানি গম্ভীর হল। সেটা যেন মুছে ফেলে মুচকি হেসে বললেন, 'এ তো কিছু নূতন নয়। বাইবেলের "এস্টার" পুস্তিকা পড়েছ ?'

আমি অভিমানের স্বরে বললুম, 'আমি অগা। কিন্তু এস্টার পড়ি নি, এ-সন্দেহ কেন করছেন ? তবে হ্যাঁ, ওল্ড-টেস্টামেন্ট পড়া উচিত, তারই নির্মাতা কোনো ইহুদি রাব্বির কাছ থেকে। আমি পড়েছি খৃষ্টান—তাও লুথেরীয় অর্থাৎ কি না প্রটেস্টান্ট—পাদ্রির কাছে। ওনরা তো এস্টারের ঐতিহাসিকতায় আদৌ বিশ্বাস করেন না।'

'সে-কথা পরে হবে। উপস্থিত অন্তত এটুকু মেনে নিতে পারো, সেখানে যে চিন্তাধারা প্রকাশ পেয়েছে তার অনেকখানি খাঁটি সত্য—তা সে যার মুখ দিয়েই বলানো হয়ে থাক না কেন এবং ইরানের রাজা গ্রীস-মিশর-বিজয়ী Xerxes ইহুদি-বালা এস্টারকে বিয়ে করে থাকুন, আর না-ই করে থাকুন। সেখানে Xerxes (বাইবেলের 'অহস্‌ভেরুস')-এর মন্ত্রী তাঁকে একদিন বললেন, "মহারাজের বিশাল সাম্রাজ্যে এক শ্রেণীর লোক সর্বদাই পাওয়া যায় (ইহুদি) যাদের আইনকানুন অন্য সব জাতদের থেকে ভিন্ন, এমন কি রাজাদেশও তারা মানে না; অতএব এক বিশেষ দিনে এদের সবংশে নির্বংশ করা হোক।"... তখনও প্রভু যীশুর জন্ম হয় নি, খৃষ্টধর্মের সঙ্গে বৈরীভাবের প্রশ্নই ওঠে না, আর, ঐ যে নয়া পলিটিকাল পার্টির কথা বলছিলে, যারা জাতে অ্যারিয়ান—তাদের ভিতর আবার নীল চোখ, ব্লণ্ড চুল-ওলা সর্বশ্রেষ্ঠ নর্ডিক জাত সম্বন্ধে প্রচার করতে গিয়ে তারা পিঠপিঠ বলে ইহুদিরা মানুষ পর্যায়ের নিম্নে (untermensch = under-man) সে পার্টি তো পর্শু দিনের—নিতান্ত শিশু। তা সে যাক্ গে—এই আড়াই হাজার বছরের ইতিহাস জেনে তোমার যে কি লাভ হবে জানি নে। তোমাদের দেশে—'

'হালে আমাদের দেশে ইহুদিরা এসেছে ইয়োরোপ থেকে। তার বহু শতাব্দী পূর্বে ঝড়ের মারে একখানা নৌকায় করে সাতজন পুরুষ আর সাতজন স্ত্রীলোক এসে পৌছয় বোম্বাইয়ের ত্রিশ মাইল দক্ষিণে, অধুনালুপ্ত চেমুল বন্দরের কাছে।[১]

১ মারাঠীতে 'চ' অক্ষরের উচ্চারণ 'ৎস'-এর মত। তাই টলেমি এ বন্দরকে তিমুলা, সিমুল্লা দুই উচ্চারণেই লিখেছেন। চিৎপাবন ব্রাহ্মণদের (টিলক,

শাস্ত্রাদি সব লোপ পায় বলে লোকে এদের ইহুদি পরিচয় পায় নি ; শুধু শনিবারে *এরা বিশ্রাম নিত বলে (ইহুদির সাব্বাৎ) এবং তেলীর ব্যবসা করতো বলে (বোধ হয় মধ্য-প্রাচ্যের অলিভ তেল তৈরির কায়দা এরা তিল-সর্ষের উপর চালায়) এদের নাম হয়েছিল "শনিবার-তেলী"। একশ' বছরও বোধ হয় হয় নি, তর্কাতীত সিদ্ধান্ত হয়েছে, এরা জাত-ইহুদি। কিন্তু এদের পিছনে তো কেউ কখনো লাগে নি—এস্টার কেতাবের পাইকিরি কচু কাটার নৃশংস প্রস্তাব কহাঁসে কঁহা !'

'জানি, তাই বলছিলুম, তোমার কি লাভ ? আর এদেশের আর্যেরা বলেন, ইহুদি লাভ, টাকা, সোনারূপো ভিন্ন অন্য চিন্তা অন্য বস্তু বোঝে না। রূপোর কথাই যদি উঠলো তবে একটি ইহুদি কথিকা—কঞ্জুসীবাবদ—ঠিক পপুলার গল্প নয়, হাফশাস্ত্র বাক্যের মত বলি,—শ্রবণ করো, এবং তারপর—'

ইঙ্গিত বুঝে বললুম, 'যাচ্ছি আপন টেবিলে হীব্রু ব্যাকরণ কণ্ঠস্থ করতে।'

ব্যাগ খুলে একটা আপেল বের করে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'একদা জনৈক অর্থ-পিচেশ মজ্জা-কিপটে কোটিপতি—কখনো কানা কড়িটি দান করেছে এ-কথা তার কোনো হাতই জানে না—এসেছে এক রাব্বির কাছে। জানলার কাছে নিয়ে গিয়ে রাব্বি তাকে বললেন, "বাইরের দিকে তাকিয়ে আমায় বলো, কি দেখতে পাচ্ছো।"

ধনী বললে, "লোকজন—বিস্তর মানুষ।"

রাব্বি বললেন, "উত্তম প্রস্তাব।" তারপর একটা আয়নার সামনে তাকে দাঁড় করিয়ে শুধোলেন, "এবারে কি দেখছ ?"

"আমি নিজেকে দেখতে পাচ্ছি—" বললে কিপটে।

গোখলে ও যদি বেয়াদপি মাফ করেন তবে উল্লেখ করি, অধীনের অধুনা প্রকাশিত 'দু-হারা' পুস্তকের চরিত্র কাণে) অনেকেরই নীল চোখ, কটা চুল ; এদের ভিতরেও কিংবদন্তী, এঁরাও ঝড়ের মারে কোঁকণ অঞ্চলে পৌঁছন।

বরদার সয়াজীরাও যেরকম রমেশ, অরবিন্দ, আম্বেডকরকে পৃষ্ঠপোষকতা দেন, ঠিক তেমনি এই সাত স্ত্রীপুরুষের বংশধর পণ্ডিত কাহিমকরকে বোম্বাই থেকে ধরে এনে বরদা হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত করেন। ভারতবর্ষের এঁরা প্রাচীনতম ইহুদি। এঁরা ইয়োরোপীয় বহু ইহুদির ন্যায় 'ইহুদি' শব্দটাকে অত্যন্ত অপছন্দ করেন এবং নিজেদের 'বেনে-ইজরায়েল' [বেনে—আরবী বিন—ইবন=পুত্র ; ইবন্ বৎতুতা তুলনীয়]='ইজরায়েল-সন্তান' রূপে পরিচয় দেন। আমার পরম সৌভাগ্য বরদাবাসকালীন এই বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা হয়। এই

"ততোধিক উত্তম প্রস্তাব"—বললেন রাব্বি, "এইবারে শোনো, বৎস, কান পেতে মন দিয়ে। জানলার শার্সি কাঁচের তৈরি, আয়নাও কাঁচের তৈরি—তফাৎ কি? আয়নার পিছনে রয়েছে অতিশয়, হাল্কার চেয়েও হাল্কা সা মা ন্য একটু রূপোর প্রলেপ—ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। কিন্তু বৎস, যেই না এল সামান্যতম রূপো, অমি তুমি আর অন্য মানুষকে দেখতে পাও না, দেখতে পাও শুধু নি জে কে॥[২]"[১]

২৩।৪।৬৬

মাটির মানুষটির যৎপরোনাস্তি অনাড়ম্বরে প্রকাশিত বেনে-ইজরায়েল পুস্তিকা ইয়োরোপীয় পণ্ডিতসমাজে, বিশেষ করে রাব্বিদের ভিতর যেন টর্পেডোর মত পড়ে। বস্তুত তারপর যে যা লিখেছেন বিশেষ করে ভিন্ন ভিন্ন এনসাইক্লোপিডিয়ায় —তার বেশীর ভাগ জজ কাহিম্‌করের কাছ থেকে নেওয়া। সপ্রশংস কৃতজ্ঞতা সহ। বরদার দ্বিতীয় ইহুদি ছিলেন জর্মন। এ-লেখনের ডঃ লেভির মত, ডঃ কোন্‌-ভীনার ('কোন্‌-ভীনারের মা' পশু—পঞ্চতন্ত্র, ১ম)। —ইয়োরোপীয় ইহুদি ও কাহিম্‌করের কোঁকণী ইহুদিদের পাল-পরবের ক্যালেণ্ডার ভিন্ন ভিন্ন—আল্লাকে বে-শুমার শোকরিয়া। আমি কখনো বা জজ সাহেবকে নিয়ে কোন্‌-ভীনারের গৃহে, কখনো বা কোন্‌-ভীনারকে নিয়ে জজের বাড়িতে বহু বিচিত্র বহ্বান্ন ভক্ষণ করে—একই পরব দু'-দুবার যথা গোস্বামী মতে ইত্যাদি পালন করে, ধর্ম রক্ষা করতুম। বেনে-ইজরায়েলদের সম্বন্ধে আমার যেটুকু সামান্য জ্ঞানগম্যি সেটুকু সমূচহ জজের খয়রাৎ।

২ এ লেখনের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও আমার অন্তরঙ্গ পাঠকদের না জানিয়ে কিছুতেই থাকতে পারলুম না যে ২৬ মার্চ (১৯৬৬) সন্ধ্যাবেলা প্যারিস বেতার থেকে ইন্দিরাজীর ফরাসীতে প্রদত্ত মঁসিয়ে দ্য গলের অভ্যর্থনার প্রত্যুত্তরের রেকর্ডিং। অনবদ্য রিসেপশনে—কলকাতা 'খ'-এর চেয়ে কোটিগুণে শ্রেয়। ইন্দিরাজীর ফরাসী উচ্চারণ অতি সুন্দর, পরিষ্কার। অনভ্যাসবশত মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছিলেন বটে, কিন্তু উচ্চারণে বিদেশী আড় প্রায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। যুদ্ধের সময় আমি চার্চিলের ফরাসী ভাষণ বেতারে শুনেছি। ইংরিজীর জোরালো একসেণ্ট দ্বারা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা ফরাসী উচ্চারণ। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে, বেতার-যন্ত্রে কান সেঁটে না শুনলে মনে হবে, গাঁক-গাঁক করে ইংরেজ সাবলটর্ন কুচকাওয়াজের 'হুকুমদার' ঝাড়ছে। ফরাসীতে অনুনাসিকের ছয়লাপ। ইংরেজের কাছে সে বহু গোমাংস। অতএব বাংলার 'চাঁদ' যেন ইংরেজের মুখে 'চ্যানড্‌' হয়ে বেরুচ্ছিল। ইন্দিরাজীর ফরাসী উচ্চারণ চার্চিলের চেয়ে ইনফিনিটি পার্সেণ্ট শ্রেয়।

এমেচার ভার্সস স্পেশালিস্ট

সব ব্যাপারেই আজকাল স্পেশালিস্ট। সেদিন মার্কিন মুল্লুকে এক স্পেশালিস্টই আবিষ্কার করেন যে শোভাযাত্রা, বয়কট বা ধর্মঘটে যাঁরা কালো ঝাণ্ডা তুলে হই হই করে, তাদের অনেকেই ভাড়াটে। এ তত্ত্ব আমাদের কাছে নূতন নয়; দিল্লিতে থাকাকালীন স্বর্গত অশ্বিনী গুপ্ত আমাকে দিল্লিতে যে 'হাঙার স্ট্রাইকে'র জন্য প্রতিষ্ঠান আছে, যিনি হাঙার স্ট্রাইক করবেন তাঁর জন্য শামিয়ানা, তাকিয়া-বালিশ, নির্জলা না হলে নিম্বুপানি—তদভাবে জিন্ (যদি তিনি মদ্যপ হন), কারণ বলতে গেলে একমাত্র জিনই সহজলভ্য কড়া ড্রিঙ্কের ভিতর জলের রঙ ধরে, আহারাদি, হ্যাঁ, আহারাদিই বলছি কারণ লুকিয়ে লুকিয়ে হাঙার স্ট্রাইকার যদি খেতে চান তবে গভীর রাত্রে তার সুব্যবস্থা—সেদিকে আমার ভোঁতা দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এবং যিনি আজো এ-প্রতিষ্ঠানটি চালিয়ে যাচ্ছেন, তিনি মার্কিনী স্পেশালিস্ট নন, নিতান্ত দিশী মাল—এবং সর্বোপরি তিনি 'এমেচার'!

এসব তো মস্করার কথা—যদিও দুটোই ভাহা 'ইমানসে' সত্য। তবে দিল্লির প্রতিষ্ঠানটি নাকি 'সদাচার কদাচারে'র উৎপাতে এদানিং বড়ই উৎপীড়িত ('তংগ্ আ গয়ে'); তার অর্থ অবশ্য এ-নয় যে 'হাঙার স্ট্রাইক' করার কারণের কিংবা/এবং অকারণের অজুহাত অছিলার অভাব ঘটেছে, কিংবা 'হাঙার-এর' হাঙরদের ক্ষুধা নিবৃত্তি ঘটেছে—আসল কারণ ওটা নাকি রেশনড্ হয়ে গিয়েছে, 'অর্থাৎ হাঙার স্ট্রাইক', 'ফাস্ট্ আন্ টু ডেথ' এসব করতে হলে সেগুলো এখন করবেন সরকার স্বয়ং! আনাড়ি এমেচারদের হাতে আর এ-সব টপ প্রায়োরিটির বস্তু ছেড়ে দেওয়া যায় না। দেশ-বিদেশে বড্ড বেইজ্জতী হয়। আইরল্যাণ্ডের কে যেন ম্যাকস্থইনি না কি যেন নাম সে নাকি বাষট্টি বা বিরানব্বই দিন নাগাড়ে উপোস মেরেছিল—এমতাবস্থায় ভারত যদি বাহান্ন দিনের রেকর্ড দেখায় তবে সেটা হবে সত্যই 'শরম্‌কী—' থুড়ি 'লজ্জাকী, ঔর আফসোস—' থুড়ি 'পশ্চাত্তাপকী বাৎ'।

তৎসত্ত্বেও এমেচারকে ঠেকানো যায় না—বারট্রাণ্ড রাসলের মত নিরহঙ্কার লোক পর্যন্তও চেষ্টা দিয়ে হার মেনেছেন।[১] স্বয়ং রবি ঠাকুর এই এমেচারি কর্মে

১ এ বাবদে তাঁর বিদকুটে রায়: সর্ব পণ্ডিত যখন কোনো তত্ত্ব এক বাক্যে স্বীকার করে নেন, তখন তুমি এমেচার সেখানে ফপরদালালী করতে যেয়ো না। আর যেখানে তাঁরাই একমত হতে পারছেন না সেখানে তুমি নাক গলাতে যাও কোন্ দুঃসাহসে? এর বিগলিতার্থ তুমি এমেচার ঠোঁট দুটি সেলাই করে বসে

বড্ডই সুখ পেতেন। আমি তামা-তুলসী স্পর্শ করে একশ' বার কিরে কাটতে রাজী আছি, তাঁকে মধ্যম শ্রেণীর হোমেওপ্যাথ ডাক্তার বললে তিনি সেটাকে কবিতায় নোবেল প্রাইজ পাওয়ার চেয়ে লক্ষ গুণে শ্লাঘনীয় বলে মনে করতেন। ঠিক তেমনি স্পেশালিস্ট সত্যেন বোস তাঁকে দিলেন টুইয়ে—বিজ্ঞান শিখতে নয়, সেও না হয় বুঝি—শেখাতে। অর্থাৎ 'মেস্টারি' করতে। তাহলে পাঠ্য-পুস্তকের প্রয়োজন। বাজারে যেগুলো মেলে সেগুলো লিখেছেন বটে বিশেষজ্ঞরা —একশ' বার মানি—কিন্তু যে বাঙলা ভাষায় লিখেছেন সেটা, ঐ যে ফরাসীতে বলে, 'ইল্‌জ এক্রিভ ফ্রাঁসে কম্ লে ভাশ্ এস্পানিয়োল'—তেনারা ফরাসী লেখেন স্প্যানিশ গাইয়ের মত।[২] রবি ঠাকুর আর যা করুন, তাঁর বাঙলাটা অন্তত বোধগম্য হবে। থাক না দু-পাঁচটা ভুল এদিক ওদিক। সেগুলো মেরামত করার জন্য তো ঐ হোথায় সত্যেন বোস বসে।

যৌবনে রবীন্দ্রনাথ একদিন শব্দতত্ত্ব নিয়ে তর্কাতর্কির দায়ে মজে যান। বৃদ্ধ বয়সে—বোধ হয় সুনীতিবাবু এবং/কিংবা গোঁসাইজীর প্ররোচনায়—তাবৎ বাঙলা ভাষাটা নিয়ে খুব একচোট তলওয়ার খেলা দেখিয়ে দিলেন। আহা সে কী স্বচ্ছ সুন্দর তরল ভাষা—যেন বোতল থেকে তেল ঢালা হচ্ছে। কে বলবে, বিষয়বস্তু নিরস শব্দতত্ত্ব—হুস্ হুস্ করে পাতার পর পাতা সিনেমার ডেলি ক্যালেণ্ডারের পাতার পর পাতা ওড়ার মত পেরিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ দুম করে সম্বিতে ফিরে

থাকো। এমন কি কেউ যদি বলে, Fine Weather—eh? তুমি হাঁ না বলতে পারবে না। তুমি ওয়েদারের জানো কি? প্রথম শ্রীনিজকে শুধোবে আবহাওয়ার দফতরে। তারা যদি বলে 'ফাউল' তবে ফাউল—তা তুমি যেখান থেকে কথা বলছো সেখানে থাক না মলয় পবন আর সূর্যাস্তের লালিমায় রঙিন গোলাপী আকাশ। এস্তেক তোমার নাম যদি 'অতুল' হয়, তবে তোমার বিপদ প্রত্যাসন্ন। শিশির ভাদুড়ী বলতেন অ (ঘর-এ যে 'অ' উচ্চারণ), আর রবি ঠাকুর বলতেন 'ওতুল'—কিন্তু তিনিও আবার 'ওতুলনীয়' না বলে বলতেন 'অতুলনীয়'। অর্থাৎ বারট্রাণ্ড রাসলের অনুশাসন মানলে তোমাকে নাম বদলে 'মাকাল-টাকাল' কিছু একটা 'দশদিশি নিরদ্বন্দ্বা' নাম রাখতে হবে।

২ আমার টায়-টায় মনে নেই তবে রাজশেখর লেখেন, 'নেত্রজনের উপস্থিতিতে অসিতলীনের উপর কুলহরনীর প্রতিক্রিয়া' শুনে মনে হয় সকলের সজাগ দৃষ্টির সামনে (এখানে পাঠক আমার তরফ থেকে একটা ভদ্রজনোচিত গলাখাঁকরি অনুমান করে নেবেন। ধন্যবাদ।) কোনো একটা বেহেড্

আসবেন। এমেচার আর্টিস্ট যেন লাজুক হাসি হেনে ঘন ঘন করতালির মধ্যিখানে শেষ বক্তব্য নিবেদন করছেন। কি বলছেন? বলছেন, তিনি শব্দতাত্ত্বিক নন্—নিতান্ত এমেচার—তাই খুব সম্ভব হেথা হোথা বিস্তর গলদ থেকে যাবে।

তারপর তিনি যে মুষ্টিযোগের শরণ নিয়েছেন সেইটে তিনি কালিদাসের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছেন। সেটা তাঁর শক্তি (fort)ও বটে, দুর্বলতাও —যদি অপরাধ না নেন—বটে কিন্তু এস্থলে তিনি যে তুলনাটি ব্যবহার করেছেন সেটি উপমা কালিদাসন্তকেও হার মানায়। তিনি বলছেন, 'কোনো কোনো বিখ্যাত রূপশিল্পী শরীরতত্ত্বের যথাতথ্যে ভুল করেও চিত্রকলায় প্রশংসিত হয়েছেন, (যেমন সেজানের ওয়েস্ট কোট-পরা ছোকরাটির হাত আজানুলম্বিত না বলে আগুলফ-লম্বিত বললেই ঠিক হয়—কিন্তু তৎসত্ত্বেও ছবিটি রসে ভর্তি—যাকে আজকের দিনে 'রসোত্তীর্ণ' বলা হয়।) ঠিক তেমনি কবির ভাষা সম্বন্ধে এ-বইয়ে দু-পাঁচটা ভুল বা অর্ধসত্য পরিবেশিত হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু এসব ভুল মেনে নিয়েও দেখা যায় এরকম তুলনাহীন প্রবন্ধ হয় না। কারণ তথ্য-পরিবেশনে অসম্পূর্ণতা থাক আর নাই থাক, সবসুদ্ধ মিলিয়ে প্রবন্ধটি বাঙলা ব্যাকরণ (খাঁটি বাঙলা ব্যাকরণ—বাঙলার ছদ্মবেশ পরে সংস্কৃত ব্যাকরণ নয়।) এবং খাঁটি বাঙলা অলঙ্কার নিয়ে এক অভূতপূর্ব রচনা। যেমন তিনি বলছেন, চলতি বাঙলাতে গুরুচণ্ডালী এখন আর দোষের মধ্যে গণ্য নয়।

ঠিক এই জিনিসটেই আমরা অন্যান্য সাহিত্যিকের কাছে প্রত্যাশা করি। কারণ সাহিত্যিকের সঙ্গে ভাষার যে পরিচয় হয় সেটা আদৌ শব্দতাত্ত্বিক বা ভাষাতাত্ত্বিকের মত নয়। সে ভাষা ব্যবহার করে নূতন নূতন সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে। তাই তার ভাষা সদা পরিবর্তনশীল। অত্যুত্তম গ্রন্থ লিখে ভাষাবাবদে আপামর জনসাধারণ তথা বৈয়াকরণিকের অকুণ্ঠ প্রশংসা পেলেও লেখক তার পরবর্তী পুস্তকে সেই অনুমোদিত ভাষার পুনরাবৃত্তি করতে চায় না, রবীন্দ্রনাথের তুলনায়, আপনার মালের রিসীভার অব স্টোলেন প্রপার্টি হতে চায় না। তাই তাকে প্রতিদিন নিত্য নবীন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এবং সেখানে সে কোনো

বেলেল্লাপনা। উহুঁ, আপনার পাপ মন, পাঠক, আপনার পাপ মতি। ওর অর্থ হচ্ছে—আবার বলছি টায়-টায় মনে নেই—The reaction of chlorine (কুলহরনীর) on acitylene (অসিতলীন) where nitrogen (নেত্রজন) is present.

বৈয়াকরণিক, কোনো শব্দতাত্ত্বিকের সাহায্য পায় না। তাই প্রাচীন লেখক— যখন নূতন শব্দভাণ্ডার নূতন বচনভঙ্গী নিয়ে পুনরায় একখানা সার্থক গ্রন্থ লেখেন, তখন সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে ভাষারও শ্রীবৃদ্ধি হয়। এ কর্ম শব্দতাত্ত্বিক করতে পারেন না—অবশ্য তিনি যদি সাহিত্যিকও হন ও তাঁর তত্ত্বগ্রন্থখানি সাহিত্যের পর্যায়ে তুলতে পারেন তবে অন্য কথা।

তাই ভাষার নব নব রূপ দেখাবার জন্য সাহিত্যিককেও এমেচারি শব্দতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে হয়।

এবং শুধু সাহিত্যিকই না, যে-ব্যক্তিই জ্ঞান-বিজ্ঞান বা অন্য যে-কোনো চিন্ময় বিষয় নিয়ে চিন্তা করেন, আলোচনা করেন, তাঁকেই কিছু-না-কিছু শব্দতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে হয়। এই তত্ত্বটি আজ হঠাৎ আমার চোখের সামনে জলজল করে ফুটে উঠলো, মুসলমানদের সন্ত ইমাম আবু হানীফার বিরাট ন'ভলুমী গ্রন্থের একটি জায়গা পড়ে।

ইমাম আবু হানীফা শিষ্যসমাবৃত হয়ে প্রতি প্রাতে বসতেন মুসলিম ধর্ম আলোচনায়। তাঁর রায় লিখে রাখা হত তো বটেই, তাঁর প্রধান শিষ্যদের কেউ ভিন্ন রায় (মিনিট অব ডিসেণ্ট) প্রকাশ করলে সেটিও সযত্নে পাশাপাশি লিখে রাখা হত।

একদা প্রশ্ন উঠলো, 'নগরে জুম্মার নমাজ অবশ্য পালনীয় ; কিন্তু গ্রামে জুম্মার নমাজ হয় না'—এ-আদেশ শিরোধার্য করবো কি না ? ইমাম সাহেব বললেন, 'শিরোধার্য করা, না-করার পূর্বে প্রথম দেখতে হবে "নগর" বলে কাকে, আর "গ্রাম" বলে কাকে ?' জনৈক শিষ্য বললেন, 'অভিধান দেখলেই হয়।' এবারে ইমাম যা বললেন, সেটি মোক্ষম তত্ত্বকথা—সর্বভাষাতে সর্বকালে প্রযোজ্য। তিনি বললেন, 'কোষকার দেবে সাধারণ প্রচলিত অর্থ। পক্ষান্তরে আমরা ধর্মশাস্ত্রের অধ্যায়ন করে জনসাধারণের জন্য অনুশাসন প্রচার করি (অর্থাৎ আমরা theologians,) ; থিওলজিয়ানের দৃষ্টিবিন্দু থেকে কোন্‌টা শহর—যেখানে জুম্মার নমাজ সিদ্ধ—এবং কোন্‌টা গ্রাম যেখানে জুম্মার নমাজ অসিদ্ধ—তার শেষ বিচার তো আমাদের হাতে।'

অত্যন্ত খাঁটি কথা। যেমন ধরুন গরুর বাথান, যেখানে রাখালরা শীতকালে থাকে। সেটাকে হয়তো গ্রামের পর্যায়েও ফেলা যাবে না। কিংবা উত্তম মরুদ্যান পেয়ে হাজার লোকের কাফেলা (ক্যারাভান) কয়েক দিন বিশ্রাম করলো। সেখানে জুম্মার নমাজ সিদ্ধ না অসিদ্ধ ?

ইমাম সাহেব বলছেন, থিয়োলজিকাল অর্থে কোন্‌টা গ্রাম, আর কোন্‌টা

শহর, তার সংজ্ঞার (definition-এর) জন্য কোষকার তো আসবে আমাদেরই কাছে।

ঠিক তেমনি আইনজ্ঞ পণ্ডিতরা সংজ্ঞা দেন কোন্‌টা crime, আর কোন্‌টাই বা tort ; তবে তো কোষকার সেটা তার অভিধানে লিপিবদ্ধ করে। সে তো আর বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রত্যেকটিতে বিশেষজ্ঞ নয় যে, নিছক আপন বুদ্ধির উপর নির্ভর করে প্রত্যেক শব্দের সংজ্ঞা দেবে, বর্ণনা দেবে, প্রতিশব্দ দেবে।

ঠিক এই জিনিসটি বাঙলা দেশে এখনো আরম্ভ হয় নি।

সবাই তাকিয়ে আছেন কোষকারের দিকে। সে পরিভাষা বানিয়ে দেবে। আর সে বেচারী তাকিয়ে আছে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, চিকিৎসা, আইন ইত্যাদির পণ্ডিতদের দিকে। তাঁরা সংজ্ঞা দেবেন—এবং তাঁদের অধিকাংশই শব্দ বা ভাষা-তাত্ত্বিক নন, সে বাবদে নিতান্তই এমেচার—তবে তো কোষকার সেগুলো লিপিবদ্ধ করবে ॥

মিজোর হেপাজতী

নেফা অঞ্চল বাদ দিলে আসামে যে কটি পার্বত্য অঞ্চল গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য ধারণ করে, তার ভিতর পড়ে খাসিয়া, গারো নাগা ও লুসাই। এর সঙ্গে ত্রিপুরার কুকি অঞ্চলেরও নাম করতে হয়, কিন্তু নানা কারণে সেখানকার কুকিরা এযাবৎ কোনো সমস্যার সৃষ্টি করে নি—এবং যেহেতু ত্রিপুরা আসামের অংশরূপে গণ্য হয় নি, তাই সে-দেশ এ প্রবন্ধের আলোচ্য নয়। কিন্তু মণিপুর সম্বন্ধে এস্থলে কিছু না বললে তাদের ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম তথা বাঙালী ধর্মপ্রচারকদের প্রতি অবিচার করা হয়।

আসামের অন্যান্য পার্বত্য জাতির মত মণিপুর অনুন্নত নয়। মহাভারতের অর্জুন-চিত্রাঙ্গদার মণিপুর ও বর্তমান মণিপুর একই কিনা সে নিয়ে তর্কাতর্কি করার শাস্ত্রাধিকার আমার নেই—এবং যেহেতু মণিপুর অধীনের জন্মভূমির প্রত্যন্ত ভূমিতে অবস্থিত, সে তার প্রতিবেশীকে অহেতুক ক্ষুব্ধ করতে চায় না, কিন্তু এ কথা সত্য যে, যদ্যপি সাধারণ মণিপুরীদের চেহারার ছাপ মঙ্গোলীয়, ওদের ভিতর হঠাৎ বিশুদ্ধ আর্য টাইপও পাওয়া যায়—এবং যেহেতু পার্শ্ববর্তী আর্য বাংলা-ভাষাভাষী সিলেট কাছাড়ে এ টাইপ দুর্লভ, তাহলেই প্রশ্ন উঠবে, কান্যকুব্জ অঞ্চলের এই আর্য টাইপ হঠাৎ মণিপুরে আবির্ভূত হল কি প্রকারে? পশ্চিম-

বাংলার সঙ্গে মণিপুরের সরাসরি যোগসূত্র না থাকা সত্ত্বেও বাঙালী আজ মণিপুরী নৃত্যের কথা ও সে নৃত্য যে রাধাকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে জন্ম ও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছে, সে-কথা জানে—বস্তুত ভারতবর্ষে অধুনা যে চার রকমের শাস্ত্রীয় নৃত্যপদ্ধতি স্বীকৃত হয়, এ নৃত্য তারই অন্যতম—কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম মণিপুরে প্রচার ও প্রসার লাভ করে অষ্টাদশ শতাব্দীতে, অতএব এ নৃত্যকে আড়াই হাজার বছরের ঐতিহ্য দিয়ে মহাভারতের সঙ্গে সংযুক্ত করা কঠিন।[১]

কিন্তু এহ বাহ্য। আসল প্রশ্ন এই: ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে রাজাদেশে মণিপুর যে বৈষ্ণবধর্ম 'রাষ্ট্রধর্ম'-রূপে গ্রহণ করল সেটা সম্ভব হল কি প্রকারে? আসামের আর পাঁচটা পার্বত্য জাতি যে রকম আর্য জনপদ থেকে দূরে হাজার হাজার বৎসর ধরে আপন আপন প্যাটার্ন অব্ কালচার বুনে যাচ্ছিল মণিপুরও করছিল তাই। তাদের মাঝখানে একমাত্র মণিপুরই বা বৈষ্ণব হয়ে গেল কেন? এ কথা সত্য যে শিলচর থেকে মণিপুর পৌঁছানো সহজতর। কিন্তু মৈমনসিং থেকে গারো পাহাড় যাওয়াও তো কঠিনতর নয়, গারোরা অতিশয় শান্তিপ্রিয় এবং দু-একটি গারো মুসলমানের সঙ্গেও আমার আলাপ-পরিচয় হয়েছে। পক্ষান্তরে নেফার অধিবাসীদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনা করা কঠিনতর; অথচ লোকমুখে শোনা, সেখানকার কোনো কোনো উপজাতি সর্ববাবদে অ-হিন্দু হয়েও মাথার এক দিকের খানিকটা চুল কামায় ও চিহ্নস্বরূপ দেখিয়ে বলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নাকি তাদের অর্ধ-হিন্দুরূপে পরিণত করে বলেন যে, তিনি আবার এসে তাদের পূর্ণ-হিন্দু করে দেবেন—তারা এখনো সেই প্রতীক্ষায় আছে। তা সে যা-ই হোক, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের বাঙালী শিষ্যেরাই যে মণিপুরে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মণিপুরী ভাষা বাংলা অক্ষরে লেখা হয়; পক্ষান্তরে পরবর্তী যুগে খৃষ্টান মিশনারিরা পার্বত্যবাসীদের খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করার পর তাদের

---

১ দক্ষিণ ভারতের ভরতনাট্যম নিয়ে যতখানি গবেষণা এই উত্তর ভারতেই হয়েছে, এই উত্তর ভারতের ঘনিষ্ঠতর মণিপুরী নৃত্য নিয়ে তার এক-দশমাংশও হয় নি। এ নৃত্য সত্যই রহস্যময়। মূল নৃত্য শান্ত ও লাস্যরসাশ্রিত কিন্তু প্রারম্ভিক অবতরণ নৃত্য (এর টেক্‌নিকাল নামটি আমি ভুলে গিয়েছি) অত্যন্ত প্রাণবন্ত, দুর্দান্ত—তাণ্ডব নৃত্যের কাছাকাছি এবং পার্শ্ববর্তী অনুন্নত অঞ্চলের সংগ্রাম-নৃত্যের সঙ্গে সাদৃশ্য ধরে। হয় তো বৈষ্ণব হয়ে যাওয়ার পরও মণিপুরীরা তাদের প্রাচীন ঐতিহ্যগত পার্বত্য নৃত্য ত্যাগ করতে চায় নি বলে 'অর ছ ভ্র' রূপে—প্রস্তাবনারূপে—সেটিকে রক্ষা করেছে।

ভাষা রোমান বা অন্তকার দিনের ইংরিজী অক্ষরে লেখেন।[২]

কিন্তু সব চেয়ে বড় তত্ত্বকথা, মণিপুরবাসী বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করতে (এবং পরবর্তী যুগে কাছাড়ে আশ্রয়গ্রহণকারী কিছু মণিপুরী ইসলাম গ্রহণ করাতে) কোনো সভ্যতা-সংস্কৃতিগত বা অর্থনৈতিক সমস্যা সৃষ্ট হয় নি। রাজনৈতিক সমস্যার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, কারণ বাঙালী মিশনারিরা মণিপুরের সিংহাসনে কোনো বাঙালীকে বসাতে চান নি। অর্থনীতির দিক দিয়ে দেখতে গেলে মণিপুরবাসী ও পার্শ্ববর্তী কাছাড়বাসীর মধ্যে দ্রব্যবিনিময়ের ফলে উভয়েই উপকৃত হন। এই অর্থনৈতিক দিকটা পাঠক বিশেষভাবে মনে রাখবেন। আমার মনে হয়, নাগা এবং মিজোদের অর্থনৈতিক সমস্যাটা কেউ সবিশেষ চিন্তা করে দেখেন নি।

আমার বাল্যকালে সিলেট জেলার একাধিক জায়গায় নিয়ত বর্ধিষ্ণু খৃষ্টান মিশন ছিল এবং সে যুগে ভারতের তাবৎ প্রটেস্টান্ট্ মিশনারিদের ভিতর দক্ষিণ-শ্রীহট্টে কর্মরত ওয়েল্‌শ্ মিশনের (এখনো মিজোদের ভিতর এই মিশনই সর্বপ্রধান এবং যে ক'জন মিশনারির খবর অধুনা পাওয়া যাচ্ছিল না তাঁরা খুব সম্ভব এই মিশনেরই।) রেভারেণ্ড পিন্‌গোয়র্ন জোন্‌স্, তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতা—বাংলা, ইংরেজী, ওয়েল্‌শ্ তিন ভাষাতেই—চরিত্রবল ও ধর্মানুরাগের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। আমি পাঠশালা যাবার সময় থেকেই তাঁর গির্জা ও সান্‌ডে স্কুলের রীতিমত অনুরাগী অংশগ্রহণকারী ছিলুম বলে প্রায়ই টিলার উপরে অবস্থিত তাঁর ছিমছাম বাংলোতেও যেতুম। মিশনে বাস করতো আরো বিস্তর ছেলেমেয়ে—প্রধানত চা-বাগিচার সাহেব ও দিশী রমণীর মিলনজাত পুত্রকন্যা এবং কিছু কিছু খাসিয়া, গারো, নাগা ও লুসাই (মিজো) খৃষ্টান। খাস বাঙালী প্রায় চোখেই পড়ে নি। আমি বিশেষ করে এই পার্বত্য খৃষ্টানদের সম্বন্ধেই কৌতূহলী ছিলুম এবং হাইস্কুলে ঢোকার সময় একটি লুসাই ছেলের সঙ্গে হৃদ্যতা হয়। সে সময় লুসাই ভাষা

---

২ এ যুগে মণিপুরে যে রকম হঠাৎ বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে হিন্দুধর্ম প্রচারিত হয়, সে রকম উদাহরণ কা অদূর অতীত কী বর্তমানে আমি অন্যত্র কোথাও পাই নি। মালকানা রাজপুতদের অল্পসংখ্যক লোকই বিংশ শতাব্দীতে 'আর্য-সমাজে' দীক্ষা নেয়। শিলঙ শহর প্রায় শত বৎসর ধরে হিন্দুপ্রধান। সেখানে ব্রাহ্ম ও ইসলাম মিশন স্থাপিত হয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত খৃষ্টান মিশনারিরাই সব চেয়ে বেশী সাফল্য অর্জন করেন। এখনও আসামের সর্ব পার্বত্য অঞ্চলে খৃষ্টান মিশনারিই অগ্রগামী—এবং কোনো কোনো লাগোয়া সমতল ভূমিতেও।

শিখতে গিয়ে—যদিও শেখা হয় নি—আবিষ্কার করি যে, অন্তত লুসাই ভাষাতে বাংলার বহু বহু শব্দের কোনো প্রতিশব্দ নেই (পরে জানতে পারি, অলিখিত ভাষা মাত্রেরই সাধারণত এই হাল)।

জোন্‌স্‌ সায়েব থাকতেন ছিমছাম বাংলোয়, জানলায় পর্দা টানানো। সায়েব-মেম খানা খেতেন ছুরি-কাঁটা দিয়ে, ধবধবে সাদা টেবিলক্লথে ঢাকা খানা-টেবিলের পাশে। আমার বয়স তখন তেরো। কিন্তু তখনই মনে হয়েছিল, ধর্মযাজকের এতখানি বিলাস ভালো না—বিশেষ করে তিনি যখন মিশনের আর সবাইকে তাঁর মত 'বিলাসে' রাখতে পারেন না। (পরবর্তী যুগে ইংলণ্ড এবং কন্টিনেন্ট ঘুরে বুঝতে পারলুম, জোন্‌স্‌ সায়েব তাঁর দেশের পাদ্রী-ভাইদের তুলনায় কতখানি আত্মত্যাগ করে ওই বিদেশ-বিভূঁইয়ে কতখানি সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন ; তাঁর আত্মাকে স্মরণ করে আজ ক্ষমা ভিক্ষা কার)।

আমার এবং আমার হিন্দু-মুসলমান বন্ধুদের মনে পাদ্রী সায়েবের ছিমছাম বাড়ি, আসবাবপত্র কোনো প্রলোভনের উদ্রেক করতো না। আমরা যেন কিছুটা বুঝে কিছুটা না বুঝে মনে মনে যুক্তি করতুম, 'খৃষ্টান হলে এ সব পাওয়া যায় ; কিন্তু আমরা তো ধর্ম বেচতে চাই নে।' তাই বোধ হয় জোন্‌স্‌ সায়েব তাঁর জোরদার বাগ্মিতা-শক্তি দ্বারাও কোনো বাঙালী হিন্দু-মুসলমানকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে পারেন নি—করে থাকলেও অত্যন্ত দুঃস্থ দূর গ্রামাঞ্চলের তথাকথিত নিম্নতম শ্রেণীর মধ্যে। আমরা কখনো তার খবর পাই নি।

আমার কিন্তু মনে প্রশ্ন জাগতো, মিশনের এই খাসি লুসাইরা কি জোন্‌স্‌ সায়েবের মত ফিটফাট বাড়িতে থাকতে চায় না ?

মণিপুরে যে সব বৈষ্ণব 'মিশনারিরা' গিয়েছিলেন তাঁরা নিশ্চয়ই সেখানে কোনো উচ্চতর মানের জীবনযাপন করেন নি। বস্তুত আজও মণিপুরের গ্রামবাসী সুর্মা উপত্যকার চাষার চেয়ে অনেক সচ্ছল। কাজেই এ নিয়ে কোনো দ্বন্দ্ব সেখানে উপস্থিত হয় নি।

কিন্তু নাগা-লুসাইদের মধ্যে কি হল ?

যারা লেখাপড়ায় সামান্য ভালো—এ কথা মানতেই হবে, খৃষ্টান মিশনারিরা তাঁদের সামর্থ্যে যতখানি কুলোয় ততখানি অর্থ শিক্ষার জন্য পাহাড়ে পাহাড়ে ঢেলে দিয়েছিলেন এবং একদা সেখানে সাক্ষরের সংখ্যা বাংলার তুলনায় ছিল বেশী—তারা কোহিমা আইজলে পড়তে এল, পরে শিলঙে এবং কেউ কেউ কলকাতা পর্যন্ত। এবং যারা আপন গ্রাম থেকে বেরুলো না, তারা অন্তত পাদ্রী সায়েবের বাড়ি, তাঁর তৈজসপত্র দেখেছে। শিলঙে যে দু-চারজন চাকরি

নিয়ে থেকে গেল তাদের কথা আলাদা, কিন্তু যারা বাড়ির টানে গাঁয়ে ফিরে গেল, এবং যারা গাঁয়েই ছিল এদের অনেকেই কি তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নততর করে পাদ্রী সায়েবের মানের কাছে আসতে চাইলো না ?

এ তো আমাদের চোখের সামনে নিত্য নিত্য ঘটছে। আমাদেরই গ্রামের ছেলে শহরে এসে আর গ্রামে ফিরে গিয়ে নিম্নমানের জীবনযাপন করতে চায় না। বস্তুত ফ্রান্স, জর্মনি সর্বত্রই ক্রন্দনরব উঠেছে, গ্রামের বুদ্ধিমান কর্মঠ ছেলে মাত্রই আর গ্রামে ফিরে যেতে চায় না। পড়ে থাকে নিষ্কর্মাগুলো। দি ভিলেজেস আর বীইং ড্রেনড্ অব দেয়ার ব্রেনস—শহর ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে গ্রামের প্রতিভাকে। বিশ্বব্যাপী এই যে একতরফা ভাটা, এরই ফলে যে গ্রামোন্নয়ন করা যাচ্ছে না এ সম্বন্ধে 'উনেস্কো' বহুকাল ধরে সচেতন, বিস্তর গবেষণা করেছেন, দাওয়াই খুঁজে পাচ্ছেন না।

কিন্তু এই সমস্যা নিয়ে আমাদের মধ্যে মারামারি খুনোখুনি হয় না, কারণ, যে গ্রামের ছেলে শহরে থাকতে চায় তার জন্য আশেপাশে বিস্তর ছোট-বড় শহর আছে—বোলপুর, শিউড়ি, বর্ধমান, শেষটায় যদি তাতেও প্রাণ না ভরে, তবে কলকাতা। রেলের চাকরি করে ভাগলপুর, পাটনা হয়ে কত কী!

কিন্তু মিজো-লুসাইবাসী যাবে কোথায় ? আইজল, লুঙলে তাদের কি দিতে পারে ? তারপর শতাধিক মাইলের ধাক্কা পেরিয়ে শিলচর—সে আমাদের সিউড়ি-বর্ধমানের তুলনায় কসমপলিটান শহর বটে—কিন্তু তারই বা মুরদ কতটুকু ? তার নিজেরই দুঃখের অবধি নেই। আসাম সরকার তাকে—যাক্, আবার না আরেকটা বাঙ্গাল খ্যাদানো আরম্ভ হয়ে যায় (ভালো তো কারো করতেই পারি নে, মন্দটা না-ই বা করলুম!), আর কেন্দ্রীয় সরকার ? কতবার বুঝিয়েছি, এই শিলচরে বেতারের কেন্দ্র বানিয়ে নাগা-লুশাইদের কন্ট্রোল করো—কে বা শোনে কার কথা (এস্থলে বলে রাখা ভালো আমার জন্মভূমি কাছাড় নয়)! থাক সে কথা। মিজো যদি বা শিলচর পেরুতে চায় তবে সামনে যে খাঁড়া পাঁচিল—হিল্ সেক্‌শন—তারপর সেই সুদূর গৌহাটি। এখানে খাসিয়াদের সঙ্গে তুলনা করলেই দেখা যাবে, একে তাদের চাষের পদ্ধতি উন্নত, শিলঙ গৌহাটির ভাষা তারা মোটামুটি জানে, জিনিসপত্র সেখানে বেচতে পারে, চাকরিনোকরি মিস্ত্রিগিরি করে পয়সা কামাতে পারে। আর শিক্ষিত সম্পদশালী বহু খাসিয়া শিলঙ শহরের পাদ্রীর বাঙলোর চেয়েও ফিটফাট বাঙলোয় বাস করেন। তাই স্বভাবতই খাসিয়ারা অনেকখানি সন্তুষ্ট এবং তাই শান্ত।

কিন্তু মিজো যায় কোথায় ?

১৯১০।১৯১১ থেকে তাদের ভিতর আরম্ভ হয় খৃষ্টধর্ম প্রচার এবং ১৯৩১ নাগাদ অর্ধেক লুসাইবাসী হয়ে গেছে খৃষ্টান। তারপর কি হয়েছে জানি নে। নিশ্চয়ই বেড়েছে। কারণ মিশনারিদের কাজ বন্ধ হয় নি। আদমশুমারীর হিসাব দেখে লাভ নেই। ঐ সময় থেকেই আরম্ভ হয়, পরের সেনসাসে কার স্বার্থ অনুযায়ী কি দেখাতে হবে তাই নিয়ে ছিনিমিনি, ইংরিজীতে যাকে বলে 'কুকিং'।

পার্বত্যাঞ্চলবাসী অনেক সময় আমাদের হিসেবে নিষ্ঠুর কিন্তু তারা সরল। সরল বিশ্বাসে তারা মনে আশা পোষণ করেছিল, যারা তাদের খৃষ্টান করেছে তাদেরই জাতভাই ইংরেজ সরকার একদিন তাদের বাসনা-কামনা পূর্ণ করে দেবে। 'জুম' খেত করে যে তার পয়সায় পাদ্রীর বাঙলো বানানো যায় না সেটা তারা বোঝে না। আমার মনে হয়, ইংরেজ-রাজ থাকলেও আজ না হোক কাল বা পরশু মিজোদের রুদ্ধ আক্রোশ ইংরেজকেই আক্রমণ করতো। তবে ইংরেজ ধাপ্পা মারতে ওস্তাদ—বাঙালীর মত চালাক জাতকেও কতবারই না একটা কুমীরছানাকে বারোটা করে দেখিয়েছে! কবিগুরুর মত বিচক্ষণ জন এবং তাঁর চেয়ে : ঢুঁদে বহু পলিটিশিয়ান 'ব্রিটিশ জস্টিসে' বহুকাল ধরে বিশ্বাস রেখে আশা করতেন, সময় এলে আমরা ইংরেজের কাছ থেকে জস্টিস—সুবিচার পাবো।

অবশ্য এ-কথাও স্বীকার করি—যাঁরা আমার সঙ্গে একমত নন তাঁদের কাছে মাফ চাইছি যে, দেশ-শাসন ব্যাপারে ইংরেজের অনেকগুলো সদগুণ আছে এবং সেই অনুপাতেই আসাম সরকার,—থাক, আবার কেন? তবে আসাম সরকার না হয়ে কেন্দ্রীয় সরকার মিজোদের ভার নিলেই যে মুশকিল আসান হয়ে যেত সেটা আমি বিশ্বাস করি নে। যাই বলুন, যাই কন, আসাম সরকার বাস করেন শিলঙে—খাসিয়াদের মধ্যিখানে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার উত্তরে নেফা অঞ্চলেও রয়েছে আরো গণ্ডায় গণ্ডায় উপজাতি। তাদের অনেকেই প্রতি হাটবারে নেমে আসে সমতলে, ক্ষেতের জিনিস, এটা-সেটা (তখনকার দিনে চামর, মৃগনাভি, হাতীর এবং 'গণ্ডারের দাঁত—ভয়ঙ্কর মূল্যবান জিনিস, মধ্যপ্রাচ্যে 'হারেম' পোষণের জন্য মৃতসঞ্জীবনীর ন্যায় নিত্যকাম্য এফ্রডিসিয়াক ইত্যাদি) বিক্রি করে প্রধানত নুন, কেরোসিন[৩] (সর্বনাশ। আমাদেরই যা হাল, ওদের হচ্ছে

৩ এক সিলেটী মুসলমান ডাক্তার বহু বৎসর আইজল-লুঙলেতে কাটিয়ে এসে আমায় বলেন, মিজোরা দু-দিন তিন-দিনের পাহাড়ের চড়াই-ওৎরাই পথ পেরিয়ে লুঙলে আসতো কেরোসিন কিনতে। সে কেরোসিন আসতো শিলচর থেকে, বেশীর ভাগ পথ মানুষের কাঁধে, বাঁকে করে। একবার একজন বাহকের কলেরা

কি? তবে হ্যাঁ, ডিগবয় ওদের অতি কাছে) কিসে নিয়ে যাবার জন্য। ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকাবাসী আসামীদের অনেকেই তাদের চেনেন। কাছাড়বাসী ক'জন সদস্য আসাম মন্ত্রিমণ্ডলীতে আছেন সঠিক জানি নে ; যে কজন আছেন একমাত্র তাঁরাই ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকাবাসীদের তুলনায় নাগা-মিজোদের বিলক্ষণ চেনেন, সদুপদেশ দিতে পারবেন, অবশ্য শর্ত, যদি কেউ চায়। এঁদের তুলনায় নাগা-মিজোদের সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের জ্ঞান সীমাবদ্ধ—এ বিষয়টি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমাকে বুঝিয়েছিলেন নাগাদের প্রথম গ্র্যাজুয়েট, সে-সময় আপন মাতৃভূমি নাগা পাহাড়েই এস ডি ও শ্রীযুত কে ভি চুসা, ট্রেনে শেয়ালদা থেকে সিলেটের কুলাউড়া পর্যন্ত দিল্লি থেকে মুককচণ্ড ফেরার পথে। সুযোগ পেলে সে কাহিনী আরেক দিন হবে। শ্রীচুসা অর্থনৈতিক দিকটারও উল্লেখ করেন।

মিজোরা সরল বিশ্বাসে ভাবছে, আমরা—তা সে কেন্দ্রীয় সরকারই হোক, আর আসাম সরকারই হোক—বিধর্মী (নাগারাও কড়া সুরে বলে, 'যারা আমাদের সঙ্গে আমাদের গির্জায় গিয়ে উপাসনা করে না তারা আমাদের ঘৃণা করে।' সেটা না হয় করা গেল, কিন্তু খেতেও হবে তাদের সঙ্গে এবং স্বর্গস্থ প্রভু জানেন, একমাত্র চারপাই ছাড়া সর্ব চতুষ্পদই তারা খায়। সঙ্গে সঙ্গে পান করতে হবে শুকনো লাউয়ের পাত্রে ভর্তি ভাত পচিয়ে তৈরী লিটার লিটার বিয়ার। কোহিমার ছোকরা ইংরেজ শাসনকর্তা এ-তিনটির প্রথমটি করে পুণ্যসঞ্চয় করতেন, বাকি দুই বাবদেও তেনারা সমগোত্রীয়, এমন কি প্রয়োজন হলে village belle-কেও তাঁরা নিরাশ করতেন না—কারণ ব্যাচেলার ভিন্ন অন্য কাউকে সেখানে সচরাচর পাঠানো হত না) এবং যেহেতু আমরা বিধর্মী তাই আমরা তাদের ন্যায্য পাওনা দিচ্ছি না। আমরা সরে গেলেই তাদের সর্ব বাসনা কামনা পূর্ণ হয়ে যাবে। মোস্ট প্রিমিটিভ জুম চাষ করে যে এবসার্ড জীবনমান উচ্চ পর্যায়ে তোলা যায় না সেটা বোঝাবে কে?

হয় নির্জন পথিমধ্যে। বাঁশের স্ট্রেচার বানিয়ে অন্য চারজন বেহারা রোগীকে নিয়ে লুঙলে পানে রওয়ানা দেয়—দশ টিন কেরোসিন পায়ে চলার 'পথের' উপর রেখে দিয়ে। গণ্ডায় গণ্ডায় কেরোসিনকামী খৃষ্টান অখৃষ্টান চলেছে লুঙলের দিকে, কিন্তু তাদের ধর্মবোধ এমনই প্রবল যে তারা কেরোসিনের দিকে ফিরেও তাকালো না। বেহারারা লুঙলে থেকে ফিরে এসে সমুচা সব কটা টিন যথাস্থানে পায়—তারাও জানতো, লোপাট হবে না, তাই লুকিয়ে রাখার প্রয়োজনও বোধ করে নি। সেই মিজোরাই এখন লুঙলেতে লুটতরাজ করলো।

অবশ্য মিজোদের অসন্তোষের অন্যান্য কারণও আছে। আমি শুধু একটা কারণ দেখালুম—অন্তত মার্কসিস্টরা খুশী হবেন—তাঁদের অনেকেরই মতে এইটেই একমাত্র কারণ। একমাত্র কারণই হোক আর প্রধানতম কারণই হোক, অর্থনৈতিক কারণটার সন্ধান নেওয়া সর্বক্ষেত্রেই বাঞ্ছনীয়। লেনিনের সমসাময়িক ভিয়েনার অর্থডক্স অর্থনীতি পণ্ডিত শুমপেটার এবং তাঁরই মত কট্টর বার্লিনের জমবার্ট কেউই এই দৃষ্টিবিন্দুটি অবহেলা করেন নি।

স্বীকার করে নিচ্ছি, আমার এ বিশ্লেষণ ভুল হতে পারে, কিন্তু তথ্যগুলো সঞ্চিত হয়েছে বিশ্বস্তজনের কাছ থেকে।[৪]

---

৪ (ক) মিজো প্রবন্ধটি লিখে 'দেশ' দপ্তরে পাঠিয়ে দেবার পর দুটি তাৎপর্যপূর্ণ খবর বেরিয়েছে। প্রথমটিতে মাদ্রাজের প্রাক্তন গভর্ণর শ্রীযুত বিষ্ণুরাম মেধী বলেছেন—'যাতে করে মাল চলাচল জাম্ না হয়ে যায় ("transport bottleneck"), মিজো, নাগা এবং অন্যান্য পার্বত্য অঞ্চলের সঙ্গে রেল-লাইন বসানো উচিত।' তিনি General council meeting of the All-India Railwaymen's Federation-এতে এ বিবৃতিটি দেন ও ২৭ ৩-৬৬র কাগজে এটি বেরোয়। মিজো নাগারা যে রেলের অভাবে বাদবাকি ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন, সে-কথা আমি প্রবন্ধে নিবেদন করেছি।

(খ) পার্বত্য-অঞ্চল সম্বন্ধে ব্যাপক রিপোর্ট দেবার জন্য যে পাটস্কর্ কমিশন নিযুক্ত হয়েছিল তার রিপোর্টের কয়েকটি প্রধান সুপারিশ ৩১ মার্চ বেরিয়েছে। সম্পূর্ণ রিপোর্ট না পড়ে কিছু বলার উপায় নেই, কিন্তু যেটুকু বেরিয়েছে তার থেকে মনে হল 'আধুনিক ঘটনার আলোকে' রিপোর্টটি আউট অব ডেট—তামাদি না হলেও বর্তমানের প্রশ্নবাণ সইতে পারবে না।

১৬।৪।৬৬

আদরের ডাক-নাম য়প্‌প্‌ বা ইয়প্‌প্‌—সারা দেশটা জুড়ে। তোলা-নাম হার ডক্টর ইয়োজেপ (য়প্‌প্‌) গ্যোবল্‌স্‌, রাষ্ট্রের প্রপাগাণ্ডা-মন্ত্রী, রাজধানী বার্লিনের গাওলাইটার (অঞ্চলাধিকারী) এবং ফুরার অ্যাডল্‌ফ্‌ হিটলারের শেষ জুয়ো-খেলার পাশা যখন ব্লাঙ্কো মেরে মেরে যাচ্ছে, তখন সর্বাত্মক, টোটাল ওয়ারের জন্য কুল্লে তাগৎ 'ইকট্টে' করার জন্য সর্বাধিকারী। পার্টির ব্রেন-বাক্সো। শত্রু-মিত্র সবাই এক সুরে বলেছেন, 'হাঁ, প্রপাগাণ্ডা কারে কয়, সে-বস্তু দেখিয়ে গেছে ঐ ব্রেন-বাক্সোটা।' বাক্সোটির এক দিক দিয়ে ঢুকতো সাদামাটা তথ্য, হাফ-তথ্য, ডাহা মিথ্যে, ঘৃতলবণতৈলতণ্ডুলবস্ত্রইন্ধন বেরিয়ে আসতো অন্য দিক দিয়ে। এক-একখানা চাঁছাছোলা, নিটোল, অব্রণ, অনিন্দনীয় কলাসৃষ্টি। দাঁড়ান, এই 'কলা-সৃষ্টি' রহস্যটা একটু গুছিয়ে বলতে হয়—কারণ, এ-বাবদ তাবৎ টেকনিক্যাল টার্ম একমাত্র ফরাসীর মারফতে প্রকাশ করা সম্ভবে। তদুপরি গ্যোবল্‌স্‌ সায়েবের দিলের দোস্ত থেকে জান্‌-এর দুশমন্‌ তক্‌ স্বীকার করেছেন, ভোঁতা হোঁৎকা টিউটন নাৎসী পাঠাদের ভিতর ঐ গ্যোবল্‌স্‌ই ছিলেন একমাত্র জিনিয়াস, যাঁর স্কন্ধে বিরাজ করতো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মস্তিষ্কণ্ডলী পরিপূর্ণ লাতিন মাথা—তাই তাঁর লিখন-কথন উভয়েতেই ছিল, ফরাসীসুলভ স্ফটিক স্বচ্ছতা।[১] এ-কলাসৃষ্টিকে অ্যাভ্‌র্‌ দা'র বলা যেতে পারে, মাস্টার পীস অব আর্ট বললে ঠিক ঠিক মানেটা ওৎরায় 'না। অব্‌জে দা'র শব্দসমষ্টি আমি শুনেছি; এটা বোধ হয় morale-এর মত ইংরিজিতে চালু ভেজাল ফরাসী মাল (আমরা যেরকম কলকাত্তাই উর্দুতে 'একঠো' 'দুঠো'র ভেজাল বরাব্বর ব্যবহার করে আসছি।) অর্থ, যে-কলাসৃষ্টি

১ অক্সফোর্ডের ইতিহাস-অধ্যাপক ট্রেভর-রোপারের মত জর্মনির জাতশত্রু শতেকে গোটেক; তদুপরি তিনি একটি আস্ত স্নবস্য স্নব। তিনি বলেন, 'and it was the Latin lucidity of his (Goebbels') mind, the un-German suppleness of his argument which made him so much more successful as a preacher than the frothblowing nationalists of the South.'

অবশ্য অধ্যাপককে বোঝা ভার। তিনি শতাধিক বার বলেছেন, জর্মনরা অতিশয় অগা জাত। উত্তরে বলি, অগারা পরিষ্কার যুক্তি বোঝে না; রহস্যের সন্ধানে কোটে মাথা। তাই জর্মন দার্শনিকদের ভিতর লাতিন ধরনের স্বচ্ছ লেখক শোপেনহাওয়ার ভোঁতা লেখক হেগেল্‌-এর তুলনায় অবহেলিত।

কোনো কাজে লাগে না, যেমন 'পাপিয়ে মাশে'তে তৈরী কাশ্মীরী ফুলদানি-পাত্র সৃষ্টিছাড়া বস্তু, যেটাতে ফুল রাখা যায় না বটে, কিন্তু দেখতে খাসা। গ্যোবলস্ সায়েবের বেতার বক্তৃতা বা সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বিলকুল বেকার নয়—টায়-টায় কাজে লাগতো। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে তিনি টলস্টয়কে নিশ্চয়ই পরম আপ্যায়িত করতে পারতেন; পার্থক্য মাত্র এইটুকু যে, টলস্টয় তাঁর কলা দ্বারা নির্মাণ করতেন স্বর্গারোহণের সোপান, য়প্‌প্‌ নির্মাণ করতেন রসাতলের খাড্ডায় সবেগে নিপতিত হওয়ার তরে অত্যুত্তম পিচ্ছল সানুপ্রদেশ। আর ইহুদিকুলের কল্যাণার্থে গ্যাস-চেম্বার!

হিটলারের বক্তৃতা-গর্জনও রুদ্রের তাণ্ডব নৃত্যতুল্য প্রলয়ঙ্কর, কিন্তু সেটাকে অত সহজে বিশ্লেষণ করা যায় না। সেটাও কলাসৃষ্টি এবং সেটি য়প্‌প্‌-মার্কার চেয়ে লক্ষগুণে কার্যকরী। কড়া পাক।

দুজনার মুখে একই জিগির: ইহুদিকুল সর্বনেশে। এদের সমূলে বিনাশ করতে হবে।[২]

কিন্তু দুজনের মনের ভিতর দু' প্রকারের যুক্তি। য়প্‌পের বিশ্বাস, ইহুদিরা সর্ব ব্যাপারেই সাতিশয় ধুরন্ধর। এদের সঙ্গে 'নর্ডিক আর্যরা' অর্থাৎ জর্মনরা কিছুতেই পাল্লা দিতে পারবে না। পক্ষান্তরে হিটলার এটা মানতে পারেন না—জান্ কবুল। তাঁর মতে, এই বসুন্ধরায় যে-কটা ডাঙর ডাঙর জাত, গোষ্ঠী, বংশ—যা খুশি বলুন, ইংরেজীতে Race, জর্মনে Rasse—তার মধ্যে 'আর্য'-রেস সর্বোত্তম। এবং সেই আর্য রেসের ভিতর সর্বোত্তমেরও সর্বশ্রেষ্ঠ জর্মনির নর্ডিক, নীল চোখ, ব্লন্‌ড্ (সোনালী, কোনো কোনো ক্ষেত্রে রূপালীও—যেটাকে বলা হয় প্লাটিনাম ব্লন্‌ড্) চুলধারী 'আর্য' রেস। ইহবিশ্বের সর্ববাবদে তারাই সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্পন্ন শক্তিমান যুবার শরীরেও যেমন ক্যানসার দেখা দিতে পারে, ঠিক তেমনি জর্মন সমাজে এসে ঢুকেছে ইহুদি গোষ্ঠী। এরা

২ ন্যুরনবেরগের মোকদ্দমায় যখন আসামী নাৎসিদের বিরুদ্ধে বলা হলো যে তাঁদের ফ্যুরার গুরুই ইহুদিদের ausrotten= 'সবংশে নির্বংশ' করবেন বলে একাধিকবার সর্বজনসমক্ষে পণ করেছিলেন, তখন আসামী পক্ষ বলে, 'ওসব কথার কথা। কেউ যখন বলে, "তোমার চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজাবো" (বাঙলায় বলতে গেলে এই অনুবাদই জুৎসই) তখন অন্য পক্ষ সেটা সিরিয়াসলি শব্দার্থে নিয়ে বিশ্বের তাবৎ ডুগডুগি বানাবার যন্ত্রপাতি বিনষ্ট করতে মাথায় গামছা বাঁধে না।'

ছারপোকার মত ভার্মিন। ছারপোকা বেশী বুদ্ধিমান না মানুষ বেশী বুদ্ধি ধরে, এ প্রশ্ন বুদ্ধিমান মানুষ তুলবে না—বুদ্ধিমান বা মূর্খ ছারপোকা তুলবে কি না, সেটা হিটলার বলেন নি।

য়প্‌প্‌ বললেন, 'এটা হল তুলনা। তুলনা যুক্তি নয়।'

ফ্র্যার বললেন, 'তুলনা মাত্রই তিন ঠ্যাঙের উপর দাঁড়ায়। টায়-টায় যুক্তির স্থান নিতে পারে না সত্য, কিন্তু আপন বক্তব্য জোরদার ও প্রাঞ্জল করার জন্য তুলনার ব্যবহার করেছেন সর্বগুণীজ্ঞানীই।'

য়প্‌প্‌ বললেন, 'তর্কস্থলে মেনে নিলুম।' গ্যোবল্‌স্‌ বড়ই প্রভুভক্ত ছিলেন। নইলে প্রভুর আত্মহত্যার চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর তাঁর ছ'টি শিশুপুত্রকন্যাদের ডাক্তার দিয়ে খুন করিয়ে সস্ত্রীক আত্মহত্যা করবেন কেন ?[৩] বললেন, 'তাই সই। কিন্তু আমি আপনাকে হাতেনাতে দেখিয়ে দেব, ইহুদিরা অন্তত ব্যবসার ক্ষেত্রে আর্যের চেয়ে বেশী বুদ্ধি ধরে।'

'কোনো ক্ষেত্রেই না।'

'বাজী ধরুন।'

'বিলক্ষণ ! কত ?'

'এক লাখ।'

'গেমাখ্‌ট্‌—পাক্কী বাৎ।'

দুজনাতে ছদ্মবেশে বেরুলেন। তার জন্য বেশী বেগ পেতে হল না। এমনিতেই ঠোঁটকাটা বার্লিন-কক্‌নিরা বলতো ফ্যুরারের চুল নেবে পড়ে কপাল ঢাকে নি—এটা অকল্পনীয়; আর গ্যোবল্‌স্‌ এক লহমার তরে বকর বকর বন্ধ করেছে—এটা ততোধিক অবিশ্বাস্য। হিটলার তাই চ্যাটচেটে পমেটম দিয়ে যেন প্রায় ভৈরবচণ্ডীর মত চূড়ো-খোঁপা বাঁধলেন—এবারে আর চুল খসে পড়ে, কপাল ছাপিয়ে চোখ এস্তেক ঢেকে দেবে না। বাস্‌, এতেই হয়ে গেল ছদ্মবেশ। আর য়প্‌প্‌ ? তিনি বললেন, তিনি প্রতি দশ মিনিটে একটি মাত্র সেনটেনস বললেন। এ-রকম বিকট চুপচাপ লোককে কে চিনবে য়প্‌প্‌ বলে !

য়প্‌পেরই প্রস্তাবমত দুজনাতে ঢুকলেন এক পাঁচমিশিলি খাঁটি আর্য দোকানে। চাইলেন একটা টী সেট। দোকানী একটি রমণীয় ট্রের উপর সব কিছু সাজিয়ে সামনে ধরলো। গ্যোবল্‌স্‌ তো তাঁর মুণ্ডটি ডান থেকে বাঁয়ে,

৩ সবিস্তর কাহিনী পাঠক পাবেন, অধীনের 'দু-হারা' পুস্তকে, হিটলারের 'শেষ দশ দিন' প্রবন্ধে।

ফের বাঁ থেকে ডাইনে নাড়িয়ে নির্বাক প্রশস্তি শুনিয়ে দিলেন। তারপর হঠাৎ যেন মনে পড়লো ঐরকম ভাবখানা করে বললেন, 'কিন্তু আমার যে-দোস্তকে আমি এই জন্মদিনের সওগাৎটা দেব তিনি তো ন্যাটা; আপনাদের কাছে কি লেফট-হ্যাণ্ডারদের জন্যে কোনো-টী সেট আছে?' হিটলার বললেন, 'হুঁ।' ভদ্র আর্যসন্তান আমাদের দোকানী তো বেবাক বে-বাক্—অবাক। 'লেফটহ্যাণ্ডারস টী সেট?' সে আবার কি গব্বযন্তণা রে বাপু! বাপের জন্মে নাম এস্তেক শোনে নি। অনেকক্ষণ ঘাড় চুলকে, বিস্তর আন্দেশা করে আপসাআপসি করে সবিনয় জানালে,ঃতার কাছে নেই।

হিটলার দিল্‌দরাজ আদমী। এক গাল হেসে বললেন, 'মাখ্‌ট্‌ নিক্‌স্‌, মাখ্‌ট্‌ নিক্‌স্—বিলক্ষণ, বিলক্ষণ! তাতে এসে যায় না। আমরা অন্য দিন দুসরা জিনিসের জন্য আসবো'খন—খাসা দোকানটি কিন্তু। কি বলো হ্যার ডক্—থুড়ি! ঔফ বীডার জেএন। গুটে নাখ্‌ট্! আসি তবে। হেঁ হেঁ, হেঁ হেঁ।'

এবারে য়প্‌প্‌ প্রভুকে নিয়ে ঢোকালেন এক ইহুদির দোকানে।

দোকানী ছিল না। তার চোদ্দ বছরের ছেলে ছুটে এসে অদৃশ্য শ্যাম্পুতে (কথাটা আজকাল বড্ডই 'ফেশিনিবিল' হয়েছে; আম্মো ব্যাভার করতে চাই) হাত কচলাতে কচলাতে একবারের জায়গায় তিন-তিনবার বলে বসলো, 'য়ুটন ময়েন, য়ুটন ময়েন, য়ুটন ময়েন (গুটন্ মর্গেনের অর্ধশিক্ষিত উচ্চারণ), মাইনে হেরেন্!'

উত্তরে হিটলার বিড়বিড় করে কি একটা বললেন, ঠিক ঠাহর করা গেল না। দক্ষিণের কোনো কোনো ব্রাহ্মণ নাকি একদা রাস্তায় ('সড়ক' 'সরকে' বা 'সরণিতে'—ওঃ! কী স্টর্ম ইন এ টী 'সেট'!) বেরুলে চিৎকার করতেন, অস্পৃশ্য যেন সরে যায়, তার ছায়া যেন ওঁর গায়ে না পড়ে—তবে এদের পঞ্চাশ বা ষাট লক্ষকে বামুন গ্যাস চেম্বারে[৪] খুন করে পুড়িয়েছে একথা কখনো শুনি নি। অতএব হিটলার যে ইহুদি ছোকরাকে হেল-ফেলো-উয়েল-মেট (hail-fellow-well-met) করেন নি, সেটা স্পষ্টই বোঝা যায়। ইহুদি

৪ এর অন্যতম বড়কর্তা হ্যোস ন্যুরনবের্গ মোকদ্দমায় সাক্ষী দেন, এবং পরে এঁর ফাঁসি হয়। দু'জন হাড়ে-পাকা মনস্তত্ত্ববিদ মার্কিন চিকিৎসক এঁকে আগা-পাশতলা পুন লুন পরীক্ষা করেও এঁর ভিতর কোনো কিছু অ্যাব নরমাল পান নি। ইনি বলেন, 'হাজার খানেক মানুষ গ্যাস দিয়ে মারতে আমার ১০ থেকে ১২ মিনিট সময় লাগতো, কিন্তু আসল মুশকিল ছিল এদের পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করা—

ছোকরা কাঁচুমাচু হয়ে বললে, 'আমার বলে দেওয়া উচিত, সরকারের হুকুম, কোনো "আর্য" যদি ইহুদির দোকানে ঢোকেন তবে দোকানদার যেন তাঁকে সতর্ক করে দেয়, এটা ইহুদির দোকান, এখানে কেনাকাটা করলে আর্যই দায়ী। সাইনবোর্ডেও স্পষ্ট করে লেখা আছে, আপনারা হয়তো লক্ষ্য করেন নি।'

হিটলার বিড়বিড় করলেন, 'শোন্ গুট্ শোন্ গুট্'—অনেকটা যেন ঠিক আছে, ঠিক আছে, মেলা বকো না।

টী সেট চাওয়া হল। এল। গ্যোবলস্ ন্যাটার সেট্ চাইলেন।

ছোকরা প্রথমটায় হকচকিয়ে গেল।

পরমুহূর্তেই সম্বিতে ফিরে এক গাল হেসে বললে, 'এখখুনি নিয়ে আসছি, স্যার!' বলে যে সেট ট্রে'র উপর সাজিয়ে রেখে দেখিয়েছিল সেইটে তুলে নিয়ে গুদোমঘরে অদৃশ্য হলো। দু-মিনিট পরেই আরেকটা আরো বাড়িয়া ট্রে'র উপর সাজিয়ে নিয়ে এল ন্যাটাদের সেট্।

তালেবর ছোকরা করেছে কি, এবারে ঐ আগেকার সেটই উল্টো করে সাজিয়েছে, অর্থাৎ টী-কাপগুলোর আঙটাগুলো রয়েছে খদ্দেরের বাঁ দিকে; তার মানে, খদ্দের বাঁ-হাত বাড়ালে আঙুল ঠিক আঙটার যথাস্থানে পড়বে।

গ্যোবল্স্ বাক্যব্যয়ে না করে যথামূল্যে সেট্ কিনে নিলেন।

বেরিয়ে এসে বললেন, 'দেখলেন ইহুদিটার চালাকিটা?'

হিটলার অতিশয় সরল দরদী কণ্ঠে বললেন, 'চালাকিটা আবার কোথায়? 'বেচারী আর্যের ন্যাটা সেট্ ছিল না স্টকে, তো সে আর করবে কি?'

* *

এবারে সিরিয়স কথা:—ব্যাটারা বলে, তারা নাকি আর্যোত্তম। আরে মোলো, আর্যোত্তম যদি হবিই, তবে সর্ব-আর্যের—তা সে গ্রীকই হোক, লাতিনই হোক কিংবা তাদের বহু পূর্বের মিটানির হিটাইটই হোক—সর্বপ্রাচীন সংহিতা চতুর্বেদ আছে ভারতীয় আর্যের শ্রুতিতে ভিন্ন অন্য কোন্ 'আর্য' গোসাইয়ের পট্টাঙ্গ প্রত্যঙ্গে?

দিনের পর দিন নাগাড়ে চব্বিশ ঘণ্টা চুল্লিগুলো চালু রেখেও কাজ খতম হত না।' গ্যাস চেম্বারে ইহুদিদের চাবুক মেরে মেরে ঢোকানো থেকে, চুল্লি চব্বিশ ঘণ্টা চালু রেখে তাতে লাশ পুড়িয়ে ছাই করে জলে ভাসানো পর্যন্ত সব কাজ করতো কোনো কোনো স্থলে ইহুদিরাই। তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে এই প্রলোভনে। পরে অবশ্য তাদেরও ঘাড়ে গুলি করে মারা হত, পিছন থেকে, অতর্কিতে।

কিন্তু, আমরা তো দিয়েছি আশ্রয়—প্রথম ইহুদিরা যখন জীবনমৃতাবস্থায় নিমজ্জমান তরণীতে করে বোম্বাই উপকূলে পৌছয়। গ্যাস-চেম্বারের কথা এই দু বা আড়াই হাজার বছর ধরে আমাদের মাথায়ই খেলল না! তবে, হ্যাঁ, এঁদানির কেউ কেউ বলেন, আমরা যে অস্মদ্দেশে ইজরায়েল প্রেসিডেন্টের শুভাগমনোপলক্ষে উদ্বাহু হয়ে 'নৃত্ত' করি নি সেটা গ্যাস-চেম্বারে পোরার চেয়েও সখ্‌ৎ গুনাহ্‌! তোবা! তোবা!!

ভাষা

হাট-বাজার, শাক-সবজি,[১] দান-খয়রাৎ, দুখ-দরদ, ফাঁড়া-গর্দিশ, মান-ইজ্জৎ, লজ্জা-শরম, ভাই-বেরাদর, দেশ-মুল্লুক, ধন-দৌলত, রাজা-বাদশা, ঝড়-তুফান, হাসি-খুশী, মায়া-মহব্বৎ, জন্তু-জানোয়ার, সীমা-সরহদ—ইত্যাদি ইত্যাদি।

এস্থলে লক্ষ্য করার প্রথম তত্ত্ব এই যে, প্রত্যেক সমাসের প্রথম শব্দটি খাঁটি দিশী ভারতীয় শব্দ; হাট, শাক, দান, দুখ, মান, লজ্জা, দেশ ইত্যাদি এবং দ্বিতীয় শব্দটি যাবনিক (আরবী, ফার্সী, তুর্কী, হীব্রূ গয়রহ্‌), যেমন বাজার, সবজী, খয়রাৎ, দর্দ্‌ ইত্যাদি। এবং দুটি শব্দই প্রায় সমার্থসূচক।

তাহলে প্রশ্ন, এ 'কুকর্মের' কি প্রয়োজন?

আমরা যখন সাধারণের কোনো অজানা ভাষা থেকে উদ্ধৃতি দিই, তখন বাঙলা অনুবাদটি দি তার পরে। তাই আমরা যদি ইংরিজী প্রবন্ধে সংস্কৃত বা বাঙলা উদ্ধৃতি দিই তবে ইংরিজী অনুবাদটি দি পরে। অর্থাৎ যাকে বোঝাতে যাচ্ছি, তার ভাষা আসে পরে।

তা হলে মনে করুন, মুসলমানের আগমনের কিছুকাল পরে কোনো হিন্দু (বা নবদীক্ষিত মুসলমানও হতে পারে, কারণ হিন্দু ধর্মবর্জন করে মুসলমান হয়ে গেলে রাতারাতি তার আরবী ফার্সী রপ্ত হয়ে যায় না) গেল মুসলমান শাসনকর্তার কাছে বিচারের আশায়। বললে, 'ধর্মাবতার, হুজুর!—দেশ—' বলেই থমকে দাঁড়ালো। ভাবলে 'হুজুর কি "দেশ" শব্দটা জানেন! হুজুর তো হাট-বাজারে ঘোরাঘুরি করে দিশী শব্দ শেখবার ফুর্সৎ পান না'—(অথচ আমাদের হিন্দুটি পেটের দায়ে, কাজের তাড়ায় বিদেশাগত মুসলমানদের সঙ্গে মেলামেশা

১ কিন্তু শাক-ভাত, শাক-পাত, শাক-পাতেড়, শাকান্ন, শাক-মাছ অন্য সমস্যার অঙ্গ। স্থানাভাব না হলে সেটিরও আলোচনা করা হবে।

করার ফলে কিছু কিছু যাবনিক শব্দ শিখে গিয়েছে) তাই 'দেশ' বলে থমকে গিয়ে বললে 'মুল্লুক'—ওটা হুজুরের যাবনিক শব্দ। অতএব শেষ পর্যন্ত তার নিবেদন দাঁড়ালো, 'দেশ-মুল্লুক ছারখার হয়ে গেল। রাজা-বাদশা (আবার রাজা বলে থমকে গিয়ে যাবনিক "বাদশা" বললে) আমাদের মত কাঙাল-গরীবের (গরীব আরবী) দুখ-দরদ্ (দরদ্, দর্দ ফার্সী) কে বুঝবে ? আমাদের মান-ইজ্জৎ (ইজ্জৎ আরবী) ধন-দৌলত (দৌলত যাবনিক) সব গেল। মেয়ে-ছেলের লজ্জা-শরম (শর্ম যাবনিক)ও আর বাঁচে না। রাস্তায় বেরোলেই দেখতে পাবেন, কারো মুখে হাসি-খুশী (খুশী ফার্সী) নেই। হুজুর অনুমতি দেন —ভাই-বেরাদর (বেরাদর ফার্সী) নিয়ে মগের মুল্লুকে চলে যাই।'

মনে করুন, কথার কথা কইছি, হুজুর সত্যকার হুজুর ছিলেন। হুঙ্কার দিয়ে প্রতিবিধান করলেন।

আমাদের বঙ্গসন্তানটি বাড়ি ফিরে গৃহিণীকে আনন্দে ডগমগ হয়ে বললে, 'বুঝলে গিন্নী, হুজুর যা আমায় খাতির—' (বলেই থমকে দাঁড়ালো ; হুজুরের দরবারে 'খাতির' কথাটি খুবই চালু, সেইটেই এতক্ষণ ধরে দরবারে সে শুনেছে, তাই দুম্ করে সেটা ব্যবহার করে দুশ্চিন্তায় পড়লো, গিন্নী তো যাবনিক শব্দটা বুঝবে না, গিন্নী তো হাট-বাজারে গিয়ে যবনের সঙ্গে মেলা-মেশা করে এসব শব্দ শেখে নি—তাই সঙ্গে সঙ্গে বললে) 'যত্ন—হুজুর যা খাতির-যত্ন করলেন কি বলবো। আবার দোকান (ফের মুশকিল—দোকান ফার্সী শব্দ, তাই বললে "হাট" [হট্ট] হাট খুলবে,—কোনো চিন্তা করো না গিন্নী! নারায়ণ, নারায়ণ!'

এ যুগে আবার ফিরে আসবো। কিন্তু তার পরবর্তী যুগে দেখুন, ইংরেজ boss-কে বলছি, 'স্যার! আমি উকিল—(বলেই থমকে দাঁড়ালুম, উকিল যদ্যপি আসলে আরবী শব্দ, এদানির ইটি খাঁটি বাঙলা, স্যার কি বুঝবেন ?—তাই হন্তদন্ত হয়ে বললুম) ব্যারিস্টার (উকিল-ব্যারিস্টার) লাগিয়েছিলুম। ঘটি-(ঐ য্যা! স্যর বুঝবেন কি ?) গেলাস (glass—এবার স্যর বুঝবেন!)—ঘটি-গেলাস বন্ধক দিয়েছি– তেনাদের জন্য এরেক (ফের ইংরাজি 'ব্রাণ্ডি') ব্রাণ্ডি, বিড়ি-সিগারেট (দ্বিতীয়টা ইয়োরোপীয়) যা গেছে সে আর বলে কাজ নেই!'

এই সব বলে-কয়ে তো ছুটি নিয়ে দেশে গেলুম। প্রথমেই ঠাকুরমাকে পেন্নাম। বললুম, 'ঠাকুমা, পরে সব গুছিয়ে বলবো, এই বেলা শুনে নাও সংক্ষেপে। বড় মাসীর গুণধর ছোট ভাইটি নিয়েছেন ফ্ল্যাট (আবার সেই হাঙ্গামা—ঠাকুমা তো 'ফ্ল্যাট' বুঝবে না, অতএব বললুম), ফ্ল্যাট-বাড়ি। আমাদের কাউকে না

শুনিয়ে করেছেন বিয়ে। কিন্তু ঠাকুমা, মেয়েটি কী সুন্দর। একেবারে ডল (doll—সর্বনাশ, ঠাকুমা তো বুঝবে না, তা হলে 'পুতুল' বলি)-পুতুলের মত। কিন্তু হলে কি হয়। গুরু আছেন, ধম্মো আছেন। ব্যাস। এল তেড়ে টাইফয়েড-জ্বর (টাইফয়েড তো জ্বরই বটে—তবু ঠাকুমা যদি না বোঝেন, অতএব 'জ্বর'টা বলতে হল); তুমি ভাবছো আমরা কিছুই করি নি। ডাক্তার (আবার সেই বিপদ, তাই বলতে হল) বদ্যি (ডাক্তার-বদ্যি) নিয়ে এলুম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না।'

তাই আবার নিবেদন করছি, যাকে বোঝাচ্ছি তার বোধ্য শব্দটি আসে পরে।

এটা কিছু নূতন তত্ত্ব, আমাদের দেশের আজগুবী ব্যাপার নয়। ইংলেণ্ডেও নরমান বিজয়ের পর ইংরেজ যখন বিদেশী হুজুরের কাছে গিয়ে ফরিয়াদ বা রিপোর্ট দিত, তখন বলতো, 'He is very meek and humble (meek খাঁটি ইংরিজি, কিন্তু humble বিজয়ী নরমানদের শব্দ), Sir, but it is odd and strange (odd ইংরিজী, strange নরমান), that although we thought it meet & proper (meet ইংরিজী, proper নরমান) that we should search every nook and corner (nook ইংরিজী, corner নরমান), our sorrow and grief (sorrow ইংরিজী, grief নরমান) know no bound that we did not find him'

তফাৎ শুধু এইটুকু যে ইংরেজ তখন দিশী ও বিদেশী শব্দের মাঝখানে and বসিয়েছে—meek and humble, odd and strange; আমরা বাঙালীরা 'and' 'এবং' বসাই নি; আমরা বলেছি, হাসি-খুশী, মান-ইজ্জৎ, দেশ-মুল্লুক।

পাঠক কিন্তু ভাববেন না, আমাদের সব সমাসই এ রকম।

জল-পানি, বাজার-উটকো, মাল-মশলা, ঘটি-বাটি, টোল-চতুষ্পাঠী, মক্তব-মাদ্রাসা, ইস্কুল-কলেজ অন্য ধরনের সমাস॥

কবিগুরু ও নন্দলাল

রসাচার্য নন্দলাল বসুর জীবন এমনই বহু বিচিত্র ধারায় প্রবাহিত হয়েছে, তিনি এতই নব নব অভিযানে বেরিয়েছেন যে তার পরিপূর্ণ পরিচয় দেওয়া অতি কঠিন, শ্রমসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ। তদুপরি যিনি সে পরিচয় দিতে যাবেন তাঁর সর্বরসসৃষ্টিতে অপর্যাপ্ত কৌতূহল ও সে রস আস্বাদন করার মত অপ্রচুর

স্পর্শকাতরতা থাকার একান্ত, অত্যন্ত প্রয়োজন। মানবসমাজে নন্দলাল ছিলেন স্বল্পভাষী তথা আত্মগোপনপ্রয়াসী—তাঁর নীরবতার বর্ম ভেদ করে তাঁকে সর্বজন সম্মুখে স্বপ্রকাশ করার মত ক্ষমতা, সে প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় শৈলী ও ভাষার উপর অধিকার এ-যুগে অত্যল্প আলঙ্কারিকেরই আছে। আমাদের নেই; আমরা সে দুঃসাহস করি নে।

আমরা তাঁকে চিনেছি, গুরু রূপে, রসসৃষ্টির জগতে বহু বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সতত রত স্রষ্টা রূপে এবং কবিগুরুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিষ্য ও সহকর্মী রূপে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্বভারতীতে প্রধানত পণ্ডিতদেরই আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন—আচার্য বিধুশেখর, ক্ষিতিমোহন, অ্যানড্রুজ, কলিন্‌স, শ্যামের রাজগুরু, উইনটারনিৎস, লেভি, গোস্বামী নিত্যানন্দ, জগদানন্দ ইত্যাদিকে। এঁদের কেউই রসস্রষ্টা ছিলেন না, এমন কি যে দিনেন্দ্রনাথ সঙ্গীতে, কাব্যে অসাধারণ সৃজনশক্তি ধরতেন তিনি পর্যন্ত তাঁর নিজস্ব সৃজনশক্তির দ্বার রুদ্ধ করে সর্বক্ষমতা নিয়োজিত করেছিলেন রবীন্দ্রসঙ্গীতের রক্ষণাবেক্ষণ কর্মে। একমাত্র নন্দলালই এই পরিপূর্ণ পাণ্ডিত্যময় বাতাবরণের মাঝখানে অপ্রমত্ত চিত্তে আপন সৃষ্টিকর্মে নিয়োজিত ছিলেন।

রবি নন্দ সম্মেলন যেন মণিকাঞ্চন সংযোগ। এ তত্ত্ব অনস্বীকার্য যে রস কি, চিত্রে, প্রাচীরগাত্রে তথা দৃশ্যমান কলার অন্যান্য মাধ্যমে তাকে কি প্রকারে মৃন্ময় করা যায় এ-সম্বন্ধে নন্দলাল তাঁর গুরু অবনীন্দ্রনাথের কাছে উৎকৃষ্টতম শিক্ষাদীক্ষা লাভ করেন। তাই নন্দলাল শান্তিনিকেতনে আগমন করার পূর্বেই বঙ্গদেশ তথা ভারতে সুপরিচিত ছিলেন ও পশ্চিমের বহু সদাজাগ্রত রসিকজনের মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু কবিগুরুর নিত্যালাপী সখা, সহকর্মী ও শিষ্য রূপে শান্তিনিকেতনে আসন গ্রহণ করার পর তাঁর চিন্ময়ভুবন ধীরে ধীরে সমৃদ্ধতর হতে লাগলো ও রবীন্দ্রাহূত পণ্ডিতমণ্ডলীর সংস্পর্শে এসে তিনি এমন সব বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরিচিতি হলেন যেগুলো সচরাচর সাধারণ আর্টিস্টকে আকৃষ্ট করে না। একটি মাত্র উদাহরণ নিবেদন করি: দ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা সম্বন্ধে একাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন, বিশ্বভারতীর সাহিত্য সভায় তথা অন্যান্য জ্ঞানচক্রে শতাধিকবার আলোচনা করেছেন, তর্কবিতর্ক উদ্বুদ্ধ করেছেন। ১৯২১ থেকে পূর্ণ কুড়িটি বৎসর এসব সম্মেলনে নন্দলাল উপস্থিত থাকতেন, কিন্তু আমি তাঁকে কখনো (১৯২১-২৬) এ সবেতে অংশগ্রহণ করতে দেখি নি।

অথচ ১৯৩৬।৩৭-এ বরোদার মহারাজা যখন তাঁকে সেখানকার কীর্তিমন্দিরে দেয়ালছবি (ম্যুরাল) আঁকতে অনুরোধ করলেন তখন তিনি চার দেয়ালে এঁকে

দিলেন 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা'। ১। 'গঙ্গাবতরণ' (গঙ্গা বিনা যে ভারতে আর্যসভ্যতার পত্তন ও বিকাশ হত না সে কথা বলাই বাহুল্য), ২। 'কুরুক্ষেত্র', ৩। 'নটির পূজা', ৪। 'মীরাবাঈ' ('সন্তন সঙ্গ বৈঠ বৈঠ লোক লাজ খোঁঈ'—চিত্রে)। আর্য, হিন্দু, বৌদ্ধ, মধ্যযুগীয় ভক্তি এই চার দৃষ্টিবিন্দু থেকে নন্দলাল দেখেছেন ভারতের সমগ্র ইতিহাস।

কিন্তু এহ বাহ্য। আসলে যদ্যপি চিত্রের মাধ্যমে রসসৃষ্টি সম্বন্ধে নন্দলাল পরিপূর্ণ শিক্ষাদীক্ষা গুরু অবনীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পেয়েছিলেন, সে রস কাব্যে, সঙ্গীতে, নৃত্যে কি ভাবে প্রকাশ পায় সেটি তিনি দেখতে পেলেন দিনের পর দিন, বহু বৎসর ধরে শান্তিনিকেতনে। রসের প্রকাশে কোন্ কলার অধিকার কতখানি নন্দলাল সে সম্বন্ধে পরিপূর্ণ মাত্রায় সচেতন হলেন শান্তিনিকেতনে, রবীন্দ্রনাথের সাহচর্যে। কারণ রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত আলঙ্কারিকের (নন্দনতত্ত্বজ্ঞের) ন্যায় রস নিয়ে আলোচনা করার সময় নিজেকে সাহিত্য, সঙ্গীত বা নাট্যরসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতেন না। স্বনামধন্যা স্টেলা ক্রামরিশের সঙ্গে তিনি দিনের পর দিন রস নিয়ে যে আলোচনা (হোয়াট ইজ আর্ট ?) করেন তাতে টলস্টয়ের অলঙ্কার শাস্ত্রও বাদ পড়তো না এবং তিনি বেটোফনের 'ক্রয়েৎসার সনাটা'-র বিরুদ্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করেন সেটিও উভয়ের মধ্যে আলোচিত হত। এসব আলোচনা সাধারণত হত বিশ্বভারতীর সাহিত্য সভায়—এবং নন্দলাল সে-স্থলে নিত্য-নীরব শ্রোতা। সে-সময় নন্দলালের চিন্তাকুটিল ললাটের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেই স্পষ্ট বোঝা যেত, আর্ট সম্বন্ধে তাঁর যা ধারণা, অভিজ্ঞতা, তাঁর যা আদর্শ সেগুলোর সঙ্গে তিনি এ-সব আলোচনার মূল সিদ্ধান্ত, মীমাংসাহীন জল্পনা-কল্পনা সব কিছু মিলিয়ে মিলিয়ে দেখছেন।

স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, নৃত্য যতখানি গতিশীল (ডাইনামিক) চিত্র ততখানি হতে পারে না। পক্ষান্তরে নটনটী রঙ্গমঞ্চ থেকে অন্তর্ধান করার সঙ্গে সঙ্গেই তার ভানুমতী থেকে যায় শুধু স্মৃতিতে—বাস্তবে সে অবলুপ্ত। কিন্তু চিত্র চোখের সামনে থাকে যুগ যুগ ধরে—এবং চিত্রের মত চিত্র হলে প্রতিবারেই যে তার থেকে আনন্দ পাই তাই নয়, প্রতিবারেই সেই প্রাচীন চিত্রে নব নব জিনিস আবিষ্কার করি, নিত্য নিত্য নবীন রসের সন্ধান পাই। তাই কোনো নৃত্য-দৃশ্য যদি চিত্রে সার্থকরূপে পরিস্ফুট করা যায়, তবে মঞ্চ থেকে অন্তর্ধান করার সঙ্গে সঙ্গে যে-চিত্রের চিরতরে অবলুপ্ত হওয়ার কথা ছিল, সে হয়ে যায় অজর অমর। কিন্তু 'চিত্রে সার্থকরূপে পরিস্ফুট' করার অর্থ, সে যেন ফটোগ্রাফ না হয়—তা হলে মনে হবে, নর্তক-নর্তকী নৃত্যকলা প্রকাশ করার সময় হঠাৎ যেন মুহূর্তেক তরে পাষাণ-

পুত্তলিকায় পরিণত হয়ে গিয়েছিলেন। যাঁরাই নন্দলালের 'নটীর পূজা' চিত্রটি প্রাচীরগাত্রে দেখেছেন, তাঁরাই আমার সামান্য বক্তব্যটি সম্যক উপলব্ধি করতে পারবেন। সে চিত্র তো স্টাটিক নয়, 'স্তম্ভিত' নয়—বস্তুত তার দিকে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলে মনে হয়, এই বুঝি নটী আরেকখানি অলঙ্কার গাত্র থেকে উন্মোচন করে দর্শকের দিকে, আপনারই দিকে অবহেলে উৎক্ষেপ করবে, এই বুঝি মৃদঙ্গে ভিন্ন তাল ভিন্ন লয়ের ইঙ্গিত ভেসে উঠবে আর সঙ্গে সঙ্গে নটী তার নৃত্য দ্রুততর করে দেবে, লাস্য-নৃত্য তাণ্ডবে পরিণত হবে, মন্দমন্থর 'নমো হে নমো' অকস্মাৎ অতিশয় দ্রুত 'পদযুগ ঘিরে' 'চন্দ্রভানু'র মদমত্ত নৃত্যে নবীন বেশ গ্রহণ করবে।

বস্তুত আপন মনে তখন প্রশ্ন জাগবে, নন্দলাল মঞ্চে বিভাসিত যে-নৃত্য স্বচক্ষে দেখেছিলেন, সে-নৃত্য কি সত্যই এতখানি প্রাণবন্ত, উচ্ছ্বসিত—শান্ত থেকে মন্থর, মন্থর থেকে উন্মত্ত—প্লাবন বেগে ধাবিত ছিল, না তিনি অঙ্কন করেছেন তাঁর নিজস্ব কল্পলোকের মৃন্ময় নৃত্যের আদর্শ প্রকাশ।

*   *

সুন্দরের পরিপূর্ণ আনন্দ-রূপের ধ্যানের বীজমন্ত্র নন্দলাল গ্রহণ করেন কবি-গুরুর কাছ থেকে। এবং তার সর্বোচ্চ বিকাশে সে বীজের যেন কোনো চিহ্নই নেই। সে যেন পত্রপুষ্পে বিকশিত মহীরূহ।

এবং একমাত্র নন্দলালই তাঁর গুরুর উপরও প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। সকলেই জানেন, পরিপূর্ণ বৃদ্ধ বয়সে কবি রবীন্দ্রনাথ চিত্রের মাধ্যমে আপন সৃজনী-শক্তি প্রকাশ করেন। কিন্তু কবির প্রভাবে ছবির নন্দলাল তো কখনো কবিতা রচনা করেন নি! ॥

খেলেন দই রমাকান্ত

ইহুদি যাজক সম্প্রদায়ের সুপুত্র শ্রীযুত লেভির সঙ্গে তাঁর বাড়িতে খানা খেতে যাচ্ছি। তাঁর আছে গল্পের অফুরন্ত ভাণ্ডার। তারই একটা ছাড়লেন :

"জারের আমলে রববার দিন গির্জেয় গেছে গ্রামের সবাই। রুশ জাতটা একদা ছিল বড়ই ধর্মানুরাগী। কুলোকে বলে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ভূতপ্রেত-তাবিজ-কবচে-বিশ্বাসী উজবুকের ভায়রাভাই। এবং সাতিশয় পাষণ্ডেরা বলে, সেই প্রাচীন কুসংস্কারই আজ তাদের টেনে নিয়ে যায় লেনিনের দর্গায় শির্ণী চড়াতে।

তা সে যাক্ গে—মোদ্দা কথা : তারা কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করে, তাদের গাঁয়ের পাদ্রি সায়েব যা বলেন তাই আপ্তবাক্য। যদ্যপি এসব পাদ্রিদের অনেকেই নিজের নামটি পর্যন্ত সই করতে পারে না—"

আমি শুধালুম, "নিরক্ষর জন গির্জায় ধর্মোপদেশ দেয় কি প্রকারে?"

বললেন, "আশ্চর্য! রাসপুতিন যে কী মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কুল্লে আড়াই আউন্স বাইবেল গলাধঃকরণ করতে পেরেছিলেন সে না হয় পড়ো নি, তাই জানো না। নিচ্চেভো—অর্থাৎ কুছ পরোয়া নেহী। সেই আড়াই আউন্স বাইবেল ডাইলুট করে তিনি মহারাণী জারিনা মায় জার প্রাসাদ জয় করলেন। তাঁকেও নাম সই করতে হলে ঘেমে নেয়ে কাঁই হতে হত।

আর এরই উল্‌টো দিক—অর্থাৎ ভালোর দিকের সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ খুঁজতে হলে অন্তত তোমাকে তো আর উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু অবধি মাকু মারতে হবে না। তোমার নবী পয়গম্বর তো ছিলেন সম্পূর্ণ নিরক্ষর! তা সে যাক্ গে।

সে রববারে পাদ্রি সায়েবের সারমন বা বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল ইহুদিরা কী অন্যায়ভাবে প্রভু যীশুকে ক্রুশের উপর খুন করলো। এ বিষয়ে বক্তৃতা শিক্ষিত অশিক্ষিত সব পাদ্রিই দেন। তফাৎ শুধু এইটুকু যে, শিক্ষিত পাদ্রি জানেন, প্রভু যীশু ক্রুশের উপর থেকে তাঁর হত্যাকারীদের ক্ষমা করে গিয়েছিলেন। তাই তিনি বক্তৃতা দেবার সময় সতত সতর্ক থাকেন, অজ্ঞ খৃষ্টানগণ যেন উত্তেজিত হয়ে ইহুদি নির্যাতন আরম্ভ না করে। কিন্তু ঐ যে রুশ পাদ্রির কথা বলছিলুম, তিনি সেদিন উঠে পড়ে লেগে গিয়েছেন, কি প্রকারে মূঢ় জনতাকে প্রতিহিংসাপরায়ণ করে তোলা যায়। অবশ্য তার জন্য অত্যধিক বাগ্মিতাশক্তির কোনো প্রয়োজন নেই—কারণ রুশ দেশে আবহমান কাল থেকে ইহুদিবৈরিতা বংশানুক্রমে চলে আসছে। কাজেই সারমন শেষেই বিক্ষুব্ধ চাষীরা একজোট হয়ে ধাওয়া করলো মাঠের অন্য প্রান্তের খাস ইহুদি গ্রামটার দিকে। দূর থেকে তাদের চিৎকার হুঙ্কার শুনে ইহুদিরা ব্যাপার কি জানবার জন্য গ্রাম থেকে বেরিয়ে এল। তাদের চিৎকারে তখন পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে—'খুন করবো, ব্যাটাদের খুন করে রক্ত দিয়ে রক্তের দাদ নেব!'

সবাই একে অন্যকে চেনে। তাই ইহুদি গাঁওবুড়ারা করজোড়ে শুধালে, 'আমরা কি অপরাধ করেছি যে আমাদের খুন করবে, এতকাল ধরে পাশাপাশি গ্রামে বাস করছি—'

উত্তেজিত জনতা বললে, 'চালাকি রাখো। তোমরা আমাদের প্রভুকে খুন করেছ, তার দাদ আমরা নেবই নেব।'

যেন পর দিনের ঘটনা। লেডি গল্প বলা ক্ষান্ত দিলেন। কারণ হঠাৎ পিটির পিটির করে বৃষ্টি নামলো। এই পোড়ার দেশে মনসুন নেই বলে বারো মাসের যে কোনো দিন আচমকা বৃষ্টি নামে। আমি বললাম, "চলুন, হ্যার ডক্টর, ট্রাম শেড্-এ আশ্রয় নি।"

বললেন, "ছোঃ! কিস্সু জানো না। ইহুদিরা ছাতা কেনে না কেন, তার খবর রাখো? খৃষ্টানদের বিশ্বাস, ইহুদিরা এমনই দুর্দান্ত চালাক যে, বৃষ্টির ফাঁকে ফাঁকে জামাকাপড় বাঁচিয়ে দিব্য চলাফেরা করতে পারে। তারপর কি বলছিলুম? —সেই রুশ ইহুদিদের কথা। তারা ছিল সত্যই চালাক। চট করে ভেবে নিয়ে দেখলে, ঐ সব জড়ভরত কেরেস্তান রুশদের বোঝানো হবে অসম্ভব, ঘটনাটা ঘটেছে দু' হাজার বছর পূর্বে, রুশ দেশে নয়—বহু দূর-দূরান্তরের প্যালেস্টাইনে—যারা মেরেছিল, তারা সেই দেশ ছেড়ে কবে কোন্ আদ্যিযুগে ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর সর্বত্র, বিয়ে করেছে জাতেবেজাতে—এখন যাদের ঠ্যাঙাতে যাচ্ছো—"

আমি বললুম, "বুঝেছি। খেলেন দই রমাকান্ত, বিকারের বেলা গোবদ্দন।"

লেডি বললেন, "লাখ কথার এক কথা।"

অতএব ইহুদি ডাণ্ডরিয়ারা হন্তদন্ত হয়ে বললে, 'ইহুদিরা প্রভু যীশুকে না হক খুন করেছিল. এ তো অতিশয় সত্য কথা—বিশ্ব-সংসার জানে। কিন্তু ভাই, তোমরা করেছ ভুল। আমরা, এ গাঁয়ের লোক, ওঁকে মারি নি—তা কথনো পারি! মেরেছ—' বলে আঙুল দিয়ে দেখালে পাশের গাঁ। বলল, 'মেরেছে ঐ ও—ই গাঁয়ের ইহুদি রাস্কেলরা!' বুঝলে তো ভায়া?" বলে লেডি গম্ভীর হয়ে গেলেন।

আমি একগাল হেসে বললাম, "যা শত্রু পরে পরে। কিন্তু গল্পটা তো সে রকম ঝাঁঝালো না—আপনার সেদিনকার রাব্বি, জানলার শার্সি আর আয়নাতে তফাৎ নিয়ে গল্পটার মত?"

লেডি বললেন, "ক্যারেকটারিস্টিক গল্পের ফান্‌কশন হচ্ছে কোনো বিশেষ জাত বা শ্রেণী বা যা-ই হোক না কেন, তার ক্যারেকটার, তার বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা। ভেড়ার বাচ্চা আর নেকড়ে বাঘের মধ্যে তর্কাতর্কি নিয়ে যে গল্প ঈসপ লিখেছেন, সেটাতে ঝাঁঝ কোথায়? কিন্তু গল্পটা সাতিশয় ক্যারেকটারিস্টিক—অর্থাৎ ভেড়া আর নেকড়ের ক্যারেকটার ওতে চমৎকার ফুটে উঠেছে—নইলে গল্পটা দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়লো কি করে, আর এত যুগ ধরে বেঁচে আছেই বা কি করে? আমি রুশ ইহুদিদের সম্বন্ধে যে গল্পটা বললুম—গল্প না হয়ে সত্য ঘটনাও হতে পারে—সেটা কিন্তু সর্ব-ইহুদিদের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। বিপদকালে তারা

এক হতে তো জানেই না, বরঞ্চ নিজেকে বাঁচাবার জন্য তার জাতভাই অন্য ইহুদিকে বিসর্জন দিতেও তার বাধে না।"

আমি বললুম, "উঁহু।"

"মানে ?"

আমি বললুম, "আমার দেশ বাঙলার উত্তর প্রান্তে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁদের সম্বন্ধে বলা হয়, স্বার্থ থাক আর নাই থাক, তাঁরা একে অন্যের সাহায্য কস্মিনকালেও করেন না। একটা নদী পেরুবার সময় নাকি পর পর পাঁচজন ব্রাহ্মণ একটা পাথরে ঠোক্কর খান, কিন্তু কেউই পরের জনকে হুঁশিয়ার করে দেবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। শেষটায় একজন যখন 'বাপ রে' বলে অন্যদের সাবধান করে দিলে, তখন তাঁরা সবাই সমস্বরে চিৎকার করে বললেন, 'ব্যাটা নিশ্চয়ই আমাদের শ্রেণীর ব্রাহ্মণ নয়।' তখন ধরা পড়লো, সত্যি, সে অন্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণ— বর্ণচোরা আঁবের মত এঁদের সঙ্গে মিশে এঁদেরই একজন হতে চেয়েছিল। গল্পটা আপনারই সংজ্ঞা অনুযায়ী খুবই ক্যারেকটারিস্টিক বটে, কিন্তু আমার মনে এ বাবদে একটা ধোঁকা রয়ে গেছে।"

লেভি বললেন, "তুমি দেখি হেরোডকেও হেরোডত্ব শেখাতে চললে—অর্থাৎ যাকে বলে গুরুমারা বিদ্যেতে ওস্তাদ হয়ে উঠছো। বুঝিয়ে বলো।"

আমি বললাম, "যে ব্রাহ্মণ শ্রেণীর গল্পটি আপনাকে বললাম, তাঁরা যে অতিশয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ধরেন, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, এবং বুদ্ধিমান জীব মাত্রেই ঐক্যে বিশ্বাস করে। তাই আমি বহুকাল ধরে পর্যবেক্ষণ করে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছলুম, এঁরা একে অন্যকে খুবই সাহায্য করে থাকেন—যে রকম ফ্রীমেসনরা একে অন্যের প্রতি বড়ই সদয়—কিন্তু সে সাহায্যটি করেন অতিশয় সঙ্গোপনে। এবং অন্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণরা যাতে করে এ-তত্ত্বটি আবিষ্কার না করতে পারেন, তাই তাঁরা নিজেরাই বাজারে একাধিক কামুফ্লাজ গল্প ছেড়েছেন এই মর্মে যে, তাঁদের ভিতর মারাত্মক ঐক্যাভাব। তাই আমার মনে হয়, আপনি যে গল্প দিয়ে প্রমাণ করতে চাইলেন, ইহুদিরা সঙ্ঘবদ্ধ হয় না, সেটা স্বয়ং ইহুদিরাই তৈরি করেছেন, খৃষ্টানদের সন্দেহ না জাগানোর জন্য।"

ইহুদি আর স্কচমেনের একটা মহৎ গুণ—তাদের নিয়ে কেউ রসিকতা করলে সেটা তারা উপভোগ করতে পারে। লেভি আমার সত্য-সিদ্ধান্ত শুনে হেসে বললেন, "এটা আজ খানা-টেবিলে আমি পেশ করবো। দেখি, ঠাকুদ্দা-বাবা কি বলেন। কিন্তু জানো, এর থেকে একটা গুরুতর সমস্যায় উপনীত হওয়া যায়। তুমিই সেদিন প্রশ্ন করেছিলে, ইহুদিরা যে প্যালেস্টাইনে 'হোম' বানাতে

চায়, সেটা ভালো না মন্দ? আমি বলেছিলুম, সময় এলে আলোচনা করা যাবে। তাই এস্থলে প্রশ্ন শুধানো যায়, পৃথিবীর সব ইহুদি এই হোম চায় কি না? এই দাবির পিছনে কি তারা ঐক্যবদ্ধ? তোমার প্যারা কবি হাইনে একদা এই আন্দোলনের সঙ্গে—ঠিক ঠিক বলতে গেলে ঐ আন্দোলনের আলোচনা-চক্রের সঙ্গে—সংযুক্ত হন। কিন্তু কিছুদিনের ভিতরই তিনি সে-চক্র থেকে নিজেকে মুক্ত করে ফেলেন। তার থেকে অবশ্য এ'টা বলা চলে না, প্যালেস্টাইনে ইহুদি হোম নির্মাণের ব্যাপারে তাঁর কোনো ঔৎসুক্য ছিল না। আসলে ব্যাপারটা অন্য ধরনের; সংখ্যালঘুদের ভিতর এক রকম লোক থাকে, যারা আপন সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র গণ্ডির ভিতর নিজেকে সীমাবদ্ধ করে রাখতে চায় না—তারা ভাবে, বাড়িতে বাপ-ভাই তো সে-গণ্ডি বানিয়ে রেখেছেনই, বাইরে গিয়েও তাঁদেরই জাতভাইদের সঙ্গে মিশে কি লাভ? আমার মনে হয়, হাইনের বেলা হয়েছিল তাই।" তারপর হঠাৎ রাস্তার উপরই থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, "তোমার দেশে তুমিও তো লঘু সম্প্রদায়ের লোক। তুমি দেশে কাদের সঙ্গে মেলামেশা করো?" উত্তর দেবার পূর্বেই তিনি বললেন, "এ-বিষয় নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা চলতে পারে, অতএব এটা এখন মুলতুবী থাক, কারণ, বাড়ি পৌঁছে গিয়েছি।"

বাউমশুল আলের শেষ প্রান্তে ছোট্ট একখানা ছিমছাম তেতলা বাড়ি।

ল্যাচ কী দিয়ে দরজা খুলে বললেন, "স্বাগত জানাই তোমাকে। মঙ্গল হোক, জয় হোক তোমার। তোমার বংশধর যেন অসংখ্য হয়।" ॥

চতুরঙ্গ

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে প্রচুর বক্তৃতা প্রচুরতর প্রবন্ধ এবং অল্প-বিস্তর বেতার কার্যকলাপের ব্যবস্থা এদেশের গুণী-জ্ঞানীরা করে থাকেন। সেই অবসরে কেউ কেউ আমাকেও স্মরণ করেন। আপাত-দৃষ্টিতে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে এঁরা আমার কল্যাণ কামনা করেন ; সরল জনের পক্ষে অনুমান করা অসম্ভব নয় যে এই করে হয়তো দেশে আমার নামটা কিঞ্চিৎ ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু আসলে যাঁরা আমাকে স্মরণ করেন তাঁরা আমার প্রাণের বৈরী। এঁরা আমাকে সর্বজন-সমক্ষে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলতে চান, 'দেখো, এ লোকটা কত বড় গণ্ডমূর্খ ; কবি-গুরুর সংস্পর্শে এসেও এর কিছু হল না। সাধে কি আর তুলসীদাস রামচরিত-মানসে বলেছেন,

"মূরখ হৃদয় ন চেৎ, যদপি মিলয়ে
গুরু বিরিঞ্চি শত"
"শত ব্রহ্মা গুরুপদ নিলেও মূর্খের
হৃদয়ে চেতনা হয় না"

আমি মূর্খ হতে পারি কিন্তু এতখানি মূর্খ নই যে তাঁদের দুষ্টবুদ্ধিজাত নষ্টামির চিন্তা ধরতে পারবো না।

তাই ঐ সময়টায় আমি গা-ঢাকা দিয়ে থাকি। নিতান্ত কারো সঙ্গে দেখা হলে বলি, এন্‌জাইনা থ্রম্‌বোসিস হয়েছে। এন্‌জাইনা পিক্‌টরিস্‌ কিংবা করোনারি থ্রম্‌বোসিস-এর যে কোনো একটার নাম শুনলেই সুস্থ মানুষের হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম করে—আমার ঐ দ্বন্দ্ব সমাস শুনে আমাকে তখন আর কেউ বড় একটা ঘাঁটায় না।

অথচ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলবার সাধ যে আমার হয় না, তাও নয়। অবশ্য তাঁর কাব্য, নাট্য কিম্বা জীবনদর্শন সম্বন্ধে নয়। অতখানি কাণ্ড-জ্ঞান বা কমনসেন্‌স্‌ আমার আছে। আমার বলতে ইচ্ছে করে সেই জিনিস, ইংরিজিতে যাকে বলে লাইটার সাইড। এই যেমন মনে করুন, তিনি গল্পগুজোব করতে ভালোবাসতেন কি না, প্রিয়জনের সঙ্গে হাস্যপরিহাস করতেন কি না, ডাইনিঙ-রুমে বসে চেয়ার টেবিলে ছুরিকাঁটা দিয়ে ছিমছাম ভাবে সায়েবী কায়দায় খেতেন, না রান্নাঘরের বারান্দায় হাপুস-হুপুস শব্দে মাদ্রাজী স্টাইলে পাড়া সচকিত করে পর্বটি সমাধান করে সর্বশেষে কাবুলী কায়দায় ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে ঢেঁকুর তুলতে তুলতে বাঙালী কায়দায় চটি কটকটিয়ে খড়কের সন্ধানে বেরতেন?

কেউ তাঁকে প্রেমপত্র লিখলে তিনি কি করতেন? কিম্বা ডিহি শ্রীরামপুর ছুই নম্বর বাই লেন তাদের কম্বল-বিতরণী সভায় তাঁকে প্রধান অতিথি করার জন্ম ঝুলোঝুলি লাগালে তিনি সেটা এড়াবার জন্ম কোন্ পন্থা অবলম্বন করতেন? কিম্বা কেউ টাকা ধার চাইলে?

ভালোই হল টাকা ধারের কথা মনে পড়ল।

'দেহলী'র উপরে থাকতেন তিনি, নিচের তলায় তাঁর নাতি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ওরফে দিনুবাবু।

তাঁরই বারান্দায় বসে আশ-কথা-পাশ-কথা নানা কথা হচ্ছে। হতে হতে টাকা ধার নেওয়ার কথা উঠলো। হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'বুঝলি, দিনু, আমার কাছ থেকে একবার একজন লোক দশ টাকা ধার নিয়ে গদগদ কণ্ঠে বললে, "আপনার কাছে আমি চিরঋণী হয়ে রইলুম"।' সভায় যাঁরা ছিলেন তাঁরা পয়েন্টটা ঠিক কি বুঝতে না পেরে চুপ করে রইলেন। আফ্‌টার অল্, গুরুদেবের পক্ষেও কালে-কস্মিনে কাঁচা রসিকতা করা অসম্ভব নাও হতে পারে।

খানিকক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে গুরুদেব বললেন, 'লোকটার শতদোষ থাকলেও একটা গুণ ছিল। লোকটা সত্যভাষী। কথা ঠিক রেখেছিল। চিরঋণী হয়েই রইল।'

শ্রীযুত বিধুশেখর শাস্ত্রী, নেপালচন্দ্র রায় ইত্যাদি মুরব্বীরা অট্টহাস্য করেছিলেন। আমরা, অর্থাৎ চ্যাংড়ারা, থামের আড়ালে ফিক্‌ফিক্ করেছিলুম।

এ গল্পটি আমি একাধিক লোকের মারফৎ পরেও শুনেছি। হয়তো তিনি গল্পটি একাধিক সভা-মজলিসে বলেছেন। এবং গল্পটি আদৌ তাঁর নিজের বানানো না অন্যের কাছ থেকে ধার নেওয়া সে-কথাও হলফ করে বলতে পারবো না। কারণ কাব্যানুশাসনের টীকা লিখতে গিয়ে আলঙ্কারিক হেমচন্দ্র বলেছেন, 'নাস্ত্য চৌরঃ কবিজনঃ নাস্ত্য চৌরো বণিক্‌জনঃ'—অর্থাৎ 'বড় বিদ্যা'টি বিলক্ষণ রপ্ত আছে স্যাকরার এবং কবি মাত্রেরই।

তা হক। মহাকবি হাইনরিষ্ হাইনে তাতে কণামাত্র আপত্তি না তুলে বলেছেন, 'যারা কবির রচনাতে "নির্ভেজাল" অরিজিনালিটি খোঁজে তারা চিবাক মাকড়ের জাল, কারণ একমাত্র মাকড়ই তার জালটি তৈরি করে আপন পেটের মাল দিয়ে, ষোল আনা অরিজিনাল; আমি কিন্তু খেতে ভালোবাসি মধু, যদিও বেশ ভালো ভাবেই জানি মধুভাণ্ডের প্রতিটি ফোঁটা ফুলের কাছ থেকে চোরাই করা মাল।'

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রচলিত গল্পের ভিতর আমার সব চেয়ে ভালো লাগে

'গুরুদেব-ভাণ্ডারে' কাহিনী। অবশ্য আমার মনে হয়, গল্পটির নাম 'ভাণ্ডারে-গুরুদেব' কাহিনী দিলে ভালো হয়, কারণ কাহিনীটি সম্পূর্ণ নির্ভর করছে, ভাণ্ডারের একটি সৎকর্মের উপর। তুলনা দিয়ে বলতে পারি, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু যখন তাঁর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার জগজ্জন সম্মুখে প্রকাশ করলেন তখন কালা আদমির কেরদানী বরদাস্ত না করতে পেরে ইংরেজ আবিষ্কারটার নামকরণ করলে 'আইন-স্টাইন-বোস থিয়রি'। স্বয়ং আইনস্টাইন তখন নাকি প্রতিবাদ জানিয়ে বলে-ছিলেন, ওটার নাম হয় হবে শুধুমাত্র 'বোস থিয়রি' নয় 'বোস-আইনস্টাইন থিয়রি'। এ-সব অবশ্য আমাদের শোনা কথা। ভুল হলে পুজোর বাজারের বিলাস বলে ধরে নেবেন।

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ইংরেজ পছন্দ করতো না বলে শান্তিনিকেতন আশ্রমটিকে নষ্ট করার জন্য ইংরেজ একটি সূক্ষ্ম গুজোব বাজারে ছড়ায়—শান্তিনিকেতনের ইস্কুল আসলে রিফরমেটরি। অন্তত এই আমার বিশ্বাস।

খুব সম্ভব তারই ফলে আশ্রমে মারাঠী ছেলে ভাণ্ডারের উদয়।

ইস্কুলের মধ্য বিভাগে বীথিকা-ঘরে ভাণ্ডারে সীট পেল। এ ঘরটি এখন আর নেই তবে ভিতটি স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। তারই সমুখ দিয়ে গেছে শালবীথি। তারই এক প্রান্তে লাইব্রেরি, অন্য প্রান্তে দেহলী। গুরুদেব তখন থাকতেন দেহলীতে।

দেহলী থেকে বেরিয়ে, শালবীথি হয়ে গুরুদেব চলেছেন লাইব্রেরীর দিকে। পরনে লম্বা জোব্বা, মাথায় কালো টুপি। ভাণ্ডারে দেখামাত্রই ছুটলো তাঁর দিকে। আর সব ছেলেরা অবাক। ছোকরা আশ্রমে এসেছে দশ মিনিট হয় কি না হয়। এরই মধ্যে কাউকে কিছু ভালো-মন্দ না শুধিয়ে ছুটলো গুরুদেবের দিকে!

আড়াল থেকে সবাই দেখলে ভাণ্ডারে গুরুদেবকে কি যেন একটা বললে। গুরুদেব মৃদু হাস্য করলেন। মনে হল যেন অল্প অল্প আপত্তি জানাচ্ছেন। ভাণ্ডারে চাপ দিচ্ছে। শেষটায় ভাণ্ডারে গুরুদেবের হাতে কি একটা গুঁজে দিলে। গুরুদেব আবার মৃদু হাস্য করে জোব্বার নিচে হাত চালিয়ে ভিতরের জেবে সেটি রেখে দিলেন। ভাণ্ডারে এক গাল হেসে ডরমিটরিতে ফিরে এল। প্রণাম না, নমস্কার পর্যন্ত না।

সবাই শুধালে, 'গুরুদেবকে কি দিলি?'

ভাণ্ডারে তার মারাঠী-হিন্দীতে বললে, 'গুরুদেব কৌন্? ওহ্ তো দরবেশ হৈ।'

'বলিস কি রে, ও তো গুরুদেব হ্যায়।'

'ক্যা "গুরুদেব" "গুরুদেব" করতা হৈ। হম্ উসকো এক অঠন্নী দিয়া।'

বলে কি ? মাথা খারাপ না বদ্ধ পাগল ? গুরুদেবকে আধুলি দিয়েছে !

জিজ্ঞেসাবাদ করে জানা গেল, দেশ ছাড়ার সময় ভাণ্ডারের ঠাকুরমা তাকে নাকি উপদেশ দিয়েছেন, সন্ন্যাসী দরবেশকে দানদক্ষিণা করতে। ভাণ্ডারে তাঁরই কথামত দরবেশকে একটি আধুলি দিয়েছে। তবে হ্যাঁ, দরবেশ বাবাজী প্রথমটায় একটু আপত্তি জানিয়েছিল বটে, কিন্তু ভাণ্ডারে চালাক ছোকরা, সহজে দমে না, চালাকি নয়, বাবা, একটি পূরী অঠন্নী !

চল্লিশ বছরের আগের কথা। অঠন্নী সামান্য পয়সা, এ-কথা কেউ বলে নি। কিন্তু ভাণ্ডারেকে এটা কিছুতেই বোঝানো গেল না যে তার দানের পাত্র দরবেশ নয়, স্বয়ং গুরুদেব।

ভাণ্ডারের ভুল ভাঙতে কতদিন লেগেছিল আশ্রম পুরাণ এ-বিষয়ে নীরব। কিন্তু সেটা এ-স্থলে অবান্তর।

ইতিমধ্যে ভাণ্ডারে তার স্বরূপ প্রকাশ করেছে। ছেলেরা অস্থির, মাস্টাররা জ্বালাতন, চতুর্দিকে পরিত্রাহি আর্তরব।

হেড মাস্টার জগদানন্দবাবু এককালে রবীন্দ্রনাথের জমিদারী-সেরেস্তায় কাজ করেছিলেন। লেঠেল ঠ্যাঙানো ছিল তাঁর প্রধান কর্ম। তিনি পর্যন্ত এই দুঁদে ছেলের সামনে হার মেনে গুরুদেবকে জানালেন।

আশ্রম-স্মৃতি বলেন, গুরুদেব ভাণ্ডারেকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ রে, ভাণ্ডারে, এ কি কথা শুনি ?'

ভাণ্ডারে চুপ।

গুরুদেব নাকি কাতর নয়নে বললেন, 'হ্যাঁ রে ভাণ্ডারে, শেষ পর্যন্ত তুই এসব আরম্ভ করলি ? তোর মত ভালো ছেলে আমি আজ পর্যন্ত দেখি নি। আর তুই এখন আরম্ভ করলি এমন সব জিনিস যার জন্য সকলের সামনে আমাকে মাথা নিচু করতে হচ্ছে। মনে আছে, তুই যখন প্রথম এলি তখন কি রকম ভালো ছেলে ছিলি ? মনে নেই, তুই দান-খয়রাত পর্যন্ত করতিস ? আমাকে পর্যন্ত তুই একটি পুরো আধুলি দিয়েছিলি ? আজ পর্যন্ত কত ছাত্র এল গেল কেউ আমাকে একটি পয়সা পর্যন্ত দেয় নি। সেই আধুলিটি আমি কত যত্নে তুলে রেখেছি। দেখবি ?'

* *

তার দু'এক বৎসরের পর আমি শান্তিনিকেতনে আসি। মারাঠী সঙ্গীতজ্ঞ

স্বর্গীয় ভীমরাও শাস্ত্রী তখন সকালবেলার বৈতালিক গীত করতেন। তার কিছু-দিন পর শ্রীযুত অনাদি দস্তিদার। তারপর ভাণ্ডারে।

চল্লিশ বছর হয়ে গিয়েছে। এখনো যেন দেখতে পাই ছোকরা ভাণ্ডারে বৈতালিকে গাইছে,

এ দিন আজি কোন্ ঘরে গো
খুলে দিল দ্বার।
আজি প্রাতে সূর্য ওঠা
সফল হল কার॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

ধর্মের ইতিহাসে দেখা যায়, কোনো সভ্য জাতির বিত্তশালী সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের মাতৃভাষা কিংবা অন্য কোনো বোধ্য ভাষাতে যদি ধর্মচর্চা না থাকে তবে সে সম্প্রদায় ক্রিয়া-কর্ম ও পাল-পার্বণ নিয়েই মত্ত থাকে। এই তত্ত্বটি ভারতবাসীর ক্ষেত্রে অধিকতর প্রযোজ্য। কারণ, তারা স্বভাবতঃ এবং ঐতিহ্যবশতঃ ধর্মানুরাগী। তার কোনো বোধ্য ভাষাতে সত্যধর্মের মূলস্বরূপ সম্বন্ধে কোনো নির্দেশ না থাকলে সে তখন সব কিছু হারাবার ভয়ে ধর্মের বহিরাচরণ অর্থাৎ তার খোলস ক্রিয়াকর্মকেই আঁকড়ে ধরে থাকে।[১]

কলকাতা অর্বাচীন শহর। যে সব হিন্দু এ শহরের গোড়াপত্তনকালে ইংরেজের সাহায্য করে বিত্তশালী হন, তাঁদের ভিতর সংস্কৃত ভাষার কোনো চর্চা ছিল না। বাঙলা গদ্য তখনো জন্মলাভ করে নি। কাজেই মাতৃভাষার মাধ্যমে যে তাঁরা সত্যধর্মের সন্ধান পাবেন তারও কোনো উপায় ছিল না। ওদিকে আবার বাঙালী ধর্মপ্রাণ। তাই সে তখন কলকাতা শহরে পাল-পার্বণে যা সমারোহ করলো তা দেখে অধিকতর বিত্তশালী শাসক ইংরেজ-সম্প্রদায় পর্যন্ত স্তম্ভিত হল। এর শেষ-রেশ 'হুতোমে' পাওয়া যায়।

জাতির উত্থান-পতনেও এ অবস্থা বার বার ঘটে থাকে। এবং সমগ্রভাবে

১ বর্তমান লেখকের মনে সন্দেহ আছে, শাক্য মুনির আবির্ভাবের ঠিক পূর্বেই এই পরিস্থিতি হয়েছিল। বৈদিক ভাষা তখন প্রায় অবোধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল বলেই ক্রিয়াকর্ম-যাগযজ্ঞ-পশুহত্যা তখন সত্য-ধর্মের স্থান অধিকার করে বসেছিল। বুদ্ধদেব তখন এরই বিরুদ্ধে সত্যধর্ম প্রচার করেন ও সবজন-বোধ্য লোকায়ত প্রাকৃত (পরে পালি নামে পরিচিত) ভাষার শরণ নেন।

বিচার করতে গেলে তাতে করে জাতির বিশেষ কোনো ক্ষতি হয় না। গরীব-দুঃখীর তথা সমগ্র সমাজের জন্য এর একটা অর্থনৈতিক মূল্য তো আছে বটেই, তদুপরি এক যুগের অত্যধিক পালপার্বণের মোহকে পরবর্তী যুগের ঐকান্তিক ধ্যান-ধারণা অনেকখানি ক্ষতিপূরণ করে দেয়।

কিন্তু বিপদ ঘটে, যখন ঐ ক্রিয়াকর্মের যুগে হঠাৎ এক বিদেশী ধর্ম এসে উপস্থিত হয়, তার চিন্তাধারা তার সত্যপথ সন্ধানের আন্দোলন-আলোড়ন নিয়ে। এবং এই ধর্মজিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গে যদি অন্যান্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক (কঁৎ, মিল ইত্যাদি) প্রশ্নের যুক্তিতর্কমূলক আলোচনা-গবেষণা বিজড়িত থাকে তবে ক্রিয়াকর্মাসক্ত সমাজের পক্ষে তখন সমূহ বিপদ উপস্থিত হয়। বাঙালী সমাজের অগ্রণীগণ ইংরেজের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে গিয়ে অনেকখানি ইংরেজী শিখে ফেলেছেন এবং খৃষ্টধর্মের মূলতত্ত্ব, তার মহান আদর্শবাদ, সেই ধর্মে অনুপ্রাণিত মহাজনগণের সমাজসংস্কার প্রচেষ্টা তাঁদের মনকে বার বার বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে—তাঁদের মনে প্রশ্ন জেগেছে, আমাদের ধর্মে আছে কি, আছে তো শুধু দেখতে পাই অন্তঃসারশূন্য পূজা-পার্বণ, আর ওদের ধর্মে দেখি, স্বয়ং ভগবান পিতারূপে মানুষের হৃদয়দ্বারের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁকে পেলে এই অর্থহীন জীবন আপন চরম মূল্য লাভ করে, দুঃখ-দৈন্য আশা-আকাঙ্ক্ষা এক পরম পরিসমাপ্তিতে অনন্ত জীবন লাভ করে।

হিন্দুশাস্ত্রের অতি সামান্য অংশও যাঁরা অধ্যয়ন করেছেন তাঁরাই জানেন, এ সব কিছু নূতন তত্ত্ব নয়। বস্তুতঃ জীবনসমস্যা ও ধর্মে তার সমাধান এই অবলম্বন করেই আমাদের সর্বশাস্ত্র গড়ে উঠেছে। একদিকে দৈনন্দিন জীবনের অন্তহীন প্রলোভন, অন্য দিকে সত্যনিষ্ঠার প্রতি ধর্মের কঠোর কঠিন আদেশ—এ দুয়ের মাঝখানে মানুষ কি প্রকারে সার্থক গৃহী হতে পারে, সেই পন্থাই তো আমাদের শাস্ত্রকারগণ যুগে যুগে দেখিয়ে গিয়েছেন।

কিন্তু এ সব তত্ত্ব যাঁরা জানতেন তাঁরা থাকতেন গ্রামে, তাঁরা পড়তেন পড়াতেন টোল'চতুষ্পাঠীতে এবং তাঁরা ইংরেজের সংস্পর্শে আসেন নি বলে ওদের ধর্ম যে নাগরিক হিন্দুকে নানা প্রশ্নে বিচলিত করে তুলেছে সে সংবাদও তাঁদের কানে এসে পৌঁছয় নি।

আর সব চেয়ে আশ্চর্য, এই সব 'টোলো' 'বিটলে বামুন'রা যে শুধু পাদ্রী সাহেবদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে আপন ধর্মের মর্যাদা মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারতো তা নয়, তারা যে কান্ট-হেগেলের চেলাদের সঙ্গে বিশুদ্ধ দর্শনের ক্ষেত্রেও সংগ্রাম করতে প্রস্তুত ছিল—এ তত্ত্বটিও নাগরিক হিন্দুদের সম্পূর্ণ অজানা ছিল।

'ঘরের কাছে নিই নে খবর, খুঁজতে গেলাম দিল্লি শহর' লালন ফকিরের অর্থহীন গীত নয়।[২] এঁরা সত্যই জানতেন না, আমাদের টোলে শুধু স্মার্ত নন, নৈয়ায়িকও ছিলেন, এবং স্মার্তরাও যে শুধু তৈলবট নিয়ে বিধান দিতেন তাই নয়, তাঁরা সে বিধানের সামাজিক মূল্যও যুক্তি-তর্ক দিয়ে প্রমাণ করতে পারতেন।

কলকাতায় চিন্তাশীল গুণীজন তখন এই পরিস্থিতি দেখে বিচলিত হয়েছিলেন।

সৌভাগ্যক্রমে এই সময় রাজা রামমোহন রায়ের উদয় হল। তাঁর ব্রাহ্ম-আন্দোলন যে বাঙালী জাতির কি পরিমাণ উপকার করেছে, এই ব্রাহ্মসমাজের কীর্তিমান পুরুষসিংহ রবীন্দ্রনাথ বাঙলা সাহিত্যকে যে কি পরিমাণ ঐশ্বর্যশালী ও বহুমুখী করে গিয়েছেন, তার সম্পূর্ণ হিসাব নিকাশ এখনো শেষ হয় নি। বাঙালী সাধক, বাঙালী লেখক, বাঙালী পাঠক সকলেই সে-কথা স্বীকার করেছেন। স্বয়ং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছেন—

এদানির ব্রাহ্মধর্ম যায় ছড়াছড়ি
তাহারেও বার বার নমস্কার করি॥

'ছড়াছড়ি' শব্দে তখনকার দিনে প্রচলিত একটু ক্ষুদ্র তাচ্ছিল্য লুকানো রয়েছে। পরমহংসদেব সেটিকেও 'নমস্কার' করেছেন।

রাজা রামমোহন খৃষ্টধর্মে মহাপণ্ডিত ছিলেন, মুসলমান ধর্মের 'জবরদস্ত মৌলবী' ছিলেন এবং সব চেয়ে বড় কথা, সে যুগে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হলে যে বস্তু সম্পূর্ণ অবান্তর এমন কি অন্তরায়, সেই হিন্দুধর্মশাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অতুলনীয় ব্যুৎপত্তি এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল।

রাজা জানতেন, সে যুগের হিন্দুকে তর্ক-বিতর্ক করতে হবে খৃষ্টধর্মের সঙ্গে। অর্থাৎ খৃষ্টান মিশনারীর সামনে 'ক' অক্ষরে 'কৃষ্ণনাম' স্মরণে 'একঘটি'[৩] চোখের জল ফেললেই আপন ধর্মের মাহাত্ম্য সুপ্রতিষ্ঠিত হবে না—খুব বেশী হলে, ভদ্র মিশনারী হয়ত তাকে ভক্ত বলে স্বীকার করবে মাত্র। তাই তাকে প্রমাণ করতে হবে যে, কলকাতার হিন্দুর ক্রিয়াকর্মের পিছনে রয়েছে, হিন্দুর ষড়দর্শন, বুদ্ধ এবং মহাবীরের বিশ্বপ্রেম এবং সর্বপশ্চাতে রয়েছে অহরহ জাজ্বল্যমান বেদ-

---

২ শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের গাওয়া গান এরই কাছাকাছি:

আপনাতে আপনি থেকো মন যেও নাকো কারু ঘরে
যা চাবি তা বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, অনিল গুপ্ত সংস্করণ, ১ম খণ্ড, ২১৩ পৃঃ।

৩ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় কথার আড়।

বেদান্তের অখণ্ড দিব্যদৃষ্টি।

দেশের আপামর জনসাধারণের ভিতর হিন্দু ধর্মের নব উন্মাদনা আনতে হলে রাজা রামমোহন হিন্দুধর্মের কোন্ কোন্ সম্পদ গ্রহণ এবং প্রচার করতেন সে কথা বলা শক্ত; কিন্তু এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, সে যুগের কলিকাতাবাসী সুসভ্য অথচ আপন শাস্ত্রে অজ্ঞ হিন্দুর সামনে তিনি সর্বশাস্ত্র মন্থন করে উপনিষদগুলিই তুলে ধরে প্রকৃত ঋষির গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন। উপনিষদ থেকেই শঙ্কর-দর্শনের সূত্রপাত এবং শঙ্করের অদ্বৈতবাদ অতিশয় অক্লেশে, পরম অবহেলায় খৃষ্টানের ট্রিনিটিকে সম্মুখ সংগ্রামে আহ্বান করতে পারে। উপনিষদের গুণকীর্তন এ ক্ষুদ্র এবং অক্ষম রচনার উদ্দেশ্য নহে,— অনুসন্ধিৎসু পাঠক তুর্কী পণ্ডিত অলবীরূণী, মোগল সুফী দারাশীকূহ্ (ঔরঙ্গজীবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা)[৪] এবং জর্মন দার্শনিক শোপেনহাওয়ারের রচনাতে তার ভূরি ভূরি উদাহরণ পাবেন।

ধর্মের যে সব বাহ্যানুষ্ঠান সত্যধর্ম থেকে অতি দূরে চলে গিয়ে অধর্মে রূপান্তরিত হয়েছে তার বিরুদ্ধে রাজা সংগ্রাম আরম্ভ করলেন সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করে এবং সে সংগ্রামের জন্য তিনি অস্ত্রশস্ত্র সঞ্চয় করলেন হিন্দু স্মৃতি থেকেই। এ-স্থলে রাজা বিশ্বজনীন যুক্তিতর্ক ব্যবহার না করে প্রধানত ব্যবহার করলেন হিন্দুশাস্ত্রসম্মত ন্যায় এবং উদাহরণ। রাজা প্রমাণ করলেন যে তিনি দর্শনে যে রকম বিদগ্ধ, ক্রিয়াকর্মের ভূমিতেও অনুরূপ স্মার্ত মল্লবীর।

শাস্ত্রালোচনায় ঈষৎ অবান্তর হলেও এস্থলে বাঙলা সাহিত্যানুরাগীর দৃষ্টি তার অতি প্রিয় একটি বস্তুর দিকে আকর্ষণ করি। রাজাকে তাঁর আন্দোলন চালাতে হয়েছিল কলকাতার বাঙালীদের ভিতর। এঁরা সংস্কৃত জানেন না। তাই তাঁকে বাধ্য হয়ে লিখতে হয়েছিল বাঙলা ভাষাতে। পদ্য এ সব যুক্তি-তর্কের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বাহন। তাই তাঁকে বাঙলা গদ্য নির্মাণ করে তার-ই মাধ্যমে আপন বক্তব্য প্রকাশ করতে হয়েছিল। রাজার পূর্বে যে বাঙলা গদ্য লেখা হয় নি

৪ দারা তাঁর অতুলনীয় ধর্মগ্রন্থ আরম্ভ করেছেন এই বলে: "হে প্রভু, তুমি তোমার সুন্দর মুখ কুফ্‌র্ (অবিদ্যা) কিম্বা ইমান (বিদ্যা) দু'পাশের কোনো অলকগুচ্ছ (জুল্‌ফ) দিয়ে ঢেকে রাখো নি।" এই শ্লোক ঈশোপনিষদের 'অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে। ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥'-রই অনুবাদ।

এ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু হিন্দুধর্মের এই তুমুল আন্দোলন আকর্ষণ মন্থনের ফলে যে অমৃত বেরুল তারই নাম বাঙলা গদ্য। পৃথিবীর ইতিহাসে এ জাতীয় ঘটনা বহুবার ঘটেছে; তথাগতের কৃপায় পালি, মহাবীরের কৃপায় অর্ধ-মাগধী। হজরৎ মুহম্মদের কৃপায় আরবী গদ্য, লুথারের কৃপায় জর্মন গদ্যের সৃষ্টি। পূর্বেই নিবেদন করেছি, গণবোধ্য মাতৃভাষাতে শাস্ত্রালোচনা না থাকলে ক্রিয়াকর্মের আত্যন্তিক প্রসার পায়; তার বিরুদ্ধে নবধর্ম পত্তন কিম্বা সনাতন ধর্মের সংস্কার আন্দোলন আরম্ভ হয়;[৫] এবং সে আন্দোলনকে বাধ্য হয়েই গণভাষার আশ্রয় নিতে হয়।

রাজার প্রচলিত সংস্কার উপনিষদে আপনার দৃঢ়ভূমি নির্মাণ করার ফলে কতকগুলি জিনিস সে অস্বীকার করল। তার প্রথম, সাকার উপাসনা। দ্বিতীয় বৈষ্ণবধর্মের তদানীন্তন প্রচলিত রূপ; এবং ক্রমে ক্রমে গণ-ধর্মের (Folk religion) প্রতি ব্রাহ্মদের অবজ্ঞা স্পষ্টতর হতে লাগল।[৬] প্রমাণ-স্বরূপ বলতে পারি, তখনকার দিনে কেন আজও যদি কেউ ব্রাহ্ম-মন্দিরের বক্তৃতা দিনের পর দিন শোনে তবু সে উপনিষদের পরবর্তী যুগের ধর্মসাধনার অল্প ইঙ্গিতই শুনতে পাবে। তার মনে হবে, উপনিষদ-আশ্রিত ধর্মদর্শনের শেষ হয়ে যাওয়ার পর আজ পর্যন্ত হিন্দুরা আর কোনো প্রকারের উন্নতি করতে পারেন নি। এমন কি গীতার উল্লেখও আমি অল্পই শুনেছি। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের কথা প্রায় কখনোই শুনি নি। বৃন্দাবনের রসরাজ-রসমতীর অভূতপূর্ব অলৌকিক প্রেমের কাহিনী থেকে কোনো ব্রাহ্ম কখনো কোনো দৃষ্টান্ত আহরণ করেন নি।

ধর্ম জানেন, আমি ব্রাহ্মদের নিকট অকৃতজ্ঞ নই। পাছে তাঁরা ভুল বোঝেন

---

৫ বস্তুতঃ, সম্পূর্ণ নূতন ধর্ম পৃথিবীতে কোনো মহাপুরুষ কখনোই আরম্ভ করেন নি। বুদ্ধদেব বলতেন, তাঁর পূর্বে বহু বুদ্ধ জন্ম নিয়েছেন, মহাবীর জৈনদের সর্বশেষ তীর্থঙ্কর বা জিন। খ্রীষ্ট বলেন, তিনি বিধির বিধান ভাঙতে আসেন নি—তিনি এসেছেন তাকে পূর্ণরূপ দান করতে। হজরৎ মুহম্মদ বলতেন, তাঁর পূর্বে বহু সহস্র পয়গম্বর আবির্ভূত হয়েছেন। বস্তুতঃ এঁদের কেউ বলেন নি, আমি প্রথম। প্রায় সকলেই বরঞ্চ বলেছেন, আমিই শেষ।

৬ একটা অবিশ্বাস্য গল্প শুনেছি, কোনো ব্রাহ্ম ভক্ত নাকি কদম্বতরুকে 'অশ্লীল বৃক্ষ' নাম দিয়েছিলেন। কিন্তু এর থেকে অন্ততঃ এইটুকু বোঝা যায়, হিন্দুরা ব্রাহ্মদের 'গোঁড়ামি' সম্বন্ধে তখনকার দিনে কি ধারণা পোষণ করতেন।

তাই বাধ্য হয়ে ব্যক্তিগত কথা তুললুম এবং করজোড়ে নিবেদন করছি, আমি মুসলমান, আমার কাছে হিন্দু যা ব্রাহ্মও তা, আমি হিন্দু ব্রাহ্ম উভয় পন্থার (আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস পন্থা ভিন্ন নয়) সাধু-সন্তদের বার বার নমস্কার করি।

ব্রাহ্মধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ যতই অধ্যয়ন করি ততই দেখতে পাই, ব্রাহ্মরা যেন ক্রমে ক্রমেই জনগণ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলেন। জনগণকে ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত করে এক বিরাট গণ-আন্দোলন আরম্ভ করার প্রচেষ্টা যেন তাঁদের ভিতর ছিল না। এ যুগেও তার উদাহরণ পাই নি। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আজ পর্যন্ত আমি বহু ব্রাহ্ম পরিবারের আতিথ্য লাভ করেছি, ফলে গভীর হৃদ্যতা হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো ব্রাহ্ম পরিবারে হিন্দু চাকর-বাকরকে ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত করার প্রচেষ্টা দেখি নি। মুসলমান-খ্রীষ্টানরা সর্বদাই করে থাকেন বলেই এটা আমার কাছে আশ্চর্যজনক বলে মনে হয়েছিল। আমার মনে হয়, ব্রহ্মমন্ত্র সর্বজনীন কিন্তু এ কথাও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ব্রহ্মজ্ঞানীরা যে কোনো কারণেই হোক সর্বজনকে আহ্বান জানাতে পারেন নি। মুসলমানের নমাজে মুটে-মজুর চাকর-বাকরের সংখ্যাই বেশী, হিন্দুর সংকীর্তনে ভাবোল্লাসে নৃত্য করে 'নিম্নশ্রেণী'র প্রচুর হিন্দু, আর মন্দিরে আরতির সময় শিক্ষিত হিন্দুকে তো আজকাল দেখতেই পাওয়া যায় না। অথচ পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্ম-সম্মেলনে ব্রাহ্ম চাকর-নফর দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

তার জন্য আমি ব্রহ্মবাদীদের আদৌ ত্রুটি ধরছি না। এঁরা অক্ষম ছিলেন, একথা আমি কখনো স্বীকার করবো না। আমার মনে হয়, এঁরা প্রধানতঃ সমাজের নেতৃস্থানীয়দের নিয়েই আপন আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন এবং তাঁদের মাধ্যমে যে আমাদের মত বহু হিন্দু-মুসলমান প্রচুর উপকৃত হয়েছিলেন সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে হিন্দু-ধর্মের গণরূপ তখন একেবারেই অভিভাবকহীন হয়ে পড়ল। তার জন্য ব্রাহ্মদের দোষ দিলে অত্যন্ত অন্যায় হবে; দোষ হিন্দুদের। তাঁদের নেতৃস্থানীয়েরা তখন হয় দীক্ষা নিয়েছেন, কিম্বা ব্রাহ্মদের প্রতি সহানুভূতিশীল, আপন গরীব জাত-ভাই কি ধর্মকর্ম করছে এবং তার কল্যাণে সত্যধর্মের সন্ধান পাচ্ছে কি না এ বিষয়ে তাঁরা তখন উদাসীন। যেন গণধর্ম ধর্মই নয়, যেন ধর্মে একমাত্র শিক্ষিত জনেরই শাস্ত্রাধিকার।

অতিশয় মারাত্মক পরিস্থিতি। দেশের দশের তা হলে সর্বনাশ হয়। শিক্ষিত-

জনকেও শেষ পর্যন্ত তার তিক্ত ফল আস্বাদ করতে হয়।[৭]

* *

ঠিক এই সময়ে করুণাময়ের কৃপায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আবির্ভাব।

পরমহংসদেবকে সমগ্র এবং সম্পূর্ণভাবে ধারণা করা আমাদের মতো অতি সাধারণ প্রাণীর পক্ষে অসম্ভব, কারণ, আমরা সব কিছুই গ্রহণ করি আমাদের বুদ্ধি দিয়ে—যুক্তিতর্কের ছাঁচে ফেলে। অথচ কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে সাধু-সন্তদের ধারণা করতে গেলে আমরা পাই বরফের সেই অতি অল্প অংশটুকুর খবর, যেটি জলের উপর ভাসছে। অর্থাৎ বেশীর ভাগ বস্তুটি যে ষষ্ঠেন্দ্রিয় তৃতীয় চক্ষু দিয়ে দেখতে হয় সেটি আমাদের নেই। তৎসত্ত্বেও যারা তার বিচার করে তাদের নিয়ে মৃদু হাস্য করে বাউল গেয়েছেন

ফুলের বনে কে ঢুকেছে সোনার জহুরী
নিকষে ঘষয়ে কমল, আ মরি আ মরি।

যার যেমন মাপকাঠি। স্যাকরার ক্রাইটেরিয়ন তার নিকষ পাথর। সে তাই দিয়ে পদ্মফুলের গুণ বিচার করতে যায়। কিন্তু এর চেয়েও মারাত্মক অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন স্বয়ং পরমহংসদেব—একাধিক বার। নুনের পুতুল সমুদ্রে নেমেছিল তার গভীরতা মাপবে বলে। তিন পা যেতে না যেতেই সে গলে গিয়ে জলের সঙ্গে মিশে গেল।[৮]

তাই নিয়ে কিন্তু কিছুমাত্র শোক করার প্রয়োজন নেই। স্বয়ং রামকৃষ্ণদেবই বলেছেন, তোমার এক ঘটি জলের দরকার। পুকুরে কত জল তা জেনে তোমার কি হবে?[৯]

তাই মা ভৈঃ। যারা বলে আমাদের মত পাপীতাপীর অধিকার নেই পরমহংসের মত মহাপুরুষের জীবন নিয়ে আলোচনা করার—তারা ভুল বলে।

---

৭ রাজনীতির ক্ষেত্রে এই শিক্ষিত-অশিক্ষিতের ব্যবধানের জন্য আমরা যে কি কর্মফল ভোগ করেছি, সে তথ্যের উত্থাপন এ-স্থলে অবান্তর।

৮ আমাদের ব্যক্তিগত প্রার্থনা, তাই যেন হয়। বাউল গেয়েছেন, 'যে জন ডুবলো, সখী, তার কি আছে আর বাকি গো?' ঠাকুরও প্রায়ই গাইতেন 'ডোব ডোব, ডোব।'

৯। এক চীনা সাধক এরই কাছাকাছি এসে বলেছেন, 'মাই কাপ্ ইজ স্মল; বাট্ আই ড্রিঙ্ক অকনার।'

অধিকার আমাদেরই—এক মহাপুরুষ অন্য মহাপুরুষের জীবনী লিখতে যাবেন কেন? সে অধিকার গ্রহণ করতে গিয়ে ভুল-ত্রুটি হলে মহাত্মাদের কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। হীন প্রাণকে নিয়ে আলোচনা করতে গেলেই সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।

পরমহংসদেবের কাছে আসার পূর্বেই চোখে পড়বে, লোকটি কী সরল। এগিয়ে এলে বোঝা যায়, এঁর বাহির-ভিতর দুই-ই সরল। এঁর শরীরটি যেমন পরিষ্কার, এঁর মনটিও তেমনি পরিষ্কার। মেদিনীপুর অঞ্চলে যাকে বলে 'নিখিরকিচ'—চাঁচা-ছোলা। যেন এইমাত্র তৈরী হয়েছে কাঁসার ঘটিটি—কোন জায়গায় টোল পড়ে নি।

এঁর মত সরল ভাষায় কেউ কখনো কথা বলে নি। এঁর ভাষার সঙ্গে সব চেয়ে বেশী সাদৃশ্য খ্রীষ্টের ভাষা ও বাক্যভঙ্গীর। আমাদের দেশের এক আলঙ্কারিক বলেছেন, 'উপমা কালিদাসস্য'। এর অর্থ শুধু এই নয় যে, কালিদাস উত্তম উপমা প্রয়োগ করতে পারতেন, এর অর্থ উপমামাত্রই কালিদাসের, অর্থাৎ উপমার রাজ্যে কালিদাস একচ্ছত্রাধিপতি। আমার মনে হয়, উপমাবৈচিত্র্যে পরমহংসদেব কালিদাসকেও হার মানিয়েছেন। কালিদাস ব্যবহার করেছেন শুধু সুন্দর মধুর তুলনা—যেগুলো কাব্যের অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে। রামকৃষ্ণের সেখানে কোনো বাছ-বিচার ছিল না। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে, 'তার জাঁতায় যাই ফেলো না কেন, ময়দা হয়ে বেরিয়ে আসে।' পরমহংসের বেলাও ঠিক তাই। কিছু একটা দেখলেই হল। সময়মত ঠিক সেটি উপমার আকার নিয়ে বেরিয়ে আসবে। এমন কি, যেসব কথা আমরা সমাজে বলতে কিন্তু-কিন্তু করি, পরমহংসদেব সর্বজনসমক্ষে অক্লেশে সেগুলো বলে যেতেন। ভগবানকে পেতে হলে কি ধরনের 'বেগে'র প্রয়োজন সে সম্বন্ধে তাঁর তুলনাটির উল্লেখ এখানে না-ই বা করলুম।

ঠিক এইখানেই আমরা একটি মূল সূত্র পাব। তিনি জনগণের ধর্ম (ফোক রিলিজিয়ন) আচার-ব্যবহার, ভাষা—সব জিনিসকেই তার চরম মূল্য দেবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন বলেই জনগণের ভাষা, বাচনভঙ্গী সানন্দে ব্যবহার করে যেতেন। জনগণের অন্যায় অধর্ম তিনি স্বীকার করতেন না। কিন্তু যেখানে শুদ্ধমাত্র রুচির প্রশ্ন সেখানে তিনি 'ধোপদুরস্ত' 'ফিটফাট' হবার কোনো প্রয়োজন বোধ করতেন না। ভাষাতে সেদিনকার 'ছুঁৎবাই' রোগ আমরা পেয়েছিলুম ভিক্টোরীয় প্যুরিটানিজ্‌ম থেকে—তখন কে জানতো পঞ্চাশ বছর যেতে-না-যেতেই লরেন্স জয়েস এসে আমাদের ছুঁৎবাইয়ের 'ভণ্ডামি' লণ্ডভণ্ড করে

দেবেন।[১০]

পরমহংসদেব গণধর্ম স্বীকার করে তার চরম মূল্য দিলেন। সাকার উপাসনা গণধর্মের প্রধান লক্ষণ। বাঙালী সেই সাকারের পূজা করে প্রধানতঃ কালীরূপে। কালীমূর্তি দেখলে অ-হিন্দু রীতিমত ভয় পায়। পরমহংসদেব সেই কালীকে স্বীকার করলেন।

অথচ 'দূরের কথা' বিচার করলে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি বলে, পরমহংসদেব আসলে বেদান্তবাদী। কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি এ-তিন মার্গ তিনি অবস্থাভেদে একে ওকে বরণ করতে বলেছেন। কিন্তু সব কিছু বলার পর তিনি সর্বদাই বলেছেন, 'কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ব্রহ্ম ব্যতীত সব কিছু মিথ্যা বলে অনুভব করতে পারো নি ততক্ষণ পর্যন্ত সাধনার সর্বোচ্চ স্তরে উঠতে পারবে না।' 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' বড় কঠিন পথ। জগৎ মিথ্যা হলে তুমিও মিথ্যা, যিনি বলেছেন তিনিও মিথ্যা, তাঁর কথাও স্বপ্নবৎ। বড় দূরের কথা।

'কি রকম জানো, যেমন কর্পূর পোড়ালে কিছুই বাকী থাকে না। কাঠ পোড়ালে তবু ছাই বাকী থাকে। শেষ বিচারের পর সমাধি হয়। তখন "আমি", "তুমি", "জগৎ", এ সবের খবর থাকে না।'

অথচ গণধর্মে নেমে এসে বলছেন, 'যিনি ব্রহ্ম, তিনিই কালী'। যখন নিষ্ক্রিয়, তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এইসব কাজ করেন, তাঁকে শক্তি বলে কই। স্থির জল ব্রহ্মের উপমা। জল হেলছে দুলছে শক্তি বা কালীর উপমা। কালী 'সাকার আকার নিরাকারা'। তোমাদের যদি নিরাকার বলে বিশ্বাস, কালীকে সেইরূপ চিন্তা করবে।[১১] আর একটি কথা—তোমার

১০ বিদ্যাসাগর মহাশয় এ দ্বন্দ্বের সমাধান না করতে পেরে দু'রকম ভাষাই ব্যবহার করতেন। 'সীতার বনবাসে'র ভাষা সকলেই চেনেন, কিন্তু যেখানে তিনি রামা-শ্যামাকে বিধবা বিবাহের শত্রুদের বিপক্ষে ক্ষেপাতে চেয়েছেন, সেখানে 'কস্যচিৎ ভাইপোস্য' এই বেনামীতে, 'ফাজিল-চালাক', 'দিলদরিয়া তুখোড় ইয়ার', 'তার একটি বেদড়া মন্ত্রী আছে—এটি তারই ত্যাঁদড়ামি', 'লোকটা লক্ষ্মীছাড়া বক্কেশ্বর আনাড়ির চূড়ামণি বে-অকুব্বের শিরোমণি'। ইত্যাদি 'গ্রাম্য' বাক্য পরমানন্দে ব্যবহার করেছেন। তিনি যে সব আদিরসাত্মক গল্প ছাপায় (!) প্রকাশ করেছেন সেগুলো সমাজে বললে এখনও সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।

১১ শক্তিকে নানা দেশের কবি এবং সাধকগণ নানারূপে কল্পনা করেছেন। কাব্যে বিবেকানন্দের কবিতাই শ্রেষ্ঠতম।

নিরাকার বলে যদি বিশ্বাস, দৃঢ় করে তাই বিশ্বাস করো কিন্তু মতুয়ার (dogmatism) বুদ্ধি করো না। তাঁর সম্বন্ধে এমন কথা জোর করে বলো না যে, তিনি এই হতে পারেন, আর এই হতে পারেন না। ব'লো আমার বিশ্বাস তিনি নিরাকার, আর কত কি হতে পারেন তিনি জানেন। আমি জানি না, বুঝতে পারি না।[12]

"মৃত্যুরূপা মাতা

নিঃশেষে নিবেছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ,
স্পন্দিত, ধ্বনিত অন্ধকার, গরজিছে ঘূর্ণ্যবায়ু-বেগ!
লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বহির্গত বন্দিশালা হ'তে,
মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে।
সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা, উঠে ঢেউ গিড়িচূড়া জিনি'
নভস্তল পরশিতে চায়। ঘোররূপা হাসিছে দামিনী,
প্রকাশিছে দিকে দিকে তা'র মৃত্যুর কালিমা মাথা গায়
লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর!—দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়,—
নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে; মৃত্যুরূপা মা আমার আয়!
করালি! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে;
তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতি পদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে!
কালি, তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মা গো, আয় মোর পাশে।
সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়,—মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে
কালনৃত্য করে উপভোগ,—মাতৃরূপা তা'রি কাছে আসে।"

(সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ)

ইংরেজীতে এর প্রথম ছত্র "The Stars are blotted out!"—আশ্চর্য বোধ হয় রবীন্দ্রনাথও অতি বাল্যবয়সে (১৪?) কালী সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখেছিলেন।'

১২ ডগমাটিজম্ না করে মনকে খোলা এবং জানা-অজানার মাঝখানেই যে সত্য পন্থা এর উৎকৃষ্ট প্রকাশ কেনোপনিষদে :—

"নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ॥"

'আমি এইরূপ মনে করি না যে, আমি ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানিয়াছি; অর্থাৎ 'জানি না' ইহাও মনে করি না, এবং 'জানি' ইহাও মনে করি না। 'জানি না

জনগণপূজ্য শক্তির সাকার সাধনা ('পৌত্তলিকতা' শব্দটা সর্বথা বর্জনীয়— এটাতে তাচ্ছিল্য এবং ব্যঙ্গের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে) স্বীকার করে পরমহংসদেব তৎকালীন ধর্মজগতের ভারসাম্য আনয়ন করলেন বটে কিন্তু প্রশ্ন, জড়সাধনার অন্ধকার দিকটা কি তিনি লক্ষ্য করলেন না ?

এইখানেই তাঁর বিশেষত্ব এবং মহত্ত্ব। এই সাকার-সাধনার পশ্চাতে যে জ্ঞেয়-অজ্ঞেয় ব্রহ্মের বিরাট মূর্তি অহরহ বিরাজমান, পরমহংসদেব বার বার সেদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই ভারসাম্যই ব্রহ্মজ্ঞানী কেশব সেন, বিজয়কৃষ্ণ এবং তাঁদের শিষ্যদের আকর্ষণ করতে পেরেছিল। তিনি যদি 'মতুয়া' কালীপূজক হতেন তবে তিনি পরমহংস হতেন না।

বস্তুতঃ একটি চরম সত্য আমাদের বার বার স্বীকার করা উচিত : যেখানেই যে কোনো মানুষ যে কোনো পন্থায় ভগবানের সন্ধান করেছে তাকেই সম্মান জানাতে হয়। এমন কি ক্ষুদ্র শিশু যখন সরস্বতীর দিকে তাকিয়ে তাঁর সাহায্য কামনা করে (হায়, কলকাতায় সরস্বতী পূজার বাহ্য আড়ম্বর দেখে অনেক সময় মনে হয়, এরাই বুঝি এ যুগে দেবীর একমাত্র সাধক) তাকেও মানতে হয়,— গাছের পাতা, জলের ফোঁটা যখন মানুষ মাথায় ঠেকায় তারও বিলক্ষণ মূল্য আছে। গীতাতে এ সত্যটি অতি সরল ভাষায় বলা হয়েছে। .

কিন্তু সাকার-নিরাকার নিয়ে আজ আর তর্ক করে লাভ কি ? বাঙলা দেশে আজ আর ক'জন লোক নিরাকার পূজা করেন তার খবর বলা শক্ত—কারণ সে পূজা হয় গৃহকোণে, নির্জনে। আর কলকাতায় বারোয়ারী সাকার পূজার যা আড়ম্বর তা দেখে বাঙলার কত গুণীজ্ঞানী যে বিক্ষুব্ধ হন তার প্রকাশ খবরের কাগজে প্রতি বৎসর দেখি। এইমাত্র নিবেদন করেছি, এরও মূল্য আছে—তাই আমার এক জ্ঞানী বন্ধু বড় দুঃখে বলেছিলেন, 'কিন্তু কি ভয়ঙ্কর স্ট্রেন করে এস্থলে সে সত্যটি স্বীকার করি'।

সাকার নিরাকারের আধ্যাত্মিক মূল্য যা আছে, তা আছে, কিন্তু এই দ্বন্দ্ব সমাধানের সামাজিক মূল্য কি ?

হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম সকলেই বাঙালী সমাজে সমান অংশীদার। এঁদের ধর্মাচরণ যা-ই হোক না কেন, সমাজে তাঁরা মেলামেশা করেছেন অবাধে।

যে তাহাও নহে এবং জানি যে তাহাও নহে'—আমাদের মধ্যে যিনি এই বচনটির মর্ম জানেন, তিনিই ব্রহ্মকে জানেন।'—গম্ভীরানন্দ

চতুর্থ পাদটীকা পুনরায় দ্রষ্টব্য।

একবার ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে এই সহজ মেলামেশা না থাকলে খ্রীষ্টান মাইকেল, মুসলমান মুশররফ হুসেন, নজরুল ইসলাম এবং জসীমউদ্দীন বাঙলা কাব্যে খ্যাতি অর্জন করতে পারতেন না। সমঝদার ও রসিক জনের গুণগ্রাহিতা ও উৎসাহ লাভ না করে কম কবিই এ সংসারে সার্থক কাব্য সৃষ্ট করতে পেরেছেন। এবং এঁদের সকলেরই উৎসাহী পাঠক এবং গুণগ্রাহী বন্ধু ছিলেন প্রধানতঃ হিন্দুরাই।[১৩]

আধ্যাত্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক যে কোনো মতবৈষম্যের ফলে যদি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় একই সমাজের ভিতর অন্তরঙ্গ ভাব বর্জন করেন তবে সেই অখণ্ড, সমগ্র সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি—'মহতী বিনষ্টি' হয়; এই তত্ত্বটি সম্বন্ধে সে যুগে কয়জন গুণী সচেতন ছিলেন? মুসলমান সাকার মানে না, কিন্তু তাই বলে তো সে যুগে বাঙালী সমাজে হিন্দু-মুসলমানের মিলন ক্ষুণ্ণ হয় নি? তবে কেন ঐ কারণেই ব্রাহ্মে হিন্দুতে সামাজিক অন্তরঙ্গ গতিবিধি বন্ধ হবে?

পরমহংসদেব এই বিরোধ নির্মল করতে চেয়েছিলেন বলেই সাকার-নিরাকারের অর্থহীন, অপ্রিয় আলোচনা বর্জন করেন নি। তাই বার বার দেখি; তিনি আপন হিন্দু ভক্তবৃন্দ নিয়েই সন্তুষ্ট নন। বার বার দেখি, তিনি উদ্‌গ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করছেন, বিজয় কোথায়, শিবনাথ যে বলেছিল আসবে, বলছেন কেশব আমার বড় প্রিয়। অথচ তিনি তো ব্রাহ্ম ভক্তদের 'কালী-কাল্টে কন্‌ভার্ট' করার জন্য কিছুমাত্র ব্যগ্র নন। তিনি সর্বান্তঃকরণে কামনা করেছিলেন, এদের বিরোধ যেন লোপ পায়।[১৪]

আমার ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস, এই দ্বন্দ্ব অপসারণে অদ্বিতীয় কৃতিত্ব পরমহংসদেবের।

১৩ পূর্ববর্তী যুগে পরাগল, ছুটি খাঁর মত মুসলমান গুণগ্রাহী ছিলেন বলেই হিন্দুরা মহাভারত অনুবাদ করেছিলেন; পরবর্তী যুগে হিন্দু সমঝদার ছিলেন বলেই সৈয়দ মরতুজা প্রমুখ বহুতর মুসলমান বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবিগণ সম্বন্ধে অত্যুৎকৃষ্ট পুস্তিকা দ্রষ্টব্য।

১৪ এ বিষয়ে পরমহংসদেব কতখানি 'নাছোড়বান্দা' ছিলেন তার সব চেয়ে ভালো উদাহরণ অনুসন্ধিৎসু পাঠক পাবেন, অনিল গুপ্ত সংস্করণ, চতুর্থ খণ্ডের চতুর্থ ভাগে। পাঠক তখন 'নাছোড়বান্দা'র সত্যপ্রয়োগ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবেন।

সামাজিক দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে এতখানি সচেতন পুরুষ যে তার অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে অচেতন থাকবেন এ কখনই হতে পারে না। পক্ষান্তরে, আবার অন্য সত্যও সর্বজনবিদিত—কামিনী-কাঞ্চনে পরমহংসের তীব্র বৈরাগ্য। তার থেকেই ধরে নিতে পারি, অর্থ-সমস্যা আপন সত্তায় (per se) তাঁর সামনে উপস্থিত হয় নি। যারা মুখ্যতঃ অর্থ কামনা করে, রামকৃষ্ণদেব তো তাঁদের উপদেষ্টা নন। যারা মুখ্যতঃ ধর্মজিজ্ঞাসু অথচ অর্থসমস্যায় কাতর তিনি তাঁদের সে দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। কাজেই পরোক্ষভাবে তিনি সমাজের অর্থনৈতিক প্রশ্নেরও সমাধান দিয়েছেন। যে যতখানি কাজে লাগাতে পেরেছে ততখানি উপকার পেয়েছে।

রামকৃষ্ণদেব বহুবার বলেছেন, 'কলিকালে মানবের অন্নগত প্রাণ'। এর অর্থ আর কিছুই নয়—এর সরল অর্থ, ইংরেজের শোষণনীতির শোচনীয় পরিণাম বাঙালীর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তখন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছে। অন্নাভাবে সে তখন এমনই কাতর যে অন্য কোন চিন্তার স্থান আর তার মস্তকে নাই। তবু যাঁরা ধর্মে অনুরক্ত তাঁরা বার বার পরমহংসদেবকে প্রশ্ন করেছেন, 'উপায় কি' ?

পূর্বেই বলেছি তিনি ছিলেন বেদান্তবাদী। তা হলে তাঁর কাছ থেকে উত্তর প্রত্যাশা করতে পারি যে জগৎ মায়া মিথ্যা অনুমিত হলেই অর্থের প্রয়োজন আপনার থেকেই ঘুচে যাবে। কিন্তু তিনি বলেছেন, পাখীর মতো দাসীর মতো সংসারের কাজ করে যাবে, কিন্তু মন পড়ে রইবে ভগবানের পায়ের তলায়। অর্থাৎ কলিযুগে সমাজের সে সচ্ছলতা নেই যে তোমাকে অন্ন জোটাবে আর তুমি নিশ্চিন্তমনে জ্ঞানমার্গে আপন মুক্তির সন্ধান পাবে। কলির মানুষের কর্ম থেকে মুক্তি নেই।

ওদিকে যে সব ব্রাহ্ম ভক্তের অর্থাভাব ছিল না,—যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানের তপস্বী তাঁদের বার বার বলেছেন, ঈশ্বরকে ব্যাকুল হয়ে ডাকো। কলিযুগে ভক্তি ভিন্ন গতি নেই।

আর সকলকেই এ কথা বলেছেন, এই জন্যেই যারা সাধনার সর্বশেষ স্তরে পৌঁছতে চায়—রাখাল, নরেন্দ্রের মত যারা জন্মাবধি জীবন্মুক্ত তাদের ক'জন বাদ দিলে আর ক'টি প্রাণী সে স্তরে পৌঁছতে পারবে সে বিষয়ে তাঁর মনে গভীর সন্দেহ ছিল—তাদের হতে হবে নিরঙ্কুশ জ্ঞানমার্গের সাধক। শুদ্ধ জ্ঞানের সাহায্যে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে, ব্রহ্ম ভিন্ন নিত্যবস্তু কিছুই নেই।

পূর্বেই নিবেদন করেছি, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে সমগ্রভাবে উপলব্ধি করার ক্ষমতা আমার নেই। এ-কথা স্বীকার করেও যদি দম্ভভরে কিছু বলি,

তবে বলবো, যে সাধক গীতোক্ত কর্ম, জ্ঞান এবং ভক্তির সমন্বয় করতে পেরেছেন তিনি সমগ্র পুরুষ—পরম পুরুষ। কোনো মহাপুরুষকে যদি দস্তুরে যাচাই করতে চাই, তবে এই তিনটির সমন্বয়েই সন্ধান করবো। তার কারণ গীতাতে এই তিন পন্থা উল্লিখিত হওয়ার পর আজ পর্যন্ত অন্য কোন চতুর্থ পন্থা আবিষ্কৃত হয় নি। এ তিন পন্থার সমন্বয়কারী শ্রীকৃষ্ণের সহচর। তাঁর নাম শ্রীরামকৃষ্ণ।

* *

যে পাঠক ধৈর্য সহকারে আমার প্রগল্‌ভতা এতক্ষণ ধরে শুনলেন তিনি কৌতূহলবশতঃ স্বতঃই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন, 'এ তো হল মানুষের সংসর্গে আগত সমাজে সমুজ্জ্বল রামকৃষ্ণদেব। কিন্তু যেখানে তিনি একা—তাঁর সাধনার লোকে তিনি কতখানি উঠতে পেরেছিলেন? সোজা বাঙলায়, 'তিনি কি ভগবানকে সাক্ষাৎ দেখতে পেয়েছিলেন?'

এর উত্তরে বলবো, মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, এ প্রশ্নের উত্তর দেবার অধিকার আমাদের কারোরই নেই। এ প্রশ্নের উত্তর জ্ঞানবুদ্ধির অগম্য। রামকৃষ্ণের সমকক্ষ জনই এর উত্তর দিতে পারেন।

রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'সাধনার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছনোর পরও কোনো কোনো মানুষ লোকহিতার্থে এ সংসারে ফিরে আসেন। যেমন নারদ শুকদেবাদি'। এ কথা ভুললে চলবে না।

স্পষ্টত দেখতে পাচ্ছি, এ-কথাটি স্বামী বিবেকানন্দের মনে গভীর দাগ কেটে গিয়েছিল। লোকহিতার্থে তিনি যে বিরাট শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন নির্মাণ করে যান, এরকম সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান প্রভু তথাগতের পর এযাবৎ কেউ নির্মাণ করেন নি।

* *

এইবারে শেষ প্রশ্ন দিয়ে প্রথম প্রশ্নে ফিরে যাই।

পরমহংসদেব গীতার তিন মার্গের সমন্বয় করেছিলেন। প্রকৃত হিন্দু সেই চেষ্টাই করবে। কিন্তু তিনি যে ধুতিখানাকে লুঙ্গীর মত পরে আল্লা-আল্লাও করেছিলেন এবং আপন ঘরে টাঙানো খ্রীষ্টের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতেন সে কথাও তো জানি। এসবের প্রতি তাঁর অনুরাগ এল কোথা থেকে? বিশেষতঃ যখন একাধিকবার বলা হয়েছে, অ-হিন্দু মার্গে চলবার সময় পরমহংসদেব কায়মনোবাক্যে সে-ই মার্গকেই বিশ্বাস করতেন।

অনেকের বিশ্বাস চতুর্বেদে বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাস অর্থাৎ পলিথেইজমের বর্ণনা আছে। কিন্তু ম্যাক্সম্যুলার দেখিয়েছেন ঋগ্বেদের ঋষি যখন ইন্দ্রস্তুতি করেন তখন তিনি বলেন,—'হে ইন্দ্র, তুমিই ইন্দ্র, তুমিই অগ্নি, তুমিই বরুণ, তুমিই

প্রজাপতি, তুমিই সব।'

আবার যখন বরুণমন্ত্র শুনি, তখন সেটিতেও তাই,—'হে বরুণ, তুমিই বরুণ, তুমিই ইন্দ্র, তুমিই অগ্নি, তুমিই প্রজাপতি, তুমিই সব।' অর্থাৎ ঋষি যখন যে দেবতাকে স্মরণ করেছেন তখন তিনিই তাঁর কাছে পরমেশ্বররূপে দেখা দিয়েছেন। এ সাধনা বহু-ঈশ্বরবাদের নয়। এর সন্ধান অন্য দেশে পাওয়া যায় না বলে ম্যাক্সমুলার এর নূতন নাম করেছিলেন, 'হেনোথেয়িজ্‌ম'।

পরমহংসদেব বেদোক্ত এই পন্থাই বরণ করেছিলেন অর্থাৎ সনাতন আর্যধর্মের প্রাচীনতম শ্রুতিসম্মত পন্থা বরণ করেছিলেন। তিনি যখন বেদান্তবাদী তখন বেদান্তই সব কিছু, আবার যখন আল্লা আল্লা করছেন তখন আল্লাই পরমাল্লা।

এই করেই তিনি সর্বধর্মের রসাস্বাদন করে সর্বধর্ম সমন্বয় করতে পেরেছিলেন।

কোনো বিশেষ শাস্ত্রকে সর্বশেষ, অভ্রান্ত, স্বয়ংসম্পূর্ণ শাস্ত্র বলে স্বীকার করে তিনি অন্য সব কিছুর অবহেলা করেন নি।

অনেকের বিশ্বাস, হিন্দু আপন ধর্ম নিয়েই সন্তুষ্ট, অন্য ধর্মের সন্ধান সে করে না।

বহু শতাব্দীর বিজয়-অভিযান ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে এ যুগের হিন্দু সম্বন্ধে এ কথা হয়ত খাটে। তাই পরমহংসদেব আপন জীবন দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, সনাতন আর্যধর্ম এ পন্থা কখনো গ্রাহ্য করে নি।

সত্য সর্বত্র বিরাজমান, ঋগ্বেদের এই বাণী, শ্রীরামকৃষ্ণে তারই প্রতিধ্বনি। সর্বত্র এর অনুসন্ধানে সচেতন থাকলে বাঙালী পরমহংসদেবের অনুকরণ অনুসরণ করে ধন্য হবে। বাকিটুকু দয়াময়ের হাতে।

পুষ্পধনু

রস কি?

অর্থাৎ যখন কোনো উত্তম ছবি দেখি, কিম্বা সরেস সঙ্গীত শুনি, অথবা ভালো কবিতা পড়ি, কিম্বা নটরাজের মূর্তি দেখি, তখন যে রসানুভূতি হয় সে রস কি, এবং সৃষ্ট হয় কি প্রকারে?

এ রসের কাছাকাছি একাধিক রস আছে। গোয়েন্দা কাহিনী পড়ে, ধাঁধার উত্তর বের করে, মনোরম সূর্যোদয় দেখে, প্রিয়াকে আলিঙ্গন করে যে সব রসের সৃষ্টি হয় তার সঙ্গে যে পূর্বোল্লিখিত রসের কোনোই মিল নেই সে কথা জোর করে বলা চলে না। এমন কি,—শোনা কথা—বার্ট্রাণ্ড রাসল্‌ নাকি বলেছেন,

গণিতের কঠিন সমস্যা সমাধান করে তিনি যে আনন্দ অনুভব করেন সেটি নাকি হুবহু কলারসের মতই। কিন্তু এ-সব রসে এবং অন্যান্য রসে পার্থক্য কিসে আলোচনায় এবেলা মেতে উঠলে ওপারে পৌঁছতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। আমার জ্ঞানও অতিশয় সীমাবদ্ধ, প্রকাশশক্তি ততোধিক সীমাবদ্ধ। (তাহলে অবশ্যই প্রশ্ন উঠবে, আমি আদৌ লিখতে যাচ্ছি কেন? উত্তরে সবিনয় নিবেদন, বহুদিন সাহিত্য রচনা করার ফলে আমার একটি নিজস্ব পাঠকগোষ্ঠী জমায়েৎ হয়েছেন; এঁদের কেউই পণ্ডিত নন—আমিও নই—অথচ মাঝে-মধ্যে এঁরা কঠিন বস্তুও সহজে বুঝে নিতে চান এবং সে কর্ম আমার মত বে-পেশাদারী—নন-প্রফেশনালই—করতে পারে ভালো। রচনার গোড়াতেই এতখানি ব্যক্তিগত সাফাই হয়তো ঠিক মানানসই হল না, তবু পণ্ডিতজন পাছে আমার উপর অহমিকা দোষ আরোপণ করেন তাই সভয়ে এ ক'টি কথা কইতে হল)।

রস কি, সে আলোচনা অল্প লোকেই করে থাকেন। আলঙ্কারিকের অভাব প্রায় সর্বত্রই। কারণ রসের প্রধান কার্যকরণ আলোচনা করতে হলে অন্তত দুটি জিনিসের প্রয়োজন। একদিক দিয়ে রসবোধ, অন্যদিক দিয়ে বসকসহীন বিচার বিবেচনা যুক্তিতর্ক করার ক্ষমতা। তাই এর ভিতর একটি দ্বন্দ্ব লুকনো রয়েছে। যারা রসগ্রহণে তৎপর তারা তর্কের কিচিরমিচির পছন্দ করে না, আর যারা সর্বক্ষণ তর্ক করতে ভালোবাসে তারা যে 'শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠতি অগ্রে' হয়ে রসিকজনের ভীতির সঞ্চার করে সে তো জানা কথা।

সৌভাগ্যক্রমে এদেশে কিন্তু কখনো আলঙ্কারিকের অনটন হয় নি। ভরত থেকে আরম্ভ করে, দণ্ডিন মম্মট ভামহ হেমচন্দ্র অভিনব গুপ্ত ইত্যাদি ইত্যাদি অন্তহীন নির্ঘণ্ট বিশ্বজনের প্রচুর ঈর্ষার সৃষ্টি করেছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মুখে শুনেছি, তাঁকে যখন রাসল্ প্রশ্ন শোধান, রস কি, হোয়াট ইজ আর্ট, তখন তিনি এঁদের স্মরণে রাসল্‌কে প্রচুর নূতন তত্ত্ব শোনান। অন্য লোকের মুখে শুনেছি, রাসল্ রীতিমত হকচকিয়ে যান।

বিদেশী আলঙ্কারিকদের ভিতর জর্মন কবি হাইনরিষ হাইনের নাম কেউ বড় একটা করে না। কারণ তিনি অমিশ্র অলঙ্কার নিয়ে আলোচনা করেন নি। জর্মন কবিদের নিয়ে আলোচনা করার সময় মাঝে মাঝে রস কি তাই নিয়ে তিনি চিন্তা করেছেন, এবং রস কি তার সংজ্ঞা না দিয়ে তুলনার মারফৎ, গল্পচ্ছলে সব কিছু অতি মনোরম ভাষায় প্রকাশ করেছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ যে রকম কোনো কিছু বলতে গেলে সংজ্ঞা নিয়ে মাথা ফাটাফাটি না করে গল্প বলে জিনিসটা সরল করে দিতেন অনেকটা সেইরকম!

বাগদাদের শাহ্ইন্-শাহ্, দীনদুনিয়ার মালিক খলীফা হারুন-অর্-রশীদের হারেমের সর্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী, খলীফার জিগরের টুকরো, চোখের রোশনী রাজকুমারীটি ছিলেন 'স্বপনচারিনী', অর্থাৎ ঘুমের ঘোরে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতেন।

গভীর নিশীথে একদা তিনি নিদ্রার আবেশে মৃদু পদসঞ্চারণে চলে গিয়েছেন প্রাসাদ-উদ্যানে। সখীরা গেছেন পিছনে পিছনে। রাজকুমারী নিদ্রার ঘোরে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে সম্পূর্ণ মোহাবস্থায় ফুল আর লতাপাতা কুড়োতে আরম্ভ করলেন আর মোহাবস্থায়ই সেগুলো অপূর্ব সমাবেশে সাজিয়ে বানালেন একটি তোড়া। আর সে সামঞ্জস্যে প্রকাশিত হয়ে গেল একটি নবীন বাণী, নূতন ভাষা। মোহাবস্থায়ই রাজকুমারী তোড়াটি পালঙ্কের সিথানে রেখে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লেন।

ঘুম ভাঙতে রাজকুমারী দেখেন একটি তোড়া যেন তাঁর দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। সখীরা বললেন, ইটি তাঁরই হাতে তৈরী। কিছুতেই তাঁর বিশ্বাস হয় না। এমন কি ফুলপাতার সামঞ্জস্যে যে ভাষা যে বাণী প্রকাশ পেয়েছে সেটিও তিনি সম্পূর্ণ বুঝতে পারছেন না—আবছা আবছা ঠেকছে।

কিন্তু অপূব সেই পুষ্পস্তবক। এটি তাহলে কাকে দেওয়া যায়? যাঁকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন। খলীফা হারুন্-অর্-রশীদ। খোজাকে ডেকে বললেন, 'বৎস, এটি তুমি আর্যপুত্রকে (খলীফাকে) দিয়ে এসো।'

খোজা তোড়াটি হাতে নিয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললে, 'ও হো হো, কী অপূর্ব কুসুমগুচ্ছ! কী সুন্দর গন্ধ, কী সুন্দর রঙ! হয় না, হয় না, এ রকম সঞ্চয়ন সমাবেশ আর কোনো হাতে হতে পারে না।'

কিন্তু সে সামঞ্জস্যে যে বাণী প্রকাশিত হয়েছিল সে সেটি বুঝতে পারলো না। সখীরাও বুঝতে পারেন নি।

খলীফা কিন্তু দেখা মাত্রই বাণীটি বুঝে গেলেন। তাঁর চোখ বন্ধ হয়ে গেল। দেহ শিহরিত হল। সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হল। অভূতপূর্ব পুলকে দীর্ঘ দাড়ি বয়ে দরদর ধারে আনন্দাশ্রু বইতে লাগলো।

এতখানি গল্প বলার পর কবি হাইনরিষ হাইনে বলছেন, 'হায় আমি বাগদাদের খলীফা নই, আমি মহাপুরুষ মুহম্মদের বংশধর নই, আমার হাতে রাজা সলমনের আঙটি নেই, যেটি আঙুলে থাকলে সর্বভাষা, এমন কি পশুপক্ষীর কথাও বোঝা যায়, আমার লম্বা দাড়িও নেই, কিন্তু পেরেছি, পেরেছি, আমিও সে ভাষা সে বাণী বুঝতে পেরেছি।'

এস্থলে গল্পটির দীর্ঘ টীকার প্রয়োজন। কিন্তু পূর্বেই নিবেদন করেছি সে শক্তি আমার নেই। তাই টাপেটোপে ঠারেঠোরে কই।

রাজকুমারী=কবি ; ফুলের তোড়া=কবিতা ; ফুলের রঙ পাতার বাহার=তুলনা অনুপ্রাস ; খোজা=প্রকাশক-সম্পাদক-ফিলিম-ডিস্ট্রিব্যুটর (তাঁরা সুগন্ধ সুবর্ণের রসাস্বাদ করতে পারেন, কিন্তু 'বাণীটি' বোঝেন না) ; এবং খলীফা=সহৃদয় পাঠক !

মরহুম মৌলানা

মরহুম (স্বর্গত) মৌলানা আবুল-কালাম মহী-উদ্দীন আহমদ অল্ আজাদ্ সম্ভ্রান্ত বংশের যোগ্য সন্তান। এ বংশের পরিচয় এবং বিবরণ বাদশা আকবরের আমল থেকে পাওয়া যায়।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে এঁর পিতা জড়িয়ে পড়েন। দিল্লীর উপর ইংরাজের বর্বর অত্যাচার আরম্ভ হলে পর তিনি তাঁর অন্যতম ভক্ত রামপুরের নবাবের সাহায্যে মক্কাশরীফে গিয়ে আশ্রয় নেন। সেখানে তিনি এক আরব কুমারীকে বিবাহ করেন। আবুল কালাম এই বিবাহের সার্থক সন্তান।

তাঁর মাতৃভাষা আরবী, পিতৃভাষা উর্দু। পরবর্তী যুগে তিনি ফার্সী এবং তুর্কীতেও অসাধারণ পাণ্ডিত্য সঞ্চয় করেন। ইংরিজি থেকেও তিনি সে সঞ্চয়ে সাহায্য গ্রহণ করেছেন। তবে এদেশে ফেরার পর তিনি উর্দু সাহিত্যের এমনি একনিষ্ঠ সাধক ও প্রেমিক হয়ে যান যে শেষের দিকে আরবী বা ফার্সীতে নিতান্ত বাধ্য না হলে কথাবার্তা বলতেন না।

তাঁর বয়স যখন দশ তখন তাঁর পিতা ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। সমগ্র ভারতবর্ষেই তাঁর বহু শিষ্য ও ভক্ত ছিলেন। এই কলকাতা শহরেই তাঁর প্রচুর অনুরাগী শিষ্য ছিলেন এবং তাঁদেরই অনুরোধে তিনি এখানে স্থায়ী বাসভবন নির্মাণ করেন। পুত্র আবুল কালাম এখানেই তাঁর শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তাঁর পরলোকগমনের পর বেতারে যে একাধিকবার বলা হয়, তিনি মিশরের অল আজহর বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন সে সংবাদ ভুল। উপরন্তু মৌলানা সাহেব নিজেকে সব সময়ই কলকাতার অধিবাসী ও বাঙালী বলেই পরিচয় দিয়েছেন। বাঙলা তিনি বলতেন না, কিন্তু বাঙলা কথোপকথনের মাঝখানে তিনি উর্দুতে প্রশ্নোত্তর করতেন এবং কিছুক্ষণ পর কারোরই খেয়াল থাকতো না যে তিনি অন্য ভাষায় কথা বলছেন।

চৌদ্দ বছর বয়সেই তিনি লিসান উল্-সিদ্‌ক্ (সত্য-বচন) নামক কাগজের সঙ্গে সংযুক্ত হন এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর খ্যাতি ভারতবর্ষের সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ে। চব্বিশ বৎসর বয়সে তাঁর 'অল্ হিলাল' (অর্ধচন্দ্র) পত্রিকা ইংরেজের মনে ভীতির সঞ্চার করতে আরম্ভ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর তাঁর কাগজ ইংরেজের শত্রু তুর্কী এবং মুসলিম বিশ্ব-আন্দোলনের অকুণ্ঠ প্রশংসা করার ফলে তাঁকে অন্তরীণ হতে হয়। মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মহাত্মা গান্ধী ও অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত হন এবং সে আন্দোলনের সঙ্গে সাদ্ জগলুল্ পাশার মিনারের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং গাজী মুস্তাফা কামাল পাশার তুর্কীর নবজাগরণের সঙ্গে সেতু নির্মাণ করেন।

এর পরের ইতিহাস ভারতীয় মাত্রই জানেন।

শ্বেত সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ এবং বিশ্ব-মুসলিম প্রেম মৌলানা আজাদের পরিবারে অবিচ্ছিন্ন অংশরূপে গণ্য করা হত। তিনি জন্মগ্রহণ করেন মক্কায়— যেখানে হজ্ উপলক্ষে বিশ্বের তাবৎ মুসলিম প্রতি বৎসর সম্মিলিত হয়ে প্রাচ্য ভূমি থেকে কি করে শ্বেতাঙ্গ ও শ্বেত-স্বৈরাচার দূরীভূত করা যায় তার পরিকল্পনা করতো এবং ভারত, মালয়, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশকে আপন আপন কর্তব্য ও জিম্মাদারী ভাগ করে দেওয়া হত। এ-পরিকল্পনা কোনো বিশেষ দেশে সীমাবদ্ধ ছিল না বলে একে ন্যাশনালিজম না বলে প্যান্-ইস্‌লামিজম্ (বিশ্ব-মুসলিম-সংহতি) নামে পূর্ব-পশ্চিম সর্বত্রই সুপরিচিত ছিল। দশ বৎসর বয়স পর্যন্ত মৌলানা এ-মন্ত্রই অহরহ শুনেছিলেন।

কলকাতা আসার সঙ্গে সঙ্গেই মৌলানার পরিবর্তন আরম্ভ হয়। এ-কথা সত্য যে বিশ্ব-মুসলিমের প্রতি তাঁর দরদ কখনো শুকিয়ে যায় নি, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাঁর জীবনের সব চেয়ে বড় উৎসাহ ও উদ্দীপনার উৎস হয়ে উঠল স্বদেশ-প্রেম। উর্দু ভারতবর্ষের ভাষা। তাঁর মাতৃভাষা আরবীকে তাঁর জীবনাদর্শ এবং রাজনৈতিক সাধনার মাধ্যমরূপে গ্রহণ না করে তিনি সর্বান্তঃকরণে বরণ করে নিলেন উর্দুকে। এ বড় সহজ কুরবাণী বা আত্মবিসর্জন নয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগেই শুধু নয়, আজও দেখতে পাই বহু লোক স্বার্থলাভের জন্য স্বদেশী ভাষা বর্জন করে বিদেশী ভাষার সাধনা করেন এবং আমাদের মত বাঙালী তাঁদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে না বলে আমাদের প্রতি রুষ্ট হন।

এবং সব চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি, এই উর্দু গ্রহণের জন্য জীবনসায়াহ্নে মৌলানাকে আবার অকরুণ কটুবাক্য শুনতে হলো সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক মণ্ডলীর কাছ থেকে। হিন্দী ভাষা কেন রাতারাতি ভারতবর্ষের তাবৎ ভাষার কণ্ঠরুদ্ধ

করে 'জাতীয় ভাষা' রূপে জগদ্দল প্রতিমার মত ভারতের মন্দিরে মন্দিরে পূজা পাচ্ছেন না, অপেক্ষাকৃত অনুন্নত শিশু ভাষাগুলোকে কেন কচি কচি পাঁঠার মত তাঁর সামনে বলি দেওয়া হচ্ছে না, তার কারণ অনুসন্ধান করে তাঁরা আপন 'বুদ্ধি'তে আবিষ্কার করলেন 'হিন্দী-বিদ্বেষী' 'হিন্দীভাষাকা কট্টর দুশ্‌মন্' মৌলানা আজাদকে। যেহেতু মৌলানা উর্দুভাষী তাই তিনি শিক্ষামন্ত্রীরূপে হিন্দীর প্রচার এবং প্রসার কামনা করেন না'—এই হল তখন তাঁদের 'যুক্তি'। হিন্দী যে দুর্বল, কমজোর ভাষা সে-কথা স্মরণ করবার অস্বস্তিকর প্রয়োজন কেউ বোধ করলেন না। পণ্ডিত নেহরুও যে উর্দুভাষী এ-কথা বলতে তাঁরা সাহস পেলেন না—এ-কথা বললে উভয়ের হৃদ্যতা বেড়ে যাবে যে!

মাত্র একবার মৌলানা লোকসভায় তাঁর বক্তব্য সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন। এবং যাঁরা সেদিন এই সভায় ছিলেন তাঁরা সবাই দেখেছিলেন মৌলানার আবেগময়ী আন্তরিক বক্তৃতার ফলে প্রতিপক্ষ কি রকম লজ্জায় অধোবদন হয়েছিলেন—শত্রু-মিত্র কারো দিকেই মুখ তুলে তাকাবার সাহস পর্যন্ত সেদিন তাঁদের আর হয় নি।

জগলুল্ পাশা, কামাল আতাতুর্কের সঙ্গে মৌলানার পত্র বিনিময় সব সময়ই ছিল, কিন্তু মৌলানা ক্রমে ক্রমে তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলেন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে। সে ইতিহাস লেখবার শক্তি আমার নেই; আমি শুধু এ-স্থলে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, মক্কা শরীফের প্যান-ইসলামী বালক যৌবনে পরিপূর্ণ জাতীয়তাবাদী হয়ে গেল। মৌলানার যে সব বিপক্ষ দল একদা মুসলিম জাহানের স্বপ্ন দেখতেন তাঁরা পর্যন্ত আজ কঠিন অভিজ্ঞতার স্বাদ পেয়ে বুঝতে পেরেছেন, সে স্বপ্ন গেছে—এখন তাঁরা পুরো পাকিস্তানী হয়ে গিয়ে জাতীয়তাবাদের আদর্শই বরণ করেছেন। দুঃখ এই, তাঁরা এ আদর্শটি কয়েক বৎসর আগে বরণ করে নিলেই তাঁদের মঙ্গল, আমাদের মঙ্গল, সকলেরই মঙ্গল হত।

এস্থলে কিন্তু আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করা উচিত।

স্বরাজলাভের পর মৌলানা তাঁর জাতীয়তাবাদ বিশ্ব-মানবের কল্যাণে নিয়োগ করেছিলেন। দেশ পর্যটন মৌলানা অত্যন্ত অপছন্দ করতেন, কিন্তু বিশ্বজনের সঙ্গে সক্রিয় যোগস্থাপনার জন্য তিনি কয়েক বৎসর পূর্বে পাকিস্তান ইরান হয়ে ইয়োরোপে যান—পূর্বে বহুবার বহু দেশে নিমন্ত্রিত হয়েও যান নি। এবং সব চেয়ে বড় কথা, জাতিসম্মেলন (ইউ. এন. ও.) এবং তার ভিন্ন ভিন্ন শাখার যে সব প্রতিনিধি ভারতে এসেছেন তাঁরা তাঁদের সর্বোত্তম সখারূপে চিনতে

শিখলেন মৌলানা আজাদকে। তাঁরা আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, যে-মৌলানা ইংরেজের বিরুদ্ধে তিক্ততম লড়াই করেছেন আজীবন, তাঁর ভিতর সে তিক্ততা আর নেই। ইংরেজ হোক, মার্কিন হোক আর রুশই হোক, যে জন বিশ্বকল্যাণের জন্য সম্মুখীন হয়, তার বহু দোষ থাকলেও সে আজাদের বন্ধুজন। এবং আরো আশ্চর্য ! ইংরেজ দেখে, মৌলানা ইংরেজী না বলেও ইংরেজের মিত্র, রাশা দেখে, তার ভাষা না জেনেও অন্যের তুলনায় মৌলানা রাশাকে চেনেন অনেক বেশী। তিনি তাদের সঙ্গে কথা বলতেন উর্দুতে, কিন্তু সে উর্দু তো উর্দু নয়, সে উর্দু বিশ্বপ্রেমের সর্বজনীন ভাষা, কিম্বা বলবো, বিশ্বপ্রেমের ভাষা উর্দুর মাধ্যমে স্বপ্রকাশ হল। একদা তিনি আরবী বর্জন করে উর্দু গ্রহণ করেছিলেন ; তখন তিনি উর্দু বর্জন করে অন্য এক ভাষা গ্রহণ করেছেন, যার নামকরণ এখনো হয় নি, কারণ সে ভাষাতে কথা বলতে আমরা এখনো শিখি নি।

অথচ তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁরই নির্দেশ অনুযায়ী চলতো তিনখানি ত্রৈমাসিক। প্রথমখানি আরবীতে—আরবভূমির সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক যোগ-সূত্র স্থাপনা ও প্রাচীন যোগ দৃঢ়তর করার জন্য ; দ্বিতীয়খানা ফার্সীতে—ইরান ও আফগানিস্থানের জন্যে ; তৃতীয়খানা ইংরিজিতে—বৌদ্ধজগতের সঙ্গে যোগস্থাপনা করার জন্য (বৌদ্ধভূমি এক ভাষায় আশ্রিত নয় বলে তিনি মাধ্যমরূপে ইংরিজি গ্রহণ করেছিলেন)। এই তিনটি পত্রিকাই ইণ্ডিয়ান্ কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশন্স দিল্লী থেকে প্রকাশিত হয় এবং মৌলানা ছিলেন তার প্রধান। শুধু প্রধান বললেই যথেষ্ট বলা হয় না—কোন্ দেশে ক'খানি পত্রিকা যাবে সেটুকু পর্যন্ত তাঁর নির্দেশানুযায়ী হত। আজ ভাবি, এ-সব কটি পত্রিকার নীতি-নির্দেশ, মানরক্ষা, তাদের সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারে এমন সর্বগুণ মেশানো আরেক পণ্ডিত পাওয়া যাবে কোথায় ? ভারতবর্ষের ভিতরে, বাইরে ?

বস্তুত আসলে এ-লোকটি হৃদয় এবং মস্তিষ্কের অন্তস্তলে ছিলেন পণ্ডিত। স্বাধীন মক্কা ত্যাগ করে পরাধীন ভারতে না এলে তিনি যে রাজনীতির চতুঃ-সীমানায় যেতেন না, সে কথা আমি স্থিরনিশ্চয় জানি। স্বাধীনতা লাভের পরও তিনি জ্ঞানমার্গেই ফিরে যেতেন কিন্তু দেশে তখন (এবং এখনো) উপযুক্ত লোকের অভাব। মৌলানা কখনো কর্তব্য অবহেলা করতে চাইতেন না। এমন কি যখন তাঁর বিরুদ্ধ পক্ষ মুখর হয়ে উঠতেন, এবং আমরা ভাবতুম তিনি পদত্যাগ করলেই পারেন, তখনো তিনি কর্তব্যবোধের দায়েই আপন কাজ করে যেতেন—লোক-নিন্দার তোয়াক্কা-পরোয়া না করে। পূর্বেই বলেছি, মাত্র একবার তিনি হিন্দী-ওলাদের কর্কশ-কণ্ঠে ব্যথিত হয়ে, আপন কাহিনী নিবেদন করেছিলেন। এ

অবসরে আরেকটি ঘটনা মনে পড়লো। সেটা কিন্তু কিঞ্চিৎ হাস্যরসে মেশানো।

বিরুদ্ধ দল শিক্ষা-দফতরের বিরুদ্ধে দুনিয়ার তাবৎ অভিযোগ-ফরিয়াদ জটলা করে শেষটায় বললে, 'শিক্ষা-দফতরের দ্বারা কিছুই হবে না—তাদের মগজের বাক্সটি (ব্রেন-বক্স্‌টি) একদম ফাঁপা।'

মৌলানা স্পর্শকাতর লোক—পণ্ডিতগণ সচরাচর তা হন। উষ্মা প্রকাশ করে তিনি কিন্তু দাঁড়ালেন হাস্যমুখে। বার কয়েক ডান হাত দিয়ে মাথার ডান দিক চাপড়ে বললেন, 'না জী, এখানে তো আছে', তারপর হাত নামিয়ে নিয়ে দীর্ঘ আগুল্‌ফলম্বিত আচকানের ডান পকেটে থাবড়া মারতে মারতে বললেন, 'এখানে নেই, এখানে কিছুই নেই।' অর্থাৎ মগজে মাল যথেষ্ট আছে, কিন্তু পকেটে কিছুই নেই। তার আরো সরল অর্থ, কেবিনেট শিক্ষাবিভাগকে যথেষ্ট পয়সা দেয় না।

পূর্বেই বলেছি, মৌলানা আসলে পণ্ডিত। কর্তব্যের তাড়নায় তিনি প্রবেশ করেছিলেন রাজনৈতিক মল্লভূমিতে অতি অনিচ্ছায়। তাঁর সে পাণ্ডিত্যের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিতে আমার কুণ্ঠা বোধ হচ্ছে, কারণ তাঁর সে পাণ্ডিত্য-সায়রে সন্তরণ করার মত শক্তি আমার নেই।

আরবী এবং সংস্কৃত জ্ঞানচর্চায় বহু সাদৃশ্য রয়েছে। তার প্রধান মিল, উভয় সাহিত্যের পণ্ডিতগণই অত্যন্ত বিনয়ী। কারো কোনো নূতন কিছু বলার হলে কোনো প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের সাহায্যে তাঁরা সেটি প্রকাশ করেন। লোকমান্য টিলক গীতার ভাষ্য লিখে সপ্রমাণ করলেন, কর্মযোগই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগ এবং এদেশ থেকে ইংরেজকে বিতাড়নই সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম ; মহাত্মা গান্ধী তাঁর গীতাভাষ্য দিয়েই প্রমাণ করতে চাইলেন যে অহিংসাই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম, এবং শ্রীঅরবিন্দ গীতাপাঠ লিখে প্রমাণ করতে চাইলেন যে জ্ঞানযোগের দ্বারা চিত্তসংযম আত্মজয় করতে পারলেই স্বাধীনতা লাভ অনিবার্য। মৌলানা আজাদ তাঁর কুরান ভাষ্য দিয়ে বিশ্ব-মুসলিমকে মুক্ত করতে চাইলেন তার যুগ-যুগ সঞ্চিত অন্ধসংস্কার এবং ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী থেকে। এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে অতি কৌশলে তিনি তাকে তার কর্তব্য কোন্ দিকে সেইটে সহজ সরল ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন।

এ ভাষ্য তিনি অনায়াসেই আরবীতে লিখতে পারতেন, এবং আরবী ভাষার মাধ্যমে তিনি পাঠকসংখ্যা পেতেন উর্দুর তুলনায় অনেক, অনেক বেশী। দ্বিতীয়ত, কুরান আরবী ভাষায় লেখা, এবং তাবৎ বিশ্ব-মুসলিম আরবীতেই তার ভাষ্য লিখে আসছে (গীতার ভাষ্য যে রকম এক শতাব্দী পূর্বেও সংস্কৃতেই রচিত হয়েছে)। তৃতীয়ত, মুসলিম-জাহানের কেন্দ্রভূমি মক্কার ভাষা আরবী, চতুর্থত, সে ভূমি

আজাদের জন্মস্থল—আপন জন্মস্থলে যশ প্রতিষ্ঠা করতে চায় না কোন্ পণ্ডিত ?

এ সমস্ত প্রলোভন উপেক্ষা করে মৌলানা তাঁর তফ্‌সীর ভাষ্য লিখলেন উর্দুতে। মক্কাতে জন্ম নিয়েছিল তাঁর দেহ, কিন্তু তাঁর চৈতন্য এবং হৃদয় গ্রহণ করেছিল তাঁর পিতৃ-পিতামহের ভূমি ভারতকে স্বদেশরূপে। তাই তিনি স্বদেশবাসীর জন্য তাঁর ভাষ্য লিখলেন উর্দুতে (টিলকও ইচ্ছা করলে তাঁর ভাষ্য সংস্কৃতে লিখতে পারতেন, কিন্তু লিখেছিলেন মারাঠীতে)। পরবর্তী যুগে আজাদ-ভাষ্য আরবীতে অনূদিত হয়, এবং তখন আরবভূমিতে সে ভাষ্যের যে জয়ধ্বনি উঠেছিল তা শুনে ভারতীয় মাত্রই না কী গর্ব, কী শ্লাঘা অনুভব করেছিল। পাকিস্তানীরাও এই পুস্তক নিয়ে গর্ব অনুভব করেন। তাঁরা পাকিস্তান যাবার সময় তাজমহল ফেলে যাওয়ার মত কিন্তু এ ভাষ্য ভারতে ফেলে যান নি। ১৯৪৭-এর পরও আজাদ-ভাষ্য লাহোর শহরে লক্ষাধিক সংখ্যক ছাপা এবং বিক্রি হয়েছে।

পাণ্ডিত্য ও সাহিত্য সচরাচর একসঙ্গে যায় না। কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে মুগ্ধ হয়েছি মৌলানার সাহিত্য-রসবোধে, সাহিত্যসৃষ্টি দেখে। মৌলানার সঙ্গে লোকমান্য টিলকের বহু সাদৃশ্য বর্তমান, কিন্তু টিলকের চরিত্রে ছিল দার্ঢ্য, মৌলানার চরিত্রে ছিল মাধুর্য। টিলককে যদি বলা হয় কট্টর কঠিন শৈব, তবে মৌলানাকে বলতে হয় মরমিয়া মধুর বৈষ্ণব। কারণ মৌলানা ছিলেন সুফী অর্থাৎ ভক্ত, রহস্যবাদী (মিস্‌টিক্)। তাঁর সাহিত্যের উৎস ছিল মাধুর্যে, এবং কে না জানে মধুর রসই সর্বশ্রেষ্ঠ রস।

তাই তাঁর চেহারায় ছিল লাবণ্য, কুরান-ভাষ্যের মত পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তকে মাধুর্য, এবং তাঁর বক্তৃতায় অদ্ভুত অবর্ণনীয় সরলতার সৌন্দর্য।

কিন্তু তাঁর সে সরল সৌন্দর্যবোধ তার পরম প্রকাশ পেয়েছে তাঁর রম্য রচনাতে। উর্দুতে এরকম রচনা তো নেইই, বিশ্বসাহিত্যে এরকম সহৃদয় রসে ভরপুর লেখা খুঁজে পাই নে। তার সঙ্গে বাঙালী পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেওয়া বক্ষ্যমাণ অক্ষম লেখকের সাধ্যাতীত।

তবে এই শোকের দিনে একটি সান্ত্বনার বাণী জানাই। সাহিত্য আকাদেমি এ পুস্তকের বাঙলা অনুবাদকর্মে লিপ্ত হয়েছেন। কিন্তু এর সঙ্গে একটি সাবধান-বাণীও শুনিয়ে রাখি। সে অনুবাদে বাঙালী পাবে কাশ্মীরী শালের উল্টো দিকটা। পাবে মূলের অসম্পূর্ণ পরিচয়, এবং হয়তো পাবে, অসম্পূর্ণের সম্পূর্ণ পরিচয় পাবার আকাঙ্ক্ষা। তাই যদি হয়, তবে হয়তো কোনো কোনো বাঙালীর অনাদৃত উর্দু ভাষা শেখার ইচ্ছাও হতে পারে। আমাদের সে প্রচেষ্টা

হয়তো শোকদুঃখের অতীত অমর্ত্যলোকে মৌলানা আবুল কালাম মহীউদ্দীন আহ্‌মদ অল্‌-আজাদকে আনন্দ দান করবে।

নসরুদ্দীন্ খোজা (হোকা)

ইস্তাম্বুল থেকে রয়টারের খবরে প্রকাশ, রসিক এবং মূর্খচূড়ামণি নসরুদ্দিন্ খোজার সপ্তশত জন্মদিবস মহা-আড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়েছে।

ইংরিজি বর্ণমালার কল্যাণে 'খোজা' কিন্তু বাঙলায় 'হোকা' রূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। অধুনা তুর্কী ভাষা ইংরিজি (লাতিন) হরফে লেখা হয় বলে তার রূপ hoca ; কিন্তু তুর্করা 'এচ' অক্ষরের নিচে একটি অর্ধচন্দ্র বা উল্টো প্রথম বন্ধনী দেয় এবং তার উচ্চারণ অনেকটা স্কচ 'লখ্', জর্মন 'বাখ্' বা ফার্সী 'খবরে'র মত, —কিন্তু 'হ' ভাগটা বেশী এবং 'সি' অক্ষরের উপরে একটি হুক্ দেয়—এবং তার উচ্চারণ হয় পরিষ্কার 'জ'। ঠিক সেই রকম বাঙলা শব্দ (আসলে আরবী) 'খারিজ' তুর্কী ভাষায় haric লেখা হয়,—অবশ্য 'হ'-এর নিচে পূর্বোল্লিখিত অর্ধ-চন্দ্র এবং 'সি'-র উপরে হুক্ দেয়। 'পররাষ্ট্রনীতি' তাই তুর্কীতে 'সিয়াসত খা রি জ।'

রয়টারের টেলিগ্রামে এই অর্ধচন্দ্র ও হুক্ বাদ পড়াতে 'খোজা' 'হোকা' হয়ে গিয়েছেন। খাজা নাজিমুদ্দীনের 'খাজা' ও আগা খানের 'খোজা' (সম্মানিত) সম্প্রদায়ের নামেও একই শব্দ—এটি আমাদের সম্পূর্ণ অজানা নয়।

এই ধ্বনি পরিবর্তনে আমাদের রাগত হওয়ার কারণ নেই। ক্রিকেটার মাঁকড়ের নাম যখন আমরা হামেশাই 'মনকদ', 'মানকদ' অনেক কিছুই লিখে থাকি, এবং ফড়্‌কর্‌-কে 'ফাদকর', 'ফদকর' লিখি, এমন কি এই কলকাতা শহরেই গোখলে-কে 'গোখেল' লিখি এবং উচ্চারণ করি তখন রসিকবর খোজা যে হোকা হয়ে আমাদের ধোঁকা দেবেন তাতে আর আশ্চর্য কি ?

খোজার জন্মদিন যে-বাইশ তারিখে উদ্‌যাপিত হচ্ছিল সেইদিনই ইস্তাম্বুল থেকে রয়টার আরেকটি তার পাঠিয়েছেন ; তাতে খবর এসেছে যে ঐদিন পাঁচ শ' বছর পরে তুর্কীতে এক সুপ্ত অগ্নিগিরি জেগে উঠে হা-হা করে হেসে উঠেছে।[১]

১ VOLCANIC ERUPTION AFTER FIVE CENTURIES

Istambul, July 22—Mount Soutlubiyan, in the Kars Province of Turkey has burst into what is believed to be

তা হলে বোঝা গেল মা ধরণীর পাকা দু'শ বছর লেগেছে খোজার রসিকতার মর্ম গ্রহণ করতে; তাই বোধ হয় হাসতে হাসতে তাঁর নাড়িভুঁড়ি এখন ভূগর্ভ থেকে ছিঁড়ে বেরিয়েছে।

এদেশে আরবী এবং ফার্সীর চর্চা একদা প্রচুর হয়েছিল। আকবর বাদশাহের আমলে ইরানের এমনই দুরবস্থা যে সেখানকার পনেরো আনা কবি দিল্লী ধাওয়া করেছিলেন। আকবরের সভাকবি আব্দুর রহিম খানখানা নিজেই গণ্ডা গণ্ডা ইরানী কবি পুষেছিলেন, আর স্বয়ং আকবর যে কবি 'আমি' 'তুমি' মিল দিয়ে 'কবিতা' রচনা করতো তাকে পর্যন্ত নিরাশ করতে চাইতেন না।

ভারতবর্ষের ফার্সী নাম হিন্দ বা হিন্দুস্তান। 'হিন্দ' শব্দের অর্থ কালো। তাই এক কবি তাঁর দৈন্যের কালরাত্রি ইরানে ফেলে পূর্বাচল ভারতবর্ষ রওয়ানা হওয়ার সময় লিখলেন,

দুর্ভাবনার কালিমা ত্যজিয়া
চলিনু হিন্দুস্তান
কালোর দেশেতে কালো আমি কেন
করিতে যাইব দান ?

তাই এক ইয়োরোপীয় ঐতিহাসিক ইরানের ঐ যুগকে শব্দার্থে 'ইণ্ডিয়ান সামার' বলেছেন। কারণ এর পরই ইরানী সাহিত্যের পতন আরম্ভ হয়।

তুর্কী ভাষার কিছুটা চর্চাও এদেশে হয়েছিল, কারণ বাবুর, হুমায়ুন এঁদের সকলেরই মাতৃভাষা তুর্কী। শেষ মোগল বাদশা-সালামৎ বাহাদুর শাহের হারেমেও কথাবার্তা তুর্কী ভাষাতেই হত এবং তুর্কী সাহিত্যের সর্বোৎকৃষ্ট না হলেও অন্যতম অত্যুৎকৃষ্ট কেতাব বাবুর বাদশার আত্মজীবনী। কিন্তু এ-তুর্কী ভাষা মুস্তফা কামালের টার্কির ওসমানলী তুর্কী নয়, বাবুরের ভাষা চুগতাই (বা জগতাই) তুর্কী। কোরমা, দোলমা এবং লড়াই-হাতিয়ারের কিছু শব্দ চুগতাই তুর্কী থেকে বাঙলাতে এসেছে। ওদিকে মোগল দরবার ফার্সীকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন বলে

Turkey's first volcanic eruption since the 15th century. A spokesman at the office of the Governor of Kars said the eruption of rock and smoke had caused anxiety and excitement among people living nearby, but there had been no serious damage yet.

তাঁদের তুর্কী এদেশে প্রচার ও প্রসার লাভ করে নি। যদিও প্রাচীন বাঙলাতে 'তুর্ক' বলতে মুসলমান বোঝাতো এবং তামিল ভাষাতে মুসলমান বোঝাতে হলে এখনও 'তুরুষ্কম্' শব্দ ব্যবহার করা হয়। বাঙালী বেকার এখনো চাকরির সন্ধানে 'তুর্কী নাচন' নাচে।

আমরা ইংরিজী ফরাসী পড়ি, রাশান কথাসাহিত্যও আমাদের অজানা নয়, স্পেন পর্তুগাল দেনমার্কের লোক এদেশে এসেছিল এবং আরো অনেকেই,—কিন্তু আশ্চর্য ওসমানলি তুর্কী ভাষা এবং সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের কণামাত্র পরিচয় নেই। আমার জানামতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে পাবনা জেলার কবি ইসমাঈল হুসেন শিরাজী (নজরুল ইসলাম এঁর কাছে একাধিক বিষয়ে ঋণী বলে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন) তুর্কীকে সাহায্য করার জন্য একটি মেডিকেল মিশন নিয়ে সে-দেশে গিয়েছিলেন এবং তুর্কী রাজনীতি, সমাজ, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে বাঙলায় একাধিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তুর্কীর সভাকবি হামিদ পাশার সঙ্গে সে সময়ে তাঁর হৃদ্যতা হয়, কিন্তু তুর্কী সাহিত্যের সঙ্গে বাঙলার পরিচয় করিয়ে দেবার পূর্বেই ইংরেজের চাপে তাঁকে দেশে ফিরে আসতে হয়।[২]

তুর্কীর বাইরে ইরান, আফগানিস্থান, উজ্‌বেক, আজারবাইজান, তথা গ্রীস, বুলগারিয়া, রুমানিয়া ইত্যাদি দেশে নস্‌রুদ্দীন খোজা সুপরিচিত। ইরানের স্বর্ণযুগের একাধিক সুরসিক কবির উপর তাঁর প্রভাব সুস্পষ্ট। বল্কানের বাইরে ইয়োরোপে তিনি জর্মনিতে সব চেয়ে বেশী ভক্ত পাঠক পেয়েছেন। ইংরিজী এনসাইক্লোপীডিয়াতে তাঁর নাম নেই, জর্মন সাইক্লোপীডিয়া আকারে ইংরিজীর

২ 'সুপ্রভাত' পত্রিকার সম্পাদিকা শ্রীমতী কুমুদিনী মিত্রকে (ইনি 'সঞ্জীবনী' সম্পাদক শ্রীঅরবিন্দের মেসোমশাই কৃষ্ণকুমার মিত্রের বড় মেয়ে) শিরাজী একটি কবিতা ও ছবি পাঠালে পর তিনি (কুমুদিনী) লেখেন, "আপনার কবিতা ও ছবি পাইয়া আমি পরম পুলকিত হইয়াছি। আপনার কবিতাটি 'সুপ্রভাতে' প্রকাশিত হইবে। তুরস্কের নারীদিগের অতীত ও বর্তমান অবস্থা, স্বদেশের কার্যে ও উন্নতিতে তাহাদের সাহায্যদান, তাহাদের শিক্ষা ও স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি সম্বন্ধে লেখা শীঘ্রই অনুগ্রহ করিয়া পাঠাইবেন। ভারতবর্ষ হইতে যে সকল যুবক আহতদিগের সেবার জন্য তথায় গমন করিয়াছেন, তাঁহাদের কার্যের বিবরণ লিখিবেন।"

বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃঃ ৫৭।

অর্থেক হওয়া সত্বেও সেটাতে তাঁর সম্বন্ধে কয়েক ছত্র আছে। আর একাধিক অনুবাদ জর্মন ভাষাতে তো আছেই। অবশ্য আজকের দিনের রুচি দিয়ে বিচার করলে তাঁর বহু জিনিস শুধু কুট্টনীরসাশ্রিত লাতিনেই অনুবাদ করা যায়।

খোজার জীবনী নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করার উপায় নেই। কারণ তাঁর জীবন ও তাঁর হরেক রকমের রসিকতা এমনই জড়িয়ে গিয়েছে যে তার জট ছাড়ানো অসম্ভব। তাঁর সম্বন্ধে প্রচলিত দু'আনা পরিমাণ কিংবদন্তী বিশ্বাস করলে আমাদের কালিদাস সম্বন্ধে প্রচলিত সব ক'টাই বিশ্বাস করতে হয়। এমন কি তিনি পাঁচ শ' না সাত শ' বছর আগে জন্মেছিলেন সেই সমস্যারই চূড়ান্ত সমাধান এযাবৎ হয় নি। তবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে খোর্তো গ্রামে তাঁর জন্ম, সম্ভবত ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এবং আক্‌শেহিরে তাঁর মক্‌বরহ্‌ বা সমাধিসৌধ দেখানো হয়। ইনি যে সুপণ্ডিত এবং সুকবি ছিলেন সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই, কাবণ ধর্মশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি না থাকলে 'ইমাম' (ইংরিজীতে অন্ততপক্ষে বিশপ) হওয়া যায় না। অন্যান্য একাধিক ব্যাপারেও তিনি সমাজের অগ্রণীরূপে তুর্কী এবং তুর্কীর বাইরে সুপরিচিত ছিলেন।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে তাঁর নামে প্রচলিত গল্পের কটি তাঁর নিজস্ব ও কটি উদোর শির্‌নি বুধোর দর্গায় সে-বিচার অসম্ভব। দেশবিদেশেব পণ্ডিতগণ হার মেনে বিক্রমাদিত্যের নামে প্রচলিত গল্প যে 'বিক্রমাদিত্য সাইক্‌ল্‌' খৈয়ামের নামে চলিত-অচলিত চতুষ্পদী 'খৈয়াম চক্র' নামে অভিহিত করেছেন ঠিক সেইরকম এখন খোজার নামে লিখিত, পঠিত, শ্রুত গল্পকে 'খোজা চক্র' নাম দিয়ে দায়মুক্ত হন। কিন্তু গল্পগুলো বিশ্লেষণ করে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে তার অনেকগুলোই আরবভূমি, প্রাচীন ইরান ও ভারতবর্ষ থেকে গিয়েছে। সিরিয়াক এবং প্রাচীন বল্কানেও এর অনেকগুলো প্রচলিত ছিল। অবশ্য এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে সে সব বাদ দিলেও খোজার তহবিলে প্রচুর হাস্যরসের উপাদান উদ্বৃত্ত থেকে যায়। এবং তার চেয়েও বড় কথা— সুখে-দুঃখে, উৎসবে-ব্যসনে, মসজিদে-সরাইয়ে, বাজারে-বৈঠকখানায় খোজা যে ভাবে তাঁর গল্পে, আচরণে, ইঙ্গিতের মাধ্যমে নিজকে প্রকাশ করেছেন তারই একটি অতি সুস্পষ্ট হাস্যময়, সদানন্দ, দরদী ছবি তুর্কীদের বুকের ভিতর আঁকা। আজ যদি বেহশ্‌ৎ থেকে ফিরিশ্‌তা (দেবদূত) ইস্তাম্বুলে নেমে বিশ্বজনের কাছে সপ্রমাণ করে যান যে ইমাম নস্‌রুদ্দীন্‌ খোজা নামক কোনো ব্যক্তি এ ধরায় জন্মগ্রহণ করেন নি তবুও তুর্কীর লোক অচঞ্চল চিত্তে সেই তসবীরই ধারণ

করবে, বিদেশীর সঙ্গে পরিচয় হওয়ার কয়েক লহমার ভিতরেই খোজার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেবে এবং যদি সেখানে একাধিক তুর্ক উপস্থিত থাকে, এবং আপনি যে খোজাকে চেনেন না সে-কথা বুঝতে পারে তবে আপসে পাল্লা লেগে যাবে কে কত বেশী খোজার গল্প বলতে পারে। এদেশে যেমন বিস্তর রবীন্দ্র-ভক্ত আছেন যাঁরা প্রত্যেক ঋতু পরিবর্তন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির রূপরসগন্ধ-স্পর্শ বিবর্তন রবীন্দ্রনাথের কোনো না কোনো গান, বা একাধিক গান দিয়ে প্রকাশ করতে পারেন, ঠিক তেমনি জীবনের সুখ-দুঃখ, বিপদ-আপদ, দুর্ঘটনা, লটারি লাভ—সব কিছুই খোজার কোনো না কোনো গল্প দিয়ে রসরূপে প্রকাশ করা যায়। কারণ খোজা শুধু এলোপাতাড়ি রসসৃষ্টি করে যান নি—তার মারফতে খোজার পরিপূর্ণ জীবনদর্শন বা 'ভেল্টআনশাউঙ' পাওয়া যায়।

খোজার গল্প তিন রকমের। সহজেই অনুমান করা যায়, তিনি যেখানে চালাকি করে অন্যকে বোকা বানাচ্ছেন, কিম্বা মারাত্মক উত্তর দিয়ে প্রতি-পক্ষকে নিরস্ত্র করছেন তার সংখ্যাই বেশী। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এন্তের গল্প আছে যেখানে তিনি একটি পয়লা নম্বরেব ইডিয়েট, গাড়লস্য কুৎব্ মিনার। এবং তৃতীয় শ্রেণী থেকে বোঝা যায় না, তিনি বোকা না আমরা বোকা।

যেমন মনে করুন, খোজাকে অমাবস্যার রাতে শুধানো হল পূর্ণিমার চাঁদ গেল কোথায়? খোজা একগাল হেসে উত্তর দিলেন, 'তাও জানো না, পূর্ণিমার চাঁদকে প্রতি রাত্রে ফালি ফালি করে কেটে নেওয়ার পর এখন সেগুলো গুঁড়ো করে আকাশের তারা করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।'

খোজা বোকা বনতে চান, না বানাতে চান?

অবশ্য খোজার গীতিরস বা লিরিকরস অসাধারণ ছিল। এই কবিত্বময় ব্যাখ্যাটি দিয়ে তিনি যে গীতিরস সৃষ্টি করতে চান নি, বা যে-সব কবি অসম্ভব অসম্ভব তুলনা দিয়ে কাব্যরস সৃষ্টি করতে চান তাদের নিয়ে মস্করা করতে চান নি এ-কথা বলা কঠিন। কারণ আমাদের অলঙ্কারশাস্ত্রেও আছে,—

'প্রিয়ে, আকাশে চন্দ্রের মুখ দেখে
মনে হল তোমার মুখ,
তাই আমি চাঁদের পিছনে পিছনে ছুটছি।'

এ ধরনের তুলনাকে 'অসম্ভব তুলনা' বলে আলঙ্কারিক দণ্ডিন্ কাব্যাদর্শে নিন্দা করেছেন। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় যে এতে হাস্যরসের অবতারণা হওয়া বিচিত্র নয়। কথা নেই, বার্তা নেই, একটা লোক যদি চাঁদের পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে হঠাৎ খোয়াই-ভাঙা মাঠ-ময়দান ভেঙে ছুটতে আরম্ভ

করে আর বলতে থাকে, 'ঐ আমার প্রিয়া', 'ঐ আমার প্রিয়া' তাহলে পাড়ার ডন্ জোয়ানদেরও হেসে ওঠা অসম্ভব নয়।

তবু না হয় মেনে নেওয়া গেল, চাঁদকে গুঁড়ো করে খোজা ইচ্ছা করেই বোকা বনেছেন। কিন্তু এখন যেটা বলছি সেটাতে খোজা কি ?

দোস্তের বাড়ির দাওয়াতে খোজা খেলেন এক নতুন ধরনের মিশরী কাবাব। অতি সযত্নে এক টুকরো কাগজে লিখে নিলেন তার রেসিপি কিংবা পাকপ্রণালী কিংবা যাই বলুন। ততোধিক সযত্নে, ব-তরীবৎ সেটি রাখলেন জোব্বার ভিতরে গালাবিয়ার বুকপকেটে। রাস্তায় বেরিয়েই গেলেন তাঁর প্যারা কসাইয়ের দোকানে। আজ সন্ধ্যায়ই গিন্নীকে শিখিয়ে দেবেন কি করে এই অমূল্যনিধি রাঁধতে হয়। আর খাবেনও পেট ভরে। বন্ধুর বাড়িতে মেকদারটা একটু কম পড়েছিল। গোশ্‌ৎ কিনে খোজা রাস্তায় নামলেন।

হঠাৎ চিল এসে ছোঁ মেরে মাংস নিয়ে হাওয়া।

খোজা চিলের পিছনে ছুটতে ছুটতে আকাশের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে চিলকে বলতে লাগলেন, 'আরে কোরছ কি ? শুধু মাংসটা নিয়ে তোমার হবে কি ? রেসিপিটা যে আমার পকেটে রয়ে গেছে। কী উৎপাত! দাঁড়াও না।'

কিন্তু এভাবে গল্পের পর গল্প বলতে থাকলে খোজার সম্পূর্ণ গ্রন্থ নকল করে দিতে হয়। সম্পাদক আপত্তি জানাবেন।

এবারে তাহলে যে ধরনের গল্পের জন্য খোজা সুপ্রসিদ্ধ তারই একটি নিবেদন করি।

কথিত আছে, একদা খোজা জন্মভূমি তুর্কীর প্রতি বিরক্ত হয়ে দেশত্যাগ করে ইরান দেশে চলে যান। এতে আশ্চর্য হবার মত কিছুই নেই। কারণ খোজা ছিলেন কাণ্ডজ্ঞানহীন পরোপকারী—আমাদের বিদ্যাসাগরের মত দাগা খাওয়া বিচিত্র নয়।

তা সে যাই হোক,—লোকমুখে ইরানের রাজা সে খুশ-খবর শুনে বে-এক্তেয়ার। তড়িঘড়ি লোকলশ্‌করসহ উজীর-ই-আলাকে পাঠিয়ে দিলেন খোজাকে পরম যত্নসহকারে রাজদরবারে নিয়ে আসতে। খোজা আসামাত্র তখ্‌ৎ-ই-সুলেমান ত্যাগ করে বাদশা তাঁকে আলিঙ্গন করে পাশে বসালেন। মাথায় সোনার তাজ পরিয়ে দিলেন, গায়ে কাশ্মীরী শাল জড়িয়ে দিলেন, কোমরবন্ধে দমশ্‌কী তলওয়ার ঝুলিয়ে দিলেন। চতুর্দিকে জয়জয়কার।

সভাভঙ্গের পর বাদশা নিভৃতে ইতি-উতি করে, আশ-কথা পাশ-কথা কাড়ার

পর অতি সন্তর্পণে তাঁর জাগীরের প্রতি ইঙ্গিত করলেন। খোজা করজোড়ে 'সে কি শাহ্-ইন-শাহ্, আপনার যে পূত পবিত্র...' ইত্যাদি[৩] বলে তিনি নিবেদন করলেন, রাজসম্মানই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট।

বাদশাহ বিস্তর চাপাচাপি করার পর খোজা বললেন, 'হুজুরের যখন নিতান্তই এ হেন বাসনা তবে হুকুমজারী করে দিন কাল সকাল থেকে যারা বউকে ডরায় তারা আমাকে একটি করে ডিম প্রতি সকালে দেবে।'

দীন-দুনিয়ার মালিক বাদশা তো তাজ্জব। 'ওতে আপনার কি হবে? আমি খবর পেয়েছি, আপনি দান-খয়রাতে দাতাকর্ণ।'

খোজা এলবুর্জ পাহাড়ের মত অচল অটল। তবে তাই সই। ইরানী ভাষায় বলতে গেলে আলোচনার কার্পেট তখন রোল্ করে গুটিয়ে ঘরের কোণে খাড়া করে রেখে দেওয়া হল।

পরদিন ফজরের নমাজের সময় থেকেই হৈ-হৈ রৈ-রৈ। এস্তেক রাজবাড়িতেও মমলেট-অমলেট নেই। কি ব্যাপার? যাদের বাড়িতে মুর্গী নেই তারা ফজরের আজানের পূর্বে ছুটেছে বাজারপানে। ডিম কিনে ধাওয়া করেছে খোজার ডেরার দিকে।

সেখানে ডাঁই ডাঁই হুদো হুদো আণ্ডার ছয়লাপ! আণ্ডার নবীন ব্রহ্মাণ্ড!

পাইকিরী ব্যবসায়ীরা চতুর্দিকে বসে!

সাতদিন যেতে-না-যেতে খোজা ঢাউস তেতলা হাওয়া-মঞ্জিল হাঁকালেন। পক্ষাধিককাল মধ্যেই বোখারার কার্পেট, সমরকন্দের রেশমী তাকিয়া, মুরাদাবাদী আতরদান, গোলাপ-পাশ, বিদরী আলবোলা, রাজস্থানের গোলাপী মার্বেলের ফোয়ারা, সরণ-দীপের (স্বর্ণদ্বীপ সিংহল) হাতির দাঁতের চামর, ব্যজনী!

বাদশা তো আজব তাজ্জব মানলেন।

কুলোকে বলে, দু'একজন অমিতবীর্য অসীম সাহসী শের-দিল রুস্তম নাকি ডিম নিয়ে যায় নি দেখে তাদের (অথবা তার) স্ত্রী নাকি শুধিয়েছিল, 'ওঃ! তুমি বুঝি আমাকে ডরাও না?' তারপর আর দেখতে হয় নি!

ইরানের বাদশা খুশীতে তুর্কীর খাস খলীফাকে ছাড়িয়ে গেছেন।

এমন সময় রাজার মস্তকে বজ্রাঘাত। খোজা তিন মাসের ছুটি চান,—দেশ থেকে বউ-বাচ্চা নিয়ে আসবেন বলে। খোজা মারাত্মক একদারনিষ্ঠ। রাজা

৩ ইরানে বাদশার সামনে কোন্ মন্ত্র দিয়ে নিবেদন আরম্ভ করতে হয়, তার পুরো বিবরণের জন্য 'দেশে-বিদেশে' অধ্যায় পশ্য।

আর কি করেন, অতি অনিচ্ছায় ছুটি দিলেন, অবশ্য, তিন মাস রিট্রেঞ্চ করে দু'মাসের তরে। যাবার সময় বললেন, 'দোস্ত্! দেরি করবেন না, আপনার বিরহে আমার—' বাদশার গলা জড়িয়ে এল। ততদিনে তাঁদের সম্পর্ক আর রাজা-প্রজায় নয়—দোস্তীতে এসে দাঁড়িয়েছে।

দু'মাসের কয়েক দিন পূর্বেই খোজা রাজসভায় পুনরায় উপস্থিত। রাজা পরমানন্দে রাজোচিত ভাষায় শুধালেন, 'তবে কি পুণ্যশ্লোকা বেগম-সাহেবা স্ব-ভবনে অবতীর্ণা হয়েছেন?'

খোজা বললেন, 'হ্যাঁ হুজুর! তবে কি না, ভবনটি তাঁর উপর অবতীর্ণ হলেই হত আরো ভালো।'

তদ্দণ্ডেই সভাভঙ্গের হুকুম হল। বাদশা নিয়ে গেলেন খোজাকে অন্দরমহলে।

'শতেক বছর পরে বঁধুয়া আসিল ঘরে—'

বাদশার তখন ঐ হাল। দোস্তের সঙ্গে নিভৃতে দুহুঁ দুহুঁ হয়ে কুহু কুহু করবেন।

দু-পাত্র শিরাজী খেয়ে বাদশা খোজার কাছে ঘেঁষে বললেন, 'দোস্ত্! রাজ্যের আর সকলের সঙ্গে আমার রাজা প্রজার সম্বন্ধ। তারা আমার কাছ থেকে চায়; আমি তাদের দি। কিন্তু আপনি আমার দোস্ত—আপনার সঙ্গে দোস্তীর সম্পর্ক। দোস্ত যখন দেশে ফেরে তখন দোস্তের জন্য—' বাদশা গলা সাফ করে বললেন, 'এই, ইয়ে, মানে, কোনো কিছু একটা সওগাত আনে। আপনি তো আনেন নি।'

বলে বাদশা খ্যাঁক খ্যাঁক করে বিশ্রী রকমের হাসতে লাগলেন।

না-হক বেইজ্জৎ হলে মানুষ যে রকম বেদনাতুর কণ্ঠে ককিয়ে ওঠে, খোজা সেইরকম বললেন, 'জহাঁপানা কুল্লে দুনিয়ার ইমান-ইনসাফের মালিক, এ সংসারে আল্লা-তালার ছায়া (জিল্লুল্লা)—আমার উপর অবিচার করবেন না। এনেছি, আলবৎ এনেছি। দেশে পৌঁছে সকলের পয়লা হুজুরেরই সওগাত সংগ্রহ করেছি। আজ সঙ্গে আনি নি। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হয়। কাল সন্ধ্যায় নিয়ে আসবো।'

একেই বলে দোস্ত্!

উদ্গ্রীব হয়ে রাজা শুধালেন, 'কি? কি? আমার যে তর সইছে না। আঃ, জীবনে এই প্রথম কিছু-একটা পেলুম।'

খোজা বললেন, 'নিজের আনা সওগাতের প্রশংসা করতে বাধছে, কিন্তু সত্যি হুজুর—অপূর্ব, অতুলনীয়। একটি অপরূপ সুন্দরী তুর্কী তরুণী আপনার জন্য

এনেছি হুজুর।'[৪]

ঝঙ্কারের জন্য ফার্সীটা শুনুন :

'অগর্ আন্ তুর্ক্-ই-শিরাজী
বদস্ত্ আরদ্ দিল-ই মারা
ব্-খাল-ই হিন্দো ওশ বখ্শম্
সমর্কন্দ্ ওয়া বুখারারা।'

কথিত আছে এ দোঁহা লিখে হাফিজকে তিমুর লেনের সামনে বিপদে পড়তে হয়েছিল। সেটা বারান্তরে হবে।

তারপর খোজা উচ্ছ্বসিত হয়ে সেই তরুণীর রূপবর্ণনা আরম্ভ করলেন, একেবারে আমাদের বিদ্যাপতি স্টাইলে, নখ্ থেকে শির পর্যন্ত—যাকে বলে নখ-শির বর্ণন। 'ওহো হো হো,—একটি তন্বঙ্গী চিনার গাছ হেন! কী দোলন, কী চলন!'

৪ ইরানে তুর্কী রমণীর বড়ই কদর।

'হে তরুণী হে তুরস্কী, হে সুন্দরী সাকি
এমনি হৃদয় মুগ্ধ করিয়াছ তুমি,
তব কপোলের ঐ কৃষ্ণ তিল লাগি
বোখারা সমরকন্দ দিতে পারি আমি।'

অনুবাদটি ভালো নয়। কিন্তু হাফিজের এই কবিতাটি এতই বিখ্যাত যে, তার একাধিক ইংরিজী অনুবাদ আছে,—

"If that unkindly Shirazi Turk
would take my heart in her hand
"I'd give Bukhara for the mole upon
her cheek, and Samarkand."

কিম্বা

"Sweet maid, if thou wouldst charm my sight ;
And bid these arms thy neck infold ;
That rosy cheek, that lily hand
Would give thy poet more delight
Than all Bokharas vaunted gold.
Than all the gems of Samarkhand."

বাদশা বললেন, 'আস্তে।'

কিন্তু খোজাকে তখন পায় কে, তিনি মৌজে। গলা চড়িয়ে বললেন, 'চিকুর কেশ তো নয়, যেন অমা-যামিনীর স্বপ্নজাল—আর্দ্র, স্নিগ্ধ, মৃগনাভি সম।'

উৎসাহের তোড়ে খোজা তখন উঠে দাঁড়িয়েছেন। যেন রাজকবি দরবারের সবাইকে শুনিয়ে কবিতা পাঠ করছেন।

বাদশা ব্যাকুল হয়ে খোজার জোব্বা টেনে কাতর কণ্ঠে বললেন, 'চুপ্, চুপ্, আস্তে আস্তে—পাশের ঘরে বেগম-সায়েবা রয়েছেন।'

ঝুপ্ করে বসে পড়ে খোজা বিনয়নম্র কণ্ঠে বললেন, 'হুজুর, কাল সকাল থেকে একটি করে আণ্ডা পাঠিয়ে দেবেন। আমার পাওনা।'

এইখানেই খোজা-কাহিনী শেষ করলে ঠিক হত। কিন্তু তাহলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। তিনি পরলোকগমনের পূর্বে যে শেষ রসিকতাটি করে গিয়েছেন, সেটি বাদ পড়ে যায়। কারণ সেটি আজও প্রথম দিনের মত তাজা, অতিশয় নব—ফার্সীতে যাকে বলে 'তাজা ব্-তাজা, নৌ-ব-নৌ'[৫]। দ্বিতীয়ত, আণ্ডার গল্পটি আমি শুনেছি আমার সর্ব-কনিষ্ঠা ভগিনী লুৎফুন্নিসার কাছ থেকে। আমার মত তার পায়েও চক্কর আছে। সে শুনেছে, লাহোর না পেশাওয়ার কোথায় যেন। এর থেকে এটাও বোঝা যায়, খোজার গল্প মুখে মুখে কতখানি ছড়িয়ে পড়েছে। এখন বাঙলা দেশেও পৌঁছল। সপ্তদশ অশ্বারোহী গাজা: দশ বাদ দিয়ে সপ্ত শতাব্দীতেই হয়।

এবারে শেষ গল্প। এটাতে আপনি আমি সবাই আছি।

যেমন মনে করুন, দৈবযোগে আপনি পৌঁচেছেন আক্‌শেহিরে। স্বভাবতই আপনার মনে বাসনা, দিলে ইরাদা জাগবে খোজার গোরস্তান দেখবার জন্য। একাই বেরিয়ে পড়ুন, কিচ্ছুটি ভাবনা নেই, সবাই রাস্তা চেনে।

সেখানে গিয়ে দেখবেন, সামনে এক বিরাট দেউড়ি—প্রবেশদ্বার। কোথায় লাগে তার কাছে ফতেহ্-পুর-সিক্রিতে আকবর বাদশার বুলন্দ-দর্ওয়াজ্। একেবারে শিশু। তা না হয় হল, কিন্তু অবাক হবেন দেখে যে বন্ধ দরজায় এক বিরাট তিন মণ ওজনের তালা!

গোরস্থানে আছেই বা কি, যাবেই বা কি? এই ভারতবর্ষেই লুটতরাজের ফলে যা কিছু ইমারৎ বেঁচে আছে, সেগুলো হয় কবর নয় মসজিদ—ওসবে লুটের

---

৫ সত্যেন দত্তের অনুবাদ আছে।

কিছু নেই বলে। তিন মণী তালা দিয়ে খোজার দেহরক্ষা—অন্যার্থে—করা হচ্ছে, মিশরী মমীর মত ? কিন্তু ইসলামে তো হেন ব্যবস্থা নেই।

নাচার হয়ে তালাটা বন্ধ দোরে বার কয়েক ঠুকলেন, এদিক ওদিক গলা বাড়িয়ে চেল্লাচেল্লি করলেন।

তখন দরাজ-দেউড়ির একপাশ দিয়ে পাঁচিল ডিঙিয়ে বেরিয়ে এল পাহারা-ওলা। আপনাকে সবিনয় নিবেদন করবে, 'কি হবে ঐ বিরাট তালা খুলে। ওটা কখনো খোলা হয় নি। চলুন পাঁচিল ডিঙিয়ে যাই।'

মানে ?

একশ' ফুট উঁচু দেউড়ি—চতুর্দিকের পাঁচিল উঁচুতে এক ফুট হয় কি না হয়!

মানে ?

খোজার আখেরী-শেষ-মস্বরা। উইলে এইভাবে তৈরী করবার আদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন।

বলতে চেয়েছিলেন, 'এ জীবনে আমরা সামনের দিকটা আগলাতেই ব্যস্ত। ইতিমধ্যে আর সব দিক দিয়ে যে বেবাক কিছু চলে যায়, তার খবর রাখি নে।'

* *

আমি আকৃশেহির যাই নি। কাজেই হলপ খেয়ে বলতে পারবো না, খোজার দর্গা এই পদ্ধতিতে নির্মিত কি না। যদি না হয় তবে বুঝবো খোজা আরো মোক্ষম রসিক। বিন খর্চায় আমাদের এখনো হাসাচ্ছেন আব বোকা বানাচ্ছেন।

নজরুল ইসলাম ও ওমর খৈয়াম

পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, রাজমহল, শ্রীরামপুর হুগলী এবং পরবর্তী যুগে কলকাতায় অনেকখানি আরবী-ফার্সীর চর্চা হয়েছিল বটে, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে এ চর্চা খুব ছড়িয়ে পড়তে পারে নি। তার প্রধান কারণ অতি সরল—ইসলাম পশ্চিম-বঙ্গের গ্রামাঞ্চলে পূর্ববাংলার মত ছড়িয়ে পড়তে পারে নি, কাজেই অতি সহজেই অনুমান করা যায়, চুরুলিয়া অঞ্চলে পীর-দরবেশদের কিঞ্চিৎ সমাগম হয়ে থাকলেও মৌলবী-মৌলানারা সেখানে আরবী-ফার্সীর বড় কেন্দ্র স্থাপনা করতে পারেন নি।

তদুপরি নজরুল ইসলাম ইস্কুলে সুবোধ বালকের মত যে খুব বেশী আরবী-ফার্সী চর্চা করেছিলেন তাও মনে হয় না। ইস্কুলে তিনি আদৌ ফার্সী (আরবীর সম্ভাবনা নগণ্য) অধ্যয়ন করেছিলেন কি-না, সে সম্বন্ধেও আমরা বিশেষ কিছু

জানি নে। শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ নিশ্চয়ই অনেক কিছু বলতে পারবেন।

তারো পরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেওয়ার ফলে তিনি যে এ সব ভাষায় খুব বেশী এগিয়ে গিয়েছিলেন তাও তো মনে হয় না। পল্টনের হাবিলদার যে জাব্বা-জোব্বা পরে দেওয়ানা-দেওয়ানা ভাব ধরে হাফিজ-সাদীর কাব্য কিম্বা মৌলানা রূমীর মসনবী সামনে নিয়ে কুঞ্জে কুঞ্জে ছন্নছাড়ার মত ঘুরে বেড়াবে তাও তো মনে হয় না। এমন কি রঙীন সদরিয়ার উপর মলমলের বুটিদার অঙ্গরখা পরে হাতে শিরাজীর পাত্র নিয়ে সাকীর কণ্ঠে ফার্সী গজল আর কসীদা-গীত শুনছেন, এও খুব সম্ভবপর বলে মনে হয় না। কসম খেয়ে এ বিষয়ে কোনো কিছু বলা শক্ত, তবে এটা তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, কাব্যে যদ্যপি 'খাকী' এবং 'সাকী' চমৎকার মিল, তবু বাস্তব জীবনে এ দুটোর মিল এবং মিলন সচরাচর হয় না।

তবু নজরুল ইসলাম মুসলিম ভদ্রঘরের সন্তান। ছেলেবেলায় নিশ্চয়ই কিঞ্চিৎ আলিফ, বে, তে করেছেন, দোয়া-দরুদ (মন্ত্র-তন্ত্র) মুখস্থ করেছেন, কুরান পড়াটা রপ্ত করেছেন। পরবর্তী যুগে তিনি কুরানের শেষ অনুচ্ছেদ 'আমপারা' বাঙলা ছন্দে অনুবাদ করেন—হালে সেটি প্রকাশিত হয়েছে। সে পুস্তিকাতে তাঁর গভীর আরবী জ্ঞান ধরা পড়ে না—ধরা পড়ে তাঁর কবি-জনোচিত অন্তদৃষ্টি এবং আমপারার সঙ্গে তাঁর যে আবাল্য পরিচয়। বিশেষ করে ধরা পড়ে, দরদ দিয়ে সৃষ্টিকর্তার বাণী (আল্লার 'কালাম') হৃদয়ঙ্গম করার তীক্ষ্ণ এবং সূক্ষ্ম প্রচেষ্টা।

এরই উপর আমি বিশেষ করে জোর দিতে চাই। ফার্সী তিনি বহু মোল্লা-মৌলবীর চেয়ে কম জানতেন, কিন্তু ফার্সী কাব্যের রসাস্বাদন তিনি করেছেন তাঁদের চেয়ে অনেক বেশী। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই অনেক সংস্কৃত ব্যাকরণবাগীশদের চেয়ে কম সংস্কৃত জানতেন, কিন্তু তিনি লিরিকের রাজা মেঘদূতখানা জীবন এবং কাব্য দিয়ে যতখানি গ্রহণ করতে পেরেছিলেন ততখানি কি কোনো পণ্ডিত পেরেছেন ? বহু লোকই বাঙলা দেশের মাটি নিখুঁতভাবে জরিপ করেছে, কিন্তু ঐ মাটির জন্য প্রাণ তো তারা দেয় নি। কানাইলাল, ক্ষুদিরাম ভালো জরিপ জানতেন এ কথাও তো কখনো শুনি নি।

কাজী রোমান্টিক কবি। বাঙলা দেশের জল-বাতাস, বাঁশ-ঘাস যে রকম তাঁকে বাস্তব থেকে স্বপ্নলোকে নিয়ে যেত, ঠিক তেমনি ইরান-তুরানের স্বপ্নভূমিকে তিনি বাস্তবে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন বাঙলা কাব্যে। ইরানে তিনি কখনো যান নি, সুযোগ পেলেই যে যেতেন, সে কথাও নিঃসংশয়ে বলা যায় না (শুনেছি, পণ্ডিত হয়েও মাক্সম্যুলার ভারতবর্ষকে ভালবাসতেন এবং তাই বহুবার সুযোগ পেয়েও এদেশে আসতে রাজী হন নি।) কিন্তু ইরানের গুল্‌ বুল্‌বুল্‌,

শিরাজী-সাকী তাঁর চতুর্দিকে এমনই এক জানা অজানার ভুবন সৃষ্টি করে রেখেছিল যে গাইড-বুক, টাইম-টেবিল ছাড়াও তিনি তার সর্বত্র অনায়াসে বিচরণ করতে পারতেন। গুণীরা বলেন, প্রত্যেক মানুষেরই দুটি করে মাতৃভূমি—একটি তাঁর আপন জন্মভূমি ও দ্বিতীয়টি প্যারিস। কাজীর বেলা বাঙলা ও ইরান। কীটস বায়রনের বেলা যে রকম ইংল্যাণ্ড ও গ্রীস।

আরবভূমির সঙ্গে কাজী সায়েবের যেটুকু পরিচয়, সেটুকু প্রধানতঃ ইরানের মারফতেই। কুরান শরীফের 'হারানো ইউসুফের' যে করুণ কাহিনী বহু মুসলিম অমুসলিমের চোখে জল টেনে এনেছে তিনি কবিরূপে তার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন ফার্সী কাব্যের মারফতে।

দুঃখ করো না, হারানো য়ুসুফ
কাননে আবার আসিবে ফিরে।
দলিত শুষ্ক এ-মরু পুনঃ
হয়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে॥
ইউসুফে গুম্‌গশ্‌তে বা'জ্‌ আয়দ্‌ ব্‌ কিনান্‌
গম্‌ ম্‌ খূর।
কুল্‌বয়ে ইহ্‌জান্‌ শওদ্‌ রূজি গুলিস্তান্‌
গম্‌ ম্‌ খূর॥

কাজী সায়েবের প্রথম যৌবনের রচনা এই ফার্সী কবিতাটির বাঙলা অনুবাদ অনেকেরই মনে থাকতে পারে। 'মেবার পাহাড়, মেবার পাহাড়ে'র অনুকরণে 'শাতিল আরব শাতিল আরব' ঐ যুগেরই অনুবাদ।

কোনো কোনো মুসলমান তখন মনে মনে উল্লসিত হয়েছেন এই ভেবে যে, কাজী 'বিদ্রোহী' লিখুন আর যা-ই করুন, ভিতরে ভিতরে তিনি খাঁটি মুসলমান। কোনো কোনো হিন্দুর মনেও ভয় হয়েছিল (যাঁরা তাঁকে অন্তরঙ্গ ভাবে চিনতেন তাঁদের কথা হচ্ছে না) যে কাজীর হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতি বোধ হয় বাঙলার জন্য নয়—তাঁর দরদ বুঝি ইরান-তুরানের জন্য। পরবর্তী যুগে—পরবর্তী যুগে কেন, ঐ সময়েই কবিকে যাঁরা ভালো করে চিনতেন, তাঁরাই জানতেন, ইরানী সাকীর গলায় কবি যে বার বার শিউলির মালা পরিয়ে দিচ্ছেন তার কারণ সে তরুণী মুসলমানী বলে নয়, সে সুন্দরী ইরানের বিদ্রোহী কবিদের নর্ম সহচরী বলে—ইরানের বিদ্রোহী আত্মা কাব্যরূপে, মধুররূপে তার চরম প্রকাশ পেয়েছে সাকীর কল্পনায়।

সে বিদ্রোহ কিসের বিরুদ্ধে?

এস্থলে কিঞ্চিৎ ইতিহাস আলোচনার প্রয়োজন।

ইরানী ও ভারতীয় একই আর্যগোষ্ঠীর দুই শাখা। দুই জাতির ইতিহাসেই অনেকখানি মিল দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইরানীরা যে রকম দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে একদিকে মিশর প্যালেস্টাইন, অন্যদিকে গ্রীস পর্যন্ত হানা দিয়েছিল, ভারতীয়েরা সে রকম করে নি। দ্বিতীয়তঃ বিদেশী অভিযানের ফলে ইরানভূমি যে রকম একাধিকবার সম্পূর্ণ লণ্ডভণ্ড হয়েছে, ভারতবর্ষের ভাগ্যে তা কখনো ঘটে নি। এ সব কারণেই হোক বা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক ইরানীরা সভ্যতার প্রথম যুগ থেকেই সে এক উগ্র স্বাজাত্যভিমানের সৃষ্টি করে। ভারতবর্ষ যেখানে শান্তভাবে বিদেশীর ভালো-মন্দ দেখে-চিনে নিজকে মেলাবার, পরকে আপন করার চেষ্টা করেছে, ইরান সেখানে আদৌ সে চেষ্টা করে নি এবং শেষটায় যখন বাধ্য হয়ে সব-কিছু নিতে হয়েছে তখন করেছে পরবর্তীকালে, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

গ্রীস-রোমের কাছে পরাজিত হওয়া এক কথা, আর প্রতিবেশী 'অনুন্নত', 'অর্ধসভ্য' আরবদের কাছে পরাজিত হওয়া আরেক কথা। তদুপরি গ্রীক রোমানরা ইরানে যে সভ্যতা এনেছিল, তাতে গরীব-দুঃখীর জন্য নূতন কোনো আশার বাণী ছিল না। যে নবীন ধন-বণ্টন পদ্ধতি দ্বারা হজরৎ মুহম্মদ আরব দেশের আপামর জনসাধারণকে ঐক্যসূত্রে গ্রথন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাঁর বাণী এসে পৌঁছল ইরানে। ফলে মুহম্মদ সাহেবের পরবর্তীগণ যখন একদিন অন্যান্য জাতির মত দিগ্বিজয়ে বেরোল তখন ইরানী শোষক সম্প্রদায় দেখে মর্মাহত ও স্তম্ভিত হল যে, ইরানের জনসাধারণ আরবের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হল না। তারপর আরবরা বিজিত দেশের ধর্মজগতে যে সাম্যবাদ ও অর্থের ক্ষেত্রে যে ধনবণ্টন পদ্ধতি প্রচার করলো, তাতে আকৃষ্ট হয়ে ইরানের জনসাধারণ মুসলমান হয়ে গেল। জ্ঞানাভিমানী ও ধর্মযাজক সম্প্রদায়ও শেষ পর্যন্ত ঐ ধর্ম গ্রহণ করল। তখনকার মত ইরানী সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রায় লোপ পেয়ে গেল।

কিন্তু বিদ্রোহ লুপ্ত হল না।

সেটা দেখা দিল প্রায় চারশ' বছর পরে ফিরদৌসীর মহাকাব্য 'শাহনামা'তে। রাষ্ট্রভাষা আরবীকে উপেক্ষা করে ফিরদৌসী গাইলেন প্রাক-মুসলিম যুগের ইরানী বীরের কাহিনী, রাজার দিগ্বিজয়, প্রেমিকের বিরহ-মিলন গাথা—নবীন অথচ সনাতন সেই ফার্সী ভাষায়। যে ফার্সী কাব্য-সাহিত্য পরবর্তী যুগে বিশ্বজনের বিস্ময় সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়, তার প্রথম সার্থক কবি ফিরদৌসী।

এই নূতন ভাষাতে, নবীন প্রাণে উন্মত্ত হয়ে যে সব কবি কাব্যের সর্ব বিষয়বস্তু নিয়ে নব নব কাব্যধারার প্রবর্তন করলেন তার কাছে পরবর্তী যুগের

ইউরোপীয় রেনেসাসও এতখানি সর্বমুখী ব'লে মনে হয় না। দু'শ বছর যেতে না-যেতেই বিশ্বের কাব্যজগতে ইরান তার অদ্বিতীয় আসন সৃষ্টি করে নিল।

এঁদের মধ্যে সত্য বিদ্রোহী কবি ওমর খৈয়াম।

* *

ইরানে ইসলাম প্রচারিত হওয়ার ফলে শিক্ষিত তথা পুরোহিত সম্প্রদায়ের ভিতর বিভিন্ন আন্দোলনের সৃষ্টি হল। তার প্রথম

(১) যাঁরা মুসলিম শাস্ত্রের চর্চা করে যশস্বী হলেন। ভাবলে আশ্চর্য বোধ হয়, ইরানীরা আরবীর মত কঠিন ভাষা আয়ত্ত করে সে শাস্ত্রে এতখানি ব্যুৎপত্তি অর্জন করলো কি করে? মুসলমানদের মনুর নাম ইমাম আবু হানীফা। পৃথিবীর শতকরা আশীজনেরও বেশী মুসলমান আজ নিজকে হানফী অর্থাৎ আবু হানীফার মতবাদে বিশ্বাসকাবী বলে পরিচয় দেয়। কিন্তু তাতে আশ্চর্য হবার মত কীই বা আছে? শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য তো শুনেছি ভারতবর্ষেব দক্ষিণতম কোণের লোক, এবং তাঁব ধমনীতে যে অত্যাধিক আর্যরক্ত ছিল তাও তো মনে হয় না, অন্তত: একথা তো অনায়াসে বলা যেতে পারে যে, আর্য উত্তর ভারতের তুলনায় মালাবাবে সংস্কৃত-চর্চা ছিল অনেক কম। তবু যে তিনি শুধু তাঁব মাতৃভূমি মালাবারে বৌদ্ধদের পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাই নয়, আর্য উত্তব ভারতেও তিনি তাঁর বিজয় পতাকা উড্ডীয়মান করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইরানী আবু হানীফার মতবাদও একদা ইসলামের জন্মভূমি মক্কা-মদীনা তথা আরব দেশ জয় করতে সক্ষম হয়েছিল। এ বকম উদাহরণ পৃথিবীতে আরো আছে।

(২) যাঁরা ক্রিয়াকাণ্ড, টীকা-টিপ্পনী, মন্ত্রতন্ত্রে সম্পূর্ণ আস্থা না দিতে পেবে 'রহস্যবাদ' বা সুফীতত্ত্বের প্রচার এবং প্রসার করতে লাগলেন, এঁরা ভগবানের আরাধনা কবেন রসের মাধ্যমে এবং বাঙলার বৈষ্ণব তথা 'মরমিয়া'দের সঙ্গে এঁদের তুলনা করা যেতে পারে।

মরম না জানে ধরম বাখানে
এমন আছয়ে যারা
কাজ নাই, সখি, তাঁদের কথায়
বা হরে থাকেন তাঁরা।

* *

ঐ চাহনিতে বিশ্ব মজেছে
পড়িয়াছে কত অশ্রুধার
পাগল করলি এ প্রমত্ত আঁখি
কুলমান রাখা হৈল ভার।

এ ধরনের কবিতা সূফী ও বৈষ্ণবদের ভিতর এতই প্রচলিত যে, কোন্‌টি সূফী কোন্‌টা বৈষ্ণব ধরে ওঠা অসম্ভব। যদি বলি,

প্রেম নাই. প্রিয় লাভ আশা করি মনে
রাধিকার মত ভ্রান্ত কে ভব-ভবনে।

তবে চট করে কেউ আপত্তি করবেন না। অথচ আসলে আছে,

প্রেম নাই, প্রিয় লাভ আশা করি মনে
হাফেজের মত ভ্রান্ত কে ভব-ভবনে।

('সদ্ভাব-শতক' কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের অনুবাদ)

বৈষ্ণবদের সঙ্গে এঁদের আরো বহু মিল আছে। এঁদের সূফীবাদ পরবর্তী যুগে তথাকথিত 'তুর্কী'রা গ্রহণ করে। বাঙলা দেশে প্রথম যে মুসলমানরা আসেন তাঁদের আমরা 'তুর্ক', 'তুরুক্' নাম দি (প্রাচীন বাঙলার 'মুসলমান' শব্দের প্রতিশব্দ 'তুর্ক'—তামিলে এখনো 'তুরস্কম') এবং তাঁদের চক্রাকারে নৃত্য করে আল্লার নাম জপ ('জিক্‌র'—যার থেকে বাঙলা 'জিগির' শব্দ এসেছে) করা দেখে 'তুর্কী-নাচন-নাচা' প্রবাদটি এসেছে। বৈষ্ণবদের মত এঁরাও জপ করতে করতে 'হাল' ('দশা') প্রাপ্ত হন,—অর্থাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েন ও মুখ দিয়ে তখন প্রচুর ফেনা বেরয়। পূর্ব ইয়োরোপে এই নাচ দেখে ইয়োরোপীয়রা এদের নাম দিয়েছিল "ডানসিং দরবেশ"। ইংরিজীতে কথাটা এখনো চালু আছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে অত্যধিক বাগাড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন, কারণ আউল-বাউল, ভাটিয়ালি-মুর্শীদীয়া গীত যাঁরাই শুনেছেন, তাঁরাই এই ফার্সী, সূফী ভক্তিবাদের কিঞ্চিৎ গন্ধস্পর্শ পেয়েছেন।

(৩) দার্শনিক সম্প্রদায়। আর্যগোষ্ঠীর দুই সম্প্রদায়—ভারতীয় ও গ্রীকরাই প্রধানতঃ দর্শনের চর্চা করেছেন।

মাহমুদ বাদশার সভাপণ্ডিত 'ভারতবর্ষ' পুস্তকের (প্রাচীন তথা অর্ধাবাচীন ভারতের বহুমুখী কার্যকলাপ, চিন্তা, অনুভূতির সঙ্গে যাঁরা পরিচিত হতে চান তাঁদের পক্ষে এ পুস্তক অপরিহার্য; বস্তুতঃ বর্তমান লেখক ব্যক্তিগত ভাবে এ পুস্তককে 'মহাভারতে'র পরেই স্থান দেয়) লেখক পণ্ডিত অল-বীরূনী মুক্তকণ্ঠে বলেছেন, 'দর্শনের চর্চা করেছেন গ্রীক এবং ভারতীয়েরা—আমরা (অর্থাৎ আরবী লেখকেরা) যেটুকু দর্শন শিখেছি তা এদের কাছ থেকেই।' কথাটা মোটামুটি সত্য, যদিও পণ্ডিতজনসুলভ কিঞ্চিৎ বিনয় প্রকাশ এতে রয়েছে, কারণ আরবরা গ্রীকদর্শনের আরবী অনুবাদ দিয়ে দর্শন-চর্চা আরম্ভ করেছিলেন সত্য কিন্তু পরবর্তী যুগে আভিচেন্না (বু আলী সিনা), আভেরস (আবু রুশ্‌দ্) ও গজ্জালী

(অল-গাজ্জেল- এঁর 'সৌভাগ্য স্পর্শমণি' প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বাঙলায় অনূদিত হয়ে রাজশাহীতে প্রকাশিত হয়) বহু মৌলিক চিন্তা দ্বারা পৃথিবীর দর্শন ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু স্মরণ রাখা ভালো, এঁদের দর্শন শঙ্কর দর্শনেরই ন্যায় ধর্মাশ্রিত এবং যে-স্থলে কুরানের বাণীর সঙ্গে গ্রীক দর্শনের দ্বন্দ্ব বেঁধেছে সেখানে তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন সে-দ্বন্দ্বের সমাধান করার এবং সময়ে সময়ে তখন তাঁরা নিও-প্লাতোনিজম অর্থাৎ ভারতের উপনিষদসম্মত অন্তর্দৃষ্টির উপর নির্ভর করেছেন। এঁদের বিশেষ নাম 'মুতকল্লিমুন' এবং পরবর্তী যুগে এদেশের রাজা রামমোহন তাঁর বিশ্বদর্শন (ভেল্টানশাউউঙ) নির্মাণে এঁদের পরিপূর্ণ সাহায্য নিয়েছেন।

(৪) ঐতিহাসিক ও কবিগোষ্ঠী। ইতিহাস-চর্চায় আরবদের দক্ষতা সর্বজনমান্য, তবে ইরানীরাও এ-শাস্ত্র তাঁদের কাছ থেকে শিখে নিয়ে এর অনেক উন্নতিসাধন করেন। কিন্তু আমরা যে যুগের আলোচনা করছি তখনো ইরানীদের কাছে ইতিহাস ও পুরাণের পার্থক্য সুস্পষ্টরূপে ধরা দেয় নি। ফিরদৌসীর 'শাহনামা' (রাজবংশ) কাব্যের রাজা-মহারাজা, নায়ক-নায়িকারা অধিকাংশই কবিজনসুলভ কল্পনাপ্রসূত—অন্তত তাঁদের কীর্তিকলাপ তো বটেই। কিন্তু সব চেয়ে লক্ষ্য করার বিষয়, প্রাক-ইসলামী এই সব অগ্নিউপাসক নায়ক-নায়িকাদের নিয়ে ফিরদৌসীর কী গগনচুম্বী গরিমা, দম্ভ এবং সময় সময় আস্ফালন। এ যেন বিজয়ী আরবদের বার বার শুনিয়ে শুনিয়ে বলা, 'কালনেমির বিরূপাবর্তনে আজ আমাদের পতন ঘটেছে বটে, কিন্তু এই কাব্যে দেখ, আমরা একদিন সভ্যতার কত উচ্চ শিখরে উঠেছিলুম। সে-দিকে একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখো। ওখানে তোমরা কখনো পৌঁছও নি, পৌঁছবেও না।' এ সুর কেমন যেন আমাদের চেনা-চেনা মনে হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েই ইংরেজকে শুনিয়ে শুনিয়ে বার বার এই গান গেয়েছে। ('অন্য জাতি দিগ্বসন পরিত যখন। ভারতে ঋগ্বেদ পাঠ হইত তখন।')। কিন্তু, আফসোস! শাহনামার মত মহাকাব্যের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারে নি। হেমচন্দ্র ও ইকবালকে ফিরদৌসীর আসনে বসানো কঠিন এবং অন্যান্য কবিরা যে 'নির্লজ্জতা' দেখালেন ('নির্লজ্জতা' শব্দটি ভেবেচিন্তেই কুটেশনের ভিতর ফেললুম, কারণ কাব্যে রসস্বরূপে প্রকাশ পেলে চরম নির্লজ্জতাও পাঠকের মনে বিদ্রোহ সঞ্চার করতে পারে না। আমাদের দুই মাইডিয়ার হীরো পবননন্দন ভীমসেন ও হনুমান যে সব দম্ভ এবং আস্ফালন করেছেন তা স্বকর্ণে শুনতে হলে 'রাম রাম' বলতে হত, কিন্তু কাব্যে পাঠ করে আনন্দাশ্রু বিগলিত

হয়, মনে হয়, ঐ সময়ে, ঐ অবস্থায় এ বাক্য ছাড়া অন্য কিছুই এঁদের মুখে মানাতো না, বলতে ইচ্ছে করে, 'ধন্য ধন্য যুগ্ম-কবি যাঁরা দম্ভকে বিনয়, লজ্জাকে শ্লাঘায় পরিণত করতে পারেন।') সেটা ঢাকবার প্রয়াস আজও ইরানে-তুরানে সহজেই চোখে পড়ে। সকলেই জানেন, মুসলমান ধর্মে মদ খাওয়া মানা আর সেই মদও যদি খাওয়া হয় তন্বঙ্গী তরুণী সাকীর সঙ্গে—যার সঙ্গে 'বে-থা' হয়েছে কিনা সে সম্বন্ধেও কবিরা বড় মারাত্মক স্মৃতিশক্তিহীন—তাও আবার ঝরণা তলায়, নির্জনে, সাঝের ঝোঁকে, যখন কিনা 'মগরিবের আইন ওকৃতে' নামাজ পড়ার কথা, আল্লা-রসুলের নাম স্মরণ করার আদেশ—এবং মনে মনে আওড়ানো,

"মত্ত, মাতাল ব্যসনী আমি গো আমি কটাক্ষ বীর"

তা হলে অবস্থাটা কি রকমের হয়?

কথা সত্য, মোল্লারা সুবো-শাম ভালো ভালো কেতাবপুঁথি পড়েন, কিন্তু মাঝে-মধ্যে, নিতান্ত কালে-কস্মিনে দু'একখানা কাব্যগ্রন্থের পাতাও তো তাঁরা ওলটান। কবি হাফিজ অবশ্য বিস্তর ঢলাঢলির পর ওকীবহাল হয়ে অভয়বাণী বলেছিলেন,

"মোল্লার কাছে কোবো না কিন্তু মোর পিছে অনুযোগ,
তারো আছে, জেনো, আমারি মতন, সুরামত্ততা রোগ।"

তবু, এ-কথাও তো অজানা নয় যে, মোল্লারাই নীতিবাগীশ সাজে আর পাঁচজনের তুলনায় বেশী।

এবং কার্যতঃ দেখা গেল তারা এবং তাদের চেলাচামুণ্ডার দল ঝোপে-ঝাপে বসে আছে, শরাব-কবাব জান-কী-সাকী সুদ্ধ কবিদের বমাল গ্রেফতার করার জন্য।

কবিরা এবং বিশেষ করে আমাদের মত তাঁদের গুণগ্রাহীরা, উচ্চকণ্ঠে তখন বললেন, এ-সব কবিতা রূপকে নিতে হয়। মদ্য অর্থ ভগবদ্ প্রেম, সাকী অর্থ যিনি সে প্রেম আমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেন, অর্থাৎ পীর, গুরু, মুরশীদ, পয়গম্বর। এবং এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, হাফিজ, আত্তার, এমন কি ওমর খৈয়ামের বহু কবিতার কোনো অর্থই করা যায় না, যদি সেগুলো রূপক দিয়ে অর্থ না করা হয়। কিন্তু বাদবাকিগুলো?

আমাদের পদাবলীতেও তাই। এবং বিস্তর সব পদ আছে যাতে মর্ত্য আর অমর্ত্য প্রেম এমন ভাবে মিশে গিয়েছে যে, দুটোকে আদৌ আলাদা করা যায় না —সমস্ত হৃদয়-মন এক অদ্ভুত অনির্বচনীয় নবরসে আপ্লুত হয়ে যায়।

তোমার চরণে আমার পরাণে
লাগিল প্রেমের ফাঁসী
সব সমর্পিয়া এক মন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী

মর্ত্য প্রেমই যদি হবে তো 'পরাণে' 'পরাণে' প্রেমের ফাঁসী লাগবে। 'পরাণে' আর 'চরণে' প্রেমের বাঁধ বেঁধে দিয়ে কী এক অপূর্ব অতুলনীয় ব্যঞ্জনার সৃষ্টি হয়েছে —যার অনুভূতি এ-জগতে আরম্ভ, আর পরিপূর্ণতা লাভ করবে সেই অমর্ত্যালোকে, 'ব্যর্থ নাহি হোক এ-কামনা।'

কিন্তু মাঝে মাঝে মনে দ্বিধা জাগে, সর্বত্রই কি রূপকের শরণাপন্ন হতে হবে? যথা:

অদ্যাপ্য-শোক-নব পল্লব-রক্ত হস্তাং
মুক্তাফল প্রচয়চুম্বিত-চুচুকাগ্রাম্।
অন্তঃস্মিতেন্দুসিত পাণ্ডুর গণ্ডদেশাং,
তাং বল্লভাং রহসি সংবলিতাং স্মরামি ॥

বিদ্যাপক্ষে

অশোক-পল্লব নব সম পাণিতলে।
কুচাগ্র শোভিত হয়েছে মুক্তাফলে ॥
অন্তরে ঈষৎ হাস গণ্ডে বিকসিত।
শরতের চন্দ্র যেন ত্রিলোক-মোহিত ॥
নির্জনেতে বসি করি সদা সম্ভাবনা।
প্রাণাধিকা প্রেয়সীকে নিতান্ত কামনা ॥
তথাপি বিদ্যার নাহি পাই দরশন।
বিদ্যা তন্ত্র মন্ত্র করি ত্যজিব জীবন ॥

দ্বিতীয়ার্থ কালীপক্ষে

রুধির-খর্পূর হস্তে দিবানিশি যার।
রক্তবর্ণ করতল হয়েছে শ্যামার ॥
উচ্চ পয়োধরপরি বান্ধিত কাঁচলী।
হীরক জড়িত হারে শোভে মুক্তাবলী ॥
অন্তরে গভীর হাস্য ঈষদ্ধাস্য কালে।
কিরণে আছয়ে গণ্ড পাণ্ডুবর্ণা ভালে ॥
অন্তর জগতে দেখি আলোক বিরাজে।
কি শোভা প্রকাশে কুলকুণ্ডলিনী মাঝে ॥

ঘনরক্ত সংবলিতা বিশ্বের কারিণী।
নিদানে গর্জনে স্মরি তারে গো তারিণী॥

(চৌরপঞ্চাশৎ, ভারতচন্দ্র, বসুমতী সংস্করণ, পৃঃ ৮)

পূর্বোল্লিখিত এই সব তাবৎ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ওমরের বিদ্রোহ।

*   *

গিয়াসউদ্দীন আবুল ফৎহ্ ওমর ইবন্ ইব্রাহিম অল-খৈয়াম ইরানদেশের নিশাপুর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মদিন কিংবা সন ঠিকমত জানা যায় নি, এমন কি তাঁর মৃত্যুর সনও মোটামুটি ১১২৩ খ্রীষ্টাব্দ বলে ধরে নেওয়া হয়েছে।

খৈয়াম শব্দের অর্থ তাম্বু নির্মাতা। এ ওজনের শব্দ বাঙলায় আরো আছে। 'কত্তাল' থেকে বাঙলা কোতয়াল, এবং 'খম্মার' থেকে 'খোঁয়ারী' (ভাঙা) শব্দ এসেছে। রান্নার মশলা-বিক্রেতা অর্থে বক্কাল শব্দও একদা বাঙলাতে সুপ্রচলিত ছিল—আরবীতে শব্দটির অর্থ 'মুদী' বা 'মশলা-বিক্রেতা'। ত্রিবর্ণের মূল ধাতুতে —যথা 'দ-খ-ল' 'দখল করা' 'ক-ত-ল' 'কোতল করা' দ্বিতীয় ব্যঞ্জনবর্ণকে দ্বিত্ব করে তাতে দীর্ঘ 'আ-কার যোগ করলে যে কর্তাবাচক শব্দ উৎপন্ন হয় তার অর্থ 'ঐ কর্ম সে পুনঃ পুনঃ করে থাকে।' তাই 'খম্মার' অর্থ 'যে ঘন ঘন মদ খায়' (বাঙলায় তাই সে সকালবেলা খম্মারী বা খোঁয়ারী ভাঙে) অর্থাৎ 'পাইকারী মাতাল', ''মদ খাওয়া তার ব্যবসা'। 'কতল' করা যার ব্যবসা সে কোতোয়াল ('কত্তাল'), 'জল্লাদ'ও ঐ অর্থে ব্যবহার হয়। 'খয়য়াম' অর্থ 'যে পুনঃ পুনঃ তাম্বু নির্মাণ করে'—'তাম্বু নির্মাণকারী'। বাঙলায় 'খইআম', 'খইয়াম' বা 'খৈয়াম' লিখলে মোটামুটি মূল উচ্চারণ আসে। অবশ্য 'খ'-র উচ্চারণ বাঙলা মহাপ্রাণ 'খ'র মত নয়—আমরা বিরক্ত হলে যে রকম 'আখ'-এর 'খ' অক্ষরটি উচ্চারণ করে থাকি অর্থাৎ ঘৃষ্ট্য কণ্ঠ্যব্যঞ্জন। স্কচের 'লখ' ও জর্মনের 'বাখ'-এর 'খ'-এর মত। আসামীতে 'অহমিয়া'র 'হ' অনেকটা সেই রকম।

কিন্তু কবি ওমর তাঁবুর ব্যবসা করতেন না। ওটা তাঁর বংশের পদবী মাত্র। আজকের দিনেব কোনো সরকার যে রকম রাইটারস বিল্ডিঙে চীফ সেক্রেটারী (সরকার) নন কিংবা কোনো ঘটকপদবীধারী যে-রকম সমাজে কুলাচার্যের কর্ম করেন না। ওমর কিন্তু তাঁর পরিবারের এই উপাধিটি নিয়ে তিক্ত ব্যঙ্গ করতে ছাড়েন নি—

জ্ঞান-বিজ্ঞান ন্যায়-দর্শন সেলাই করিয়া মেলা
খৈয়াম কত না তাম্বু গড়িল, এখন হয়েছে বেলা

নরককুণ্ডে জ্বলিবার তরে। বিধি-বিধানের কাঁচি
কেটেছে তায়—ঠোক্কর খায়, পথ-প্রান্তের ঢেলা।

(লেখকের এমেচারী অক্ষম অনুবাদে রসিক পাঠক অপরাধ নেবেন না। অন্ত কারো অনুবাদ না পেয়ে বাধ্য হয়ে মাঝে-মধ্যে এ ধরনের 'অনুবাদ' ব্যবহার করতে হয়েছে।)

এস্থলে উল্লেখ প্রয়োজন রুবাঈ জাতীয় শ্লোকে প্রায়শ. প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ ছত্রে মিল থাকে—তৃতীয় ছত্রান্ত স্বাধীন। ইরান আলঙ্কারিকবা বলেন, তৃতীয় ছত্রে মিল না দিলে চতুর্থ ছত্রের শেষ মিলে বেশী ঝোঁক পড়ে এবং শ্লোক সমাপ্তি তার পরিপূর্ণ গাম্ভীর্য ও তীক্ষ্ণতা পায়। কথাটা ঠিক, কারণ আমবাও তেতাল বাজাবাব সময় তৃতীয়ে এসে খানিকটা কারচুপি করলে সম মনকে ধাক্কা দেয় আরো জোরে। পাঠককে এই বেলাই বলে রাখি, তৃতীয় ছত্রে মিলহীন এই জাতীয় শ্লোক পড়ার অভ্যাস করে বাখা ভালো। নইলে নজরুল ইসলামেব ওমর-অনুবাদ পড়ে পাঠক পরিপূর্ণ রসগ্রহণ করতে পাববেন না। কাবণ কাজী আগাগোড়া ক ক খ ক মিলে ওমরেব অনুবাদ করেছেন। কান্তি ঘোষ কবেছেন বাঙলা রীতিতে, অর্থাৎ ক ক খ খ।

ভাগ্যক্রমে ওমরের জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। পাকাপাকি শুধু এইটুকু বলা যেতে পারে যে তিনি গণিতশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডত ছিলেন এবং অবসর কাটাবাব জন্য দৈবেসৈবে চতুষ্পদী লিখতেন·· তার নামে প্রচলিত গজল, মসনবী বা অন্য কোনো শ্রেণীর দীর্ঘতব কবিতা আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। এই-টুকু সংবাদ ছাড়া বাদবাকী কিংবদন্তী। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। যাঁব জন্মেব তারিখ কেন, সন পর্যন্ত জানা নেই, যাঁর পবলোক গমনের সন পর্যন্ত পণ্ডিতদের গবেষণাধীন, তাঁব সম্বন্ধে যে প্রচুর কিংবদন্তী প্রচলিত থাকবে তাতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই।

তবে তিনি যে উত্তম গুরুব কাছে শিক্ষালাভ কবেছিলেন সে-বিষয়ে পণ্ডিতগণ একমত স্মবণ বাখা ভালো যে, ছাপাখানার প্রচলন না হওয়া পর্যন্ত অল্প লোকই গুরুর সাহায্য বিনা উচ্চশিক্ষা লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন।

কথিত আছে, বিখ্যাত পণ্ডিত ইমাম মুওয়াফ্ফকেব কাছে একই সময়ে তিন-জন অসাধারণ মেধাবী ছাত্র শিক্ষালাভ করেন। এঁদেব ভিতব খেলাচ্ছলে চুক্তি হয় যে, এঁদের কোনো একজন পববর্তী জীবনে প্রভাবশালী হতে পারলে তিনি অন্য দু জনকে সাহায্য করবেন। এঁদের একজন কালক্রমে প্রধান মন্ত্রী বা নিজাম-উল্-মুল্ক-এব পদ প্রাপ্ত হন। খবব পেয়ে দ্বিতীয় বন্ধু হাসন বিন্ সব্বাহ তাঁর

কাছে এসে তাঁর পূর্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়ে দিয়ে উচ্চ রাজকর্ম চান। বন্ধুর কৃপায় আশাতীত উচ্চপদ পেয়েও হাসন তাঁকে সরিয়ে নিজে প্রধান মন্ত্রী হবার জন্য ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন। কিন্তু শেষটায় ধরা পড়ে বাদশার হুকুমেই রাজপ্রাসাদ থেকে বহিষ্কৃত হন। হাসন প্রতিশোধ নেবার জন্য এক গুপ্ত প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে গোপন আততায়ী দিয়ে অনেক লোককে হত্যা করিয়ে প্রচুর অর্থ ও প্রতিপত্তি অর্জন করেন। ক্রুসেডের একাধিক খ্রীষ্টান নেতা এইসব গুপ্তঘাতকের হস্তে প্রাণ দেন। এরা ভাঙ জাতীয় এক প্রকার হশীশ্ সেবন করতো বলে এদের নাম হয়েছিল 'হশীশীয়যুন' এবং ইংরিজি 'এ্যাসাসিন'—গুপ্তঘাতক—এই শব্দ থেকেই অর্বাচীন লাতিন তথা ফরাসীর মাধ্যমে এসেছে। অনেকে বলেন, পরবর্তীকালে নিজাম-উল্-মুল্ক যে গুপ্তঘাতকের হস্তে প্রাণ দেন, সেও হাসন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এদের সম্বন্ধে লেখকের 'অবিজিন অব দি খোজা' পুস্তক লেখকের বাল্য রচনা বলে দ্রষ্টব্যের মধ্যে ধর্তব্য নয়।

ওমরকে যখন নিজাম-উল্ মুল্ক উচ্চপদ দিতে চাইলেন তখন তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে নির্জনে অনটনবিহীন জীবনযাপনের সুবিধাটুকু মাত্র চাইলেন এ তো জানা কথা। যে ব্যক্তি স্বর্গ-সুখ বলতে বোঝে,

সেই নিরালা পাতায় ঘেরা বনের ধারে শীতল ছায়,
খাদ্য কিছু, পেয়ালা হাতে, ছন্দ গেঁথে দিনটা যায়।
মৌন ভাঙ্গি মোর পাশেতে গুঞ্জে তব মঞ্জু স্বর—
সেই তো সখি স্বপ্ন আমার, সেই বনানী স্বর্গপুর।

(কান্তি ঘোষ)

কিংবা—

আমার সাথে আসবে যেথায়—দূর সে রেখে শহরগ্রাম
এক ধারেতে মরু তাহার, আর একদিকে শস্প শ্যাম।
বাদশা-নফর নাইকো সেথা—রাজ্য-নীতির চিন্তা-ভার ;
মামুদ শাহ ?—দূরে থেকেই করব তাঁকে নমস্কার।

(কান্তি ঘোষ)

তার রাজপদ নিয়ে কি হবে ? নিজাম-উল্-মুল্ক বিচক্ষণ লোক ছিলেন, বুঝতে পারলেন, ওমরের খ্যাতি-প্রতিপত্তি প্রত্যাখ্যান মৌখিক বিনয় নয় এবং তাঁর জন্য সচ্ছল জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করে দিলেন। কবিও কখনো তাঁর মত পরিবর্তন করেন নি। বস্তুতঃ তাঁর কাব্যের মূল সুর ঐটিই।

কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর ডাক পড়লো রাজদরবারে—পঞ্জিকা সংশোধন করে

দেবার জন্য। ইরানীদের 'নওরোজ' বা নববর্ষ আসে বসন্ত ঋতুতে, কিন্তু বহু শত বৎসর লীপ ইয়ার গোনা হয় নি বলে তখন আর নববর্ষ বসন্ত ঋতুতে আসছিল না। ওমর ঐ কর্মটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করে দিলেন।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে, কবিরূপে যে ব্যক্তি বিশ্বজগতে বিখ্যাত তিনি আসলে ছিলেন বৈজ্ঞানিক। শুধু তাই নয়, ফিটস্‌জেরাল্ডের মাধ্যমে ইয়োরোপে প্রচারিত হবার পূর্বেই ওমরের বিজ্ঞানচর্চা ফ্রান্সে অনূদিত হয়ে সেখানে তাঁর খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। বর্তমান লেখক এসব লেখা দেখবার সুযোগ পায় নি, তাই এনসাইক্লোপিডিয়ার 'কোনিক্ সেক্‌শন' অনুচ্ছেদ থেকে ইয়োরোপে ওমরের বৈজ্ঞানিক যশ সম্বন্ধে উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

"Greek mathematics culminated in Apollonius. Little further advance was possible without new methods and higher points of view. Much later, Arabs and other Muslims absorbed the classical science greedily, it was the Persian poet Omar Khayyam, one of the most prominent mediaeval mathematicians, with his remarkable classification and systematic study of equations, which he emphasized, who blazed the way to the modern union of analysis and geometry. In his "Algebra" he considered the cubic as soluble only by the intersection of conics, and the biquadratic not at all."

শেষ ছত্রটির বাঙলায় অনুবাদ মূল ইংরিজি, এমন কি আধুনিক বাঙলা কবিতার চেয়েও শক্ত হয়ে যাবে বলে গোটা টুকরোটাই অতি অনিচ্ছায় ইংরিজিতেই রেখে দিতে বাধ্য হলুম। বৈজ্ঞানিক পাঠক বিনা অনুবাদেই এটি বুঝতে পারবেন, প্রাঞ্জল অনুবাদেও আমাদের মত অবৈজ্ঞানিকেব কোনো লাভ হবে না।

ইরানের অধিকাংশ গুণীই একমত যে, ওমর তাঁর জীবনের প্রায় সব সময়টুকুই কাটিয়েছেন বিজ্ঞানচর্চায় এবং অতি অল্প সামান্য সময় 'নষ্ট' করেছেন কাব্যলক্ষ্মীর আরাধনায়। তাই দীর্ঘ কবিতা লেখবার ফুরসৎ তাঁর হয়ে ওঠে নি—এমন কি রুবাঈগুলোও গীতিরস দিয়ে সরস করবার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন নি।

গণিত এবং বিশেষ করে জ্যোতিষচর্চার ফল ওমরের কাব্যে পদে পদে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ গ্রহ-নক্ষত্র যে অলঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক নিয়মে চলে তার থেকেই তিনি দৃঢ় মীমাংসায় উপনীত হন যে, মানুষেরও কোনো প্রকারের স্বাধীনতা নেই, তার

কর্মপদ্ধতি স্বেচ্ছায় নিয়ন্ত্রণ করার কোনো অধিকারই সে পায় নি। তাই—

প্রথম মাটিতে গড়া হয়ে গেছে শেষ মানুষের কায়
শেষ নবান্ন হবে যে ধান্যে তারো বীজ আছে তায়।
সৃষ্টির সেই আদিম প্রভাতে লিখে রেখে গেছে তাই,
বিচার-কর্ত্রী প্রলয় রাত্রি পাঠ যা করিবে ভাই।

(সত্যেন দত্ত)

পৃথ্বী হ'তে দিলাম পাড়ি, নভঃগেহে মনটা লীন—
সপ্ত-ঋষি যেথায় বসি ঘুমিয়ে কাটান রাত্রি দিন।
বিদ্যাটা মোর উঠলো ফেঁপে কাটলো কত ধাঁধার ঘোর—
মৃত্যুটা আর ভাগ্যলিখন—ওইখানে গোল রইল মোর।

(কান্তি ঘোষ)

কিন্তু এস্থলে আমি ওমর-কাব্যের মল্লিনাথ হবার দুরাশা নিয়ে পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত হই নি। ওমরের নামে প্রচলিত প্রায় ছ'শ'টি রুবাইয়াৎ ইরানী বটতলাতেও পাওয়া যায়—পার্টিশনের পূর্বে কলকাতার ফার্সী বটতলা তালতলা অঞ্চলেও পাওয়া যেত। তার অতি অল্পই অনুবাদ করেছেন ফিটস্‌জেরাল্ড এবং সেই ছ'শ'র কটি কবিতা ওমরের নিজস্ব, তাই নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বাক্‌-বিতণ্ডা এখনো শেষ হয় নি—আমার বিশ্বাস কখনো হবে না। সেই ছ'শ' চতুষ্পদীর টীকা পড়ার উৎসাহ ও ধৈর্য রসিকজনের থাকাব কথা নয়—পণ্ডিতের থাকতে পারে। আমি রসিকের সেবা করি।

তাই আমিও ওমরের সামান্যতম ঐতিহাসিক পটভূমি নির্মাণ করার চেষ্টা করছি এবং তাও শুধু ওমরের বিদ্রোহী মনোভাব দেখাবার জন্য—কারণ ঐখানেই নজরুল ইসলামের সঙ্গে তিনি সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন।

ওমরের প্রধান বিদ্রোহ ধর্মগুরুদের বিরুদ্ধে :—

খা'জা! তোমার দরবারে মোর একটি শুধু আর্জি এই
থামাও উপদেশের ঘটা, মুক্তি আমার এই পথেই।
দৃষ্টি-দোষে দেখছ বাঁকা আমার সোজা সরল পথ,
আমায় ছেড়ে ভালো করো, ঝাপসা তোমার চক্ষুকেই।

(কাজী সাহেবের অনুবাদ)

O master! grant us only this, we prithee;
Preach not! But mutely guide to bliss,
we prithee!

"We walk not straight"—Nay,
it is thou who squintest !
Go, heal thy sight, and leave us in peace,
we prithee !

(কার্ণের অনুবাদ)

পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক রাজা-রাজড়ার শৌর্যবীর্য নিয়ে যে সব কবি ফিরদৌসীর ন্যায় আস্ফালন করে বর্তমানের আনন্দকে অবহেলা করতেন তাঁদের সম্বন্ধে বলছেন—

ভাগ্য-লিপি মিথ্যা সে নয়—ফুরোয় যা' তা ফুরিয়ে যাক্,
কৈকোবাদ আর কৈখ্‌সরুর ইতিহাসের নামটা থাক।
রুস্তম আর হাতেম-তায়ের কল্পকথা—স্মৃতির ফাঁস—
সে-সব খেয়াল ঘুচিয়ে দিয়ে আজকে এস আমার পাশ।

(কান্তি ঘোষ)

দরবেশ-সুফীরা করতেন কৃচ্ছ্রসাধন এবং যোগচর্চা। পূর্বেই নিবেদন করেছি, তাঁরা নৃত্যের সঙ্গে চিৎকার করতেন নাম-জপ, তাঁদের বিশ্বাস, ঐ করেই ভগবদ্-প্রেম এবং চরম মোক্ষ পাওয়া যায়।

দ্রাক্ষালতার শিকড় সেটি তার না জানি কতই গুণ—
জড়িয়ে আছেন অস্থিতে মোর দরবেশী সাঁই যাই বলুন—
গগনভেদী চীৎকারে তাঁর খুলবে নাকো মুক্তিদ্বার,
অস্থিতে এই মিলবে যে খোঁজ সেই দুয়ারের কুঞ্চিকার।

(কান্তি ঘোষ)

কিন্তু সব চেয়ে বেশী চতুষ্পদী তিনি রচনা করেছেন দার্শনিক এবং পণ্ডিতদের বিরুদ্ধে। সেখানে তিনি জ্যোতির্বিদ ওমরকেও বাদ দেন নি।

অস্তি-নাস্তি শেষ করেছি, দার্শনিকের গভীর জ্ঞান
বীজগণিতের সূত্র-রেখা যৌবনে মোর ছিলই ধ্যান,
বিদ্যারসে যতই ডুবি, মনটা জানে মনে (মানে ?) স্থির—
দ্রাক্ষারসের জ্ঞানটা ছাড়া রসজ্ঞানে নেই গভীর।

অর্থহীন, অর্থহীন, সমস্তই অর্থহীন। তাই ওমরের বার বার কাতর রোদন, দরদী ফরিয়াদ—

হেথায় আমার আসাতে প্রভু হন নি তো লাভবান
চলে যাবো যবে হবেন না তিনি কোনো মতে গরীয়ান।

এ কর্ণে আমি শুনি নি তো কভু কোনো মানবের কাছে
এই আসা-যাওয়া কি এর অর্থ—খামখা পোড়েন টান।

(লেখক)

তাই ওমরের শেষ মীমাংসা—একবার মরে যাবার পর তুমি আর এখানে ফিরে আসবে না। অতএব যতটুকু পাবো, যতক্ষণ পাবো দর্শন-বিজ্ঞান-সাঁই-সুফীদের ভুলে গিয়ে সাকী সুরা নিয়ে নির্জন কোণে আনন্দ করো।

মৃত্যু আসিয়া মস্তকে মোর আঘাত করার আগে
লে আও শরাব—লাও ঝটপট—রাঙানো গোলাপী রাগে।
হায়রে মূর্খ! সোনা দিয়ে মাজা তোর কি শরীর খানা—?
গোরা হয়ে গেলে ফের খুঁড়ে নেবে—? ও ছাই কি কাজে লাগে।

(লেখক)

কিন্তু একটা জিনিস ভুল করলে চলবে না। ওমর খাঁটি চার্বাকপন্থী এবং ঐ জাতীয় লোকায়তীদের মত নন। 'ঋণ ক'রে ঘি খাও, কারণ দেহ ভস্মীভূত হলে ঋণ তো আর শোধ করতে হবে না', অর্থাৎ ইহসংসারে কিংবা পরলোকে অন্য কারো প্রতি তোমার কোনো নৈতিক দায়িত্ব—মরাল রেসপনসিবিলিটি নেই—এ তত্ত্বেও ওমর বিশ্বাস করতেন না। তাই তাঁর একমাত্র উপদেশ—

কারুর প্রাণে দুখ্ দিও না, করো বরং হাজার পাপ,
পরের মনে শান্তি নাশি বাড়িও না আর মনস্তাপ।
অমর-আশিস্ লাভের আশা রয় যদি, হে বন্ধু মোর,
আপনি স'য়ে ব্যথা, মুছো পরের বুকের ব্যথার ছাপ।

(নজরুল ইসলাম)

গুণীরা বলেন, 'কুরানই কুরানের সর্বশ্রেষ্ঠ টীকা।' তরুণদের আমি প্রায়ই বলি, 'রবীন্দ্রনাথের রচনাই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ টীকা—ঐ কাব্যই বার বার অধ্যয়ন করো, অন্য টীকার প্রয়োজন নাই।' ওমরই ওমরের সর্বশ্রেষ্ঠ মল্লিনাথ এবং কাজীর অনুবাদ সকল অনুবাদের কাজী।

ত্রিমূর্তি (চাচা-কাহিনী)

বার্লিন শহরের উলাণ্ড স্ট্রীটের উপর ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে 'হিন্দুস্থান হৌস' নামে একটি রেস্তোরাঁ জন্ম নেয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর যা স্বভাব, রেস্তোরাঁর সুদূরতম কোণে একটি আড্ডা বসে যায়। আড্ডার চক্রবর্তী ছিলেন চাচা—

বরিশালের খাজা বাঙাল মুসলমান—আর চেলারা গোসাই, মুখুয্যে, সরকার, রায় এবং চ্যাংড়া গোলাম মৌলা, এই ক'জন।

চাচার ন্যাওটা শিষ্য গোসাই বললেন, 'যা বলো, যা কও, চাচা না থাকলে আমাদের আড্ডাটা কি রকম যেন দড়কচ্চা মেরে যায়। তা বলুন, চাচা, দেশের—না, ত্যাশের—খবর কি? কি খেলেন, কি দেখলেন, বেবাক কথা খুলে কন।'

চাচা বরিশাল গিয়েছিলেন। তিন মাস পরে ফিরে এসেছেন। বললেন, 'কি খেলুম? কই মাছ—এক-একটা ইলিশ মাছের সাইজ, ইলিশ মাছ—এক-একটা তিমি মাছের সাইজ, আর তিমি মাছ—তা সে দেখি নি। তবে বোধ হয়, তাবৎ বাখরগঞ্জ ডিস্‌টিকটাই তারই একটাব পিঠের উপর ভাসছে। ঐ যেরকম সিন্দবাদ তিমির পিঠটাকে চব ভেবে তারই পিঠের উপর রশুই চড়িয়েছিল।'

বাকি কথা শেষ হওয়ার পূর্বে সকলের দৃষ্টি চলে গেল দোরের দিকে দুটি জর্মন চ্যাংড়া একটি চিংড়িকে নিয়ে রেস্তোরাঁয় ঢুকল। ভারতীয় রান্নার ঝালের দাপটে জর্মনরা সচরাচর হিন্দুস্থান হৌসে আসতো না। পাড়ার জর্মনরা তো আমাদের লঙ্কা-ফোঁড়ন চড়লে পয়লা বিশ্বযুদ্ধেব ডিসপোজেলেব গ্যাস-মাস্‌ক পরতো। তবে দু'একজন যে একেবারেই আসতো না তা নয়—'ইণ্ডিশে রাইস-কুরি' অর্থাৎ ভারতীয় ঝোল ভাতেব খুশবাই জর্মনি হাঙ্গেরি সর্বত্রই কিছু কিছু পাওয়া যায়।

আলতো ভাবে ওদের উপব একটা নজব বুলিয়ে নিয়ে আড্ডা পুনরায় চাচার দিকে তাকাল। চাচা বললেন, 'থাইছে! আবার সেই ইটারনেল্ ট্রায়েঙ্গল্।'

পাইকিরি বিয়ার খেকো সুয্যি বায় বললে, 'চাচা হরবকতই ট্রায়েঙ্গল্ দেখেন। এ যেন ঘামের ফোঁটাতে কুমীর দেখা। দ্য ত্রো নিয়ে কি কেউ কখনো বেরয় না?'

রায়ের গ্রাম সম্পর্কে ভাগ্নে, সতেবো বছরেব চ্যাংডা সদস্য লাজুক গোলাম মৌলা শুধালে, 'মামু, দ্য ত্রো কাবে কয়?'

রায় বললেন, 'পই পই কবে বলেছি ফরাসী শিখতে, তা শিখবি নি। ডি, ই ঋ, টি, আর, ও, পি ত্রো—পি সাইলেণ্ট। অর্থাৎ একজন অনাবশ্যক বেশী—One too many। এই মনে কর্, তুই যদি তোর ফিয়াঁসেকে—এ কথাটাও বোঝাতে হবে নাকি?—নিয়ে বেরোস আর আমি খোদার-খামোখা তোদের সঙ্গে জুটে যাই, তবে আমি দ্য ত্রো। বুঝলি?'

গোলাম মৌলা মাথা নিচু করে সেই বার্লিনের শীতে বরাব্বর লজ্জায় ঘামতে

লাগলো।

আড্ডার লটবর লেডি-কিলার পুলিন সরকার মৌলাকে ধমক দিয়ে বললে, 'তুই লজ্জা পাচ্ছিস কেন রে বুড়বক্? লজ্জা পাবেন রায়। ডাণ্ডা-গুলি খেলার সময় গুলিকে ভয় দেখাস্ নি ডাণ্ডাকে না ছোঁবার জন্য? তখন কি বলিস? 'ভাগ্নে-বৌ তুয়ারে—কোণা কেটে ফালদি যা।' বরঞ্চ সুয্যি রায় যদি তাঁর ম্যাডামকে নিয়ে বেরোন, আর তুই যদি সঙ্গে জুটে যাস, তবু কিন্তু তুই স্ত্রো নস্। রাধা কেষ্টর কি হন জানিস তো?'

গোলাম মৌলা এবারে লজ্জায় জল না হয়ে একেবারে পানি।

গোসাঁই বললেন, 'চাচা, আপনি কিন্তু যেভাবে ঘন ঘন মাথা দোলাচ্ছেন তাতে মনে হচ্ছে, আপনি একদম শোয়ার, এ হচ্ছে তুটো-ফুনো একটা-মেনীর ব্যাপার। তা কি কখনো হওয়া যায়?'

চাচা বললেন, 'যায়, যায়, যায়। আকছারই যায়। অবশ্য প্র্যাক্‌টিস থাকলে।'

আড্ডা সমস্বরে বললে, 'প্র্যাক্‌টিস!'

চাচা বললেন, 'হঁ। এবারে দেশে যাবার সময় জাহাজে হয়েছে।'

গল্পের গন্ধ পেয়ে আড্ডা আসন জমিয়ে বললে, 'ছাড়ুন, চাচা।'

চাচা বললেন, 'এবার দেখি, জাহাজ ভর্তি ইহুদির পাল। জর্মনি, অস্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া থেকে ঝেঁটাই করে সবাই যাচ্ছে শাংহাই। সেখানে যেতে নাকি ভিজার প্রয়োজন হয় না। কি করে টের পেয়েছে, এবারে হিটলার দাবড়াতে আরম্ভ করলে নেবুকাডনাজাবের বেবিলোনিয়ান ক্যাপটিভিটি নয়, এবারে স্রেফ কচু-কাটার পালা। তাই শাংহাই হয়ে গেছে ওদের ল্যাণ্ড অব মিল্ক্ এণ্ড হানি, ননীমধুর দেশ।

আমার ডেক-চেয়ারটা ছিল নিচের তলা থেকে ওঠার সিঁড়ির মুখের কাছে। ডাইনে এক বুড়ো ইহুদি আর বাঁয়ে এক ফরাসী উকিল। ইহুদি ভিয়েনার লোক, মাতৃভাষা জর্মন, ফরাসী জানে না। আর ফরাসী উকিল জর্মন জানে না, সে তো জানা কথা। ফরাসী ভাষা ছাড়া পৃথিবীতে অন্য ভাষা চালু আছে সে তত্ত্ব জাহাজে উঠে সে এই প্রথম আবিষ্কার করলে। এতদিন তার বিশ্বাস ছিল, পৃথিবীর আর সর্বত্র ভাঙা-ভাঙা ফরাসী, পিজিন ফ্রেঞ্চই চলে -বিদেশীরা প্যারিসে এলে যে রকম টুকিটাকি ফরাসী বলে ঐ রকম আর কি।

তিনজনাতে তিনখানা বই পড়ার ভান করে এক একবার সিঁড়ি দিয়ে উঠনে-

ওলা নামলে-ওলা চিড়িয়াগুলোর দিকে তাকাই, তারপর বইয়ের দিকে নজর ফিরিয়ে আপন আপন সুচিন্তিত মন্তব্য প্রকাশ করি।

একটি মধ্যবয়স্কা উঠলেন। জর্মন ইহুদি বললে, 'হাল্‌ব্‌-উন্‌ট্‌হাল্‌ব্‌—অর্থাৎ হাফাহাফি।' ফরাসী বললে, 'অঁ প্যো আঁসিয়েন্‌—একটুখানি এনশেন্ট।' জর্মন আমাকে শুধালে, 'ফ্রেঞ্চি কি বললে?' আমি অনুবাদ করলুম। জর্মন বললে, 'চল্লিশ, পঁয়তাল্লিশ হবে। তা আর এমন কি বয়স—নিষ্‌ট্‌ ভার—নয় কি?' ফরাসী আমাকে শুধালে, 'ক্যাস্‌ কিল দি—কি বললে ও?' উত্তর শুনে বললে, 'মঁ দিয়ো—ইয়াল্লা—চল্লিশ আবার বয়স নয়! একটা কেথীড্রেলের পক্ষে অবশ্য নয়। কিন্তু মেয়েছেলে, ছোঃ!'

এমন সময় হঠাৎ একসঙ্গে তিনজনের তিনখানা বই ঠাস করে আপন উরুতে পড়ে গেল। কোর্ট মার্শালের সময় যে রকম দশটা বন্দুক এক ঝটকায় গুলি ছোঁড়ে। কি ব্যাপার? দেখ্‌তো না গ্যাখ্‌, সিঁড়ি দিয়ে উঠলো এক তরুণী!

সে কী চেহারা! এ রকম রমণী দেখেই ভারতচন্দ্রের মুণ্ডুটি ঘুরে যায় আর মানুষে দেবতাতে ঘুলিয়ে ফেলে বলেছিলেন, 'এ তো মেয়ে মেয়ে নয়, দেবতা নিশ্চয়।'

ইটালির গোলাপী মার্বেল দিয়ে কোদা মুখখানি, যেন কাজল দিয়ে আঁকা দুটি ভুরুর জোড়া পাখিটি গোলাপী আকাশে ডানা মেলেছে, চোখ দুটি সমুদ্রের ফেনার উপর বসানো দুটি উজ্জ্বল নীলমণি, নাকটি যেন নন্দলালের আঁকা সতী অপর্ণার আবক্ররেখা মুখের সৌন্দর্যকে দু'ভাগ করে দিয়েছে, ঠোঁট দুটিতে লেগেছে গোলাপ ফুলের পাপড়িতে যেন প্রথম বসন্তের মৃদু পবনের ক্ষীণ শিহরণ।'

চাচা বললেন, 'তা সে যাক্‌ গে। আমার বয়েস হয়েছে। তোদের সামনে সব কথা বলতে বাধো বাধো ঠেকে। কিন্তু সত্যি বলতে কি, অপূর্ব, অপূর্ব।'

দেখেই বোঝা যায়, ইহুদি—প্রাচ্য প্রতীচ্য উভয় সৌন্দর্যের অদ্ভুত সম্মেলন।

জর্মন এবং ফরাসী দুজনাই চুপ। আম্মো।

আর সঙ্গে সঙ্গে দুটি ছোকরা জাহাজের দু'প্রান্ত থেকে চুম্বকে টানা লোহার মত তার গায়ের দু'দিকে যেন সেঁটে গেল। স্পষ্ট বোঝা গেল, এতক্ষণ ধরে দু'জনাই তার পদধ্বনির প্রতীক্ষায় ছিল।

জাহাজে প্রথম দু'একদিন ঠিক আঁচা যায় না, শেষ পর্যন্ত কার সঙ্গে কার পাকাপাকি দোস্তী হবে। কোন মসিয়ো কোন্‌ মাদ্‌মোয়াজেলের পাল্লায় পড়বেন, কোন্‌ হ্যার্‌ কোন্‌ ফ্রাউ বা ফ্রলাইনের প্রেমে হাবুডুবু খাবেন, কোন্‌ মিসিস কোন্‌ মিস্টারের সঙ্গে রাত তেরোটা অবধি খোলা ডেকে গোপন প্রেমালাপ করবেন।

এ তিনটির বেলা কিন্তু সবাই বুঝে গেল এটা ইটার্নল্ ট্রায়েঙ্গল। আমি অবশ্য গোঁসাইয়ের মত প্রথমটায় ভাবলুম, হার্মলেস ব্যাপারও হতে পারে।

মেয়েটা ফরাসিস, ছেলে দুটোর একটা মারাঠা, আরেকটা গুজরাতি বেনে! প্যারিস থেকেই নাকি রঙ্গরস আরম্ভ হয়েছে। বোম্বাই অবধি গড়াবে। উপস্থিত কিন্তু আমাদের তিনজনারই মনে প্রশ্ন জাগলো, আখেরে জিতবে কে?

শুনেছি, এহেন অবস্থায় দুজনাই স্পানিয়ার্ড হলে ডুয়েল লড়ে, ইতালীয় হলে একজন আত্মহত্যা করে, ইংরেজ হলে নাকি একজন অন্যকে গম্ভীর ভাবে টিক বাও করে দু'দিকে চলে যায়, ফরাসী হলে নাকি ভাগাভাগি করে নেয়।

প্রথম ধাক্কাতেই গুজরাতি গেলেন হেরে। মারাঠারা চালাকি করে ডবল পয়সা খর্চা করে দু'খানি ডেক-চেয়ার ভাড়া করে রেখেছিল পাশাপাশি। বেনের মাথায় এ বুদ্ধিটা খেললো না কেন আমরা বুঝে উঠতে পারলুম না। মারাঠা নটবর সেই হুরীকে নিয়ে গেল জোড়া ডেক-চেয়ারের দিকে—স্যর ওয়ালটর রেলে যে রকম রানী ইলিজাবেথকে কাদার উপর আপন জোব্বা ফেলে দিয়ে হাত ধরে ওপারের পেভমেণ্টে নিয়ে গিয়েছিলেন।

দু'জনা লম্বা হলেন দুই ডেক-চেয়ারে। বেনেটা ক্যাবলাকান্তের মত সামনে দাঁড়িয়ে খানিকটা কাঁই-কুঁই করে কেটে পড়লো।

আমার পাশের ফরাসী বললে, 'ইডিয়ট!' জর্মন শুনে বললে, 'নাইন, আখেরে জিতবে বেনে।' 'এঁ্যাপসিব্ল্!' 'বেট্!' 'বেট্!' 'পাঁচ শিলিঙ?' 'পাঁচ শিলিঙ!'

আড্ডার দিকে ভালো করে একবার তাকিয়ে নিয়ে চাচা বললেন, 'বিশ্বাস করো আর নাই করো, আস্তে আস্তে জাহাজের সবাই লেগে গেল এই বাজি ধরাধরিতে। বুকিরও অভাব হল না। আর সে বেট্ কী অদ্ভুত ফ্লাকচুয়েট করে। কোনোদিন ভোরে এসে দেখি জর্মনটা গুম্ হয়ে বসে আছে—যেন জাহাজ একটা কনসান্ট্রেশন ক্যাম্প—আর ফরাসীটা উল্লাসে ত্রিং ত্রিং করে পল্কা নাচ নাচছে। ব্যাপার কি? পাকা খবর মিলেছে, আমাদের পরীটি কাল রাত দু'টো অবধি মারাঠার সঙ্গে গুজুর-গুজুর করেছেন। বেনে মনের খেদে এগারো-টাতেই কেবিন নেয়। ফরাসী এখন সক্কলের গায়ে পড়ে থ্রি টু ওয়ান্ অফার করছে। সে জিতলে পাবে কুল্লে এক শিলিং, হারলে দেবে তিন শিলিং। নাও, বোঝ ঠ্যালা! আর কোনোদিন বা খবর রটে, বেনের পো জাহাজের ক্যাম্বিসের চৌবাচ্চায় হুরীর সঙ্গে দু'ঘণ্টা সাঁতার কেটেছে—মারাঠা জলকে ভীষণ ডরায়। ব্যস্, সেদিন বেনের স্টক স্কাই হাই!

ইতিমধ্যে একদিন বেনের বাজার যখন বড্ড ঢিলে যাচ্ছে তখন ঘটলো এক নবীন কাণ্ড। হুরী ও মারাঠা তো বসতো পাশাপাশি কিন্তু লাইনের সর্বশেষে নয় বলে হুরীর অন্য পাশে বসতো এক অতিশয় গোবেচারা ভালো মানুষ নিগ্রো পাদ্রী। সে গিয়ে তার ডেক-চেয়ারের সঙ্গে বেনের ডেক-চেয়ারের বদলাবদলির প্রস্তাব করেছে। বেনে নাকি উল্লাসে ইয়াল্লা বলে আকাশ-ছোঁয়া লম্ফ মেরেছিল। বেটিঙের বাজার আবার স্টেডি হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে প্রশ্ন উঠলো, এ বেটিঙের শেষ ফৈসালা হবে কি প্রকারে? বহু বাক্-বিতণ্ডার পর স্থির হল, যেদিন হুরী মারাঠা কিংবা বেনের সঙ্গে তার কেবিনে ঢুকবেন সেদিন হবে শেষ ফৈসালা। যার সঙ্গে ঢুকবেন তার হবে জিত।

দু'একজন রুচিবাগীশ আপত্তি করেছিলেন কিন্তু ফরাসী উকিল হাত-পা চোখ-মুখ নেড়ে বুঝিয়ে দিল, 'C'est, c'est, এটা, এটা হচ্ছে একটা লিগাল ডিসিশন, একটা আইনত ন্যায্য হক্কের ফৈসালা। ঢলাঢলির কোনো কথাই হচ্ছে না।'

রেসের বাজি তখন চরমে। কখনো বেনে, কখনো মারাঠা। সেই যে চণ্ডুখোর গল্প বলেছিল, পাখিকে গুলি মেরে সঙ্গে সঙ্গে শিকারী কুকুরকেও দিয়েছে লেলিয়ে। তখন বুলেটে কুকুরে কী রেস্—কভী কুত্তা, কভী গুলি, কভী গুলি, কভী কুত্তা।

এমন সময় আদন বন্দর পেরিয়ে আমরা ঢুকলুম আরব সাগরে। আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আঠেরো হাজার টনের জাহাজকে মারলে মৌসুমী হাওয়া তার বাইশ হাজারি টনের থাবড়া। জাহাজ উঠলো নাগর বেনাগব সবাইকে নিয়ে নাগরদোলায়। আর সঙ্গে সঙ্গে সী সিক্‌নেস! বমি আর বমি! প্রথম ধাক্কাতেই মারাঠা হল ঘায়েল। রেলিঙ ধরে পেটেব নাড়ি-ভুঁড়ি বের করার চেষ্টা দিয়ে টলতে টলতে চলে গেল কেবিনে। বেনেব মুখে শুকনো হাসি, কিন্তু তিনিও আরাম বোধ করছেন না। পরদিন সমুদ্র ধরলো রুদ্রতর মূর্তি। এবারে হুরী পড়ে রইলেন একা। তাঁর মুখও হরতালের মত হলদে। তার পরের দিন ডেক প্রায় সাফ। নিতান্ত বরিশালের পানি-জলের প্রাণী বলে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে কোনোগতিকে আমি টিঁকে আছি আর কি! খাবার সময় পেটে যা যায় সে-সব রিটার্ন টিকিট নিয়ে মোকামে পৌছবার আগেই ফিরি ফিরি করছে। হুরী নিতান্ত একা বলে ফরাসী বন্ধু তাকে আদর করে ডেকে এনে আমাদের পাশে বসালে।

সে রাত্রে জাহাজ খেলো ঝড়ের মোক্ষমতম থাবড়া। ফরাসী গায়েব। হুরী এই প্রথম ছুটে গিয়ে ধরলো রেলিঙ। আমিও এই যাই কি তেই যাই। তবু

ধরলুম গিয়ে তাকে। হুরী ক্ষীণকণ্ঠে বললে, "কেবিন।" আমি ধরে ধরে কোনোগতিকে তাকে তার কেবিনের দিকে নিয়ে চললুম। দুজনাই টলটলায়মান। আমার কেবিনের সামনে পৌঁছতেই ঝড়ের আরেক ধাক্কায় খুলে গেল আমার কেবিনের দরজা। ছিটকে পড়লুম দুজনাই ভিতরে। কি আর করি? তাকে তুলে ধরে প্রথম বিছানায় শোয়ালুম। তারপর কেবিন-বয়কে ডেকে দু'জনাতে মিলে তাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে গেলুম তার কেবিনে। বাপ্‌স্‌!'

চাচা থামলেন। একদম থেমে গেলেন।

আড্ডায় সবাই একবাক্যে শুধালে, 'তারপর?'

চাচা বললেন, 'কচু, তারপর আর কি?'

তবু সবাই শুধায়, 'তারপর?'

চাচা বললেন, 'এ তো বড় গেরো। তোরা কি ক্লাইমেক্‌স্‌ বুঝিস নে? আচ্ছা, বলছি। ভোর হতেই বোম্বাই পৌঁছলুম। ডেকে যাওয়া মাত্রই সবাই আমাকে জাবড়ে ধরে কেউ বলেফেলিসিতাসিয়োঁ, মসিয়ো, কেউ বলে কন্‌গ্রাচুলেশনস্‌, কেউ বলে গ্রাতুলিয়েরে—তুচ্ছাই, এ-সব কি? কিন্তু কেউ কিচ্ছুটি বুঝিয়ে বলে না।'

শেষটায় ফরাসী উকিলটা বললে, 'আ মসিয়ো, কী কেরদানিটাই না দেখালে। ওস্তাদের মার শেষ রাতে। মহারাষ্ট্র গুজরাত দু'জনাই হার মানলে। জিতলে বেঙ্গল। ভিভ্‌ ল্য বাঁগাল। লং লিভ বেঙল।'

'আমি যতই আপত্তি করি কেউ কোনো কথা শোনে না।

আর শুধু কি তাই? ব্যাটারা সবাই আপন আপন বাজির টাকা ফেরত পেল—বেনে কিংবা মারাঠা কেউ জেতে নি বলে। কিন্তু আমার দশ শিলিং স্রেফ, বেপরোয়া, মেরে দিলে। বলে কি না, আমি যখন ঘোড়ায় চড়ে জিতেছি, আমার বাজি ধরার হক নেই। টাকাটা নাকি তছরুপ হয়ে যায়।'

খানিকক্ষণ চুপ থেকে চাচা বললেন, 'কিন্তু সেই থেকে আমার চোখ বলে দিতে পারে ইটার্নেল ট্রায়েঙ্গল কোথায়।'

এমন সময় সেই দুই জর্মন ছোকরায় লেগে গেল মারামারি। সেটা থামাতে গিয়ে আড্ডা সেদিন ভঙ্গ হল।

মামদোর পুনর্জন্ম

সংস্কৃত ভাষা আত্মনির্ভরশীল। কোনো নূতন চিন্তা, অনুভূতি কিংবা বস্তুর জন্য নবীন শব্দের প্রয়োজন হলে সংস্কৃত ধার করার কথা না ভেবে আপন ভাণ্ডারে অনুসন্ধান করে, এমন কোনো ধাতু বা শব্দ সেখানে আছে কি না যার সামান্য অদল বদল করে কিংবা পুরনো ধাতু দিয়ে নবীন শব্দটি নির্মাণ করা যায় কি না। তার অর্থ অবশ্য এ নয় যে, সংস্কৃত কস্মিনকালেও বিদেশী কোনো শব্দ গ্রহণ করে নি। নিয়েছে, কিন্তু তার পরিমাণ এতই মুষ্টিমেয় যে, সংস্কৃতকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাষা বলাতে কারো কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়।

প্রাচীন যুগের সব ভাষাই তাই। হীব্রু, গ্রীক, আবেস্তা এবং ঈষৎ পরবর্তী যুগের আরবীও আত্মনির্ভরশীল এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বয়ংসম্পূর্ণ।

বর্তমান যুগের ইংরিজি ও বাঙলা আত্মনিভবশীল নয়। আমরা প্রয়োজন মত এবং অপ্রয়োজনেও ভিন্ন ভিন্ন ভাষা থেকে শব্দ নিয়েছি এবং নিচ্ছি। পাঠান-মোগল যুগে আইন-আদালত খাজনা-খারিজ নূতনরূপে দেখা দিল ব'লে আমরা আরবী ও ফার্সী থেকে প্রচুব শব্দ গ্রহণ কবেছি। পরবর্তী যুগে ইংরিজি থেকে এবং ইংরিজির মারফতে অন্যান্য ভাষা থেকে নিযেছি এবং নিচ্ছি।

বিদেশী শব্দ নেওয়া ভালো না মন্দ সে প্রশ্ন অবান্তব। নিয়েছি, এবং এখনো সজ্ঞানে আপন খুশীতে নিচ্ছি এবং শিক্ষাব মাধ্যমরূপে ইংবজিকে বর্জন করে বাঙলা নেওয়াব পব যে আরো প্রচুর ইউরোপীয় শব্দ আমাদের ভাষায় ঢুকবে, সে সম্বন্ধেও কারো কোনো সন্দেহ নেই। আলু-কপি আজ রান্নাঘর থেকে তাড়ানো মুশকিল, বিলিতি ওষুধ প্রায় সকলেই খান, ভবিষ্যতে আরো নূতন নূতন ওষুধ খাবেন বলেই মনে হয়। এই দুই বিদেশী বস্তুব ন্যায় আমাদের ভাষাতেও বিদেশী শব্দ থেকে যাবে, নূতন আমদানিও বন্ধ করা যাবে না।

পৃথিবীতে কোনো জিনিসই সম্পূর্ণ অসম্ভব নয়। অন্তত চেষ্টা কবাটা অসম্ভব নাও হতে পারে। হিন্দী উপস্থিত সেই চেষ্টাটা কবছেন—বহু সাহিত্যিক উঠে পড়ে লেগেছেন, হিন্দী থেকে আরবী, ফার্সী এবং ইংবিজী শব্দ তাড়িয়ে দেবাব জন্য। চেষ্টাটার ফল আমি হয়তো দেখে যেতে পাববো না। আমাব তরুণ পাঠকেরা নিশ্চয়ই দেখে যাবেন। ফল যদি ভালো হয় তখন তাঁবা না হয় চেষ্টা কবে দেখবেন। (বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ স্বচ্ছন্দে লিখেছেন, 'আব্রু দিয়ে, ইজ্‌জৎ দিয়ে, ইমান দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে।' নজরুল ইসলাম 'ইনকিলাব',—'ইনক্লাব' নয়—এবং 'শহীদ' শব্দ বাঙলায় ঢুকিয়ে গিয়েছেন। বিদ্যাসাগর 'সাধু' রচনায় বিদেশী শব্দ ব্যবহার করতেন না, বেনামীতে লেখা 'অসাধু' রচনায় চুটিয়ে

আরবী-ফার্সী ব্যবহার করতেন। আর অতিশয় নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ৺হরপ্রসাদ আরবী-ফার্সী শব্দের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা 'আহাম্মুখী' বলে মনে করতেন। 'আলাল' ও 'হুতোম'-এর ভাষা বিশেষ উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছিল ; সাধারণ বাঙলা এ-স্রোতে গা ঢেলে দেবে না ব'লে তার উল্লেখ এস্থলে নিষ্প্রয়োজন এবং হিন্দীর বঙ্কিম স্বয়ং প্রেমচন্দ্র হিন্দীতে বিস্তর আরবী-ফার্সী ব্যবহার করছেন।)

এস্থলে আরেকটি কথা বলে রাখা ভালো। রচনার ভাষা তার বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে। শঙ্করদর্শনের আলোচনায় ভাষা সংস্কৃতশব্দবহুল হবেই, পক্ষান্তরে মোগলাই রেস্তোরাঁর বর্ণনাতে ভাষা অনেকখানি 'হুতোম'-ঘ্যাঁষা হয়ে যেতে বাধ্য। 'বসুমতী'র সম্পাদকীয় রচনার ভাষা এক—তাতে আছে গাম্ভীর্য, 'বাঁকা চোখে'র ভাষা ভিন্ন—তাতে থাকে চটুলতা।

* *

বাঙলায় যে সব বিদেশী শব্দ ঢুকেছে তার ভিতরে আরবী, ফার্সী এবং ইংরিজীই প্রধান। সংস্কৃত শব্দ বিদেশী নয় এবং পর্তুগীজ, ফরাসিস, স্প্যানিশ শব্দ এতই কম যে, সেগুলো নিয়ে অত্যধিক দুশ্চিন্তা করার কোনো কারণ নেই।

বাঙলা ভিন্ন অন্য যে-কোনো ভাষার চর্চা আমরা করি না কেন, সে ভাষার শব্দ বাঙলাতে ঢুকবেই। সংস্কৃত চর্চা এদেশে ছিল ব'লে বিস্তর সংস্কৃত শব্দ বাঙলায় ঢুকেছে, এখনো আছে ব'লে অল্পবিস্তর ঢুকছে, যতদিন থাকবে ততদিন আরো ঢুকবে ব'লে আশা করতে পারি। ইস্কুল-কলেজ থেকে যে আমরা সংস্কৃত চর্চা উঠিয়ে দিতে চাই নে তার অন্যতম প্রধান কারণ বাঙলাতে এখনো আমাদের বহু সংস্কৃত শব্দের প্রয়োজন, সংস্কৃত চর্চা উঠিয়ে দিলে আমরা অন্যতম প্রধান খাদ্য থেকে বঞ্চিত হব।

ইংরিজীর বেলাতেও তাই। বিশেষ ক'রে দর্শন, নন্দনশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ইত্যাদি জ্ঞান এবং ততোধিক প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানেরাও শব্দ আমরা চাই। রেলের ইঞ্জিন কি ক'রে চালাতে হয়, সে সম্বন্ধে বাঙলাতে কোনো বই আছে ব'লে জানি নে, তাই এসব টেকনিকল শব্দের প্রয়োজন যে আরো কত বেশী সে সম্বন্ধে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা এখনো আমাদের মনের মধ্যে নেই। সুতরাং ইংরিজী চর্চা বন্ধ করার সময় এখনো আসে নি।

একমাত্র আরবী-ফার্সী শব্দের বেলা অনায়াসে বলা যেতে পারে যে, এই দুই ভাষা থেকে ব্যাপকভাবে আর নূতন শব্দ বাঙলাতে ঢুকবে না। পশ্চিম বাঙলাতে আরবী-ফার্সীর চর্চা যাবো-যাবো করছে, পূব বাঙলায়ও এ সব ভাষার প্রতি তরুণ

সম্প্রদায়ের কৌতূহল অতিশয় ক্ষীণ ব'লে তার আয়ু দীর্ঘ হবে ব'লে মনে হয় না এবং শেষ কথা, আরব-ইরানে অদূর ভবিষ্যতে যে হঠাৎ কোনো অভূতপূর্ব জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা আরম্ভ হয়ে বাঙলাকে প্রভাবান্বিত করবে তার সম্ভাবনাও নেই।

কিন্তু যে সব আরবী-ফার্সী শব্দ বাঙলাতে ঢুকে গিয়েছে তার অনেকগুলো যে আমাদের ভাষাতে আরো বহুকাল ধরে চালু থাকবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই এবং দ্বিতীয়তঃ কোনো কোনো লেখক নূতন বিদেশী-শব্দের সন্ধান বর্জন ক'রে পুরনো বাঙলার—'চণ্ডী' থেকে আরম্ভ করে 'হুতোম' পর্যন্ত—অচলিত আরবী-ফার্সী শব্দ তুলে নিয়ে সেগুলো কাজে লাগাবার চেষ্টা করছেন। কিছুদিন পূর্বেও এই এক্সপেরিমেন্ট করা অতিশয় কঠিন ছিল কিন্তু অধুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণে অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে বাধ্য হয়ে পুরনো বাঙলা পড়তে হয়—তারা এই সব শব্দের অনেকগুলো অনায়াসে বুঝতে পারবে ব'লে অচলিত অনেক আরবী-ফার্সী শব্দ নূতন মেয়াদ পাবে।

এই পরিস্থিতির সামনে জীবন্মৃত এসব শব্দের একটা নূতন খতেন নিলে ভালো হয়।

* *

সংস্কৃত, গ্রীক, বাঙলা আর্য ভাষা ; আরবী, হীব্রু সেমিতি ভাষা। ফার্সী, উর্দু, কাশ্মীরী, সিন্ধীও আর্য ভাষা, কিন্তু এদের উপর সেমিতি আরবী ভাষা প্রভাব বিস্তার করেছে প্রচুর। উত্তর ভারতের অন্যান্য ভাষাদের মধ্যে বাঙলা এবং গুজরাতিই আরবী ভাষার কাছে ঋণী, কিন্তু এই ঋণের ফলে বাঙলার মূল সুর বদলায় নি। গুজরাতির বেলাও তাই।

হীব্রু এবং আরবী সাহিত্যের ঐশ্বর্য সর্বজনবিদিত। ঠিক সেই রকম প্রাচীন আর্য ভাষা ফার্সী তার ভগ্নী সংস্কৃতের ন্যায় খ্রীষ্টের জন্মের পূর্বেই সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিল। আবররা যখন ইরান জয় করে তখন তারা ইরানীদের তুলনায় সভ্যতা-সংস্কৃতিতে পশ্চাৎপদ। কিন্তু তারা সঙ্গে আনলো যে ধর্ম সেটি জরথুস্ত্রী ধর্মের চেয়ে প্রগতিশীল, সর্বজনীন এবং দুঃখীর বেদনা উপশমকারী। ফলে তাবৎ ইরান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলো এবং আপন ভাষা ও সাহিত্য বর্জন করে আরবীকে রাষ্ট্রভাষা ও সংস্কৃতির বাহনরূপে স্বীকার ক'রে নিল। আরবী ভাষা ও সাহিত্যে তাই ইরানীদের দান অতুলনীয়।

চারশত বৎসর পরে কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হল। ইরানীদের আপন ভাষা তখন মাহমুদ বাদশার উৎসাহে নবজন্ম লাভ ক'রে নব নব সাহিত্য-সৃষ্টির পথে এগিয়ে চললো। বাল্মীকি যে রকম আদি এবং বিশ্বজগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি,

ফিরদৌসীও এই নব ইরানী (ফার্সী) ভাষার আদি এবং শ্রেষ্ঠ কবি। আরবী থেকে শব্দ এবং ভাবসম্পদ গ্রহণ ক'রে ফার্সী সাহিত্য যে অভূতপূর্ব বিচিত্র রূপ ধারণ করলো তা আজও বিশ্বজনের কাছে বিস্ময়ের বস্তু। রূমী, হাফিজ, সাদী, খৈয়াম আপন আপন রশ্মিমণ্ডলে সবিতাস্বরূপ। সেমিতি আরবী এবং আর্য ফার্সী ভাষার সংঘর্ষের ফলেই এই অনির্বাণ হোমানলের সৃষ্টি হল।

পরবর্তী যুগে এই ফার্সী সাহিত্যই উত্তর ভারতে ব্যাপকরূপে প্রভাব বিস্তার করলো। ভারতীয় মক্তব-মাদ্রাসায় যদিও প্রচুর পরিমাণে আরবী ভাষা পড়ানো হয়েছিল তবু কার্যত দেখা গেল ভারতীয় আর্যগণ ইরানী আর্য সাহিত্য অর্থাৎ ফার্সীর সৌন্দর্যে অভিভূত হলেন বেশী। উর্দু সাহিত্যের মূল সুর তাই ফার্সীর সঙ্গে বাঁধা—আরবীর সঙ্গে নয়। হিন্দী গদ্যের উপরও বাইরের যে প্রভাব পড়েছে সেটা ফার্সী—আরবী নয়।

একদা ইরানে যে রকম আর্য ইরানী ভাষা ও সেমিতি আরবী ভাষার সংঘর্ষে নবীন ফার্সী জন্মগ্রহণ করেছিল, ভারতবর্ষে সেই সংঘর্ষের ফলে সিন্ধী, উর্দু ও ও কাশ্মীরী সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। কিন্তু আরবীর এই সংঘর্ষ ফার্সীর মাধ্যমে ঘটেছিল ব'লে কিংবা অন্য যে কোনো কারণেই হোক, ভারতবর্ষীয় এ তিন ভাষা ফার্সীর মত নব নব সৃষ্টি দিয়ে ঐশ্বর্যশালী সাহিত্যসৃষ্টি করতে পারলো না। উর্দুতে কবি ইকবালই এ তত্ত্ব সম্যক হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন ও নূতন সৃষ্টির চেষ্টা করে উর্দুকে ফার্সীর অনুকরণ থেকে কিঞ্চিৎ নিষ্কৃতি দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

*   *

বাঙলা আর্যভূমি, কিন্তু এ ভূমির আর্যগণ উত্তর ভারতের অন্যান্য আর্যের মত নন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার স্থান এখানে নয়। তাই মাত্র কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি।

(১) বাঙলা দেশকে যখনই বাইরের কোনো শক্তি শাসন করতে চেষ্টা করেছে তখনই বাঙালী বিদ্রোহ করেছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আপন স্বাধীনতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। পাঠান যুগে বাঙলা অতি অল্পকাল পরাধীন ছিল এবং মুগল যুগেও মোটামুটি মাত্র জাহাঙ্গীর থেকে আওরঙজেব পর্যন্ত বাঙলা দিল্লীর শাসন মেনেছে।

(২) অন্যান্য আর্যদের তুলনায় বাঙালী কিছুমাত্র কম সংস্কৃত চর্চা করে নি, কিন্তু সে-চর্চা সে করেছে আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে। আদিশূর থেকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সকলের বহু চেষ্টাতেও বাঙালী উত্তর ভারতের সঙ্গে স্ট্রীমলাইন্‌ড্ হয়ে সংস্কৃত পদ্ধতিতে সংস্কৃত বর্ণমালার উচ্চারণ করে নি এবং বাঙলাতে সংস্কৃত শব্দ

উচ্চারণ করার সময় তো কথাই নেই।

(৩) বাঙালীর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যসৃষ্টি তার পদাবলী কীর্তনে। এ সাহিত্যের প্রাণ এবং দেহ উভয়ই খাঁটি বাঙালী। এ সাহিত্যে শুধু যে মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ বাঙলায় খাঁটি কানুরূপ ধারণ করেছেন তাই নয়, শ্রীমতী শ্রীরাধাও যে একেবারে খাঁটি বাঙালী মেয়ে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ভাটিয়ালির নায়িকা, বাউলের ভক্ত, মুর্শীদীয়ার আশিক ও পদাবলীর শ্রীরাধা একই চরিত্র একই রূপে প্রকাশ পেয়েছেন।

বাঙালীর চরিত্রে বিদ্রোহ বিদ্যমান। তার অর্থ এই যে, কি রাজনীতি, কি ধর্ম, কি সাহিত্য, যখনই যেখানে সে সত্য শিব সুন্দরের সন্ধান পেয়েছে তখনই সেটা গ্রহণ করতে চেয়েছে; এবং তখন কেউ 'গতানুগতিক পন্থা' 'প্রাচীন ঐতিহ্য'-এর দোহাই দিয়ে সে প্রচেষ্টায় বাধা দিতে গেলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। এবং তার চেয়েও বড় কথা,—যখন সে বিদ্রোহ উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত হতে চেয়েছে, তখন তার বিরুদ্ধে আবার বিদ্রোহ করেছে।

এ বিদ্রোহ বাঙালী হিন্দুর ভিতরই সীমাবদ্ধ নয়। বাঙালী মুসলমানও এ কর্মে পরম তৎপর। ধর্ম বদলালেই জাতির চরিত্র বদলায় না।

* *

পাঠান আমলে বাঙলা দেশে আরবী-ফার্সীর চর্চা ব্যাপকভাবে হয় নি। সে-যুগে বাঙলাতে লিখিত সরকারী দলিলপত্রে পর্যন্ত আরবী-ফার্সী টেকনিকল শব্দ প্রায় নেই। মহাপ্রভু এবং তাঁর শিষ্যদের কেউ কেউ মুসলমান ধর্মের সঙ্গে সুপরিচিত হওয়া সত্ত্বেও সে যুগের বাঙলা সাহিত্যে আরবী-ফার্সী শব্দ অতি অল্প।

খাস পাঠান যুগে তো কথাই নেই, মোগল যুগের প্রারম্ভেও কবি আলাওল যে কাব্য রচনা করেছেন তাতে সংস্কৃত ভাষার প্রাধান্যই লক্ষণীয়—

উপনীত হৈল আসি যৌবনের কাল।
কিঞ্চিৎ ভুরুর-ভঙ্গে যৌবন রসাল॥
আড় আঁখি বঙ্ক-দৃষ্টি ক্রমে ক্রমে হয়।
ক্ষণে ক্ষণে লাজে তনু যেন শিহরয়॥
সম্বরয় গিম-হার, কটির বসন।
চঞ্চল হইল আঁখি, ধৈরয-গমন॥
চোররূপে অনঙ্গ অঙ্গেতে আসে যায়।
বিরহ বেদনা ক্ষণে ক্ষণে মনে ভায়॥

এ ধরনের কাব্য তখন মুসলমানদের ভিতর কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল

তার বর্ণনা পাই অন্য এক কবির কাছ থেকে। সৈয়দ সুলতান বলেন,

আপনা দীনের বোল্ এক না বুঝিল।
পরস্তব-সকল লৈয়া সব রহিল॥

(দীন=ধর্ম ; পরস্তব=পরধর্ম কীর্তন। এর পূর্বেই মুসলমানরা পদাবলী কীর্তন রচনা আরম্ভ করেছেন এবং কাজী ফয়জউল্লার 'গোরক্ষবিজয়' মুসলমানদের ভিতর লোকপ্রিয় হয়ে গিয়েছে।)

মুসলমানরা আপন ধর্মচর্চা না করে 'হিন্দুয়ানী' কাব্য নিয়ে মেতে আছে দেখে মুসলমান মোল্লা-মৌলবীগণ তারস্বরে আপন প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং আরবী-ফার্সীতে ধর্মচর্চা করবার জন্য বার বার কড়া ফতোয়া জারী করেছেন।

তখন সৈয়দ সুলতান বললেন, 'আমরা বাঙলা ছাড়বো না ; কিন্তু মুসলমান শাস্ত্রচর্চাও কববো। তাই বাঙলাতেই মুসলমান শাস্ত্রচর্চা হবে।'

আরবী-ফার্সী ভাষে কিতাব বহুত।
আলিমানে বুঝে, না বুঝে মূর্খসুত॥
যে সবে আপন বুলি না পাবে বুঝিতে।
পাচালী রচিলাম করি আছয়ে দূষিতে॥
আল্লায় বলিছে, 'মুই যে-দেশে যে-ভাষ,
সে-দেশে সে-ভাষে কইলুম রসুল প্রকাশ॥'

(আলিমান=আলিমগণ=পণ্ডিতগণ ; রসুল=আল্লাব প্রেরিত পুরুষ, পয়গম্বর।)

অতি মোক্ষম জবাব। সৈয়দ সুলতান কুরানের বচন উদ্ধৃত ক'রে সপ্রমাণ করলেন, বাঙলাতেই বাঙালী মুসলমানের শাস্ত্রচর্চা করা ফর্‌জ্—অবশ্য করণীয়।

সৈয়দ সুলতান কিন্তু আটঘাট বেঁধে পয়গম্বর সাহেবের বাণী বাঙলাতে প্রকাশ করেছেন। নিতান্ত যে কটি আরবী শব্দ ব্যবহার না করলেই নয়, তিনি মাত্র সেগুলোই ব্যবহাব করেছেন এবং প্রচলিত হিন্দু ধর্মের মাধ্যমেই ইসলাম প্রকাশ করেছেন।

তোমার সবের মুই জানো হিতকারী।
ইমান-ইসলামের কথা দিলাম প্রচারি॥
যেরূপে সৃজন হইল সুরাসুরগণ।
যেরূপে সৃজন হইল এ তিন ভুবন॥
যেরূপে আদম হবা সৃজন হইল।
যেরূপে যতেক পয়গম্বর উপজিল॥

বঙ্গেতে এসব কথা কেহ না জানিল।
নবী-বংশ পাঁচালীতে সকল শুনিল॥

এস্থলে দ্রষ্টব্য, হিন্দু মুসলমান উভয়কে মুসলমান ধর্ম বোঝাতে গিয়ে কবি এমন সব বস্তুর উল্লেখ করেছেন, যা মুসলমান ধর্মে নেই। 'সুর' 'অসুর' কল্পনা ইসলামে নেই। 'তিন ভুবন' ইসলামে নেই, আছে 'দুই ভুবন'। তাঁর পুস্তকের নাম 'নবীবংশ'ও হিন্দু 'হরিবংশে'র অনুকরণ—আরবীতে এই ধরনের নাম নেই।

এমন কি তিনি পয়গম্বর হজরৎ মুহম্মদকে 'অবতার' আখ্যা দিয়ে মোল্লাদের মতে পাপ করেছেন; কারণ মুসলিম শাস্ত্রমতে আল্লা মনুষ্যদেহ গ্রহণ ক'রে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন না, তিনি মানুষদের একজনকে বেছে তাঁকে তাঁর মুখপাত্র করেন। সৈয়দ সুলতান কিন্তু বলছেন,

মুহম্মদ রূপ ধরি নিজ অবতার।
নিজ অংশ প্রচারিল হইতে প্রচার॥

আর সব চেয়ে বড় তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন সৈয়দ সাহেব, এই দুইটি ছত্রে—

যারে যেই ভাষে প্রভু করিল সৃজন।
সেই ভাষা তাহার, অমূল্য সেই ধন॥

এই দু'টি ছত্রে যে কত বড় সত্য নিহিত আছে, সে তত্ত্ব কি আমরা আজও বুঝতে পেরেছি? এই সৈয়দ সুলতানকে তখনকার দিনের মোল্লা-মৌলবীরা 'ইসলামের ঐক্য নষ্ট হয়ে যাবে', 'আরবীর মর্যাদা লোপ পাবে' এই সব ভয় দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁকে 'মুনাফিক' অর্থাৎ 'ভণ্ড' অর্থাৎ 'ধর্মধ্বংসকারী' আখ্যা দিয়ে 'ফতোয়া' পর্যন্ত জারী করেছেন। সাহসী কবি কিন্তু অকুণ্ঠ ভাষায় তাঁর মাতৃভাষা বাঙলার জয়গান গেয়ে গেছেন। এ লোক যদি প্রকৃত বাঙালী না হয়, তবে বাঙালী কে?

সে শুভবুদ্ধি, সে সাহস কি আজও আমাদের হয়েছে? কেউ বলে 'রাষ্ট্রের অখণ্ডতার জন্য হিন্দী গ্রহণ করো', কেউ বলে 'ইংরিজী বর্জন করলে আমরা বর্বর হয়ে যাব।' হায়, বাঙলার পদমর্যাদা কেউ স্বীকার করে না।

যখন দ্বন্দ্ব নেই, সংঘাত নেই, তখন মাতৃভাষার গৌরবগান গেয়ে লম্ফ-ঝম্প করে সবাই; কিন্তু যুগসন্ধিক্ষণে, নানা প্রলোভন-বিভীষিকার সম্মুখে মাতৃভাষাকে নিজের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা বলতে পারাতেই প্রকৃত সাহস, প্রকৃত জ্ঞান উপলব্ধির লক্ষণ। সৈয়দ সুলতানের দুইশত বৎসর পরে ইংরিজী ভাষা বাঙালীকে প্রলোভন দেখিয়েছিল আরেকবার। কিন্তু মুসলমান সুলতানের ন্যায় খৃষ্টান মাইকেল তখন

উচ্চকণ্ঠে বাঙলার জয়গান গেয়েছিলেন।

সৈয়দ সুলতানের অনুকরণকারীরা কিন্তু তাঁর মত বিচক্ষণ ভাষাবিদ ছিলেন না : ফলে বাঙলাতে যে পরিমাণে আরবী-ফার্সী শব্দ প্রবেশ করতে লাগল তাতে ভাষার বৈশিষ্ট্য বিপন্ন হতে লাগল। ইতিমধ্যে—মোগল যুগের শেষের দিকে—উর্দু ভাষাও বাঙলা দেশে প্রবেশ করেছে। তাই তখন যে বাঙলা পাচ্ছি তার উদাহরণ—

বিশ্বনাথ বিশ্বাসে বুঝায়ে বলে বাছা।
দুনিয়ামে এসাভি আদমী রহে সাচা ॥
ভালা বাওয়া কাহে তেরা মৃত্যুকাল কাছে।…
রাতদিন যৈসা তৈসা সুখ দুঃখ হোয়ে ॥
জানা গেল বাত বাওয়া জানা গেল বাত।
কাপড়া লেও আওর আও মেরা সাথ ॥

যুক্তি নয়, অজুহাত হিসেবে বলা যেতে পারে, আকবরের আমল থেকে বহুল ফার্সী শিক্ষাদানের ফলে বাঙলা দেশে তখন প্রচুর লোক বিস্তর আরবী-ফার্সী শব্দ দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছে। এটা কিন্তু কোনো সৎযুক্তি নয়। কারণ আজ আমরা দৈনন্দিন জীবনে বিস্তর ইংরিজী শব্দ ব্যবহার করি : তাই ব'লে সাহিত্যসৃষ্টির সময় বে-এক্তেয়ার হয়ে যত্র-তত্র ভূরি ভূরি ইংরিজী শব্দ ব্যবহার করি নে।

কিন্তু সত্য কবি পথভ্রষ্ট হন না। তার প্রকৃত নিদর্শন আমরা পাই, চট্টগ্রামের মহিলা কবি 'শ্রীমতী রহীম্মুনিসা'র (আশা করি 'শ্রীমতী' লেখাতে কেউ আপত্তি করবেন না, কারণ তিনি নিজেই তাঁর কাব্যে আপন পরিচয় দেবার সময় লিখেছেন—

"স্বামী আজ্ঞা শিরে পালি লিখি এ-ভারতী।
রহিমুনিচা নাম জান আছে ছিরীমতী ॥")

এই মহিলা কবির সঙ্গে হালে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন সুপণ্ডিত ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, পূর্ববঙ্গের বাঙলা-একাডেমির প্রথম ডাইরেক্টর (বাঙলা-একাডেমী পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, পৌষ ১৩৬৩, পৃ: ৫৩)। তাঁর মতে '১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই রহীম্-'ন্-নিসা আবির্ভূতা হয়েছিলেন।' ইনিও সৈয়দ সুলতানের মত সৈয়দ বংশের মেয়ে এবং পরিবারে প্রচুর আরবী-ফার্সীর চর্চা থাকা সত্ত্বেও সুস্থ, সবল এবং মধুর বাঙলায় কবিতা রচনা ক'রে গিয়েছেন।

এঁর হাতের লেখা খুব সম্ভব সুন্দর ছিল। তাই বোধ করি তাঁর স্বামী তাঁকে কবি আলাওলের 'পদ্মাবতী' নকল করতে আদেশ দেন :—

শুন গুণিগণ হই এক মন,
লেখিকার নিবেদন।
অক্ষর পড়িলে টুটা পদ হৈলে
শুধারিঅ সর্ব্বজন॥
পদ এই রাষ্ট্র হেন মহাকষ্ট
পুঁথি সতী পদ্মাবতী।
আলাওল মণি, বুদ্ধি বলে গুণী,
বিরচিল এ ভারতী॥
পদের উকতি বুঝি কি শকতি,
মুই হীন তিরী জাতি।
স্বামীর আদেশ মানিয়া বিশেষ
সাহস করিল গাঁথি॥

রহীমুন্নিসার স্বরচিত কাব্য অল্পই পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে তাঁর একটি 'বারমাস্যা' বড়ই করুণ এবং মধুর। পূর্ববঙ্গের কবিরা সচরাচব প্রিয়বিরহে বারমাস্যা রচনা করেছেন—রহীমুন্নিসা ভ্রাতৃশোকে তাঁর নব বারমাস্যা রচনা করেছেন।

আশ্বিনেতে খোয়াময় কান্দে তরুলতাচয়
ভাই বলি কান্দে উভরায়।
আমার কান্দনি শুনি বনে কান্দে কুরঙ্গিণী
জলে মাছ কান্দিয়া লুকায়॥
(খোয়া = কুয়াশা)

অন্য এক স্থলে 'কন্যাহারা জননী'র শোকাতুরার ক্রন্দন প্রকাশ করেছেন অতুলনীয় সরল বাঙলায়—

নয়া সন নয়া মাস ফিরে বারে বার
মোর জাদু গেল ফিরি না আসিল আর॥

এঁর রচনায় সত্যই মধুর কবি-প্রতিভা 'বারেবার' ধরা পড়ে। পাঠককে মূল প্রবন্ধটি পড়তে অনুরোধ জানাই।

* *

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বন্দ্ব প্রধানতঃ ইংরিজীর সঙ্গে। এবং সেই দ্বন্দ্ব বিদ্রোহ-

রূপ ধারণ করলো পূব বাঙলার ভাষা আন্দোলনে ১৯৫১-৫২ খ্রীষ্টাব্দে। বাঙলা আবার জয়ী হল—কিন্তু এবারে তার জয়মূল্য দিতে হল বুকের রক্ত দিয়ে—কিন্তু আব্রু, ইজ্জৎ, ইমান দিয়ে নয়। পাকিস্তান হওয়া সত্ত্বেও পূব বাঙলার লোক বাঙলাতে আরেক দফে আরবী-ফার্সী শব্দ আমদানি করে ভাষাকে 'পাক' করতে প্রলোভিত হল না।

তাই এই প্রবন্ধের নাম দিয়েছি 'মামদো'র পুনর্জন্ম। 'মামদো'রই যখন কোনো অস্তিত্ব নেই, তখন তার পুনর্জন্ম হবে কি প্রকারে? পূব বাঙলার লেখকদের স্কন্ধে আরবী-ফার্সী শব্দের মামদো ভর করবে, আর তারা বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে আরবী-ফার্সীতে অর্থাৎ "যাবনী মেশালে' কিচিরমিচির করতে আরম্ভ করবে, বিজাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি করবে—যার মাথামুণ্ডু পশ্চিম বাঙলার লোক বুঝতে পারবে না, সে ভয় 'স্বপ্ন, মায়া, মতিভ্রম'।

দিল্লী স্থাপত্য

যাঁরা এই শীতে প্রথম দিল্লী যাচ্ছেন কিংবা যাঁরা পূর্বে গিয়েছেন কিন্তু পাঠান-মোগলের দালান-কোঠা, এমারত-দৌলত দেখবার সুযোগ ভালো করে পান নি, এ-লেখাটি তাঁদের জন্য। এবং বিশেষ করে তাঁদের জন্য যাঁদের স্থাপত্য দেখে অভ্যাস নেই বলে ঐ রস থেকে বঞ্চিত। লেখাটিতে কিঞ্চিৎ 'মাস্টারি মাস্টারি' ভাব থেকে যাবে বলে গুণীজনকে আগের থেকেই হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি তাঁরা যেন এটি না পড়েন।

কোনো-কালে যে ব্যক্তি গান শোনে নি সে যদি হঠাৎ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শুনে উদ্বাহু হয়ে নৃত্য না করে তা হলে চট করে তাকে বেরসিক বলা অন্যায়। বাঙলা দেশে এখানে-ওখানে ছিটেফোঁটা স্থাপত্য আছে বটে, কিন্তু একই জায়গায় যথেষ্ট পরিমাণে নেই বলে স্থাপত্যের যে ক্রমবিকাশ এবং সামগ্রিক রূপ তার রস বুঝতে সাহায্য করে তার সম্পূর্ণ অভাব। বিচ্ছিন্নভাবে যে বিশেষ একটি মন্দির, মসজিদ বা সমাধি রসসৃষ্টি করতে পারে না, তা নয়। তাই তুলনা দিয়ে বলতে পারি, জগতের কোনো সাহিত্যের সঙ্গে যদি আপনার কিছুমাত্র পরিচয় না থাকে, তবে সাধারণত ধরে নেওয়া যেতে পারে যে উটকো একখানা ফরাসী উপন্যাসের রস আপনি গ্রহণ করতে পারবেন না। রসবোধের জন্য ঐতিহাসিক ক্রম-বিকাশ-জ্ঞান অপরিহার্য কিনা এ প্রশ্ন নন্দনশাস্ত্রের অন্যতম কঠিন প্রশ্ন। সে গোলক-ধাঁধার ভিতর একবার ঢুকলে আর দিল্লী যাবার পথ পাবেন না,—আর 'দিল্লী

দুর অস্ত্' তো বটেই।

কবিতা, সঙ্গীত, স্থাপত্য, ভাস্কর্যের মূল রস একই—ইংরিজীতে যাকে বলে ঈসথেটিক ডিলাইট। কিন্তু এক রসের চিন্ময়রূপ (যথা কাব্যের) যদি অন্য রসের মৃন্ময়রূপে (যথা ভাস্কর্য, স্থাপত্যে) টায়-টায় মিলছে না দেখেন তবে আশ্চর্য হবেন না। এদের প্রত্যেকেই মূল রস প্রকাশ করে আপন আপন 'ভাষায়', নিজস্ব শৈলীতে এবং আঙ্গিকে। একবার সেটি ধরতে পারলেই আর কোনো ভাবনা নেই। তার পর নিজের থেকেই আপনার গায়ে রসবোধের নূতন নূতন পাখা গজাতে থাকবে, আপনি উড়তে উড়তে হঠাৎ দেখবেন তাজমহলের গম্বুজটিও আপনার সঙ্গে আকাশপানে ধাওয়া করেছে—নীচের দিকে তাকিয়ে দেখবেন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল যেন ক্রমেই পাতালের দিকে ডুবে যাচ্ছে।

স্থাপত্যের প্রধান রস—প্রধান কেন, একমাত্র বললেও ভুল বলা হয় না, অন্যগুলো থাকলে ভালো, না থাকলে আপত্তি নেই—তার কম্পজিশনে, অর্থাৎ তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, যেমন ধরুন, গম্বুজ, মিনার, আর্চ (দেউড়ি), ছত্রি (কিয়োস্ক্, পেভিলিয়ন্), ভিত্তি এমনভাবে সাজানো যে দেখে আপনার মনে আনন্দের সঞ্চার হয়। তুলনা দিয়ে বলতে পারি, সঙ্গীতেও তাই। কয়েকটি স্বর—সা, রে, গা, মা, ইত্যাদি এমনভাবে সাজানো হয় যে শোনামাত্রই আপনার মন এক অনির্বচনীয় রসে আপ্লুত হয়।

এই সামঞ্জস্য যখন সর্বাঙ্গসুন্দর হয়, তখনই স্থাপত্য সার্থক। এবং স্থাপত্যের এই অনিন্দ্য সামঞ্জস্য যদি কাব্যে কিংবা উপন্যাসে পাওয়া যায় তবে বলা হয়, কাব্যখানিতে আরকিটেকৃটনিকাল্ মহিমা আছে—মহাভারতে আছে, ফাউস্টে আছে এবং উ:য়ার অ্যাণ্ড পীসে আছে; জঁ্যা ক্রিস্তফ উত্তম উপন্যাস কিন্তু এ-গুণটি সেখানে অনুপস্থিত। লিরিক বা গীতিকাব্যে যদিও কম্পজিশন থাকে—তা সে যতই কম হ'ক না কেন তাতে আরকিটেক্টনিকাল্ বৈশিষ্ট্য থাকে না।[১]

স্থাপত্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তারপর গুণীরা বলেন, এবং সার্থক স্থাপত্যে স্থপতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোর নিখুঁত সামঞ্জস্য করার পর সেগুলোকে অলঙ্কার সহযোগে সুন্দর করে তোলেন। অধম একথা সম্পূর্ণ স্বীকার করে না। কিন্তু এ গোলক-ধাঁধায়ও সে ঢুকতে নারাজ। দিল্লীর দিওয়ান-ই-খাস ও দিওয়ান-ই-আমে অলঙ্কারের ছড়াছড়ি, তুগলুক যুগের স্থাপত্যে অলঙ্কার প্রায় নেই—পাঠক দিল্লী

---

(১) 'আধেক ঘুমে নয়ন চুমে' গানটি সার্থক, এবং এই নীতির প্রকৃষ্টতম উদাহরণ।

দেখার সময় এই তত্ত্বটি সম্বন্ধে সচেতন থাকবেন[২]। অথচ দুইই সার্থক রসসৃষ্টি।

এই সামঞ্জস্য যদি খাড়াই চওড়াই—অর্থাৎ মাত্র দুই দিক—নিয়ে হয় তবে সেটা ছবি। শুধু সামনের দিক থেকে দেখা যায়। তিন দিক নিয়ে—তিন ডাইমেনশনাল—হলে সেটা ভাস্কর্য কিংবা স্থাপত্য। কিন্তু অনেক সময় মূর্তির পিছন দিকটা অবহেলা করা হয় বলে সেটাকে শুধু সামনের দিক থেকে দেখতে হয়। গড়ের মাঠের যে সব মূর্তি ঘোড়-সওয়ার নয় সেগুলো পিছন থেকে দেখতে রীতিমত খারাপ লাগে (বস্তুত এই সমস্যা সমাধানের জন্যই অনেক নিরীহ লোককে ঘোড়ায় চড়ানো হয়েছে) এবং বাস্‌ট্‌গুলো পিছন থেকে রীতিমত কদাকার বলে সেগুলোকে দেওয়ালের গায়ে ঠেলে দেওয়া হয়—যাতে করে পিছন থেকে দেখবার কোনো সম্ভাবনাই না থাকে। বিদ্যাসাগরের মূর্তিটি জলের কাছে রয়েছে বলেই ঐ সমস্যাটির সমাধান হয়েছে—জলে সাঁতরাতে সাঁতরাতে মূর্তির পিছন দিকে তাকাবে ক'জন লোকে?

কিন্তু স্থাপত্যের বেলা সেটি হবার জো নেই। স্থাপত্য এমন হবে যে সেটাকে যেন সব দিক থেকে এবং বিশেষ করে যে-কোনো দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়। কোনো জায়গা থেকে যদি, ধরুন, মনে হয়, দুটো মিনার এক হয়ে গিয়ে কেমন যেন দেউড়িটাকে ঢেকে অপ্রিয়দর্শন করে তুলেছে তবে বুঝবেন স্থপতি আর্টের কোনো একটা সমস্যার ঠিক সমাধান করতে পারেন নি বলেই এস্থলে তাল কেটেছেন, অর্থাৎ রসভঙ্গ করেছেন।

মসজিদ মাত্রেরই একটা খুঁত, ঠিক এই কারণে, থেকে যায়। শাস্ত্রের হুকুম মসজিদের পশ্চিম দিক যেন বন্ধ থাকে, যাতে করে নমাজীদের সামনে কোনো বস্তু তার দৃষ্টিকে আকর্ষণ না করতে পারে। ফলে বাধ্য হয়ে স্থপতিকে পশ্চিম দিকে দিতে হয় খাড়া পাঁচিল। এটার সঙ্গে আর বাদবাকি তিন দিক কিছুতেই খাপ খাওয়ানো যায় না বলে, মসজিদ শুধু তিন দিক থেকে দেখা যায়। ধর্মতলার টিপ্‌পু সুলতানের মসজিদ কিছু উত্তম রসসৃষ্টি নয়—দক্ষিণী ঢঙের গম্বুজগুলোই যা দেখবার মতো—কিন্তু পাঠক সেটাকে একবার প্রদক্ষিণ করলেই সমস্যাটা বুঝে যাবেন। দিল্লীর পুরনো মসজিদে-মসজিদে পাঠক দেখবেন, স্থপতি কত রকম চেষ্টা করেছেন এই সমস্যা সমাধানের।

২ 'তুলসীর মূলে যেন সুবর্ণ দেউটি উজলিল দশ দিক—' এবং 'পিকবররব নব-পল্লব মাঝারে' দুটিই সার্থক। প্রথমটিতে অলঙ্কার নেই। অলঙ্কারের বাড়াবাড়ি হলে কাব্য দুর্বল হয়ে পড়ে। মেঘদূতের তুলনায় যে রকম গীত-গোবিন্দ।

সমাধি, রাজপ্রাসাদ, বিজয়স্তম্ভ সম্বন্ধে শাস্ত্রের কোনো বাধাবন্ধক নেই। তাই সেগুলোতে এ অপরিপূর্ণতা থাকা মারাত্মক। সচরাচর থাকেও না।

পূর্বেই নিবেদন করেছি সার্থক স্থাপত্য যে-কোনো জায়গাতে, যে-কোনো দৃষ্টিবিন্দু থেকে দেখা যায়। কিন্তু তবু প্রশ্ন ওঠে, সব চেয়ে ভালো কোন্ জায়গা থেকে দেখা যায়? উচ্চাঙ্গ মোগল স্থাপত্যমাত্রেই স্থপতি এর নির্দেশ নিজেই দিয়ে গিয়েছেন। স্থাপত্যে পৌঁছবার বেশ কিছুটা আগে যে প্রধান তোরণদ্বার (দেউড়ি—গেটওয়ে) থাকে—এরই উপব নহ্বৎখানা—তার ঠিক নীচে দাঁড়ালেই স্থাপত্যের পবিপূর্ণ সৌন্দর্য উপভোগ করতে পাববেন। সাধারণত ছবি এ-জায়গা থেকেই ভালো ওঠে। আব যদি নিজের রসবোধ তার সঙ্গে সংযোজন করতে চান, তবে একটু পিছিয়ে গিয়ে দেউড়ির আর্চসুদ্ধ ছবি তুললে তাতে 'ঈসথেটিক ইফেক্ট' আসবে—যদিও মূল স্থাপত্যেব কিছুটা হয়ত তাতে করে কাটা পড়বে।

এ সম্বন্ধে আরো অনেক কিছু বলাব আছে, কিন্তু আমাব মনে হয় স্থাপত্য দেখার সঙ্গে সঙ্গে প্রসঙ্গত সে আলোচনা তোলাই সঙ্গত।

* *

দিল্লীর স্থাপত্য তাব বাজবংশানুযায়ী ভাগ কবা যায়।

॥ ১ ॥ দাস বংশ

কুতুব মিনাব, কুওওতুল-ইসলাম মসজিদ, ইলতুতমিশের সমাধি। (কুওওতুল ইসলাম মসজিদের আঙ্গিনায়—সেহ্ন্—চন্দ্ররাজা নির্মিত একটি শতকবা নিরানব্বই ভাগেব লৌহস্তম্ভ আছে। এটি ও মসজিদের থামগুলো হিন্দুযুগেব।) —সব কটি কুতুবের গা ঘেঁষে।

॥ ২ ॥ খিলজী-বংশ

আলাউদ্দীন খিলজী নির্মিত 'আলা-ই-দরওয়াজা'—কুতুবেব গা ঘেঁষে। আলাউদ্দীন কিংবা তাঁব ছেলের ('দেবল-দেবীব' বল্লভ) তৈবী মসজিদ—দিল্লী-মথুরা ট্রাঙ্ক রোডেব উপর (নিউ দিল্লী থেকে মাইল খানেক) নিজামউদ্দীন আউলিয়ার[৩] দরগাব ভিতব[৪]।

॥ ৩ ॥ তুগলুক-বংশ

গিয়াসউদ্দীন তুগলুক[৫] নির্মিত আপন সমাধি——কুতুব থেকে মাইল তিনেক

৩, ৫ 'দৃষ্টিপাতে' উল্লিখিত 'দিল্লী দূর অস্ত্' কাহিনীর নায়কদ্বয়। গিয়াসের ছেলে 'পাগলা' রাজা মহম্মদ তুগলুকের তৈরী 'আদিলাবাদ'-এর ভগ্নাবশেষে বিশেষ

দূরে তাঁর-ই নির্মিত তুগলুকাবাদের সামনে। তুগলুকাবাদ।

ফিরোজ তুগলুক নির্মিত হাউজ খাস—দিল্লী থেকে কুতুব যাবার পথে রাস্তার ডান দিকে। ফিরোজ নির্মিত ফিরোজশাহ্-কোট্‌লা,—দিল্লী এবং নয়াদিল্লীর প্রায় মাঝখানে (অন্যান্য দ্রষ্টব্যের ভিতর এখানে আছে একটি অশোকস্তম্ভ; ফিরোজ এটাকে দিল্লীতে আনিয়ে উঁচু ইমারত বানিয়ে তার উপরে চড়ান)।

॥ ৪ ॥ সৈয়দ এবং লোদীবংশ

লোদী গার্ডেন্‌স্—নয়াদিল্লীর লোদী এস্‌টেটের গা ঘেঁষে—ভিতরে আছে, (ক) মুহম্মদ শাহ্ সৈয়দের কবর, খ) সিকন্দর লোদীর তৈরী মসজিদ এবং মসজিদের প্রবেশগৃহ, (গ) অজানা কবর এবং (ঘ) সিকন্দর লোদীর কবর।

ইসা খানের কবর—হুমায়ুনের কবরের বাইরে। যদিও পরবর্তী যুগের, তবু লোদীশৈলীতে তৈরী।

॥ ৫ ॥ মোগল-বংশ

বাবুর কিছু তৈরী করার সময় পান নি। কেউ কেউ বলেন, পালম এ্যার-পোর্টের সামনে যে দুর্গের মতো সরাই এটি তাঁর হুকুমে তৈরী। এতে দ্রষ্টব্য কিছুই নেই।

হুমায়ূনও এক পুরনো কিলা (ন্যাশনাল স্টেডিয়ামের পিছনে) ছাড়া কিছু করে যেতে পারেন নি। পুরনো কেল্লারও কতখানি তাঁর, কতখানি শের শা'র, বলা শক্ত। কেল্লার ভিতরে মসজিদটি কিন্তু শের শা'র তৈরী এবং এর শৈলী পাঠান মোগল থেকে ভিন্ন। সাসারামে শেরের কবর সৈয়দ-লোদী শৈলীতে।

হুমায়ূনের বিধবার—আকবরের মাতার—তৈরী হুমায়ূনের কবর। নিজামউদ্‌দীন আউলিয়ার দরগার সামনে, দিল্লী-মথুরা রোডের ওপাশে।

আকবরের কীর্তি-কলা আগ্রাতে—সেকেন্দ্রা ফতহ্-পুর সিক্রী, আগ্রা দুর্গ। ঐ সময়ে তৈরী দিল্লীতে আছে আৎকা খান, আজিজ কোকলতাশ, আব্দুর রহীম খান খানা ও আদ্‌হম্ খানের কবর।

শাহজাহান—দিল্লী দুর্গ বা লাল কিলা। তার-ই সামনে চাঁদনী চৌকের

কিছু দেখবার নেই। মুহম্মদ এবং নিজামউদ্‌দীনের মিত্র কবি-সম্রাট আমির খুসরৌ ('দেবল-দেবীর' প্রেমের কাহিনী ইনিই প্রথম ফার্সীতে লেখেন) এবং প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বরনীর কবর নিজামউদ্দীনের দরগার ভিতর।

৪ ইলতুতমিশের কন্যা সম্রাজ্ঞী রিজিয়ার যে কবর দিল্লীতে আছে সেটি সম্বন্ধে ঐতিহাসিকেরা সন্দেহ প্রকাশ করেন।

কাছে জাম-ই মসজিদ।

ঔরঙ্গজেব—লাল কিলার ভিতর মোতী মসজিদ।

ঔরঙ্গজেবের ভগ্নী রৌশনারার নিজের তৈরী সমাধি—রৌশনারা-গার্ডেন্‌সের ভিতর।

ঐতিহাসিক মাত্রেই জানেন, ঔরঙ্গজেবের পরের বাদশাদের অর্থ ও প্রভাব দুই-ই কম ছিল বলে এঁরা প্রায় কিছুই করে যেতে পারেন নি। যেটুকু আছে তাতে আলঙ্কারিক সৌন্দর্য যথেষ্ট বটে, কিন্তু স্থাপত্যের লক্ষণ প্রায় নেই—স্থপতি সে-চেষ্টা করেনও নি। এর ভিতর উল্লেখযোগ্য জাহানারা, মুহম্মদ শাহ বাদশাহ রঙ্গীলা, এবং দ্বিতীয় আকবরের (ইনি রাজা রামমোহনকে 'রাজা' উপাধি দিয়ে বিলেত পাঠিয়েছিলেন) কবর। তিনটিই নিজামউদ্‌দীনের দরগার ভিতরে। মোগল স্থাপত্যের 'শেষ নিশ্বাস' সফ্‌দর্‌-জঙ্গের সমাধি ও তৎসংলগ্ন মসজিদ—কুলোকে বলে এটার মার্বেল আব্দুর রহীম খান খানার কবর থেকে চুরি করা। ইমারতটি যদিও অপেক্ষাকৃত বৃহৎ তবু তার সৌন্দর্য নিম্নশ্রেণীর, রুচির বিলক্ষণ অধোগতি এতে স্পষ্ট ধরা পড়ে। ছবিতে হুমায়ুনের কবর, তাজমহল, এমন কি আৎকা খানের ছোট কবরটির সঙ্গে তুলনা করলেই পাঠক আমার বক্তব্য বুঝতে পারবেন। আৎকা খানের কবরটি আমার বড় প্রিয় স্থাপত্য। দিল্লীর লোক এ-কবরটির খবর রাখে না, কারণ এটি নিজামউদ্‌দীন দরগার এক নিভৃত কোণে পড়ে আছে।

দিল্লীতে তিনটি বড় দরগা আছে। প্রথমটি কুৎবউদ্‌দীন বখতিয়ার কাকীর। ইনি কুৎবউদ্‌দীন আইবকের গুরু ছিলেন। অনেকের ধারণা আইবক গুরুর স্মরণে কুতুব মিনার নির্মাণ করেছিলেন। দরগাটি কুতুব মিনারের কাছেই এবং 'কুতুব-সাহেব' নামে পরিচিত।

দ্বিতীয়টি নিজামউদ্‌দীন আউলিয়ার এবং তৃতীয়টি নাসিরউদ্‌দীন 'চিরাগ দিল্লী'র। দরগাটি দিল্লী থেকে মাইল তিনেক দূরে।

প্রথমটির পত্তন দাস আমলে, দ্বিতীয়টির খিলজি আমলে এবং তৃতীয়টির তুগলুক আমলে। সেই যুগ থেকে শেষ-মোগল পর্যন্ত এসব দরগাতে বহু ভক্ত নানা ইমারত গড়েছেন বলে অল্পের ভিতর সব স্থাপত্যেরই নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু চোখ কিছুটা না বসা পর্যন্ত এসব জায়গায় গবেষণা করা বিপজ্জনক।

কুতুব মিনার পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মিনার। ইংরেজ পর্যন্ত একথা স্বীকার করেছে। আশ্চর্য মনে হয় যে, এর পূর্ববর্তী নিদর্শন এদেশে নেই, ইরান-তুরানেও নেই।

বহু স্থপতির বহু এক্‌সপেরিমেন্টের সম্পূর্ণ ফায়দা উঠিয়ে তাজ নির্মিত হল—কিন্তু মিনারের ক্ষেত্রে কুতুব প্রথম এবং শেষ এক্‌সপেরিমেন্ট। এ ধরনের বিজয়স্তম্ভ পূর্বে কেউ করে নি; কাজেই গুণীজনের বিস্ময়ের অবধি নেই যে, হঠাৎ স্থপতি এ সাহস পেল কোথা থেকে? কানিংহাম, ফার্গুসন, কার স্টিফেন, স্যর সৈয়দ আহমদ অনেক ভেবে-চিন্তেও এর কোনো উত্তর দিতে পারেন নি।

কুতুব পাঁচতলার মিনার। প্রথম তলাতে আছে 'বাঁশী' ও 'কোণে'র পর-পর সাজানো নকশা। দ্বিতীয় তলাতে শুধু বাঁশী, তৃতীয় তলাতে শুধু কোণ; চতুর্থ ও পঞ্চম তলাতে কি ছিল জানার উপায় নেই, কারণ বজ্রাঘাতে সে দুটি ভেঙে যাওয়ায় ফিরোজ তুগলুক (যিনি 'অশোক স্তম্ভ' দিল্লী আনেন; ইনি যেমন নিজে সোৎসাহে ইমারত বানাতেন ঠিক তেমনি অকাতরে অন্যের ইমারত মেরামত করে দিতেন—দিল্লীর অতি অল্প রাজাতেই এই দ্বিতীয় গুণটি পাওয়া যায়) সে দুটি মার্বল দিয়ে মেরামত করে দেন। পঞ্চমটিতে নাকি আবার সিকন্দর লোদীরও হাত আছে। মিনারের মুকুটরূপে সর্বশেষে (যেখানে এখন আলো জ্বালানো হয়) কি ছিল সে সম্বন্ধে রসিকজনের কৌতূহলের অন্ত নেই।[৬] দুনিয়ার সব চেয়ে সেরা মিনারকে স্থপতি কি রাজমুকুট পরিয়েছিলেন—সেখানেও তিনি তাল রেখে শেষরক্ষা করতে পেরেছিলেন কিনা, তাঁর যে অদ্ভুত কল্পনা-শক্তি মিনারের সর্বাঙ্গে স্বপ্রকাশ সে-কল্পনাশক্তি দিয়ে তিনি দর্শককে কোন্ দ্যুলোকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, কে জানে?

ইমারত তৈরি করা কত সোজা! কারিগরের হাতে সেখানে কত অজস্র মাল-মশলা। গম্বুজ, থাম, আর্চ, ছত্রি, মিনারেট, ছজ্জা (ড্রিপস্টোন), কার্নিস, ব্র্যাকেট কত কী! তার তুলনায় একটা সোজা খাড়া স্তম্ভে সৌন্দর্য আনা কত শক্ত! এখানে শিল্পী সফল হয়েছেন শুধু সেটাকে কয়েকটি তলাতে বিভক্ত করে, সামঞ্জস্য রেখে প্রতি তলায় তাকে একটু ছোট করে করে, গুটিকয়েক ব্যালকনি লাগিয়ে দিয়ে এবং মিনারের গায়ে কখনো 'বাঁশী', কখনো 'কোণে'র নকশা কেটে।

৬ গেল শতকের গোড়ার দিকে এক ইংরেজ মেজরের হাতে কুতুবের মেরামতির ভার পড়ে। ব্যালকনি (গ্যালারির) রেলিঙগুলো ছিল বলে তিনি সেখানে চারপাপড়ির নিজস্ব নকশা দিয়ে রেলিঙ বানান—নীচের হানিকুম্ অর্থাৎ মৌমাছির চাকের নকশা মূল স্থপতির—এবং মাথায় 'নিজস্ব' কল্পনাপ্রসূত একটা মুকুট পরান। সেইটে দেখে দিল্লী-ওলারা সন্ত্রাসে তারস্বরে চিৎকার করেছিল। বহু বৎসর পরে লর্ড কার্জন সেই মুণ্ডুটি কেটে নীচে নামিয়ে দূরে সরিয়ে রাখেন।

'প্রপর্শনে'র এরকম চূড়ান্ত পৃথিবীর আর কোনো মিনারে পাওয়া যায় না।

আব তার গায়ের কারুকার্যও অতি অদ্ভুত। বাঁশী এবং কোণের উপর দিয়ে সমস্ত মিনারটিকে কোমরবন্ধের মতো ঘিরে রয়েছে সারি সারি লতা-পাতা, ফুলের মালা, চক্রের নকশা। এগুলো জাতে হিন্দু এবং এর সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে এক সারি অন্তর অন্তর আরবী লেখার সার—সেগুলো জাতে মুসলমান। কিন্তু উভয় খোদাইয়ের কাজই যে হিন্দু শিল্পী করেছেন সে বিষয়ে কণামাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। গোটা মিনারটির পরিকল্পনা করেছে মুসলমান, যাবতীয় কারু-শিল্প করেছে হিন্দু—ভারতবর্ষে মুসলমানদের সর্বপ্রথম সৃষ্টিকার্যে হিন্দু-মুসলমান মিলে গিয়ে যে অদ্ভুত সাফল্য দেখিয়েছিল সে-মিলন পরবর্তী যুগে কখনো ভঙ্গ হয় নি, কভু বা মুসলমানের প্রাধান্য বেশী, কোনো ইমারতে হিন্দুব প্রাধান্য বেশী। আট শত বৎসর একসঙ্গে থেকেও হিন্দু-মুসলমান চিন্তার ক্ষেত্রে, রাজনীতির জগতে সম্পূর্ণ এক হয়ে যেতে পারে নি, কিন্তু কলার প্রাঙ্গণে (স্থাপত্য, সঙ্গীত এবং নৃত্যে) প্রথম দিনেই তাদের যে মিলন হয়েছিল আজও সেটি অটুট আছে।

কুতুবের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আর কোনো মিনার কখনো মাথা খাড়া করেনি। দীর্ঘ আট শতাব্দী ধরে বহু বাদশা বহু ইমাবত গড়েছেন কিন্তু 'কুতুবের চেয়েও ভালো মিনার গড়বো' এ সাহস কেউ দেখান নি। যে ইংবেজ দিল্লীতে সেক্রে-টারিয়েট, রাজভবন গড়ে, কলকাতায় ভিক্টোরিয়া মেমোবিয়াল বানিয়ে নিজকে অতুল বিড়ম্বিত করেছে সেও বিলক্ষণ জানতো কুতুবের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কোনো স্থপতির কর্ম নয়।[৭]

আলাউদ্দীন খিলজীর মত দুঃসাহসী রাজা ভাবতবর্ষে কমই জন্মেছেন। এক-মাত্র তিনিই চেয়েছিলেন, কুতুবের সঙ্গে পাল্লা দিতে। তাই কুতুবের দ্বিগুণ ঘের দিয়ে তিনি আরেকটি মিনাব গড়তে আরম্ভ করেন—বাসনা ছিল মিনারটি কুতুবের দ্বিগুণ উঁচু হবে। ইমারত মাত্রেরই একটা অপটিমাম্ সাইজ আছে—অর্থাৎ যার চেয়ে বড় হলে ইমারত খাবাপ দেখায়, ছোট হলেও খাবাপ দেখায় (সর্ব কলাতেই এ সূত্র প্রযোজ্য; কিন্তু স্থাপত্যের বেলা এটা অন্যতম মূলসূত্র)—কাজেই আলাউদ্দীনের চূড়া ডবল হলে ফল কি ওতরাতো বলা কঠিন। তা সে যা-ই হোক, মিনাবেব কাঠামোর কিছুটা শেষ হতে-না-হতেই ওপাবেব ডাক খিলজীর

---

৭ অক্টরলনি মনুমেন্টে কোনো কলাপ্রচেষ্টা নেই বলে সেটাকে কুতুবের সঙ্গে তুলনা করা অন্যায়—সেটাকে চটকলের চোঙার সঙ্গে তুলনা করা যায়। বড়বাজারের দালান কোঠার সঙ্গে কেউ তাজের তুলনা করে না।

কানে এসে পৌঁছল যে-পারে খুব সম্ভব মিনার হাতে নিয়ে লাঠালাঠি চলে না।

আপন মহিমায়, নিজস্ব ক্ষমতায় যে স্তম্ভ দাঁড়ায় তার নাম মিনার, এবং মসজিদ, সমাধি কিংবা অন্য কোনো ইমারতের অঙ্গ হিসেবে যে মিনার কখনো থাকে, কখনো থাকে না, তার নাম মিনারেট—মিনারিকা। কুতুবের পর পাঠান মোগল বিস্তর মিনারেট গড়েছে, কিন্তু সেগুলোও কুতুবের কাছে আসতে পারে না। তাজের মিনারিকা ভুবনবিখ্যাত, কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি শিল্পী সেখানে নতমস্তকে হার মেনে নিয়ে সেটাকে সাদামাটার চরমে পৌঁছিয়ে খাড়া করেছেন। পাছে লোকে তাঁর মিনারিকার সঙ্গে কুতুবের তুলনা করে লজ্জা দেয় তাই তিনি সেটাকে গড়েছেন এমন ন্যাড়া করে যে দর্শকের মন অজান্তেও যেন কুতুবকে স্মরণ না করে। না হলে যে-তাজের সর্বাঙ্গে গয়নার ছড়াছড়ি তার চারখানা মিনারিকা-হস্তে 'নোয়াটুকু'র চিহ্ন নেই কেন? ওদিকে দেখুন, হুমায়ুনের সমাধি-নির্মাতা ছিলেন আরওঘড়েল—তিনি তাঁর ইমারতটি গড়েছেন মিনারিকা সম্পূর্ণ বর্জন করে।

দিল্লী-আগ্রার বহু দূরে, কুতুবের আওতার বাইরে গুজরাতের রাজধানী আহমদাবাদে আমি একটি মিনারিকা দেখেছি যার সঙ্গে কুতুবের কোনো মিল নেই এবং বোধ হয় ঠিক সেই কারণেই তার নিজস্ব মূল্য আছে। রাজা আহমদের —এঁরই নামে আহমদাবাদ—বেগম রানী সিপ্রির মসজিদে একটি মধুরদর্শন মিনারিকা বহু ভূপর্যটকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। গুজরাত এবং রাজপুতানার মেয়েরা তাদের বাহুলতা মণিবন্ধে যে বিচিত্র-আকার, বিচিত্র-দর্শন অসংখ্য বলয়-কঙ্কণ পরে এ মিনারিকা যেন সেই কমনীয়তায় অনুপ্রাণিত। রাজেশ্বরী সিপ্রি যেন তাঁরই অনুপম হাতখানি নভোলোকের দিকে তুলে ধরেছেন ভুবনেশ্বরের ললাটে তিলক পরিয়ে দেবেন বলে।

কুতুবের সঙ্গে সঙ্গে—আসল কুতুব তৈরী হয় প্রথম তলা থেকে নমাজের আজানের জন্য—নির্মিত হয় কুওওতুল ইসলাম মসজিদ। এ মসজিদে এখন দর্শনীয় তার উন্নতদর্শন তোরণ (আর্চ) এবং স্তম্ভগুলি। ভাবতীয় কারিগর তখনো জোড়ের পাথর (কী-স্টোন) তৈরী করে তার গায়ে গায়ে চৌকো পাথর লাগিয়ে আর্চ বানাতে শেখে নি বলে[৮] আর্চের সঙ্গে জোড়া বাকি ইমারত ভেঙে

---

৮ ইঞ্জিনিয়ারিঙ স্থাপত্যের অংশ বটে কিন্তু বিশুদ্ধ স্থাপত্য-রস আস্বাদনের সময় তার স্থান অতি নীচে। আর্চ, ডোম বানাতে 'কী-স্টোন'

পড়েছে ; কিন্তু রসের বিচারে এ আর্চটি এখনো অতুলনীয়। এর শান্ত গাম্ভীর্য, আপন কৌলীন্যেই সুপ্রতিষ্ঠিত ঋজু অবস্থিতি নিতান্ত অরসিক জনেরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। পরবর্তী যুগে বহু জায়গায় বিস্তর আর্চ নির্মিত হয়েছে, কিন্তু এর প্রসাদগুণ এখনো অতুলনীয়।

এবং এর গায়ে যে হিন্দু কারুকার্য তার সুনিপুণ দক্ষতা, সুক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং মন্দাক্রান্তা গতিচ্ছন্দ দেখে যেন শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। যেন অজন্তা ইলোরার চিত্রকর শিলাকর দুজনে মিলে প্রাণের আনন্দে এর প্রতিটি রেখা প্রতিটি বক্র প্রতিটি চক্র এঁকে চলেছে। এদের নিশ্চয়ই বলা হয়েছিল যে মুসলমান স্থাপত্যে পশুপক্ষী আঁকা বারণ। সেইটে মেনে নিয়ে কী আশ্চর্য নৈপুণ্যে 'শেষনাগ' মতিফকে এরা সাপ না বানিয়েও সাপ এঁকেছে সেটা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় কলার সঙ্গে এরা কুরানের হরফও খোদাই করেছে সমান দক্ষতা নিয়ে। উভয়ের সংমিশ্রণ অপূর্ব, রসসৃষ্টি অসামান্য।

কুওওতুল ইসলাম মসজিদের থামগুলো হিন্দু বৌদ্ধ ও জৈন মন্দির থেকে নেওয়া। এদের গায়ে দর্শক বিস্তর পশুপক্ষী, বুদ্ধ এবং তাঁর শিষ্য এবং অন্যান্য দেব-দেবীর নানা মূর্তি দেখতে পাবেন। মসজিদ গড়ার সময় এগুলোর গায়ে পলস্তরা লাগিয়ে মূর্তিগুলো ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। পলস্তরা খসে যাওয়াতে এখন আবার দেখা যাচ্ছে।

এভাবে প্রতিটি ইমারত নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তা হলে দশ-ভলুমি কেতাব লিখতে হয়—এবং সেগুলো কেউ পড়বে না। আমার উদ্দেশ্য—বাকি ইমারতগুলো দর্শক যেন নিজে আরো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন।

যেমন, কুওওতুল ইসলামের গম্বুজ রসের ক্ষেত্রে নগণ্য—তার পরের ইমারত ইলতুৎমিশের সমাধিতে সেটা ভেঙে পড়ে গিয়েছে—খিলজী যুগে সেটা সুন্দর •হতে

ইত্যাদি ইঞ্জিনিয়রী ব্যাপার পাঠক চেম্বার অভিধান দেখেই বুঝে নিতে পারবেন। এসব স্থাপত্যের পশ্চাতে কী অদ্ভুত ইঞ্জিনিয়ারিঙ স্কিল আছে তার আলোচনা আমি আদপেই করি নি। যেমন, কুতুবের আসল কেরামতি যে এত অল্প গোড়া (বেস্) নিয়ে এত উঁচু মিনার আর কোথাও হয় নি। অদ্ভুত ভারসাম্যই (ব্যালান্স্) তার কারণ। এ যেন বাজিকর হাতের আঙুলের ডগায় বিশগজী বাঁশ খাড়া করে রেখেছে। ইঞ্জিনিয়ারী হিসেবে কণামাত্র ভুল থাকলে কুতুব হুড়মুড়িয়ে পড়ে যেত।

আরম্ভ করেছে, তুগলুক যুগে গম্বুজ রীতিমত রসসৃষ্টি করে ফেলেছে, সৈয়দ-লোদী যুগে সে পৃথিবীর আর দশটা গম্বুজের সঙ্গে পাল্লা দিতে আরম্ভ করেছে, হুমায়ুনের গম্বুজকে তো কেউ কেউ তাজের চেয়েও ভালো বলেছেন, আর তাজের তম্বঙ্গ গম্বুজ, শুনি, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ। দেখলে পরে তার ক্ষীণ কটিকে নাকি জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে।

কিংবা আর্চের উত্থান-পতন দেখুন। কিংবা দেখুন ছত্রির আবির্ভাব ক্রমবিকাশ। হুমায়ূনের কবর ও তাজের ছাতের উপরকার ছত্রির মতো ছত্রি পৃথিবীর আর কোথাও পাবেন না। স্থাপত্যে ছত্রির ব্যবহার মুসলমানেরা এদেশে এসে শিখল। তাই এদেশের স্থাপত্যের স্কাই-লাইন ইরান তুরানের স্থাপত্যকে এ-বাবদে অনায়াসে হার মানায়।

কিংবা দেখুন, ভিতবকার কারুকার্য, যার পরিসমাপ্তি তাজের 'মর্মরস্বপ্নে'।

দাস-যুগের শেষের দিকে মুসলিম জিওমেট্রিক ডিজাইনের বাড়াবাড়ি হয়েছিল, খিলজি-যুগে আবার ভারসাম্য ফিরে পেল।

তুগলুক যুগে পাবেন দার্ঢ্য—শক্তিশালী স্থাপত্যের পরিপূর্ণতা। অলঙ্কার এখানে বাহুল্যরূপে বর্জিত। দেয়াল বাঁকা—যেন পিরামিডের ঢঙে ট্যারচা করে একে আরও মজবুত করার চেষ্টা হয়েছে, গম্বুজও শক্তির পরিচায়ক। লাল পাথর, কালো শ্লেট (তখনো কালো মার্বেল এ-দেশে আসে নি) এবং মর্মরের ধবল এই তিন রঙের খেলা নিয়েই স্থপতি এখানে অলঙ্কারহীন দৃঢ়তার একঘেয়েমি ভেঙেছেন। গিয়াসউদ্দীন তুগলুকের কবর এরই প্রকৃষ্টতম উদাহরণ।

সৈয়দ-লোদী বংশদ্বয়ের অর্থ ও প্রতিপত্তি দুই-ই ছিল সামান্য। তাই এঁদের কলা-প্রচেষ্টা ছোট ইমারতের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। ওদিকে ইরান-তুরানের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল বলে সে-দিক থেকে নব নব অনুপ্রেরণাও আসছিল না। ফলে তাদের স্থাপত্যে হিন্দু প্রাধান্য বেশী এবং ছোট ইমারতে অলঙ্কারের প্রয়োজন বড় ইমারতের চেয়ে বেশী। কম্পজিশনেও এই প্রথম হিন্দু প্রভাব স্পষ্ট হয়ে এল। বস্তুত এই আটকোণওলা ইমারত এবং আট দিকের ঘেরা বারান্দা বৌদ্ধস্তূপ এবং তার প্রদক্ষিণচক্রের কথাই মনে করিয়ে দেয়। হিন্দুরা স্তম্ভ-নির্মাণে চিরকালই দক্ষ, ছত্রিও তাদেরই সৃষ্ট। হিন্দু ছজ্জা (ড্রিপ-স্টোন—এগিয়ে আসা কার্নিসের মত) ছাতের বৃষ্টি ছড়িয়ে দেবার জন্য এদেশে প্রয়োজন—ইরানে দরকার নেই বললেও চলে—সে-সব এসে এখানে ইমারতের সৌন্দর্য বাড়িয়েছে। তুগলুক প্রভাব এখানে অতি সামান্য—কেবল মাত্র ট্যারচা

স্তম্ভে কিছুটা পাওয়া যায়। সৈয়দ-লোদী স্থাপত্য দেখে মানুষ হতবাক হয় না সত্য, কিন্তু এর এমন একটা কমপেক্টনেস্ বা ঠাস-বুনুনি আছে যা অন্য স্থাপত্যে বিরল। অল্প দিয়ে রসসৃষ্টিতে সৈয়দ-লোদী প্রথম না হলেও প্রধানদের একজন।

মোগল-যুগ আরম্ভ হল হুমায়ুনের কবর দিয়ে। সেখানে ইরান-তুরানের প্রাধান্য। কিন্তু ছবি এবং পদ্মফুলের ডিজাইন এখানে প্রচুর এবং কারুকার্যেও হিন্দু প্রাধান্য বেশী। সিক্রিতে ইরাণী ভাব এত কমে গিয়েছে যে, কোনো কোনো ইমারতে কার প্রাধান্য বেশী কিছুতেই স্থির করা যায় না। সেকেন্দ্রার গম্বুজ শেষ করার পূর্বেই আকবর ইহলোক ত্যাগ করেন—তাই বলা শক্ত সম্পূর্ণ সমাধি মনে রসের কোন্ ভাবের উদয় করে দিত। দিওয়ান-ই-খাস ও আম্ যে অলঙ্কারের চূড়ান্তে পৌঁছে গিয়েছে সে সত্য তো পৃথিবীর সবাই স্বীকার করে নিয়েছে। এত দিন বলা হত, পাঠান স্থাপত্যে স্থপতি ও স্বর্ণকার একজোটে কজে করেছেন। দিওয়ান-ই-খাস্ ও আম্ দেখে লোকে বলল, এইবারে এসে জহুরীও যোগ দিয়েছেন।

মোগল-কলা এত বিচিত্র ও ভিন্নমুখী যে, তাকে গুটিকয়েক সূত্রে ফেলা প্রায় অসম্ভব। তবে স্থাপত্যের বিকাশ দেখতে হলে সব চেয়ে উত্তম পন্থা হুমায়ুনের কবর ও তাজ দুটি মিলিয়ে দেখা। দুটোর গম্বুজ মিলিয়ে দেখুন, ছত্রিগুলো কার ভালো (এখানে বলা উচিত হুমায়ুনের ছত্রিগুলো নীল টাইলে ঢাকা ছিল ; এখন উঠে গিয়ে কালো হয়ে গিয়েছে—তাই আগে ছিল গম্বজ মর্মরের সাদা, পুরো ইমারত লাল পাথরের আর ছত্রিগুলোর গম্বুজ নীল, তাজে তিনই মার্বেলের), হুমায়ুনের ভিত্তিতে এক সার আর্চ (তার ভিতর দিয়ে নীচে যাওয়া যায়), তাজে তার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে মাত্র, গুলদস্তাজ (মিনারিকার ও চোট মিনারিকা যার শেষ হয় অর্ধস্ফুট পদ্মকোরকে) দুই ইমারতেই এক রকম, নির্মাণকালে হুমায়ুনে ছিল লাল-সাদা-নীলের সামঞ্জস্য, তাজ শুভ্র-ধবল এবং সবচেয়ে বড় পার্থক্য—হুমায়ুনে মিনারিকা নেই, তাজের চার কোণে চারটি। আপনার কোন্‌টি ভালো লাগে ? আর এই শৈলীর অধঃপতন দেখতে হলে দেখুন সফদরজঙ্গের কবর—ওয়েলিংডন অ্যারোড্রোমের কাছে।

স্পষ্ট দেখছি হুমায়ুনে দার্ঢ্য, তাজে মাধুর্য।

তার কারণ, অনেক ভেবে আমি মন স্থির করেছি, হুমায়ুনের সমাধি নির্মাণ করেছেন তাঁর বিধবা—স্বামীর জন্য। তাই তাতে পৌরুষ সমধিক। তাজ নির্মাণ করেছেন বিরহকাতর স্বামী—প্রিয়ার জন্য। তাই সেটিতে লালিত্য বেশী।

বেজো না চরণে চরণে

বিখ্যাত সাহিত্যিকদের কাছে নাকি নবীন সাহিত্যিকরা তাঁদের লেখা নিয়ে গিয়ে চাঁইদের সার্টিফিকেট চান। বেচারীদের বিশ্বাস, চাঁইবা উত্তম সার্টিফিকেট দিলে তাঁরা সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতি-প্রতিপত্তি পেয়ে যাবেন।

চাঁইদের কেউ-কেউ সার্টিফিকেট দেন, কেউ লেখককে অন্য চাঁইদের কাছে পাঠিয়ে দেন, কেউ বা অসুখের ভান করে দেখাই করেন না। এ বাবদে পূজনীয় রাজশেখরবাবু রাজকীয় পন্থাটি বেব কবে আরামসে দিন কাটাচ্ছেন। তিনি সবাইকে অকাতরে সার্টিফিকেট দেন—এমন কি মাঝে-মধ্যে না চাইলেও দেন। তাঁব বয়স হয়েছে। শেষের কটি দিন শান্তিতে কাটাতে চান। সোজাসুজি 'দেব না' বললে তাঁকে আব বাঁচতে হবে না, এবং 'দেব-দিচ্ছি' 'দেব-দিচ্ছি' করে টাল-বাহানা দেবার মতো শক্তিও তাঁর নেই। রবীন্দ্রনাথ অমিতবীর্য পুরুষ-সিংহবৎ ছিলেন, উমেদওয়ারদের ঠেকাবার মতো তাঁর সেক্রেটারিও ছিলেন—তবু তিনিও অকাতরে সার্টিফিকেট দিতেন। প্রাণের প্রতি তাঁর অহেতুক কোনো মায়াও ছিল না—'মরণ রে তুহুঁ মম শ্যাম সমান' এ গান তিনি রচেছেন অল্প বয়সেই—তবু তিনি 'না-চাহিতে যারে দেওয়া যায়' ভাবখানা মুখে মেখে পিলপিল করে সার্টিফিকেট বিলোতেন। আমাকে পর্যন্ত তিনি একখানা দিয়েছিলেন—অবশ্য সাহিত্যেব জন্য নয়, চাকরির জন্য। আমি তাঁর 'কৃতী ছাত্র' এ ধরনের বহুবিধ আগড়ম-বাগড়ম লিখে তিনি আমাকে শ্যামাপ্রসাদবাবুর কাছে পাঠিয়েছিলেন। শ্যামাপ্রসাদবাবু বিচক্ষণ লোক, তিনি আমাকে চাকবি দেন নি। অন্যত্র চেষ্টা করাব জন্য সার্টিফিকেটখানা ফেরত পেলুম না—কারণ চিঠিখানা ছিল নিতান্ত প্রাইভেট এবং পার্সনাল। শ্যামাপ্রসাদবাবু রবিবাবুব সার্টিফিকেটের মূল্য না দিলেও রবিবাবুর হাতের লেখা চিঠিব মূল্য জানতেন। চিঠিখানা সযত্নে শিকের হাঁড়িতে তুলে রেখে দিয়েছিলেন।

এবং যাঁরা কিছুতেই সার্টিফিকেট দিতে রাজী হন না, তাঁদের দু-একজনকে আমি চিনি। এবং এ কথাও বিলক্ষণ জানি, তাঁরা যে-সব বইয়ের সার্টিফিকেট দেওয়া দূরে থাক, গাল-গালাজ পর্যন্ত করেছেন তারই অনেকগুলো বাজারে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছে। রাজশেখরবাবুর 'দুই সিংহ' গল্পে আছে কোনো লেখক তাঁর বই কিছুতেই বিক্রি হচ্ছে না দেখে কেনো এক বাঘা সাহিত্যিককে ঘুষ দিয়ে লিখিয়ে নেয়, বইখানা অতিশয় অশ্লীল এবং কদর্য। ফলে নাকি সে বইয়ের প্রচুর কাটতি হয়েছিল।

কিন্তু এ-সব শোনা কথা, কিংবা কাল্পনিক। রবিবাবু টাকের ওষুধের প্রশংসা

করাতে ওষুধের বিক্রি বেড়েছিল কি না তার সঠিক স্টাটিস্‌টিক্‌স্ এখনো দেখি নি। উল্টোটাও সঠিক জানবার উপায় নেই। এ যেন আবহাওয়ার পূর্বাভাসের মতো। বেতারে আলিপুর বললে, 'সন্ধ্যায় বৃষ্টি হবে'। আপনি অবিশ্বাস করে ছাতা না নিয়ে বেরলেন। ফিরলেন ভিজে ঢোল হয়ে। তবেই দেখুন, এমনি লক্ষ্মীছাড়া দফ্‌তর যে, অবিশ্বাস করেও নিষ্কৃতি নেই, বিশ্বাস তো করা যায়ই না।

* *

কিন্তু একখানা বই পড়ে আমি এ-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ হদিস পেয়েছি।

বইখানার নাম 'লিমিট অব্ আর্ট'। চল্লিশ টাকা দাম। ঢাউস মাল। কপিকল দিয়ে শেলফ্ থেকে ওঠাতে নাবাতে হয়।

কবিতার চয়নিকা। গ্রীক-লাতিন থেকে আরম্ভ করে, ফরাসী-জর্মন-ইংরিজী-স্প্যানিশ-রুশ তাবৎ ইয়োরোপীয় ভাষা থেকে কবিতা সঞ্চয় করে এ-চয়নিকাটি নির্মাণ করা হয়েছে।

গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক সবিনয় নিবেদন করেছেন, তিনি এ-চয়নিকার মাধুকরী করার সময় নিজের ব্যক্তিগত রুচির উপর নির্ভর করেন নি। তবে কি তিনি বন্ধুবান্ধবদের রুচির উপর নির্ভর করেছেন? তাও নয়। তিনি লিখেছেন, বিখ্যাত প্রখ্যাত কবিরা যে-সব অন্যান্য কবির কবিতার প্রশংসা করেছেন তাই দিয়ে তিনি এ-'সঞ্চয়িতা' নির্মাণ করেছেন। যেমন মনে করুন, বায়রন বলেছেন, 'পেত্রাকের এ ছত্র কটি কী চমৎকার, কী অনির্বচনীয়!' চয়নিকাকার সেই কবিতাটি তুলে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার বায়রনের প্রশস্তিটিও তুলে দিয়েছেন। ঠিক এইভাবেই, শেকস্‌পীয়র আছেন গ্যেটের প্রশংসাসহ, কীট্‌স আছেন শেলির তারিফযুক্ত, এবং আরো বিস্তর চেনা-অচেনা কবি।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, এর চেয়ে আর উত্তম ব্যবস্থা কি হতে পারে?

কিন্তু বিশ্বাস করুন, আর নাই করুন, এ-রকম রদ্দি, ওঁচা কবিতার সঙ্কলন আমি জীবনে কোনো ভাষাতে কখনো দেখি নি।

এবং শুধু তাই নয়, পৃথিবীর সর্বোত্তম বেশ কয়েকটি কবিতা তাতে বাদ পড়েছে। তুলনা দিয়ে বলতে পারি, একবার এই বঙ্গভূমিতেই এ-ঘটনা ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথের কোন্ কোন্ কবিতা বাঙালী পাঠকের ভালো লাগে তারই ভোট নিয়ে একখানি 'চয়নিকা' রচিত হয়েছিল। তাতে এত বেশী ভালো কবিতা বাদ পড়ে গিয়েছিল, এবং অপেক্ষাকৃত কাঁচা লেখা ঢুকে গিয়েছিল যে এর পর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যে চয়ন করেন সেটিই 'সঞ্চয়িতা' এবং বাজারে সেইটেই চালু। এস্থলে পাঠক অবশ্য বলবেন, 'রাস্তার লোকের ভোট নিয়ে কি আর উত্তম

কবিতা-সঞ্চয়ন হয় ? ওদের কীই বা বুদ্ধি, কীই বা রুচি।' অতএব যে বিদেশী চয়নিকা দিয়ে আরম্ভ করেছিলুম সেইটেতেই ফিরে যাই।

অর্থাৎ ভালো ভালো কবি কর্তৃক নির্মিত সঞ্চয়নও উত্তম হল না কেন ?

তার প্রধান কারণ, সাধারণ এবং সুরুচিসম্পন্ন পাঠক কবিতা পড়ে কিংবা গান শুনে যদি আনন্দ পায় তবেই সে বলে, কবিতা কিংবা গানটি ভালো। অর্থাৎ তার কাছে যে-কোনো বস্তু রসোত্তীর্ণ হলেই হল। কিন্তু কবি যখন অন্য কবির কবিতা পাঠ করেন তখন তাঁর নজর যায় কবিতার গ ঠন, ভাষা, ছন্দ, মিল—এক কথায় আঙ্গিকের দিকে। কবিতাটি রচনা করতে গিয়ে কবিতাকার কি কি মালমশলা নিয়ে আরম্ভ করেছেন, তাঁকে কোন্ কোন্ বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে সেগুলো তিনি কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন কি না পাঠক-কবির দৃষ্টি থাকে প্রধানতঃ সেই দিকে। কিংবা মনে করুন, আপনি আমি যখন গান শুনি তখন গানটি মিষ্ট এবং মর্মস্পর্শী হলেই হল। পক্ষান্তরে আকছারই দেখবেন, বদখদ গলা নিয়ে, বিদকুটে মান্ধাতার আমলের একটা সম্পূর্ণ অজানা রাগ ধরলে এক হাড়-চিমসে গাওয়াইয়া। তবলচীও বাজাতে লাগলো এমন এক তাল যে তার কোথায় সম, কোথায় ফাঁক কিছুই মালুম হচ্ছে না। আপনি বিরক্তিতে উঠি-উঠি করছিলেন, এমন সময় দেখেন হঠাৎ মহ্ফিলের অন্য গাওয়াইয়া শ্রোতারা 'আহা, আহা, ক্যাবাৎ, ক্যাবাৎ' বলে অচৈতন্যি প্রায়। কি হল ? ব্যাপারটা কি ? না এই ওস্তাদস্য ওস্তাদ এক অ্যাসন অতি-অতি কোমল এমন এক কঠিনস্য কঠিন জায়গায় লাগিয়ে দিয়ে অ্যাসা এক পানিপথ নাকি জয় করেছেন যা পূর্বে নাকি কেউ কখনো করতে পারে নি—না, তানসেন নাকি মাত্র দু'বার পেরেছিলেন, ওস্তাদ আব্দুল করীম কুল্লে একবার! ব্যস, হয়ে গেল !

অবশ্য সব পাঠক কবি কিংবা শ্রোতা-গাওয়াইয়াই যে শুদ্ধমাত্র আঙ্গিক এবং টেক্নিকল স্কিলের দিকে এক-চোখা দৈত্যের মতো তাকিয়ে থাকেন সে কথা বলছি না—তবে ঐ হল গিয়ে নিয়ম, এবং পূর্বোল্লিখিত 'লিমিট্ অব্ আর্ট' ঐ পর্যায়ের বই।

সমসাময়িক লেখক যখন অন্য লেখকের লেখা পড়েন তখন আরেক মুশকিল। দৃষ্টান্ত দিয়ে কথাটা খোলসা করি।

এই মনে করুন, গৌরকিশোর ঘোষ রম্য-রচনা লিখে দেশে নাম করে ফেলেছেন। আমারও বাসনা গেল, ঐ লাইনে যখন খ্যাতি আছে, পয়সাও থাকতে পারে, তখন আমিই বা বাদ যাই কেন? গৌরকিশোরের লেখার

অনুকরণে আমিও কয়েকটি রম্য-রচনা লিখে নিয়ে গেলুম তাঁর কাছে। তিনি দেখলেন, তাঁর এক নবীন শাকরেদ্ জুটলো, তাঁর অনুকরণে এবার একটা 'স্কুল' 'ঘরানা' গড়ে উঠতে চললো। আমার রচনা যে আদপেই 'রম্য' হয় নি, এমন কি এরে 'রচনা'ও কওয়া যায় না সেদিকে তাঁর নজরই গেল না। তিনি সার্টিফিকেট দিলেন, 'তোফা লেখা, খাসা লেখা, বেড়ে লেখা।' আমিও খুশী। অবশ্য এ-সার্টিফিকেট আমি এখনো কাজে লাগাই নি। সাহিত্যিকের সার্টিফিকেট-হাল পাঠকের পানি পাবে কি না সে বাবদে আমার মনে এখনো ধোঁকা রয়ে গেছে।

পক্ষান্তরে ফরাসী কবি-সম্রাট মলিয়ের নাকি তাঁর তাবৎ কৌতুকনাট্য পড়ে শোনাতেন তাঁর নিরক্ষরা বাড়িউলীকে। বাড়িউলী যে-সব রসিকতা শুনে হাসতো, তিনি সে-সব রসিকতার মাত্রা বাড়িয়ে দিতেন, যেগুলো শুনে গম্ভীর-মূর্তি ধারণ করতো সেগুলো তিনি নির্মমভাবে কেটে দিতেন। অথচ আজ তো গুণীমূর্খ সবাই তাঁর নাট্য দেখে আনন্দ লাভ করে। এই কয়েকদিন মাত্র হল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কৃত তাঁর বাঙলা অনুবাদ কলকাতার রসিক সমাজকে যা হাসালো তা দেখলে স্বয়ং মলিয়েরই অবাক হতেন।

তবে কি ঐ বাড়িউলী অতিশয় সুরসিকা ছিলেন ? এ-পর্যন্ত কেউ তো তা বলেন নি। তবে কি ওঁকে না শুনিয়ে সে-যুগের নামকরা সমঝদারকে শোনালে মলিয়েরের কাব্য আরো রসোত্তীর্ণ হত ? বলা অসম্ভব।

* *

যে নল চালিয়েছিলুম, সে তবে এখন এসে খাড়া হল কোথায়, পাকড়ালো কাকে ? অর্থাৎ হরে-দরে দাঁড়ালো কি ?

আমার বিশ্বাস এ-নল কোথাও দাঁড়াবে না। এ-আলোচনায় কস্মিনকালেও কোনো হদিস পাওয়া যাবে না।

তবে যদি শোধান, আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস কি, তবে আমি নবীন লেখককে অকুণ্ঠ ভাষায় বলবো, সার্টিফিকেট কুড়োতে যেয়ো না। ওতে কানাকড়ির লাভ নেই। ঐ যে পাঠক-সম্প্রদায় নামক কিম্ ভূত কিম্ আকার জীব আছে সে যে কখন কার প্রতি সদয়, কার প্রতি নির্দয়, কখন কাকে আশা-গাছের শাখায় চড়ায়, আর কখন কাকে নির্মমভাবে জিল্ট্ করে তার হদিস কেউ কখনো পায় নি।

অবশ্য আপনি যদি ভবিষ্যৎ যুগের পাঠকের জন্য লেখেন তবে আপনার কোনো ভাবনা নেই। তবে সে-কথাটা পুস্তকের অবতরণিকায় বলে দিলেই সাধু আচরণ হয়। এ বছরের তাজা মাছকে আসছে বছরের শুঁটকি বলে চালানোটা

জোচ্চুরির শামিল। পঞ্চাশ বছর পরে যে র মাল মেচ্যোর লিক্যোর হবে সেটা আজ বাজারে ছাড়া ধাপ্পা। তার জন্য আজ যে-লোক সার্টিফিকেট দেয় সেও ধাপ্পাবাজ।

* *

হালে আকাশে এক নয়া চিড়িয়ার উদয় হয়েছে।

নিজের সার্টিফিকেট নিজে লিখে, কিংবা/এবং চেলা-চামুণ্ডাদের সামনে নিজের লেখার গুণকীর্তন করতে গিয়ে পয়েন্ট বাংলে বিজ্ঞাপন লিখিয়ে নিয়ে কিংবা/এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের অন্যান্য লেখাতে সে লেখা সম্বন্ধে দারুণ-দারুণ রেফরেন্স্ ঝেড়ে—সব-কিছু প্রকাশককে দিয়ে বিজ্ঞাপনরূপে ছাপিয়ে দেওয়া।

এ সিস্টেমের সঙ্গে 'আধুনিক বাঙলা কবিতা'র বেশ মিল আছে। বাঙলা ভাষায় লেখা দেখে পড়তে গিয়ে মালুম হল যে কিছুই মালুম হচ্ছে না—এ ভাষার শব্দরূপ, ধাতুরূপ কৃৎ তদ্ধিত আপনি কিছুই জানেন না। অর্থাৎ বন্ধু বাঙলা ভাষার মুখোশ পরে অজানাজন এসে মেরেছে চাকু।

প্রকাশকের মুখোশ পরে এখানে আসে লেখক—হাতে চাকু। পাঠক, সাবধান !!

রবীন্দ্রনাথ কি যেন গেয়েছেন, দুঃখের বেশে এসেছ বলে তোমাকে ডরাবো না ? এ তার উল্টো পিঠ ; মিত্রের বেশে এসেছে বলে তোমারেই যত ভয়।

এ সিস্টেম পাঠক-ব্যাঙ্কারের চালানো জুয়ো-ভূমি মন্টে কার্লোর ব্যাঙ্ক ভাঙতে পারবে কি না, সেই খবরের প্রত্যাশায় আছি। এযাবৎ তো কোনো সিস্টেম পারে নি।

আর যা করুন, করুন, কিন্তু পাঠকসাধারণকে আহাম্মুখ ঠাউরে আপন আহাম্মুখির পচা ডিম হাটের মধ্যিখানে ফাটাবেন না !!

ইভান সের্গেভিচ তুর্গেনেফ

গত ৩রা সেপ্টেম্বর ইভান তুর্গেনেফের ৭৫তম মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে। এ-উপলক্ষে বহু দেশ তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে আপন আপন সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়েছেন। কলকাতা বেতার কেন্দ্র পর্যন্ত সেদিন তাঁকে স্মরণ করেছেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে, আজ এঁর, কাল ওঁর কত লোকের মৃত্যুবার্ষিকী, জন্মবার্ষিকী নিত্য নিত্য হয়ে যাচ্ছে, সেগুলোর হিসেবরাখতে যাবে কে ?

যার যে রকম খুশী, এর বেশী কিছু বলা যায় না।

তাই জানি, আমরা যখন গোরস্তানে যাই, তখন খুঁজি আপন প্রিয় ও পরিচিতজনের কবর। যখন কোনোও নূতন লাইব্রেরিতে ঢুকি তখন খুঁজি আপন প্রিয় লেখকের বই। তাই তুর্গেনেফের শতবার্ষিকী না হয়ে ৭৫তম মৃত্যুদিনও আমার ও আমার মতো বয়স্কদের মনে দোলা লাগিয়েছে। তরুণরা লাইব্রেরিতে যে-রকম নূতন বইয়ের সন্ধান নেয়, ক্ল্যাসিক্স্ পড়ে না, ঠিক তেমনি তারা তুর্গেনেফ কিংবা হাইনের শতাব্দীপ্রয়াণও স্মরণ করে না ; তারা স্মরণ করে র‍্যাঁবো কবে হেঁচেছিলেন, ভেরেন কবে কেশেছিলেন।

তা তারা করুক। কিন্তু যখন দেখি অপেক্ষাকৃত বয়স্ক এবং তথাকথিত শিক্ষিত লোকও সদম্ভে বলে বেড়াচ্ছেন র‍্যাঁবোর কাছে রবি ঠাকুর শিশু, মাইকেলের অমিত্রাক্ষর উডেন্ (কাষ্ঠরস) এবং সম্পাদক-মণ্ডলীও সেগুলো পরম শ্রদ্ধাভরে ছাপাচ্ছেন তখন এঁরা যে তুর্গেনেফকে স্মরণ করবেন না সে তো জানা কথা। শুধু তাই নয়, এখন আপনারা আমার পক্ষে তুর্গেনেফ কিংবা সত্যেন দত্তকে স্মরণ করতে হলে লণ্ডনে রঙিন হওয়ার মতো রীতিমতো সঙ্কট-সঙ্কুল— রাষ্ট্রভাষায় যাকে বলে 'খতরনাক্'—স্কন্ধোপরি যুগ্ম-শিবের প্রয়োজন।

আমি মুসলমান। আমার শাস্ত্রে আছে বিধর্মীর ভয়ে আল্লা রসুলকে বর্জন করা মহাপাপ। আমার সাহিত্যধর্মে গুরু-মুর্শীদ হয়ে আছেন রবি ঠাকুর, হাইনে, তুর্গেনেফ, মাইকেল। আজ এঁদের অস্বীকার করতে পারব না—র‍্যাঁবো-এলিয়ট সম্প্রদায় যতই শক্তিশালী হন না কেন।

এবং আমার মনের গোপন কোণে একটা অহেতুক ক্ষীণ আশা আছে যে, তুর্গেনেফ-প্রীতিতে আমি একেবারে একা নই। 'বুড়া রাজা প্রতাপ রায়ে'র মতো 'বরজলালে'র হাত ধরে আমাকে একাকী সভাস্থল ত্যাগ করতে হবে না। প্রতাপ রায়ের সমকালীন শ্রোতা সে-সভাতে আর কেউ ছিল না। আমার কিন্তু এখনও অনেক মুরুব্বী আছেন। তাঁরা তুর্গেনেফ সম্বন্ধে আমার চেয়ে ঢের ঢের ভালো লিখতে পারেন, কিন্তু লেখেন না, কারণ তাঁরা জানেন, পাগলাগারদে সুস্থ লোকের লক্ষণ দেখানো পাগলামি, ভেক যেখানে রব ছেড়েছে সেখানে কোকিলের পক্ষে মৌনতাই শ্রেয়—'ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং কোকিল জলদাগমে'।

তুর্গেনেফের মন্দ ভাগ্য সম্বন্ধে তিনি নিজেই সচেতন ছিলেন। তিনি থাকতেন বিদেশে—জার্মানী এবং ফ্রান্সে—এবং সেখানে বসে বসেই তিনি জানতে পেতেন কী ভাবে ক্রমে ক্রমে তিনি দস্তেফ্স্কি, তলস্তয় এমন কি কবি নেক্রাসফেরও বিরাগভাজন হয়েছেন। 'বিরাগভাজন' বললে বোধ করি কমই বলা হল। তুর্গেনেফ শেষের দিকে রীতিমত এঁদের বিদ্বেষভাজন হয়েছিলেন।

বিদ্বেষ আসে হিংসা থেকে। এঁদের সবাই বড় লেখক। জীবিতাবস্থায়ই এঁরা দেশে প্রচুরতম সম্মান পেয়েছিলেন। তবে দূর-দেশবাসী প্রবাসী নিরীহ ('নিরীহ' কেন সে কথা পরে হবে) তুর্গেনেফ তাঁদের ক্রোধের কারণ হয়েছিলেন কেন?

এ-তত্ত্বটি বুঝতে পারলেই জানা যাবে লেখক হিসাবে তুর্গেনেফের অপ্রতিদ্বন্দ্বী মাহাত্ম্য কোন্‌খানে?

দস্‌তেফ্‌স্কি ও তলস্তয় জানতেন সৃষ্টির ক্ষেত্রে এঁদের আপন মাহাত্ম্য কোন্‌খানে। দস্‌তেফ্‌স্কি তাঁর প্রতি চরিত্রের গভীরতম অন্তস্তলে পৌঁছে গিয়ে তার সুখদুঃখ, তার দুর্বলতা মহত্ত্ব, তার প্রচেষ্টা এবং ভাগ্যে দ্বন্দ্ব' সমাজ-প্রবাহের খরস্রোতের বিরুদ্ধে তার উজান চলার আপ্রাণ প্রয়াস, কিংবা সে- স্রোতে গা ঢেলে দিয়ে ভেসে যেতে যেতে তাকে প্রাণভরে অভিসম্পাত—এ সব-কিছু লোহার কলম দিয়ে পাথরের উপর খোদাই করতে পারেন, ভাস্করের মতো দৃঢ়পেশী সবল হস্তে। প্রত্যেকটি চরিত্র তাঁর হাতে যেন দৈত্যের হাতে প্রজাপতি। চোখে একস্বরে, বুকে অসীম করুণা। তাঁর লেখা পড়ে মনে হয়, একটা বিরাট এঞ্জিন আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। খেলাব এঞ্জিন যত তেজেই এগিয়ে আসুক না কেন, জানি, ভালো করেই জানি, সামান্য কড়ে আঙুলটি তার সামনে ধরলেই সে থেমে যাবে, কিন্তু দসতেফ্‌স্কির এঞ্জিন পিঁপড়ের গতিতে এলেও তার সামনে যা পড়বে তার আব উদ্ধার নেই। অরসিকতম পাঠকেবও সাধ্য নেই, তাঁর বর্ণনা পড়ে তিনি যা বলতে চেয়েছেন, তা না শুনে বা বুঝে থাকতে পারে। কিংবা বলব, কুমির যে-রকম ছাগলের বাচ্চাব ঠ্যাং কামড়ে ধবে ডুব দেয় নদীতে, দসতেফ্‌স্কি সে-রকম পাঠককে নিয়ে ডুব দেন মানব-চরিত্রের অতল সায়রে। এবং আশ্চর্য, সেখানে মণি-মুক্তাব সঙ্গে সঙ্গে যে ক্লেদ-পঙ্ক দেখি তাব প্রতিও তো ঘৃণা হয় না। মাতাল বাপের উচ্ছৃঙ্খলতায় সরলা কুমারী রাস্তার বেশ্যা হয়ে বাপকে মাতলামোর পয়সা যোগাচ্ছে—কই লোকটাকে তো খুন করতে ইচ্ছে করে না। তার অসহায় অবস্থা দেখে শুধু ভগবানকে শোধাতে ইচ্ছে করে, 'একে বিবেকহীন পাষণ্ডরূপে জন্ম দিলে না কেন? এরও তা হলে কোনো দুঃখ থাকত না, আমরাও অকরুণ হৃদয়ে তাকে খুন করতে পারতুম। কিন্তু এ সব বোঝে, এ তো সব-কিছু জানে। তবে এই ঝঞ্ঝা-ঝড়ের ঘূর্ণিবায়ুর মাঝখানে মানুষকে তুমি প্রজাপতির মতো সৃষ্টি করলে কেন?' কিংবা হয়ত অতখানি চিন্তা করার শক্তিই পাঠকের থাকে না। মোহমান হয়ে যায় পাঠক সেই বিশ্বব্যাপী অভিজ্ঞতার সামনে—সমস্ত জীবন বয়ে বেড়ায় তার অনপসরণীয় স্মৃতি।

তলস্তয়ের রঙ্গমঞ্চ ভুবন-জোড়া বিরাট। তার পাত্রপাত্রীদের নাম ভুলে যাই, কিন্তু চেহারা ভুলি নে। তারা রঙ্গমঞ্চে নাচছে যে যার আপন কোণে আপন আপন মণ্ডলী বানিয়ে। প্রত্যেকের আপন নৃত্য সামঞ্জস্য রেখেছে তার মণ্ডলীর সঙ্গে, মণ্ডলী সামঞ্জস্য রেখেছে আর আর মণ্ডলীর সঙ্গে—কখনও বা দুই কিংবা তিনটি মণ্ডলী একে অন্যকে ভেদ করে মিশে এক হয়ে গিয়ে আবার আলাদা হয়ে যাচ্ছে—আর সব কটি মণ্ডলীর এ-কোণে ও-কোণে যে-কটি ছন্নছাড়া আপন মনে নাচছে তাদেরও সঙ্গে নিয়ে গড়ে তুলেছে সেই বিরাট ভুবন। বাস্তব জীবনেও আমরা এ-রকম ভুবনের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাই নে। তলস্তয় কতখানি পেয়েছিলেন কে জানে কিন্তু তাতে কীই বা যায় আসে। তাঁর কল্পনার ভুবন আমাদের বাস্তব ভুবনের চেয়ে ঢের ঢের বেশী প্রত্যক্ষ, অঙ্গে অঙ্গে প্রাণবন্ত।

তলস্তয় কখনও কবিতা রচনা করেছিলেন কি না জানি না, কিন্তু তিনি কবি। তাঁর ভানুমতী দণ্ড দিয়ে তিনি যে-রকম আমাদের কল্পনার অতীত বস্তু সৃষ্টি করতে পারেন ঠিক তেমনি আমাদের নিত্যকার চেনা বস্তু—যে বস্তু বহুদর্শনের ফলে তার বৈশিষ্ট্য তার নবীনতা হারিয়ে ফেলেছে—তিনি সামনে তুলে ধরেন সেই চেনা রূপেই, অথচ মনে হয়, 'কী আশ্চর্য, একে এত দিন ধরে লক্ষ্য করি নি কেন?' এবং সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও জেনে যাই যে, একে আর কখনও ভুলব না। তাই তাঁর পাত্রপাত্রী দেশে কালে সীমাবদ্ধ নয়। দস্তেফ্স্কির চাষা কৃভাস ভদ্কা না খেলেও সে রুশ চাষা; তলস্তয়ের চাষা অন্তহীন স্তেপের উপর দিয়ে ভেঙে চলেছে বরফের পাথার, সরাইয়ে ঢুকে সে তার চামড়ার ছেঁড়া ওভারকোট স্টোভের পাশে শুকোতে দেয়, আইকনের সামনে বিড় বিড় করে সে মন্ত্র পড়ে ডান হাতের তিন আঙুলে ডাইনে থেকে বাঁয়ে ক্রস্ করে, কিন্তু বার বার ভুলে যাই সে বাঙালী চাষা নয়। অবাক হয়ে ভাবি, বসিরুদ্দি, পাঁচু মোড়ল, নিজ্নি নভ্গরদের দিকে চলেছে কেন?

মহাভারতের পরেই ওয়ার অ্যাণ্ড পীস্!

তুর্গেনেফ দঁস্তেফ্স্কির মতো প্রত্যেক চরিত্রের গোপনতম অন্ধকারে বিদ্যুল্লেখা দিয়ে আলোকিত করতে চান না। তার কারণ বোধ হয় তুর্গেনেফ নখ্-শির, আপাদমস্তক ভদ্রলোক। কোনো ভদ্রলোক পরিচিত অপরিচিত কারও গোপন চিঠি পড়ে না—হাতে পড়লেও, কারও হাতে ধরা পড়ার ভয় না থাকলেও। ঠিক তেমনি তার চরিত্রের গোপন দুর্বলতা তার অজানাতে সে জানতে চায় না, প্রকাশ করতে তার মাথা কাটা যায়—সে তো দুশমনের কাজ, গোয়েন্দার ব্যবসা। ভদ্র তুর্গেনেফ তাঁর নায়ক-নায়িকার দিকে তাকান শিশুর মতো সরল

চোখে ; তারা কথাবার্তায়, আচার-ব্যবহারে যতখানি আত্মবিকাশ করে তাতেই তিনি সন্তুষ্ট, তাঁর পক্ষে সেই যথেষ্ট। শার্লক হোম্‌সের মতো আতশী কাচ দিয়ে তিনি তার জুতোর দাগ পরীক্ষা করেন না, পোয়ারোর মতো তাকে ক্রস-এগজামিনেশনের ঠেলায় কোণ-ঠাসা করে অট্টহাস্য করে ওঠেন না, 'ধরেছি, ধরেছি, তোর গোপন কথা কতক্ষণ লুকিয়ে রাখবি, বল্‌!'

অথচ শিশুর কাছে কেউ কোন জিনিস গোপন রাখে না। কবি মাত্রই শিশু। তার চোখে ছানি পড়ে নি। প্রতি মুহূর্তে সে এই প্রাচীন ভুবনকে দেখে নবীন রূপে।

রুশদেশে পুশ্‌কিনের পর যদি কোনো কবি জন্মে থাকেন, তবে তিনি তুর্গেনেফ। তলস্তয় কবি স্রষ্টিকর্তা হিসেবে, আবিষ্কর্তা রূপে, আর তুর্গেনেফ কবি অন্য অর্থে। পৃথিবীতে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু কুৎসিত, কিংবা যার দিকে কারও দৃষ্টি যায় না এসব-কিছু তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর কবিত্ব দিয়ে। তিনি অন্য কবির মতো অবাস্তবকে বাস্তব করেন না, বাস্তবকে অবাস্তব করেন না। বাস্তব অবাস্তব দুইই তাঁর কবি-মনের স্পর্শ পেয়ে আপন আপন সীমা ছাড়িয়ে তৃতীয় সত্তায় পরিণত হয়। ঘৃত-প্রদীপ শুষ্ক কাষ্ঠ দুইই তাঁর কবিত্বশিখার পরশে আগুন হয়ে জ্বলে ওঠে। কিংবা বলব, শীতের শিশির যেমন তার শুভ্র পেলব আস্তরণ দিয়ে মধুর করে দেয় সদ্য-ফোটা ফুলকে, শুকনো পাতার অঙ্গ থেকে ঘুচিয়ে দেয় তার সর্ব কর্কশতা। ওপারের ঝাউবন, এপারের কাশ, ঘাস, সর্বোচ্চ শাল বকায়ন থেকে আরম্ভ করে রাস্তায় পাশের নয়ানজুলি—সবাই যেন সূক্ষ্ম মসলিনের অঙ্গাভরণ পরে সৌন্দর্যের গণতন্ত্রে কৌলীন্য পেয়ে গিয়েছে।

এই কবিত্বপ্রতিভাকেই হিংসা করতেন দস্‌তেফ্‌স্কি, তলস্তয়, নেক্রাসফ ত্রিমূর্তি। নেক্রাসফ স্বয়ং কবি কিন্তু তিনি জানতেন যে-জিনিসের পরশ পেয়ে শুকনো গদ্য গান হয়ে নেচে ওঠে সেইটির পূর্ণ অধিকার আছে একমাত্র তুর্গেনেফের। আঙ্গিকের উপর এ-রকম অখণ্ড অধিকার ত্রিমূর্তির কারও ছিল না। তাঁদের কোনো বিশেষ রচনা হয়ত তুর্গেনেফের রচনা অপেক্ষা উচ্চাঙ্গের কিন্তু তুর্গেনেফ তাঁদের শ্রেষ্ঠতর রচনাকে তাঁর আঙ্গিকের স্পর্শ দিয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম রচনা করে দিতে পারতেন। দস্‌তেফস্কি তলস্তয় যেন লিখেছেন কবিতা। তুর্গেনেফ যে-কোনো মুহূর্তে তার যে-কোনো একটিকে সুর লাগিয়ে গানের রূপ দিয়ে দিতে পারতেন। আর তুর্গেনেফের প্রত্যেকটি রচনা যেন গান, তার গায়ে আর হাত দেবার উপায় নেই—তা সে গানের মূল্য কবিতার চেয়ে কম হক আর বেশীই হক।

সে-যুগে ভাষা, ছন্দের রাজা ছিলেন ফ্রান্সের ঔপন্যাসিক ফ্লবের। তাঁর শিষ্য এবং মানসপুত্র মপাসাঁ তখনও গুরুর মজলিসে আতরদান, গোলাপ-পাশ এগিয়ে দেন। তুর্গেনেফ ফ্লবেরের বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ বন্ধু। ফ্লবেরকে চিঠি লেখার সময় মপাসাঁ লেখেন 'গুরুদেব', তুর্গেনেফকে লেখার সময় লেখেন, 'গুরু এবং সখা'। ফ্লবেরের আকস্মিক মৃত্যুতে মপাসাঁ যখন শোকে অভিভূত হয়ে অন্ধের মতো এদিক ওদিক হাতড়াচ্ছেন তখন তুর্গেনেফ শেষবারের মতো দেশের কাছ থেকে বিদায় নিতে গিয়েছেন রুশে! মপাসাঁ তাঁকে চিঠি লিখে খুঁজেছেন সান্ত্বনা। লিখেছেন, 'জীবনের সব কটি আনন্দের দিনও তো আমার এই দুঃখের দিনটার ক্ষতিপূরণ করতে পারছে না।'

তার তিন বছর পর গত হলেন তুর্গেনেফ।

এবারেও হয়ত তিনি কোনো সাহিত্যিক বন্ধুকে চিঠি লিখে সান্ত্বনা খুজেছিলেন। তখনকার দিনের ফ্রান্সের সব বিখ্যাত সাহিত্যিকদের সঙ্গেই তুর্গেনেফ, ফ্লবের, মপাসাঁর বন্ধুত্ব ছিল। ভিক্তর হ্যুগো, এদমোঁ দ গঁকুর, এমিল জোলা, আলফঁস দদে এঁদের কাউকে হয়ত তিনি লিখেছিলেন, কিন্তু আমার মনে হয়, ফ্লবের গত হলে শোক নিবেদন করা যায় তুর্গেনেফকে, কিন্তু তুর্গেনেফ গত হলে লেখা যায় আর কাকে? বঙ্কিমের মৃত্যু-সংবাদ রবীন্দ্রনাথকে জানিয়ে হয়ত সান্ত্বনার বাণী চাওয়া যায়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গত হলে বাঙালী জানাবে কাকে?

মপাসাঁ এর অনেক আগেই ফ্রান্সের বিখ্যাত পত্রিকায় তুর্গেনেফ সম্বন্ধে প্রশস্তি লিখেছিলেন। এবারে তিনি যেটি লিখলেন, সেটি বড়ই করুণ। মপাসাঁর পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থাবলীতে এ-দুটি থাকার কথা কিন্তু আজ যখন মপাসাঁকেই লোকে স্বীকার করতে চায় না—যদি বা করে তাও তাঁর তথাকথিত অশ্লীল গল্পের জন্য—তখন তাঁর প্রবন্ধ পড়তে যাবে কে? তবু বলি আনাতোল ফ্রাঁসের রম্য-রচনাকে যদি সত্য ও সুন্দরের অভূতপূর্ব অনির্বচনীয় সঙ্গম বলে ধরা হয়, তবে সে-দুটির উৎস খুঁজতে হবে মপাসাঁর রচনায়। তাঁর ছোটগল্পের সর্বত্র-পরিচিত শৈলীতেই সেগুলো লেখা। ছোট ছোট শব্দ, ছোট ছোট বাক্য আর তার মাঝে মাঝে অকস্মাৎ দীর্ঘায়তন দীর্ঘকলেবর উদ্দাম উত্তাল শৈলধারার মতো দ্রুতগামী বাক্য-বিন্যাস। মন্দাক্রান্তার পাঁচটা হ্রস্বের পর দুটো দীর্ঘ এলে যে-রসের সৃষ্টি হয়।

এর অনুবাদ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। সারাংশ নিবেদন করি।

"রুশ দেশের মহান ঔপন্যাসিক ইভান তুর্গেনেফ ফ্রান্সকে আপন দেশরূপে বরণ করেছিলেন। এক মাস অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করার পর তিনি গত হয়েছেন।"

"এ-যুগের অত্যাশ্চর্য লেখকদের তিনি অন্যতম। সঙ্গে সঙ্গে সাধু, সৎ, অকপট ও বন্ধুবৎসল সমাজের তিনি ছিলেন সর্বাগ্রণী। এ রকম লোকের দেখা মেলে না।

"তাঁর বিনয় ছিল আত্মাবমাননার কাছাকাছি; কাগজে তাঁর সম্বন্ধে কেউ কিছু লিখলে তিনি তা একেবারেই বরদাস্ত করতে পারতেন না। একাধিকবার তাঁর সম্বন্ধে উচ্চ প্রশস্তি সংবলিত রচনা তাঁকে যেন মর্মাহত করেছে; কারণ তিনি কিছুতেই স্বীকার করতে রাজী হতেন না যে, শুদ্ধ সাহিত্য ভিন্ন অন্য কোনো বিষয় নিয়ে রচনা লেখা হক। সাহিত্য কিংবা কলা-সমালোচনাকে পর্যন্ত তিনি প্রগল্‌ভ বাক্যবিন্যাস বলে মনে করতেন। একবার কোনো এক সাহিত্য-সমালোচক তাঁর একখানা বই সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর জীবন নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করাতে তিনি রীতিমত আহত হয়েছিলেন। তার সে বেদনা-বোধে ছিল লেখকের ব্রীড়া—শুদ্ধ বিনয় তার কাছে নতমস্তক হয়।

"আজ গত হয়েছেন এই মহান পুরুষ, তাঁর সম্বন্ধে সামান্য কিছু নিবেদন করি।

"প্রথমবার তাঁকে দেখি গুস্তাফ ফ্লবেরের পার্টিতে।

"দরজা খুলতে ঘরে ঢুকলেন দৈত্য বিশেষ। রুপালী মাথা—রূপকথায় যাকে বলে রজতশির। লম্বা-লম্বা সাদা চুল, রুপালী চোখের পলক আর বিরাট সাদা দাড়ি—সত্যই যেন খাঁটি রুপোর অতি মিহিন তার দিয়ে তৈরী। ঝকঝক চকচক করছে, প্রতিটি রশ্মিকণা যেন তার উপর থেকে ঠিকরে পড়ছে। আর সেই ধবলিমার মাঝখানে শান্ত সুন্দর মুখচ্ছবি। নাক চোখ যেন একটু বড্ড বেশী ধারালো। সত্যই যেন বরুণদেবের শির—চতুর্দিকে ধবল জলের ঢেউ তুলেছেন—কিংবা আরও ভালো হয়, যদি বলি, অনন্তদেব, বিশ্বপিতার মুখচ্ছবি।

"অতি দীর্ঘ দেহ—বিরাট, কিন্তু দেহে মেদচিহ্ন নেই। আর সেই বিশালবপু, অতিকায় পুরুষটির চলাফেরা, নড়াচড়া একেবারে শিশুটির মতো—বড় ভীরু-ভীরু ভাব। অতি মিষ্ট মৃদু কণ্ঠে কথা বলেন, কেমন যেন মনে হয়, পুরু জিভ শব্দের ভার যেন সইতে পারছে না। কখনও কখনও কথা বলতে বলতে একটু আটকে যান যেন, ঠিক মনের মতো কথাটি ফরাসীতে কি হবে সেটা খোঁজেন আর প্রতিবারেই চমৎকার ঠিক শব্দটি খুঁজে পান। এই সামান্য থমকে যাওয়াটা তার বচনভঙ্গীতে লাবণ্য এনে দিত।

"গল্প বলতে পারতেন অতুলনীয় মধুর ভঙ্গীতে। সামান্যতম ঘটনাকে তিনি সেই ভঙ্গীর পরশ লাগিয়ে রসের স্তরে তুলে নিতে পারতেন। তাঁর অসাধারণ

প্রতিভার মূল্য আমরা ভালো করেই জানতুম কিন্তু আসলে তিনি সর্বজনপ্রিয় ছিলেন অন্য কারণে। তাঁর চরিত্রের শিশুর মতো সরলতা ছিল সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য; এক দিক দিয়ে এই প্রতিভাবান ঔপন্যাসিক পৃথিবী পরিক্রমা করেছেন, তাঁর যুগের তাবৎ গুণী-জ্ঞানীকে তিনি চিনতেন, মানুষের পক্ষে যা পড়া সম্ভব তার সব কিছুই তাঁর পড়া ছিল, ইয়োরোপের সব ভাষা আপন মাতৃভাষার মতো বলতে পারতেন অথচ অন্য দিক দিয়ে তাঁর আর পাঁচজন বন্ধু-বান্ধবের কাছে যা কিছু অতিশয় সামান্য সাধারণ তারই সামনে তিনি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে অবাক মানতেন, ভাবতেন, এটা হল কী করে?

"সাহিত্য বিচারের সময় তিনি আমাদের পাঁচজনের মতো সব কিছু বিশেষ গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ হয়ে বিশেষ দৃষ্টিবিন্দু থেকে দেখতেন না। পৃথিবীর তাবৎ সাহিত্য তাঁর খুব ভালো করে পড়া ছিল বলে সর্বসাহিত্যেব সমন্বয় করে তারই বিরাট পটভূমিতে তিনি পৃথিবীব এক প্রান্তে প্রকাশিত একখানা বই তুলনা করতেন। অন্য প্রান্তে প্রকাশিত অন্য ভাষায় লিখিত আরেকখানা বইয়ের সঙ্গে তাই তাঁব সমালোচনা আমাদের কাছে তাব বিশেষ মূল্য পেত।

"তাঁব বয়স হয়েছিল, তাঁব সাহিত্য-জীবন প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল অথচ সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর অভিমত ছিল আধুনিকতম এবং সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল। প্লটের প্যাঁচ আর থিয়েটারী কৌশলে ভর্তি উপন্যাস তিনি দু চোখে দেখতে পারতেন না, তিনি বলতেন, কিছু না, শুদ্ধমাত্র জীবন হবে উপন্যাসেব উপাদান—তাতে প্লটের ছলা কৌশল থাকবে না, থাকবে না অসম্ভব অসম্ভব কীর্তিকাহিনী।

"তাঁর মতে উপন্যাস আর্টেব সর্বাধুনিক রূপ। গোড়ার দিকে রূপকথার ছলা-কলা তাতে ব্যবহার করা হত এবং উপন্যাস এখনও তাব থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পায় নি। নানা রকম রোমান্টিক আর আকাশ-কুসুম কল্পনা উপন্যাসকে এতদিন ধর্মভ্রষ্ট করেছে। এখন আস্তে আস্তে মানুষের রসবোধ শুদ্ধ হতে চলেছে। এখন ওসব শস্তা ছলাকলা বর্জন করে উপন্যাসকে করতে হবে সরল, তাকে জীবনের আর্ট রূপে তুলে ধরতে হবে যাতে করে একদিন সে জীবনের ইতিহাস রূপে গণ্য হতে পাবে।

"আজ তাঁব প্রতিভাপ্রসূত কাব্যসৃষ্টির বিশ্লেষণ করা যাবে না—যদিও জানি তাঁর সৃষ্টি রুশ সাহিত্যের সর্বোচ্চ সৃষ্টির সমপর্যায়ে স্থান পেয়েছে। তাঁর প্রিয়তম বন্ধু মহাকবি পুশ্‌কিন্, লেরমন্তফ এবং ঔপন্যাসিক গগলের সৃষ্টির পাশাপাশিই তাঁর রচনার স্থান। রুশ দেশ যাঁদের সৃষ্টি চিরকৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ রাখবে ইনি তাঁদেরই একজন। ইনি রুশকে দিয়েছেন চিরঞ্জীব সম্পদ, অমূল্য নিধি। ইনি

দিয়েছেন এমনই সম্পূর্ণ আর্ট, এমন সব সৃষ্টি যার বিস্মরণ অসম্ভব; তিনি দিয়েছেন এমন এক গৌরব যে-গৌরবের মূল্য বিচার অসম্ভব, যার আয়ু অন্তহীন এবং রুশ দেশের অন্য সর্বগৌরব সে অনায়াসে অতিক্রম করে যায়। এঁর মতো লোকই দেশের জন্য এমন কিছু করে যান যার কাছে প্রিন্স্ বিসমার্ক তুচ্ছ; পৃথিবীর সর্বভূমির সর্বমহাজনের কাছে এঁরা নমস্য হন।"

গাঁজা

কিংবা গুলও বলতে পারেন। সদাশয় ভারত সরকার যখন আমাকে কিছুতেই 'পদ্মশ্রী' 'পদ্মবিভূষণ' জাতীয় কোনো উপাধিই দিলেন না, এবং শেষ পর্যন্ত শিশির ভাদুড়ী পেয়েও সেটি বেয়ারিং চিঠির মতো ফেরত দিলেন তখন হাজরা রোডের রক্ফেলাররা (অর্থাৎ যাঁরা রকে অন্তত এক লক্ষ গুল মেরে লক্ষপতি রক্ফেলার হয়েছেন) সাড়ম্বরে আমাকে 'গুলম্‌গীর' উপাধি দিলেন।

হালের কথা। বর্ষার ছদ্মবেশ পরে শরৎ নেমেছেন, কলকাতার শহরে। বাড়ির আঙিনায় হাঁটুজল, রাস্তায় কোমর। সেই জল ভেঙে ভিজে জগঝম্প হয়ে তাবৎ 'ফেলাররাই' উপস্থিত, এসেই বসলেন টেলিফোনটি মাঝখানে রেখে। তারপর সবাই আপন আপন আপিস-আদালত কারখানা-শুঁড়িখানাতে খবর পাঠালেন, 'কী ভয়ঙ্কর জল দাঁড়িয়েছে রাস্তায়! বাড়ি থেকে বেরনো সম্পূর্ণ অসম্ভব। নৌকো ভাড়ার চেষ্টা করছি। আপিসে আজ না আসতে পারলে কয়েকটা ভিজিটার ফিরে যাবে। সর্বনাশ হবে। কি করি বলুন তো?'

মশাদার এরকম সকরুণ বেদনার গন্ধঢালা আপিস-প্রীতি এর পূর্বে আমি কখনো দেখি নি। রকে আসতে তাকে বুক ভেজাতে হয়েছে, এখন তার চোখ ভেজা অথচ তার বাড়ি থেকে যেদিকে আপিস সেদিকে যেতে হাঁটু পর্যন্ত ভেজাতে হয় না।

আমাদের রকটি সংমিশ্রিত; অর্থাৎ দু-চারটি চিংড়ি সদস্যও আছেন। আবার ফণি-কাকার বয়স ষাট পেরিয়েছে, গুড়গুড়ির বয়স পাঁচ পেরোয় নি। এরা মাঝে-মধ্যে থাকলে আমাদের একটু সামলে-সুমলে কথা কইতে হয়।

মশাদার প্যাঁচটা দেখে টেটেন মারলে ডবল প্যাঁচ। অজন সেনকে বললে, 'অজনদা, আমার আপিসকে ঝপ্ করে একটা ফোন করে দিন তো, আমি আপিসে বেরিয়ে গিয়েছি, পৌঁচেছি কিনা!'

অজনদা আরো তৈরী মাল। নম্বর পেয়ে খবরটা দিয়ে কি একটা শুনে

আঁতকে উঠে বললে, 'কী বললেন? পৌঁছয় নি? বলেন কি মশাই? বড় দুশ্চিন্তায় ফেললেন তো।'

নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

অজনদার নিজের কোনো ভাবনা নেই। তার আপিসে মাত্র একটি কল। সেটা সে প্রায়ই আপিস ছাড়ার পূর্বে বে-কল করে আসে।

এবারে আমরা শান্তমনে সমাহিত চিত্তে কর্তব্য-কর্মে মন দিলুম।

অজন বুঝিয়ে বলে, 'আলম অর্থাৎ দুনিয়া জয় করে পেলেন বাদশা আওরঙ্গজেব ঐ আলমগীর নাম। সেই ওজনে আপনি গুলমগীর।'

আমি বললুম, 'হাসালি রে হাসালি! এ আর নূতন কি শোনালি? প্রথম আমি পরীস্তানে ছিলুম গুল্-ই-বকাওলী, তারপর লন্ডনে নেমে হলুম ডিউক অব গুলস্টার, তারপর ফ্রান্সে হলুম দ্য গুল, তারপর পাকিস্তানে হলুম গুল মুহম্মদ, এখানে এসে হলুম গুলজারিলাল নন্দ। তা ভালোভালো। গুলমগীর! বেশ বেশ।'

বড়দা উপর থেকে রকে নামেন ক্বচিৎ-কস্মিন। বললেন, 'ল্যাটে—ল্যাটে বুঝলেন।' বড়দার মুখ হামেহাল পানের পিকে ভর্তি। তারই মহামূল্যবান এক ফোঁটা পাছে বরবাদ হয়, সেই ভয়ে তিনি আকাশের দিকে মুখ তুলে, স্বর্গের দিকে ঠোঁট দুটি সমান্তরাল করে সেই দুটিকে মুখের ভিতরের দিকে বেঁকিয়ে দিয়ে 'ত', 'দ'-কে 'ট', 'ড' করে কথা বলেন—অল্পই।

তাঁর এসব কলকায়দা করা সত্ত্বেও আমরা তখন পাখা, খবরের কাগজ হাতের কাছে যা পাই তাই দিয়ে মুখ ঢাকি। আমি স্বয়ং ছাতা ব্যবহার করি।

অজনদা বললে, 'এবারে আপনি আপনার উপাধি-প্রাপ্তির সম্মানার্থে একটি সরেস গুল ছাড়ুন তো, চাচা।'

মশা বললে, 'কিংবা গাঁজা।'

আমি বললুম, 'যদি ছাড়ি গাঁজার গুল?'

ঘেণ্টু বললে, 'চাচাকে নিয়ে তোরা পারবি নে রে, ছেড়ে দে।' ঘেণ্টুর পাড়াদত্ত নাম ঘণ্টু। আমি নাম দিয়েছি ঘেণ্টু। যবে থেকে আমার চর্মরোগ হয়েছে। ঘেণ্টু চর্মরোগের জাগ্রতা দেবী। বিশ্বেস না হলে চলন্তিকা খুলে দেখুন।

আমি বললুম, 'তবে শোন। কিন্তু তার পূর্বে টেটেনকে সাবধান করে দিচ্ছি, সে যেন আমার গাঁজার গুল নিয়ে কোনো সোসিয়ো-পোলিটিকো-ইকনমিক-স্ট্যাটিসটিকস সঞ্চয় না করে। সে আজকাল ঐ নিয়ে মেতেছে।'

টেটেন নানাবটি কেস পড়ছিল। বললে, 'আপনি কিস্‌সুটি জানেন না, চাচা। আপনার জানা নেই, এ সংসারে মিথ্যাবাদী আছে এবং তার চেয়ে বড় মিথ্যাবাদীও আছে এবং সর্বশেষে স্টাটিস্‌টিশিয়ানদের কথা ভুলবেন না। ওদের মাল নিয়েই তো সরকার গুল মারে। নিত্যি নিত্যি কাগজে দেখতে পান না? আমি আপনার দোরে যাব কেন?'

'তবে শোন্। নিশ্চিন্ত হয়ে বলি।

পার্টিশেনের বছর খানেক পরের কথা। আমার মেজদা ওতর বাংলার কোথায় যেন কি একটা ডাঙর নোকরি করেন। তাঁর সঙ্গে দেখা। আমরা এখন দুই ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন দেশের অধিবাসী। কিন্তু আমাদের ভিতর কোনো ঝগড়া-কাজিয়া নেই। এই অ্যাদ্দিন বাদে নেহরুজী আর আইয়ুব খান সায়েব সেটা বুঝতে পেরে আমাদের শুভ-বুদ্ধি এক্তেয়ার করেছেন। তা সে যাক গে।

হিন্দুস্থানের বিস্তর দরদ-ভরা তত্ত্বতাবাশ করে মেজদা শুধলে, "তোদের দেশে গাঁজার কি পরিস্থিতি?"

আমি একগাল হেসে বললুম, "স্বরাজ পেয়ে বাড়তির দিকে।"

মেজদা আশ্চর্য হয়ে শুধালে, "সে কি রে। কোথায় পাচ্ছিস? আমি তো চালান দিতে পারছি নে!"

আমিও অবাক। শেষটায় বোঝা গেল, দাদা ছিলিম মেরে শিবনেত্র হওয়ার সত্যিকার গাঁজার কথা বলছে। আমি কি করে জানবো? আমি পাষণ্ড বটি, —দাদা ধর্মভীরু, সদাচারী লোক।

বললে, "শোন।"

পার্টিশেনের ফলে মেলা অচিন্তিত প্রশ্ন, নানা ঝামেলা মাথা চাড়া দিয়ে খাড়া হয়ে উঠলো এবং তারই সর্বপ্রধান হয়ে উঠে দাঁড়ালো গঞ্জিকা-সমস্যা।

গাঁজার এত গুণ আমি জানতুম না। শুনতে পেলুম, স্বয়ং জাহাঙ্গীর বাদশা নাকি গাঁজা খেয়ে উভয়ার্থে অচৈতন্য হয়েছিলেন। সেটা নাকি তুজ্‌ক্‌-ই-জাহাঁগীরীতে আছে। গাঁজা ছাড়েন শেষটায় তিনি মনের দুঃখে। এর দাম অতি শস্তা বলে সেটা পোষায় না রাজা-বাদশাদের রাজসিক জাত্যাভিমানে। সে কথা যাক।

আমার এলাকায় পৃথিবীর বৃহত্তম গাঁজার চাষ এবং গুদোম। ভারতে গাঁজার চাষ প্রায় নেই। আমি এসব তত্ত্ব জানতুম না—সমস্ত জীবন কাটিয়েছি আসামে, বরঞ্চ চায়ের খবর কিছুটা রাখি। এসব গুহ্য রহস্যের খবর দিয়ে গাঁজা ফর্মের ম্যানেজার আমাকে একদিন দুঃসংবাদ দিলে, সে বচ্ছরের গাঁজা গুদোমে

প্যাচ বরবাদ হব-হব করছে। ইণ্ডিয়াতে চালান দেবার উপায় নেই—অথচ সেখানেই তার প্রধান চাহিদা।"

আমি শুধলুম, "কেন? তুমি নিজে খাও না বলে অন্য লোকেও খাবে না? এ তো বড় জুলুম!"

দাদা বললে, "কী জ্বালা! আমি শ্রীঘরবাস পছন্দ করি নে; তাই বলে আমি জেল তুলে দিয়েছি নাকি? সাধে কি বলি তুই একটি চাইল্ড্ প্রডিজি—ওয়াণ্ডার চাইল্ড্—চল্লিশ বছরে তোর যা জ্ঞানগম্যি হল, আল্লার কুদরতে পাঁচ বছর বয়েসেই সেটা তুই অর্জন করে নিয়েছিলি।"

আমি চটে গিয়ে বললুম, "আর তুমি বিয়াল্লিশে।" দাদা আমার চেয়ে দু' বছরের বড়।

দাদা বললে, "তোর রসবোধ নেই। ঠাণ্ডা হ।" '

রক্‌ফেলারদের দিকে তাকিয়ে বললুম, 'এসব মাইনর বর্ডার ইন্‌সিডেণ্ট আমাদের ভিতরে কালে-কস্মিনে হয়, কিন্তু মিটমাট হয়ে যায় "আকাশ-বাণী", "ঢক্কা-ডিংডমে" পৌছবার পূর্বেই।'

অজনদা শুধোলে, 'ঢক্কা-ডিংডমটা কি চাচা?'

'ডিংডম্ মানে জগঝম্প, বিরাট ঢাক, যার থেকে ইংরিজি "টম্‌টম্", "টমটমিং" শব্দ এসেছে। অর্থাৎ ঢাকার বেতার কেন্দ্র। তারপর শোন:

দাদা বললে, "ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। ভারতের ষাট হাজার সন্ন্যাসী নাকি রাষ্ট্রপতির কাছে সই, হাতের টিপ দিয়ে আবেদন জানিয়েছেন, গাঁজার অভাবে তাঁদের নানাবিধ কষ্ট হচ্ছে, আত্মচিন্তায় ব্যাঘাত হচ্ছে—"

আমি গোশ্‌শা করে বললুম, "দেখো দাদা, পিতা গত হওয়ার পর অগ্রজ পিতৃতুল্য। কিন্তু তুমি যদি আমাদের সন্ন্যাসীদের নিয়ে মস্করা করো—"

বাধা দিয়ে দাদা বেদনাতুর কণ্ঠে বললে, "দেখ ভাই, তুই কখনো দেখেছিস যে আমি কাউকে নিয়ে—"

এবারে আমি বাধা দিয়ে বললুম, "থাক্ থাক্। তুমি বলো।" দাদার ঐ গলাটা আমি বড়ই ডরাই। ওটা দাদা ব্যবহার করে পঞ্চাশ বছরে একবার। দাদার বয়স তখন বিয়াল্লিশ।

দাদা তো আমাকে মাফ করবার জন্য তৈরী। চশমার পরকলা দুটো পুঁছে নিয়ে বললে, "পূর্বেই বলেছি, পার্টিশেনের ফলে বিস্তর অভাবিতপূর্ব সমস্যা দেখা দিল—এটা তারই একটা। পার্টিশেনের পূর্বে সান্তাহারের গাঁজা যেত হরিদ্বারে অক্লেশে, বাঙালোরের বিয়ার আসত ঢাকায় লাফিয়ে লাফিয়ে। এখন মধ্যিখানে

এসে দাঁড়ালো এক দুশমন। জিনীভাতে কবে কে আইন করেছিল বিশ্বজনের কল্যাণার্থে—কল্যাণ না কচু—তার সারমর্ম এই: আপন দেশে তুমি সার্বভৌম রাজা, যা খুশী করতে পারো, যত খুশী ততো আফিঙ ফলিয়ে বিক্রি করতে পারো, গাঁজা চালাতে পারো—কিন্তু ভুলো না, আপন দেশের চৌহদ্দীর ভিতর। এক্স্‌পোর্ট করতে গেলেই চিত্তির। তখন জিনীভার অনুমতি চাই। যেমন মনে কর, ফিনল্যাণ্ড জিনীভার মারফতে তোদের কাছে চাইলে দু' মণ আফিঙ—ওষুধ বানাবার জন্য। জিনীভা সন্দেহের গোয়েন্দা লাগাবে জানবার জন্যে, সত্যি ওষুধ বানাবার জন্য ফিনল্যাণ্ডের অতখানি প্রয়োজন কি না, কিংবা ওরি খানিকটে আক্রা দরে বাজারে বিক্রি করে, দেশের লোককে আফিঙখোর বানিয়ে দু'পয়সা কামিয়ে নিতে চায়। কারণ কোনো কোনো দেশ নাকি বিদেশের ওষুধ বানানেওলাদের সঙ্গে ষড় করে ওষুধের অছিলায় বেশী বেশী হশীশ, ককেইন রপ্তানি করে সে-সব দেশের বহু লোকের সর্বনাশ করেছে। আইনগুলো আমি পড়ে দেখি নি, তাই ঠিক ঠিক বলতে পারবো না—নির্যাসটি জানিয়েছিল, গাঁজা ফার্মের ম্যানেজার। এখন নাকি জিনীভার পারমিশন চাই, সেটা পেতে কতদিন লাগবে তার ঠিকঠিকানা নেই, কতখানি পাঠানো যাবে তার স্থিরতা নেই।

ইতিমধ্যে উপস্থিত হল আরেক সঙ্কট।

গেল বছরের গাজাতে গুদোম ভর্তি। এদিকে হাল বছরের গাঁজা ক্ষেতে তৈরী। তুলে গুদোমজাত করতে হবে। নূতন গুদোম এক ঝটকায় তৈরী করা যায় না—শেষটায় হয়তো জিনীভা কোনো পারমিটই দেবে না, কিংবা এত অল্প দেবে যে বেবাক ব্যবসাই গুটোতে হবে। নয়া গুদোমের কথাই ওঠে না।

তখন নানা চিন্তা, বহু ভাবনা, ততোধিক কর্তৃপক্ষকে আলোচনা করে স্থির করা হল, গেল বছরের গাঁজা পোড়াও—" '

আড্ডার কেউই গঞ্জিকা-রসিক নয়। তবু সবাই—টেটেনদি ছাড়া—এক কণ্ঠে হায় হায় করে উঠলো। খাই আর না-ই খাই, একটা ভালো মাল বরবাদ হতে দেখলে কার না দুঃখ হয়! রায়টের সময় পার্ক সার্কাসের মদের দোকানে বোতল ভাঙা হচ্ছে দেখে এক টেম্পারেন্‌স পাদ্রীকে পর্যন্ত আমি শোক করতে দেখেছি।

স্টাটিস্‌টিশিয়ান টেটেন বললে, 'আপনারা এতে এমন কি নূতন শোক পাচ্ছেন? মার্কিনরা যে দু'দিন অন্তর অন্তর অঢেল গম লিট্‌রিলি অ্যাণ্ড মেট্‌ফরিক্লি দরিয়ায় ভাসিয়ে দেয় সে বুঝি জানেন না?' টেটেনই আমাদের মধ্যে ইংরিজিতে এম-এ। ওর উচ্চারণ আমাদের বুঝতে কষ্ট হয়।

সবাই হ্যাঁ হ্যাঁ বলার পর আমি গল্পের খেই ধরে এবং সিগরেট ধরিয়ে বললুম, 'তারপর দাদা বললে, "গুদোমেতে নূতন মাল পোরা হবে। ম্যানেজারকে বললুম, আমি অমুক দিন যাবো, সেদিন পুরনো মাল পোড়ানো হবে। কারণটা তাকে আমি আর বললুম না। সেই যে—তুই জানিস না কি? বড়দা তোকে বলেছেন, তিনি যখন জাপানী বোমার সময় ট্রেজারি অফিসার ছিলেন তখন-হুকুম এল, জাপানী বোমা পড়লে, ব্যাপক বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিলে ট্রেজারির তাবৎ কারেন্সি নোট পুড়িয়ে ফেলবে! ভাইজাগ না কোথাকার এক সুবুদ্ধিমান একটি মাত্র বোমা পড়ামাত্রই সরকারকে খবর দিলে সে সব নোট পুড়িয়ে ফেলেছে। তারপর দু'বছর বাদে, তাজ্জবকী বাৎ, বাজারে সে-সব নোটের দর্শন পাওয়া যেতে লাগল। পোড়ায় নি। সরিয়ে ফেলেছিল। আমার তাই ভয়, গাঁজার বেলাও ঐ যদি হয়।

আগেভাগে দিনক্ষণ দেখে, অর্থাৎ টুর প্রোগ্রাম যথা-যথাস্থানে পাঠিয়ে দিয়ে বেরলুম গাঁজা পোড়াতে।"

আমি আঁৎকে উঠে বললুম, "কি বললে?"

দাদা ঈষৎ চিন্তা করে বললে, "হ্যাঁ তা তো বটেই। 'গাঁজা পোড়ানো' কথাটার অর্থ 'গাঁজা খাওয়া'ও হয়। তাই শুনেছি, ছোকরা নাতির হাতে সিগরেট দেখে যখন ঠাকুরদা গম্ভীর কণ্ঠে তাকে বললেন, 'জানিস, সিগরেট মানুষের সব চেয়ে বড় শত্রু'—সে তখন শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিল, 'তাই তো ওকে পোড়াতে যাচ্ছি'।

মোকামে পৌঁছে দেখি বিরাট ভিড়। বিশখানা গাঁয়ের বাছাই বাছাই লোক জমায়েত হয়েছেন সেখানে গাঁজা পোড়ানো দেখবেন বলে। আমি তো অবাক। বাঁশ-পাতা পোড়ানো আর গাঁজা-পাতা পোড়ানোতে এমন কি তফাৎ যে দুনিয়ার লোক হদ্দমুদ্দ হয়ে জমায়েত হবে? তা সে যাক গে।

হুদো হুদো গাঁজা ওজন করে হিসেব মিলিয়ে ডাঁই ডাঁই করে মাঠের মধ্যিখানে রাখা হল। তারপর চোখের জল মুছতে মুছতে ম্যানেজারই মুখাগ্নি করলে। সে-ই তার জনক—একে দিয়ে তার বহু পয়সা কামাবার কথা ছিল।

সেদিন বাতাসটা ছিল একটু এলোমেলো। গাঁজার ধুঁয়ো ক্ষণে এদিকে যায়, ক্ষণে ওদিকে যায়। আর তখন দেখি অবাক কাণ্ড! পাতা পোড়াবার সময় যেদিকে ধুঁয়ো যায় মানুষ সেদিক থেকে সরে যায়। আজ দেখি উল্টী বাৎ। জোয়ান-বুড়ো, মেয়েমদ্দে—হ্যাঁ, কয়েকটি মেয়ে-ছেলেও ছিল—ছোটে সেদিকে।

আর সে কী দম নেওয়ার বহর। সাঁই সাঁই শব্দ করে সবাই নাভিকুণ্ডলী

পর্যন্ত ভরে নিচ্ছে সেই নন্দন-কাননের পারিজাত-পাপড়ি পোড়ানোর খুশবাই— অন্তত তাদের কাছে তাই। আমার নাকে একবার একটুখানি ঢোকাতে আমি তো কেশে অস্থির। আর ওরা ফেলছে কী পরিতৃপ্তির নিশ্বাস—'আঃ, আঃ'। কেউ খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে, কোমরে দু'হাত রেখে, আকাশের দিকে জোড়া মুখ তুলে নাসারন্ধ্র স্ফীত করে নিচ্ছে এক-একখানা দীর্ঘ দম, আর ছাড়ছে দীর্ঘতর 'আঃ—!' শব্দ। কেউ বা মাটিতে বসে ক্যাবলাকান্তের মতো মুখ হাঁ করে আস্য মার্গ দিয়ে যৌগিকধূম্র গ্রহণ প্রশস্ততর মনে করছে।

হঠাৎ হাওয়া ওলটালো। তখন পড়িমাড় হয়ে সবাই ছুটলো সেদিকে। আমি, ম্যানেজার, সেরেশ্তাদার ততোধিক পড়িমড়ি হয়ে ছুটলুম অন্যদিকে। দু' একটি চাপরাসী দেখি মনস্থির করতে পারছে না। তাদের আমি দোষ দিই নে।

ভেবে দেখ, পৃথিবীতে এ ঘটনা ইতিপূর্বে আর কখনো হয়েছে? গাঁজা তো আর কোথাও ফলানো হয় না। তারই মণ মণ পুড়িয়ে একচ্ছত্র গঞ্জিকাযজ্ঞ চতুর্দিকে গরীব দুঃখী বিস্তর। এক ছিলিমের দম বাজারে কিনতে গেলে এদের দম বেরিয়ে যায়। আর এখানে লক্ষ লক্ষ টাওয়া পোড়ানো হচ্ছে আকাশ বাতাস টৈটম্বুর করে। হয়ত ধরণীর সুদীর্ঘ ইতিহাসে এই শেষ যজ্ঞ।

আমি তো সায়েন্সের ছাত্র ছিলুম। তোদের কোনো এক ঔপন্যাসিক নাকি সদর রাস্তায় মদের পিপে ফেটে যাওয়ার বর্ণনা দিয়েছে! আমি তার ট্রেলার বাইস্কোপে দেখেছি। কিছু না। ধুলোখেলা। সেখানে সবাই করছে মালের জন্য হুটোপুটি একই দিকে। এখানে বিরাট জিবগা-জলসাব জনসমাজ দিকনির্ণয় যন্ত্রের অষ্টকোণ চষে ফেলছে—ধুঁয়ো যখন যেদিকে যায় সেদিকে। এবং সঙ্গে সঙ্গে উল্টোদিকে ছুটছি আমরা কয়েকজন। রবীন্দ্রনাথ নাকি 'জাগ্রত ভগবানকে' ডেকেছিলেন তাঁকে 'জনসমাজ-মাঝে' ডেকে নেবার জন্যে! আমি পরিত্রাহি চিৎকার ছাড়ছি, অবশ্য মনে মনে—আল্লাতালা যেন এই আমামুন্নাস, এই 'জন-সমাজ' থেকে আমাকে তফাৎ রাখেন।"

আমি ততক্ষণে হাসতে হাসতে প্রায় কেঁদে ফেলেছি। দাদা আমার গম্ভীর স্বল্পভাবী প্রকৃতির লোক, চোখে-মুখে কোনো রকম ভাব প্রকাশ করে না, অবশ্য দরদী লোক বলে মাঝে মাঝে ঠোঁটের কোণে মৃদু হাস্য দেখা যায়—যা ই হোক, যা-ই থাক, আমার মতো ফাজিল-পঞ্চানন নয়। কোটপাতলুন তুর্কী টুপি পরা সেই লোক খনে এদিক খনে ওদিক ধাওয়া করছে, টুপির ফুন্না বা ট্যাসেল চৈতনের মতো খাড়া হয়ে এদিক ওদিক কম্প্রমান—এ দৃশ্যের কল্পনা মাত্রই বাস্তবের বাড়া।

দাদা বললে, "তুই তো হাসছিস। আমার তখন যা অবস্থা। শেষটায় দেখি, মাথাটা তাজ্জিম্ তাজ্জিম্ করতে আরম্ভ করেছে। এত ছুটোপুটি সত্ত্বেও ঘিলুতে খানিকটে ধুঁয়ো ঢুকে গিয়েছে নিশ্চয়ই। তারপর মনে হল বেশ কেমন যেন ফুর্তি ফুর্তি লাগছে, কি রকম যেন চিত্তাকাশে উড়ুক্ক উড়ুক্কু ভাব। তারপর দেখি, ম্যানেজারটা আমার দিকে কি রকম বেয়াদবের মতো ফিক্ ফিক্ করে হাসছে। ওর তা হলে হয়েছে। কিংবা আমার। অথবা উভয়ের।

আর এস্থলে থাকা নয়।

টলটলায়মান, পড়পড়ায়মান হয়ে জীপে উঠলুম। সেও এক বিপদ। দেখি দুখানা জীপ। দুটোই ধুঁয়োটে কিন্তু হুবহু একই রকম। কোনটায় উঠি? শেষটায় দেখি আমার পাশে আমারই মতো কে একজন দাঁড়িয়ে। হুবহু আমারই মতো, তার টুপির ফুন্নাটি পর্যন্ত। দুজনাতে দুই জীপে উঠলুম।"

আমি বললুম, 'দু'টা জীপ না কচু!'

দাদা বললে, "বুঝেছি, বুঝেছি, তোকে আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। শান্ত হয়ে শোন। তারপর গাড়ি যায় কখনো ডাইনে ঢাকা, আর কখনো বাঁয়ে মতি-হারী। তবে কি ড্রাইভারটা—? সে তো সর্বক্ষণ আমারই পিছনে ছিল। তারপর দেখি সেই অন্য জীপটাও ঢাকা মতিহারী করছে একদম পাশে পাশে থেকে। ওমা! তারপর দেখি চারটে জীপ। সেও না হয় বুঝলুম। কিন্তু তারপর, মোশয়, সে কী কাণ্ড! চারখানাই উড়তে আরম্ভ করল।"

আমি শুধালুম, "উড়তে!"

"হ্যাঁ, উড়তে। জীপটাই তো ছিল ঠায় দাঁড়িয়ে। ধুঁয়ো খেয়েছিল আমাদের চেয়েও বেশী।

হাওয়ায় উড়তে উড়তে ঘুমিয়ে পড়লুম। এবং শেষ পর্যন্ত বাঙলোয় পৌঁছলুম।

ভাগ্যিস বেশী ধুঁয়ো মগজে যায় নি। আপন পায়েই ঘরে ঢুকলুম।

সামনেই দেখি তোর ভাবী। আমার দিকে একদৃষ্টে তাকালেন। বাপ্‌স্! তারপর অতি শান্ত কণ্ঠে—কিন্তু কী কাঠিন্য কী দার্ঢ্য সে কণ্ঠে—শুধালেন, 'আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?' আমি কিছু বলি নি।"

দাদা থামলেন।'

আমি আড্ডাকে বললুম, 'আমার ভাবী সাহেবা অতিশয় পুণ্যশীলা রমণী, পাঁচ বেকৎ নামাজ পড়েন, রোজা রাখেন, তসবী টপকান। শমসুল্-উলেমার মেয়ে।'

রক শুধালে, 'ওটার মানে কি চাচা?'

আমি বললুম, 'পণ্ডিত-ভাস্কর। তোদের মহামহোপাধ্যায়ের অপজিট্ নাম্বার।'

রক শুধালে, 'তারপর?'

আমি বললুম, 'তদনন্তর কি হল জানি নে। বৌদি দাদার হাল থেকে কতখানি আমেজ করতে পেরেছিলেন তাও বলতে পারি নে, কারণ ঠিক সেই সময়ে ভাবী সায়েবা তাঁর স্পিশিলাটি চারপরতি পরোটা ও দেখতে বজ্রের মতো কঠোর খেতে কুসুমের মতো মোলায়েম শবডেগ নিয়ে ঢুকলেন। আমরা খেতে পেলুম বটে কিন্তু কাহিনীটি অনাহারে মারা গেল।'

মশাদা বললে, 'বিলকুল্ গুল্।'

আমি পরম পরিতৃপ্তি সহকারে বললুম, 'সাকল্যে। তাই না বলেছিলুম, গাঁজার গুল। অর্থাৎ গুলের রাজা গুলম্‌গীর। তোরা আমাকে আজ ঐ টাইটিলটি দিলি না?'

হরিনাথ দে'র স্মরণে

বহু ভাষা শিখতে পারলে বহু সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় হয়। তার মারফতে অনেক সভ্যতা, বিস্তর সংস্কৃতির সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হয়—এ সব কথা ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি।

উপস্থিত দেখতে পাচ্ছি, বাঙালী ছেলেকে বাধ্য হয়ে অন্তত তিনটে ভাষা শিখতে হয়—বাঙলা, ইংরিজী এবং সংস্কৃত (কিংবা আরবী অথবা ফার্সী)। হয়ত তাকে হিন্দীও শিখতে হচ্ছে, কিংবা অদূরভবিষ্যতে শিখতে হবে। এ অবস্থায় আমি যদি প্রস্তাব করি, আরো গুটি দুই শিখলে হয় না? তাহলে ছেলেদের হাতে আমার প্রাণ বিপন্ন হবার সমূহ সম্ভাবনা—বাঙলা দেশে না থাকলেও এ খবরটি আমি বিলক্ষণ রাখি। বিশেষতঃ এই পূজোর বাজারে,—মানুষ যখন বলির পাঁঠার সন্ধানে থাকে।

তাই হট্টগোল আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই আমি নিবেদন করছি, এ প্রস্তাবটি শুধু তাদেরই জন্য, যারা বুঝে গিয়েছে যে সংস্কৃতে তারা বিদ্যাসাগর হতে পারবে না, ওটাকে নিতান্ত পরীক্ষা পাসের জন্য যেটুকু সম্মান দিতে হয় তাই দেবে, বাঙলা তো মাতৃভাষা, এবং ইংরিজীর চর্চা ততটুকুই করবে যতটুকু পাশের পর চাকরির জন্য নিতান্তই প্রয়োজন। এই সংজ্ঞা থেকেই সুচতুর পাঠক বুঝে যাবেন যে,

আমি মোটামুটি থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ার ছেলেদের কথাই ভাবছি। অর্থাৎ এরা ক্লাসে (সেভেন-এটে) যে রকম পড়ি-মরি হয়ে তিনটে ভাষার পিছনে ছুটতো এখন আর তা করে না। বিশেষতঃ গোটা পাঁচেক ইয়ার্লি আর থান-দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাস করে এরা ভাষা না শিখে কি করে তার পরীক্ষা পাস করতে হয় সে 'বিদ্যায়' বিলক্ষণ রপ্ত হয়ে গিয়েছে।

এতখানি বলার পরও যদি কেউ লেমনেডের বোতল খোঁজে তবে আমার দ্বিতীয় নিবেদন, গোটা দুই ভাষা শিখলে চাকরি জোটার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। হল? এখন তবে আশা করতে পারি, পাঠক বোতলটি আমার মাথায় না ফাটিয়ে সেটার ভিতরকার জিনিস বরফের সঙ্গে মিশিয়ে আমাকে খাওয়াবার চেষ্টা করবেন।

দয়া করে সেটিও করবেন না; কারণ আমি যে প্রস্তাব করতে যাচ্ছি সেটা লটারির টিকিট কাটাব চেয়ে মাত্র এক চুল ভালো—এই যা। ইংরিজিতে একেই বলে 'চেজিং দি ওয়াইল্ড গীজ্'—কিন্তু চাকরির বাজারে বাঙালী ছেলের সামনে যখন কোনো 'গ্যজ'ই নেই তখন আশা করতে পারি সে ঘরের না পেয়ে বনের হাঁস তাড়া করতে আপত্তি করবে না। বুঝিয়ে বলি।

স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ভাষা শেখার কোনো অর্থকরী মূল্য এদেশে ছিল না। স্বরাজ লাভের পর অবস্থাটা বদলেছে। আমরা নানা দেশে আমাদের রাজপ্রতিনিধি, রাজদূত, হাই-কমিশনার, কন্সাল-জেনারেল, কন্সাল, ট্রেড কমিশনার এবং তাঁদের দফ্তরের জন্য কাউনসেলর, প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় সেক্রেটারি, মিলিটারি আতাশে, ট্রেড আতাশে, প্রেস আতাশে, কেরানী, দোভাষী ইত্যাদি পাঠাচ্ছি এবং দিল্লীর পরদেশী দফ্তর বা ফরেন অফিসেও ভাষা জাননে-ওলা লোকের প্রয়োজন হয়। তা ছাড়া বেতার-কেন্দ্র ফরাসী, ইরানী, ফার্সী, কাবুলী-ফার্সী, আরবী, পশতু, সুহেলী, গুর্খালী, বর্মী, ইন্দোনেশী ও চীনা ভাষায়ও প্রোগ্রাম দেন। আমাদের ফৌজী ইস্কুলেও অনেক ভাষা শেখানো হয়।

এই তিনটির প্রতিষ্ঠানে যে গণ্ডায় গণ্ডায় চাকরি খালি পড়েছে তা নয়, তবু আমার ব্যক্তিগত ধারণা উপযুক্ত ভাষাজ্ঞান থাকলে যোগ্য লোককে এ তিনটি প্রতিষ্ঠান খাতির করবে। আর পূর্বেই নিবেদন করেছি, আমার এ প্রস্তাব তাদেরই জন্য, যারা চাকরির বাজারে একটুখানি রিস্ক্, রতিভর ঝুঁকি নিতে রাজী আছে।

আমি যে খবরটি দিলুম সেটি কিছুমাত্র নূতন নয়। কারণ প্রায়ই বেকার

ছেলেরা এসে আমাকে অনুরোধ জানায় তাদের ফ্রেঞ্চ জর্মন শিখিয়ে দিতে। (এখানেই লক্ষ্য করে রাখুন 'ফ্রেঞ্চ-জর্মনই' বলে, অন্য কোনো ভাষার নাম তোলে না।) আমার সময়ের অভাব, দ্বিতীয়তঃ আমি বাঙলাটাই ভালো করে জানি নে—কাজেই ফরাসী-জর্মনের কথাই ওঠে না, তাই তাদের কিঞ্চিৎ সদুপদেশ দিয়ে বিদেয় দি।

এদের প্রশ্ন করে দেখলুম, এরা জানে না (ক) কোন্ ভাষার চাহিদা বাজারে কতখানি, (খ) কোন্ ভাষা শক্ত আর কোন্টা নরম, (গ) ভাষা শিখতে হয় কি করে এবং আরো অনেক কিছুই জানে না।

আমি দোষ দিচ্ছি নে। জানবার সুযোগ দিলে তো তারা জানবে। আর যদি জানতই তবে আজ আমি এ বিষয়ে লিখতে যাবো কেন ?

আমাকে এক উত্তম ব্যবসায়ী বলেছিল, 'জিনিস বেচা সোজা, কেনা শক্ত।' আমি তো তাজ্জব। বলে কি ? তখন বুঝিয়ে বললে, 'বাজারে ঠিক যে জিনিসের চাহিদা তাই দিয়ে যদি আমি আমার দোকান সাজিয়ে রাখি তবে সন্ধ্যে হতে-না-হতেই দোকান সাফ হয়ে যাবে। তাই বললুম, বেচা সহজ। কিন্তু আড়তদারদের কাছ থেকে যদি বে-আক্কেলের মতো বে-চাহিদার মাল কিনি তবে সেগুলো দোকানে পচবে, দোকান উঠে যাওয়ার পরও। তাই বললুম, 'কেনা শক্ত।'

এস্থলেও সেই নীতি প্রযোজ্য। অর্থাৎ প্রথম দেখতে হবে, আপনি কি মাল কিনবেন, অর্থাৎ কোন্ ভাষা শিখবেন।

সবাই বলে 'ফ্রেঞ্চ জর্মন'। এ যেন কথার কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফ্রেঞ্চ ভুবন-বিখ্যাত ভাষা। এককালে ফ্রেঞ্চ না জেনে কূটনীতি মহলে যাওয়া বিনা পৈতেয় ব্রাহ্মণভোজে যাওয়ার মতো ছিল। এখনো পৃথিবীর যে কোনো দেশের পাসপোর্টে দেখতে পাবেন দুটি ভাষাতে সব কিছু ছাপা, প্রথমটি তার আপন ভাষা এবং দ্বিতীয়টি ফরাসী। কিন্তু এসব হচ্ছে উনবিংশ শতকের কথা। আপনি যদি সেই শতকের চাহিদা মেটাতে চান, তবে মেটান। আপনি যদি একশ' বছরের পুরনো বিজ্ঞাপন-মাফিক চাকরির জন্য দরখাস্ত করতে চান তো করুন।

তাই প্রথম দেখতে হবে :—এখন, এই মুহূর্তে চাহিদা কি এবং চাহিদার গতিটা কোন্ দিকে, অর্থাৎ আপনি ভাষাটাষা শিখে দু'তিন বছরে যখন বাজারে নামবেন তখন চাহিদাটা কি হবে ?

ভাষার প্রাধান্য তার লোকসংখ্যা থেকে বিচার করা ভুল। দৃষ্টান্তস্বরূপ চীনা

ভাষা নিন। ইংরিজী, রাশান, চীনা এ তিন ভাষায় কথা বলে পৃথিবীর সব চেয়ে বেশী লোক এ কথা সত্য, কিন্তু চীনা ভাষায় লোকসংখ্যা যত বেশীই হোক না কেন তারা সবাই মাত্র একটি রাষ্ট্রের অধিবাসী। কাজেই ঐ রাষ্ট্রে আমাদের থাকবে মাত্র একটি এম্বেসি। পক্ষান্তরে জর্মন ভাষার অবস্থা বিবেচনা করুন। জর্মন বলা হয় জর্মন রাষ্ট্রে (উপস্থিত সেটিও আবার দুই রাষ্ট্রে বিভক্ত), অস্ট্রিয়া রাষ্ট্রে এবং সুইটজারল্যাণ্ডে। এই তিন দেশে আমাদের তিনটি রাজদূতাবাস আছে। তা ছাড়া জর্মন বলা হয়, উত্তর ইটালির টিরোল, ফ্রান্সের আলসেস-লরেন ও বেলজিয়ামের অয়পেন অঞ্চলে। এসব অঞ্চলে যদি কখনো রাজনৈতিক গোলমাল আরম্ভ হয় এবং আপনাকে তার রিপোর্ট লিখতে সেখানে যেতে হয় তবে জর্মন ছাড়া এক প ও এগুতে পারবেন না। এবং সর্বশেষ কথা : জর্মনী, অস্ট্রিয়া, সুইটজারল্যাণ্ড বেচে তৈরী মাল, ভারত বিক্রি করে কাঁচা মাল। এসব দেশের সঙ্গে আমাদের ব্যবসা দ্রুতগতিতে বাড়তেই থাকবে; বিস্তর কনসুলেট ও ট্রেডকমিশন ক্রমে ক্রমে ওসব জায়গায় আমাদেব খুলতে হবে।[১] কিন্তু চীন ও ভারত সমগোত্রীয়, দুজনেই বেচে কাঁচা মাল, অতএব 'বৈবাহিক' বৈষয়িক কাজ আমাদের চলে না।

আমরা যে স্বার্থ নিয়ে এ আলোচনা করছি তার দৃষ্টিবিন্দু থেকে দেখতে গেলে রাষ্ট্রীয় শক্তি ও ভাষার গুরুত্ব বিচার অবান্তর। সোভিয়েট বাশা বিরাট রাষ্ট্র কিন্তু ঐ দেশে আছে এবং বহুকাল ধরে থাকবে আমাদের একটি মাত্র রাজদূতাবাস। রাশা আবার মারাত্মক রকমের কেন্দ্রপ্রাণ বাষ্ট্র—মস্কোর নাম বদলে তাকে 'সেণ্টার' নাম দেবাব প্রস্তাব ঐ কারণেই একবার হয়েছিল—তাই তার উপবাষ্ট্র যথা, তুর্কোমানিস্থান উজবেকিস্থানে যে আমাদের রাজদূত আস্তানা গাড়বেন তার আশু সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি নে। অবশ্য উত্তম সাহিত্যরস আস্বাদনের জন্য রাশানের মতো ভাষা পৃথিবীতে বিরল।

পক্ষান্তরে রাষ্ট্রশক্তি হিসেবে আরবরা আজ পৃথিবীতে উঁচু আসনে বসে না। তার প্রধান' কারণ, তারা নানা রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এবং ঠিক ঐ কারণেই আমাদের দৃষ্টিবিন্দু থেকে তাদের প্রাধান্য বেড়ে গেল। উপস্থিত আরব জাতি এই ক'টি রাষ্ট্রে বিভক্ত :—ইরাক, সিরিয়া (শাম), লেবানন, হাদ্রামুৎ

১ এখানে এম্বেসি, হাই কমিশন, লিগেশন ইত্যাদির পার্থক্য সম্বন্ধে সামান্য কিছু বলে দেওয়া ভালো। এই তিনটিই রাজনৈতিক যোগাযোগ এবং কূটনৈতিক কাজকর্ম চালায়। এম্বেসি এবং হাই-কমিশন পদমর্যাদায়

ট্রানস্‌জর্ডন, সউদী আরব, ইয়েমেন, মিশর, সুদান, টুনিসিয়া, আলজিরিয়া, মরক্কো, লিবিয়া। তা ছাড়া কুয়েৎ বাহরেইন, ওমান ইত্যাদি। এদের সব কটি স্বাধীন নয়, কিন্তু ভগবানের আশীর্বাদে আমরা যেদিন অ্যাংলো-আমেরিকান আড়কাটির হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে আড়তদারের কাছ থেকে সোজা পেট্রল কেনবার দুই নম্বরের 'স্বরাজ' পাব সেদিন আরবের আনাচে-কানাচেও আমাদের কনসুলেট বসাতে হবে। উপস্থিত, আমার যতদূর জানা, মিশর, সউদী আরব, ইরাকে আমাদের রাজদূতাবাস আছে। এদের সংখ্যা বাড়বে বই কমবে না।

কিন্তু রাষ্ট্রগুলোর এসব 'মেল' খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মেলাতে গেলে আমরা পুজোর বাজার পেরিয়ে শ্যামা পুজোয় পৌঁছে যাব। তাই সংক্ষেপে বলি, আমার মনে হয়, আমাদের স্বার্থের জন্য উপস্থিত স্প্যানিশ-ই সব চেয়ে প্রয়োজনীয়। আপনি বলবেন, ঐটুকু দেশ স্পেন—তার ঐ 'ভাঙা নৌকায়' আমাদের কতখানি 'সোনার ধান' ধরবে!

আমি স্পেনের কথা আদপেই ভাবছি না। আমি ভাবছি দক্ষিণ আমেরিকার কথা। সেখানে ডজনখানেক সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র। তাদের ভাষা স্প্যানিশ—হিস্পানী। ওদের গুটিকয়েকে আমাদের রাজদূতরা বেশ কিছুকাল হল ডেরা গেড়ে বসেছেন। আমার বিশ্বাস সব কটাতে না হোক, বাকী অনেকগুলোতেই ক্রমে ক্রমে আমাদের রাজদূতাবাস বসবে। অতএব আমার সলা যদি নেন তবে স্প্যানিশ শিখুন।

ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে অধমের জ্ঞান অতিশয় অপ্রচুর। তবু বলবো, ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রমে ক্রমে এদেরই সঙ্গে আমাদের বাড়বে। সংক্ষেপে তার কারণটা বলি,—আমেরিকা, ইয়োরোপ এবং রাশা তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, বলতে গেলে

একই—বৃটিশ ক্রাউনের আওতায় থাকলে এম্বেসির নাম হাই-কমিশন—লিগেশন পদমর্যাদায় ছোট। কনসুলেটের কাজ ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজন মতো একাধিক কনসুলেট থাকতে পারে—কিন্তু একাধিক এম্বেসি হয় না,—এবং সে স্থলে কনসুলেট-জেনারেলও থাকে। ট্রেড কমিশন কনসুলেটের চেয়ে জাতে ছোট—অনেকটা এক্সপেরিমেণ্টাল পোস্ট-অফিসের মতো। ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়লে তার পদবৃদ্ধি হয়। কোনো কোনো দেশে আমাদের কনসুলেট না থাকলে, সেখানকার এম্বেসি-হাই-কমিশন-লিগেশন ঐ কাজও করে থাকে। এই সব তাবৎ প্রতিষ্ঠান আমাদের ফরেন অফিসের তাঁবেতে থাকে।

তাদের সম্পূর্ণ অর্থনীতি যুদ্ধ-প্রস্তুতির চতুর্দিকে এমনি কেন্দ্রীভূত করেছে যে তারা কিনতে চায় যুদ্ধের জন্য তাদের যে সব মালের দরকার এবং বেচতে চায় যুদ্ধের জন্য যার প্রয়োজন নেই। আর যুদ্ধ যদি লেগে যায় তবে আপনার অর্ডারগুলো তারা শিকেয় তুলে রাখবে, আপনার কাঁচা মাল বন্দরে বন্দরে পচবে। দক্ষিণ আমেরিকা এসব আওতার বাইরে। ওদের সঙ্গে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বেড়েই যাবে—আমাদের তৃতীয় 'স্বরাজ' লাভের পর। দশটা রাজদূতাবাস যদি তিনশটা চাকরি দিতে পারে তবে ব্যবসা-বাণিজ্য দেবে তিন হাজার কিংবা ত্রিশ হাজার। আর চাকরি ছেড়ে দিয়ে যদি ভাষার জোরে ব্যবসা চালান তবে তো আর কথাই নেই।

এস্থলে আরেকটি তত্ত্ব এবং তথ্যপূর্ণ ইঙ্গিত দি। ভাষা শেখাব সময় গোড়ার দিকে সমগোত্রের ভাষা শিখে তাড়াতাড়ি ভাষার সংখ্যা বাড়িয়ে নেবেন। উদাহরণ-স্থলে বলি আপনি বাঙালী, আজ যদি আপনাকে নিছক ভাষার সংখ্যাই দেখাতে হয় তবে আপনার পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে অসমীয়া এবং উড়িয়া নিয়ে। এ দুটি ভাষা বাঙলার এত কাছাকাছি যে আপনাকে বেগ পেতে হবে অতি কম। তারপর শিখবেন, হিন্দী, গুজরাটী মারাঠী, গুরুমুখী। ঠিক ঐ রকমই পর্তুগীজ ইটালিয়ান ও ফ্রেঞ্চ ভাষা স্পেনিশ ভাষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আপনাব বাঙলা জানা থাকলে অসমীয়া শিখতে কত দিন লাগার কথা? না হয় তারই ডবল ধরুন স্পেনিশ শেখা হয়ে গেলে পতুর্গীজ, কিংবা ফরাসিস্ শিখতে। ঠিক সেই বকম জর্মন ফ্লেমিশ এবং ডাচ পড়ে অন্য গোত্রে। একদা ব্রাসেল্‌স্ শহরে আমি একখানা ফ্লেমিশ খবরের কাগজ কিনে পড়ে দেখি মোটামুটি বক্তব্যটা ধরে ফেলতে পেরেছি—অল্পস্বল্প যা জর্মন জানি তাব-ই কৃপায়। এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। আপনি অসমীয়া শিশুশিক্ষা কখনো পড়েন নি। একখানা অসমীয়া বই নিন। দেখবেন বারো আনা পরিমাণ অনায়াসে বুঝতে পারছেন। কিংবা বেতারে যখন 'অসমীয়া বাতরি' শোনেন তখন কি তার মোটামুটি অর্থ ধরতে পারেন না?

তাই এই অনুচ্ছেদের গোড়াতে ভাষার সংখ্যাবৃদ্ধির যে কথা তুলেছিলুম সেটাতে ফিবে যাই। অর্থাৎ গুরুর সাহায্যে 'যদি বিদ্যায়তনে আপনি স্পেনিশ আরম্ভ করেন তবে মাস দুই যেতে-না-যেতেই বাড়িতে, কারো সাহায্য ছাড়া পর্তুগীজ কিংবা ফরাসী আরম্ভ করে দেবেন। ব্যাকরণখানার দু-দশপাতা ওলটাতে-পালটাতেই দেখবেন একসঙ্গে দুটো ভাষা আয়ত্ত করা কিছুমাত্র কঠিন কর্ম নয়। গোড়ার দিকে কিছুটা গুবলেট হয়ে যাবে সন্দ নেই। কিন্তু কিছুদিন পরে যদি সেটা কাটিয়ে না উঠতে পারেন তবে বুঝবেন ঐদিকে ভগবান আপনার

প্রতি সদয় নন, তখন না হয় লেগে যাবেন মানুষ মারার ব্যবসাতে—যাকে অজ্ঞজন বলে ডাক্তারি, কিংবা রেলকলিশনের পরিপাটি ব্যবস্থা করাতে—যাকে অজ্ঞজন নাম দিয়েছে ইঞ্জিনিয়ারি। কিন্তু নিবেদন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ম্যাট্রিক বড় কঠিন পরীক্ষা। আপনি যদি সেটা পাস করে থাকতে পারেন তবে গোটাতিনেক ভাষা শিখতে পারবেন না কেন ?

গোত্রবিচারে ফিরে যাই।

১। লাতিন গোত্র—স্পেনিশ, ফরাসিস্, পর্তুগীজ, ইটালিয়ান।

২। জর্মন গোত্র—জর্মন, ডাচ, ফ্লেমিশ।

৩। স্কাণ্ডিনেভিয়ান গোত্র—নরউইজিয়েন, সুইডিশ।

৪। তুর্কী গোত্র—তুর্কী (ওসমানলি তুর্কী, অর্থাৎ টার্কির ভাষা,—তুর্কমানিস্থানের ভাষা, জগতাই তুর্কী। প্রথমটা মুস্তফা কামালের মাতৃভাষা, দ্বিতীয়টা বাবুর বাদশার)—হাঙ্গেরিয়ান ও ফিনিশ কিন্তু এক হলেও শাখাতে বর্ণ-বৈষম্য প্রচুর।

৫। রাশান গোত্র—রাশান, পলিশ, ল্যাটাভিয়ান, স্লোভাক ইত্যাদি।

৬। ইরানী গোত্র—ইরানী ফার্সী ও কাবুলী ফার্সী—পার্থক্য সামান্য।

৭। আরবী গোত্র—আরবী, হীব্রু, ইড্ডিশ (অধুনা প্যালেস্টাইনে প্রচলিত প্রাচীন হীব্রুর অর্বাচীন রাষ্ট্রভাষা), আহ্‌মেরিক (আবিসিনিয়ান ভাষা)।

৮। চীনা গোত্র—চীনা, জাপানী, কোরিয়ান ইত্যাদি।

৯। এছাড়া টিবেটো-বর্মন গোত্রের বর্মী ইত্যাদি। মালয়, থাই, ইণ্ডোনেশিয়ন ইত্যাদি।

অজানাতে এবং জানাতে ও ছোট এবং বড় কোনো কোনো ভাষা বাদ প.ড় গেল। তাই নিয়ে শোক করবেন না। উপস্থিত এগুলো শিখে নিন। তা হলে অন্যগুলোর খবর আপনার থেকেই জানা হয়ে যাবে।

এর ভিতর সহজ ১ এবং ৬নং গোত্রের ভাষা, তার চেয়ে কঠিন ২ এবং ৩নং গোত্রের ভাষা, তার চেয়ে কঠিন ৫ নম্বরের গোত্র, তার চেয়েও কঠিন ৭নং, পারতপক্ষে ৮ নম্বরের পাড়া মাড়াবেন না (অবশ্য জাপানী তেমন শক্ত নয়), ৪ আর ৯ নম্বরেব খবর জানি নে, তবে খুব শক্ত হওয়ার কথা নয়।

দুই গোত্রের দুটো ভাষা একসঙ্গে শেখা যে খুব কঠিন তা নয়, তবে তার জন্য সৎপ্রতিষ্ঠান ও সৎগুরু প্রয়োজন। এই দুইটির বড়ই অভাব—এই দুঃসংবাদটি যতক্ষণ পারি চেপে গিয়েছিলুম ; আর পারা গেল না। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে

এই সুসমাচারটিও বিতরণ করছি যে ভারতবর্ষের কোথাও এমন সুব্যবস্থা নেই যে তার পাল্লায় পড়ে আপনি হেরে যাবেন। এই যে আমাদের রাজধানী দিল্লী শহর, যেখানকার লোক কেন্দ্রের নোকরি বাবদে হামেহাল তেজ-নজর ওকীবহাল সেখানে যে দু'একটি প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলো অতিশয় রদ্দী অথচ টাকা লুটছে এস্তের। ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি, কলকাতায় নাকি গোটাদুত্তিন প্রতিষ্ঠান আছে সেখানে বিদেশী ভাষা শেখানো হয়। খোঁজ করলে দেখবেন, খুড়ো-জ্যেঠার আমল থেকে বাড়িতে দু'চারখানা মার্লবর পড়ে আছে, কিন্তু ইংরিজী ছাড়া কোনো বিদেশী ভাষা কেউ শেখেন নি। আমিও ভূ-ভারতে এমন প্রাণীর সংস্পর্শে আসি নি যিনি ঐসব প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে কলকাতাতে বসে কোনো বিদেশী ভাষা শিখেছেন। তবে ইদানীং অবস্থা একটু ভালো হয়েছে।

অধমের শেষ সাবধান বাণী: সব কটা আণ্ডা একই ঝুড়িতে রাখবেন না—কুল্যে শির্নি একই দরগায় উজোড় করে দেবেন না। তার সরল অর্থ বি-এ, এম-এ পাস অবহেলা করে হঠাৎ তেরিয়া হয়ে বিদেশী ভাষার পশ্চাদ্ধাবন করবেন না। এসব পড়াশুনো বি-এ, এম-এ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চালাবেন—আড্ডাটা সিকিটাক কমিয়ে দিয়ে ফুটবল দেখাটা একটু মুলতুবী রেখে দিয়ে। একদম ছেড়ে দিতে বলবো কেন, তওবা, তওবা, তাহলে আপনার বাঙালীত্বই যে উপে যাবে। ভাষা শিখে পরীক্ষা দিয়ে যদি সেদিকে নোকরি না জোটে তবে বি-এ, এম-এ পাস করে যা করতেন তাই করবেন। তা হলে অন্তত আমার গলায় গামছার ফাঁস লাগিয়ে বলতে পারবেন না, 'তবে রে—, তোর কথায় না—ইত্যাদি।'

অনুকরণ না হনুকরণ?

আগে-ভাগেই বলে রাখছি, এ-লেখা সমালোচনা নয়।

সমালোচনা লেখবার মতো শক্তি—দুষ্টলোকে বলে, শক্তির অভাব—আমার এবং আমার মতো অধিকাংশ লোকের নেই। গল্পছলে নিবেদন করি :—

প্রতি রববারে এক বঁড়শে সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি মাছ ধরে। বড় মাছের শিকারী, তাই ফাতনা ডোবে কালেকস্মিনে, আকছার রববারই যায় বিন্-শিকারে। তারই একটু দূরে আরেকটা লোক প্রতি রববারে এসে বসে, এবং তামাম দিনটা কাটায় গভীর মনোযোগের সঙ্গে ওর মাছধরা দেখে দেখে। দু'জনায় আলাপ-পরিচয় নেই। মাস তিনেক পর শিকারী লোকটার 'আলসেমি' দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে যাওয়ার পর একটু বিরক্তির সুরে শুধালে, 'ওহে, তুমি

তাহলে নিজেই মাছ ধরো না কেন ?'

লোকটা আঁৎকে উঠে বললে, 'বাপস ! অত ধৈর্য আমার নেই।'

সমালোচনা লেখার ধৈর্য আমার নেই !

আর কি-ই বা হবে সমালোচনা লিখে ? কটা সুস্থ লোক সমালোচনা পড়ে ? কটা বুদ্ধিমান মাছ টোপ গেলে ? আলগোছে তফাতে থেকে সমালোচক প্রবন্ধে একটু-আধটু ঠোক্কর দেয় অনেককেই—অর্থাৎ রোকা পয়সা ঢেলে মাসিকটা যখন নিতান্তই কিনেছে তখন পয়সার দাম তোলবার জন্য একটু-আধটু খোঁচাখুঁচি করে। ফলে, চারের রস যত না পেল বড়শির খোঁচাতে তার চেয়ে বেশী জখম হয়ে "দুত্তোর ছাই" বলে তাস-পাশাতে ফিরে যায়।

সমালোচকরা ভাবেন, পাঠকসাধারণ বোকার পাল। ওরা তাঁদের মুখে ঝাল চেখে বই কেনে। তা হলে আর দেখতে হত না। মারোয়াড়ীরা সস্তায় রাবিশ পাণ্ডুলিপি কিনে পয়সা দিয়ে উৎকৃষ্ট সমালোচনা লিখিয়ে রাবিশগুলো খুচকারী (অর্থাৎ খুচরোর লাভে, পাইকারীর পরিমাণে) দরে বিক্রি করে ভুঁড়ি বাড়িয়ে নিতো—ফাও হিসেবে দেশে নামও হয়ে যেত, 'সৎসাহিত্য' তথা 'সমালোচকদে'র পৃষ্ঠপোষকরূপে।

আমার কথা যদি চট করে বিশ্বাস না করতে পারেন তবে চিন্তা করে দেখুন, আপ্তবাক্য নিবেদন করছি, 'পয়সা দিয়ে সমালোচনা লেখানো যায়, পয়সা দিয়ে কবিতা লেখানো যায় না।' না হলে আমেরিকায় ভালো কবির অভাব হত না। সমালোচকের অভাব সেখানে নেই এবং বর্ণে গন্ধে তাঁরা অস্মদ্দেশীয় সমালোচক-দেরই মতো।

পলিটিশিয়ানরাও ভাবেন প্রোপাগাণ্ডিস্ট (অর্থাৎ সমালোচক)-দের দিয়ে নিজ পার্টির প্রশংসা কীর্তন করিয়ে নিয়ে বাজিমাৎ করবেন। কিন্তু ভোটার—ভোটার যা পাঠকও তা—আহাম্মুখ নয়, যদিও সরল বলে সত্য বুঝতে তার একটু সময় লাগে। না হলে আওয়ামীরা মুসলিম লীগকে কস্মিনকালেও হটাতে পারতো না।

আমিও মাঝে-মধ্যে সমালোচনা পড়ি, কারণ আমিও আর পাঁচজন পাঠকের মতো পয়সা ঢেলেই কাগজ কিনি। তবে আমার পড়ার ধরন স্পানিয়ার্ডদের রুটি খাওয়ার মতো। শুনেছি, স্পানিয়ার্ডরা বছরের পয়লা দিন গির্জায় উপাসনা সেরে এসে এক টুকরো রুটি চিবোয়—কারণ প্রভু যীশুখৃষ্ট তাঁর প্রার্থনায় বলেছেন, 'আর আমাদের অন্নকার রুটি দাও।' খানিকটে চিবিয়ে থু থু করে ফেলে দিয়ে বলে, 'তওবা, তওবা, সেই গেল বছরের রুটিরই মতো যাচ্ছেতাই সোয়াদ।'

তারপর বছরের আর ৩৬৪ দিন সে খায় কোর্মা-কালিয়া কটলেট মমলেট। আমিও সমালোচনার শুকনো রুটি বছরের মধ্যে চিবুই মাত্র একটি দিন এবং প্রতিবারই হৃদয়ঙ্গম হয়, সমালোচনার স্বাদ-গন্ধ সেই গেল বছরের মতো—এক বছরে কিছুমাত্র উন্নতি করতে পারে নি।

কথাটা যে ভাবে বর্ণনা করলুম, তাতে পাঠকের ধারণা হওয়া বিচিত্র নয় যে, এটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। কিন্তু মোটেই তা নয়। অভিজ্ঞতাটা পাঠক-সাধারণ মাত্রেরই নিদারুণ নিজস্ব। অবশ্য সমালোচকদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁরা একে অন্যের সমালোচনা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মনোযোগ সহকারে পড়ে থাকেন। কেন পড়েন? জ্ঞান সঞ্চয়েব জন্য? রাম রাম! শুধুমাত্র দেখবার জন্যে কে তার মতে সায় দিয়েছে, কে দেয় নি এবং সেই অনুযায়ী দল পাকানো, ঘোট বাড়ানো, শক্তি সঞ্চয় করে রুটিটা আগুটা—থাক্।

অবশ্য সমালোচকদের সমালোচনা করার কুবুদ্ধি যদি আমার কখনো হয়—এতক্ষণ যা করলুম সেটা তারই সেতার বাঁধা মাত্র—তা হলে সেটা আপনাদেরই পাতে নিবেদন করবো। তবে ধর্মবুদ্ধি তখনো আপনাদের সাবধান করে দেবে, ও-লেখাটা না পড়তে।

* *

মূল বক্তব্যে আসি। ইদানীং আমি বাঙলার বিভিন্ন জায়গা থেকে, এবং বাঙলার বাইরে থেকেও কয়েকখানা চিঠি পেয়েছি। এঁরা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছেন, 'কি প্রকারে ভালো লেখক হওয়া যায়?'

প্রথমটায় উল্লসিত হয়েছিলুম। যাক, বাঁচা গেল। বাঙলা দেশ তা হলে স্বীকার করেছে, আমি ভালো লেখক। এবারে তা হলে কলকাতা-দিল্লীতে গিয়ে কিঞ্চিৎ তদ্বির করলেই, দু'চারটে প্রাইজ পেয়ে যাব, লোকসভাব সদস্যগিরি, কলচেরল ডেলিগেশনের মেম্বরী এ-সবও বাদ যাবে না। বিদেশ যাবার সুযোগও হয়ে যাবে—বিলেত দেখার আমার ভারী শখ, অর্থাভাবে এতদিন হয়ে ওঠে নি। ইংরিজীটা জানি নে, এতদিন এই একটা ভয় মনে মনে ছিল। এখন বুলগানিন, চু-এন-লেইয়ের কল্যাণে সেটাও গেছে। এঁরা ইংরিজী না জেনে আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু হায়, এত সুখ সইবে কেন? আমার গৃহিণী নিরক্ষরা—টিপসই করে লে আদালতে তালাকের দরখাস্ত করেছেন। তালাকটা মঞ্জুর না হওয়া পর্যন্ত আমার সঙ্গেই আছেন। তাঁর কাছে চিঠিগুলো পড়ে নিজের মূল্য বাড়াতে গিয়ে-ছিলুম। তিনি করলেন উল্টো অর্থ। সেটা আরো সরল। ব্যবসাতে যে দেউলে

হয়েছে, তারই কাছে আসে লোক সলার সন্ধানে ; ফেল-করা ছেলে পাস-করার চেয়ে ভালো প্রাইভেট ট্যুটর হয়।

এর উত্তর আমি দেব কি ? গৃহিণী যে কটা গল্প জানেন সব কটাই আমার সঙ্গে টায়-টায় মিলে যায়। মনে হয় আমার পূজ্যপাদ শ্বশুর-শাশুড়ী ছেলেবেলা থেকে তাঁকে এই তালিমটুকুই শুধু দিয়েছেন, স্বামীর গোদা পায়ের গোদটি কি প্রকারে বারে বারে দেখিয়ে দিতে হয়। অবশ্য তার জন্য যে বিশেষ তালিমের প্রয়োজন হয় সেটা অস্বীকার করলেও চলে। ওটা তাদের বিধিদত্ত জন্মলব্ধ অশিক্ষিত পটুত্ব। যে-সব সমালোচকদের কথা পূর্বে নিবেদন করেছি, তাদের বেলাও এই নীতি প্রযোজ্য।

ব্রাহ্মণীর আপ্তবাক্য আমি মেনে নিয়েছি। তিনি তালাকের দরখাস্তটি উইথড্র করেছেন—শুনে দুঃখিত হবেন।

* *

শঙ্করাচার্য দর্শনরণাঙ্গনে অবতীর্ণ হয়ে বলেছিলেন, 'সাংখ্যমল্লকে আহ্বান করো। সেই মল্লদের অধিপতি। তাকে পরাজিত করলে অন্যান্য সফরী-গোষ্ঠীর সঙ্গে যুদ্ধ করে অযথা কালক্ষয় করতে হবে না।' আমি শঙ্কর নই। তাই সব চেয়ে সরল প্রশ্নটির উত্তর দেবার চেষ্টা করব।

প্রশ্নটি এই : 'মপাসার ছোট গল্প অপার আনন্দ দেয়, কিন্তু তাঁর অনুকরণ-কারীদের গল্প এত বিস্বাদ কেন ? অপিচ, মপাসা ছোট গল্প লেখার যে কাঠামো তৈরি করে দিয়ে গিয়েছেন তার অনুকরণ না করে গল্প লিখিই বা কি প্রকারে ?'

যাঁরা সঙ্গীত আয়ত্ত করবার চেষ্টা করেছেন তাঁরাই জানেন, ওস্তাদ যে-ভাবে গান গান তারই হুবহু অনুকরণ করতে হয় ঝাড়া দশটি বছর ধরে। ভারতনৃত্য শিখতে গেলে মীনাক্ষীসুন্দরম্ পিল্লের নৃত্য অনুকরণ করতে হত ততোধিক কাল। স্যাকরার শাগরেদকে কত বছর ধরে একটানা গুরুর অনুকরণ করে যেতে হয়, তার ঠিক ঠিক খবর আমার জানা নেই। ভারতবর্ষে এই ছিল রেওয়াজ।

সাহেবরা এ দেশে এসে বললে, 'এত বেশী অনুকরণ করলে নিজস্ব সৃজন-শক্তি (অরিজিনালিটি) চাপা পড়ে যায়। ফলে কোনো কলার আর উন্নতি হয় না।' কথাটা হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এর মধ্যে অনেকখানি সত্য লুকনো আছে।

কিন্তু তার বাড়াবাড়িতে কি হয়, সেটাও তো নিত্য নিত্য স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। গুণীজনের উচ্চাঙ্গ সৃষ্টি অধ্যয়ন না করেই, আরম্ভ হয়ে যায় 'এপিক' লেখা, দু'কদম চলতে না শিখেই ডান্স্ 'কম্পোজ' করা, আরো কত কী, এবং

সর্বকর্মে নামঞ্জুর হলে সমালোচক হওয়ার পন্থা তো সব সময়েই খোলা আছে। সেই যে পুরনো গল্প—শহর-পাগলা ভাবতো, সে বিধবা মহারানী ভিক্টোরিয়ার স্বামী। পাগলা সেরে গেছে এই রিপোর্ট পাওয়ার পর পাগলা-গারদের বড় ডাক্তার তাকে ডেকে পাঠিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে শুধালেন, 'তা তুমি খালাস হওয়ার পর করবে কি?' সুস্থ লোকের মতো বললে, 'মামার বড় ব্যবসা আছে, সেখানে ঢুকে যাবো।' 'সেটা যদি না হয়?' চিন্তা করে বললে, 'তা হলে আমার বি-এ ডিগ্রী তো রয়েছেই—টুইশনি নেব।' তারপরে এক গাল হেসে বললে, 'অত ভাবছেন কেন, ডাক্তার? কিছু না হলে যে কোনো সময়ই তো আবার মহারানীর স্বামী হয়ে যেতে পারবো।' সমালোচক সব সময়ই হওয়া যায়।

তৃতীয় দল অন্য পন্থা নিলে। ওস্তাদদের হুবহু নকল তারা করলে না—তাতে বয়নাক্কা বিস্তর। আবার বিন্-তালিমের 'অরিজিনালিটি' পাঠকসাধারণ পছন্দ করে না। উপায় কি? তাই তারা ওস্তাদদের কতকগুলো বাছাই বাছাই জিনিস অনুকরণ করলে এবং শুধু অনুকরণই না, বাছাই বাছাই জিনিসগুলোর মাত্রা দিলে বাড়িয়ে।

চার্লি চ্যাপলিন একবার নাম ভাঁড়িয়ে গোপনবাসের জন্য গেছেন চিলির এক অজানা শহরে। বেড়াতে বেড়াতে দেখেন, দেয়ালের গায়ে বিজ্ঞাপন 'সোমবার রাত্রে শহরের কনসার্ট ঘরে চার্লি চ্যাপলিনের নকল করার প্রতিযোগিতা হবে। ভ্যাগাবণ্ড চার্লির বেশভূষা পরিধান করে ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে স্টেজের ইস্পার্ উস্পার হতে হবে চার্লি ধরনে। সর্বোৎকৃষ্ট অনুকরণের পুরস্কার পাঁচশ টাকা।'

চার্লি ভাবলেন, এখানে তো কেউ তাঁকে চেনে না, দেখাই যাক না, প্রতিযোগিতায় ছদ্মনামে কি হয়।

ছাব্বিশ জন প্রতিযোগীর ভিতর চার্লি হলেন তেরো নম্বর!

তার সরল অর্থ, ঐ ছোট শহর, ধেড়ধেড়ে ডিহি গোষ্ঠীপুরে বারো জন ওস্তাদ রয়েছেন যাঁরা চার্লিকে হাতে-কলমে দেখিয়ে দিলেন চার্লির পার্ট কি করে প্লে করতে হয়!

চার্লি শিরে করাঘাত করে বলেছিলেন, 'হে ভগবান, আমার অভিনয় যদি এই বারো জনের মতো হয় তবে আমি আত্মহত্যা করে মরবো।'

ব্যাপারটা হয়েছে, চার্লি যেখানে সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা দিয়ে হৃদয়ের গভীর অনুভূতি প্রকাশ করেন এরা সেটাকে দশগুণ বাড়িয়ে দিয়ে মস্করাতে পরিণত করেছেন,

চার্লি যেখানে চোখের জলের রেশ মাত্র দেখিয়েছেন এঁরা সেখানে হাউমাউ করে আসমান-জমীন ফাটিয়ে আড়াই ঘটি চোখের জল ফেলেছেন, চারুকলার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রেখে চার্লি যেখানে অখণ্ড সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রশান্ত শিব সৃষ্টি করেছেন সেখানে তাঁরা প্রত্যেক অঙ্গে ফাইলেরিয়ার গোদ জুড়ে বানিয়ে তুলেছেন এক একটি বিকট মর্কট।

ঘরোয়া উপমা দিতে হলে বলি, ভেজাল সরষের তেলেরই বড় বেশী সোনালী ঝাঁঝ—মারাত্মক তুখোড়।

রবীন্দ্রনাথের 'দোদুল-দোলা', 'ব্যাকুল বেণু', 'উদাস হিয়াকে', 'দোলান্তর', 'বেণুতর' করে নিত্য নিত্য কত না নব নব মস্করা হচ্ছে। কিন্তু তবু চার্লি বেঁচে গেছেন। কারণ আর যা-ই হোক মার্কিন মুল্লুক পরশু দিনের গড়া নবীন দেশ। ভেজালে এদের অভিজ্ঞতা আর কতটুকু? প্রাচীন চীনের কাহিনী শ্রবণ করুন।

একদা চীন দেশে এক গুণীজ্ঞানী, চরিত্রবলে অতুলনীয় বৌদ্ধ শ্রমণের আবির্ভাব হয়। যেমন তাঁর মধুর সরল শিশুর মতো চলাফেরা-জীবনধারা, তেমনি তাঁর অদ্ভুত বচনবিন্যাস। বুদ্ধের কীর্তিকাহিনী তিনি কখনো বলতেন বলদৃপ্ত কণ্ঠে, কখনো সজল করুণ নয়নে—তথাগতেরই মতন তখন তাঁর সৌম্যবদন দেখে, আর উৎসাহের বচন শুনে বহু শত নরনারী একই দিনে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতো। ক্রমে ক্রমে তাঁর মাতৃভূমির সর্বত্র বৌদ্ধধর্মের জয়ধ্বনি বেজে উঠলো, বুদ্ধের জীবনাদর্শ বহু পাপী তাপীকে ধর্মের মার্গ অনুসরণে অনুপ্রাণিত করলো।

দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর ধরে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করার পর তাঁর মৃত্যুক্ষণ কাছে এল। তাঁর মন কিন্তু শান্ত, তাঁর চিত্ত নিষ্কম্প প্রদীপ শিখাবৎ। শুধু একটি চিন্তা-বাত্যা ক্ষণে ক্ষণে তাঁর মুমূর্ষু প্রদীপশিখাকে বিতাড়িত করছে। শিষ্যেরা বুঝতে পেরে সবিনয় জিজ্ঞেস করলে, সেবাতে কোন ত্রুটি হচ্ছে কি না।

গুরু বললেন, 'না। ইহলোক ত্যাগ করতে আমার কোনো ক্ষোভ নেই। আমার মাত্র একটি ভাবনা। আমার মৃত্যুর পর আমার কাজের ভার কে নেবে?'

শিষ্যেরা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। তাঁর চরিত্রবল কে পেয়েছে, তাঁর বক্তৃতাশক্তি কার আছে যে এ-কঠিন কাজ কাঁধে তুলে নেবে?

গুরু দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

এমন সময় অতি অজানা এক নূতন শিষ্য সামনে এসে বললে, 'আমি এ ভার নিতে পারি।'

গুরুর বদনে প্রসন্নতার দিব্য জ্যোতি ফুটে উঠলো। তবু ঈষৎ দ্বিধার কণ্ঠে

শুধালেন, 'কিন্তু বৎস তোমাকে তো আমি চেনবার অবকাশ পাই নি। তুমি কি সত্যই এ কাজ পারবে? ঐ দেখো, আমার দীর্ঘদিনের শিষ্যেরা সাহস না পেয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। আচ্ছা দেখি, তুমি অমিতাভের জীবনের যে কোনো বিষয় নিয়ে একটি বক্তৃতা দাও তো।'

বিস্ময়! বিস্ময়!—সেই শিষ্য তখন গলা খুলে গাধার মতো, হুবহু গাধার মতো চেঁচিয়ে উঠলো। কিছু না, শুধু গাধার মতো চেঁচালে।

সবাই বাক্যহীন নিস্পন্দ।

ব্যাপার কি?

গুরুর মাত্র একটু সামান্য ত্রুটি ছিল। তিনি বক্তৃতা দেবার সময় অন্য বক্তাদের তুলনায় একটু বেশী চিৎকার করে কথা বলতেন। ভুঁইফোঁড় শিষ্য ভেবেছে ভালো করে চেঁচাতে পারাতেই উত্তম বক্তৃতার গূঢ় রহস্য। ঐ কর্মটি সে করতে পারলে তাবৎ মুশকিল হবে আসান। তাই সে চ্যাঁচানোর চ্যাম্পিয়ন রাসভরাজের মতো চেঁচিয়ে উঠেছে।

আমার গুরুদেবের পিতৃতুল্য অগ্রজ সত্যদ্রষ্টা, প্রাতঃস্মরণীয় ঋষি দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেছেন,

'To imitate-এর বাঙলা, অনুকরণ।
To ape-এর বাঙলা, হনুকরণ।'

এস্থলে রাসভকরণ।

ফরাসী-বাঙলা

রবীন্দ্রনাথ নাকি কোনো এক স্থলে খেদ করেছেন, আমরা ইয়োরোপের যে-টুকু চিনলুম সেটা ইংরেজের মারফতে।

তিনি ঠিক কি বলেছিলেন মনে নেই বলে অপরাধ মেনে নিয়ে নিবেদন করি, ইংরেজ বরঞ্চ চেষ্টা করেছে আমরা যেন ইয়োরোপকে না চিনতে পারি।

ইংরেজ যখন এদেশে রাজত্ব করতো তখন দু'টি প্রচারকর্মে মেতে থাকতে সে বড় আনন্দ পেত। তার প্রথম, বিশ্বজনকে জানানো যে, ভারতীয়েরা ড্যাম নিগার, কালা আদমী, তাদের কোনো প্রকারের কল্‌চর্ নেই। দ্বিতীয়, ভারতীয়দের জানানো, ইংরেজ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাত এবং তাই (আ ফর্তেরিয়রি) ইয়োরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ নেশন তো বটেই। প্রমাণস্বরূপ শেক্‌সপিয়রের নাম করলে।

আমরা তখন আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে যাচাই-পরখ করে দেখলুম, কথাটা ঠিক; শেক্‌স্‌পিয়রের মতো কবি পৃথিবীতে কম,—নেই বললেও চলে। ইংরিজিতেই পড়লুম, ফরাসী-জর্মন-ওলন্দাজ-দিনেমার সবাই এ-কথা স্বীকার করেছে। তাই আমরা ইংরেজের বাদবাকি দাবীগুলোও সুড়সুড় করে মেনে নিলুম। ঘড়েল মিথ্যে সাক্ষী—কনফিডেন্‌স্‌ ট্রিক্‌স্‌টার—এইভাবেই সরল জনকে আপন সব পচা মাল পাচার করে দেয়।

ইংরেজ কিন্তু এ-কথা বলতে ভুলে গেল, উপন্যাসে তার টলস্টয় নেই, গল্পে তার মপাসাঁ নেই, চিত্রকলায় তার রাফায়েল নেই, ভাস্কর্যে তার মাইকেল এঞ্জেলো নেই, দর্শনে কাণ্ট নেই, নৃত্যে পাভলোভা নেই, ধর্মে লুথার নেই, সঙ্গীতে বেটোফোন নেই।

বিশেষ করে বেটোফেনের কথাই তুললুম।

ইংরেজ জাত সুর-কানা। তাই সে বেটোফেনের নাম করে না। তাই ইংরেজের বাড়িতে সঙ্গীত-চর্চা নেই। যদি থাকতো তবে এ-দেশের বড় সায়েবদের বাড়িতেও সে-চর্চা আসন পেত। আমরাও ইয়োরোপীয় সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচিত হতুম। ইংরেজ চর্চা করলে এবং আমাদের শেখালে—জ্যাজ্‌, যেটা তার খুড়তুতো ভাই মার্কিন শিখলে তাদের গোলাম নিগ্রোদের কাছ থেকে।

অতি অবশ্য আমাদেরও দোষ আছে। আমাদের ছেলেমেয়েরা হাজারে হাজারে ফ্রান্‌স্‌-জর্মনী-ইতালি-রুশে যায় নি বটে, কিন্তু শতে শতে তো গিয়েছে। তাদের মধ্যে যে ক'জন ইয়োরোপের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন তাদের সংখ্যা এক হাতের এক আঙুলে গোনা যায় (এবং আশ্চর্য, যে মহাজন আমাদের সঙ্গে ফরাসী সাহিত্যের ঘনিষ্ঠতম পরিচয় ঘটিয়ে দিলেন তিনি কখনো ফ্রান্সে যান নি—তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

'দেশ' পত্রিকার এ সংখ্যা ফরাসিস্‌ সাহিত্য নিয়ে। অতএব সেই বিষয়বস্তুর ভিতরেই নিজেকে সীমাবদ্ধ করি।

ইংরিজী ভাষা গম্ভীর এবং জটিল কিন্তু তার প্রসাদগুণও আছে। ফরাসী চটুল ও রঙীন। অতিশয় গম্ভীর বিষয় আলোচনা করার সময়ও ফরাসী কেমন যেন একটুখানি তরল থেকে যায়। পক্ষান্তরে রসিকতা করার সময়ও ইংরিজী তার দার্ঢ্য সম্পূর্ণ বর্জন করতে পারে না। চার্লস ল্যাম্‌, এমন কি জেরম্‌ কে জেরম্‌ পর্যন্ত যে ভাষা ব্যবহার করেছেন সেটা ধ্রুপদ। উড্‌ হাউসে এসে আমরা সর্বপ্রথম চটুলতা পাই।

কিন্তু এহ বাহ্য। ফরাসী ভাষার সর্বপ্রধান গুণ তার স্বচ্ছতা, তার সরলতা।

ফরাসীরা নিজেই বলেন, 'যে বস্তু স্বচ্ছ (ক্ল্যার, ক্লিয়ার) নয় সে জিনিস ফরাসী নয়।' আমাদের দেশে আজকাল যে দুর্বোধ্য অবোধ্য পদ্য বেরয় সে 'মাল' প্রথম যখন ফ্রান্সে বেরতে আরম্ভ করল তখন গুণী আনাতোল ফ্রাঁস বলেছিলেন, 'যে মধুর ললিত বয়সে মানুষ অবোধ্য জিনিস ভালোবাসে আমার সে বয়স পেরিয়ে গিয়েছে ; আমি আলো ভালোবাসি।' তাই আরেক গুণী শেষ কথা বলেছেন, 'স্বচ্ছতা, স্বচ্ছতা, পুনরপি স্বচ্ছতা।'

ফরাসী চটুলতা হয়ত অনেকেই অপছন্দ করতে পারেন কিন্তু ফরাসী স্বচ্ছতা বাঙলা ভাষা এবং সাহিত্যে যদি আসতো তবে আর কিছু না হোক, আমাদের মনন সাহিত্য যে অনেকখানি লোকপ্রিয় হত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। শ্রীযুত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যদি আরো একটুখানি ফরাসী আওতায় আসতেন তবেই ঠিক বোঝা যেত তাঁর দেবার মতো সত্যিই কিছু ছিল কিনা। এ বিষয়ে বরঞ্চ বলবো, শ্রীযুত অন্নদাশঙ্করের লেখা অনেকখানি ফরাসিস্।

শব্দতত্ত্ব এবং ভাষাতাত্ত্বিকেরা ঠিক ঠিক বলতে পারবেন কিন্তু সাধারণ পাঠক হিসাবে আমার নিবেদন, বাঙলা ভাষার উপর ফরাসী ভাষার (language) প্রায় কোনো প্রভাবই পড়ে নি। বাঙলাতে ক'টি ফরাসী শব্দ ঢুকেছে সে কথা প্রায় পাঁচ আঙুলে গুনেই বলা যায়। অবশ্য এইটেই শেষ যুক্তি নয় ; আমরা বাঙলাতে প্রচুর আরবী এবং ফার্সী শব্দ নিয়েছি বটে কিন্তু ঐ দুই ভাষার প্রভাব আমাদের উপরে প্রায় নেই। কিন্তু অন্য কোনো বাবদেও ফরাসী ভাষার প্রভাব বাঙলার উপর আমি বড় একটা পাই নি।

সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। আমার ব্যক্তিগত দৃঢ়বিশ্বাস ইনি ফরাসী সাহিত্যের যতখানি চর্চা করেছেন ততখানি চর্চা বাঙলা দেশে তো কেউ করেনই নি, অল্প ইংরেজ জর্মন ইতালিয়ই—অর্থাৎ অফরাসিস—করেছে। ছোট গল্প, উপন্যাস, নাট্য, কবিতা, ভ্রমণ-কাহিনী, কত বিচিত্র বস্তুই তিনি ফরাসী থেকে অনুবাদ করে বাঙলায় প্রচার করেছেন। এই যে ইংরিজী এবং ফরাসী পাশাপাশি জাতের ভাষা—সেই ইংরিজীতেই পিয়ের লোতির লেখা 'ভারত ভ্রমণ' অনুবাদ করতে গিয়ে ইংরেজ অনুবাদক হিমসিম খেয়ে গিয়েছেন অথচ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুবাদে মূল ফরাসী যে ঠিক ঠিক ধরা তাই পড়েছে নয়, প্রাচ্য দেশীয় আবহাওয়াও সম্পূর্ণ বজায় রয়েছে।

এই জ্যোতিরিন্দ্রের বাঙলা ভাষাতেই ফরাসী ভাষার কোনো প্রভাব দেখতে পাওয়া যায় না।

বরঞ্চ ফরাসী শৈলীর (style) প্রভাব বেশ কিছুটা আছে।

বাঙলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকরা পাকাপাকি ভাবে বলতে পারবেন, বাঙলার কোন্ লেখক সর্বপ্রথম ফরাসীর সঙ্গে বাঙলার যোগসূত্র স্থাপনা করেছিলেন; আমি শুধু সার্থক সাহিত্যিকদের কয়েকজনের কথাই তুলবো।

মাইকেলের সার্থক সৃষ্টিমাত্রই গম্ভীর—সংস্কৃত এবং লাতিনের ক্লাসিকাল গুণের সঙ্গে তিনি তাঁর বীণার তার বেঁধে নিয়েছিলেন। ওদিকে তিনি আবার অতি উত্তম ফরাসী জানতেন—নূতন ভাষা তিনি যে কত তাড়াতাড়ি শিখতে পারতেন, সে কথা আজকের দিনের ভাষার 'ব্যবসায়ী'রা কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না—কিন্তু সে 'রঙ্গীলা ঘরানা' তাঁর ভাষার উপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারে নি।[১] তাই কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি নে তিনি লা ফঁতেনের ধরনে 'ফাব্‌ল্' (ফেব্‌ল্) রচনা করলেন কেন? লা ফঁতেন তাঁর অনেক গল্প নিয়েছেন ঈশপের গম্ভীর গ্রীক থেকে, কিন্তু লিখেছেন অতি চটুল ফরাসী কায়দায়। অথচ তাঁরই অনুকরণে যখন মাইকেল বাঙলাতে 'ফাব্‌ল্' রচনা করেছেন তখন তিনি গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলছেন,

'রসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণলতিকারে—'

দুই সুর একেবারে ভিন্ন। অথচ মাইকেলের প্রায় সব ক'টি 'ফাবলে'র উৎস লা ফঁতেন।

প্রহসনেও তাই। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ-'র মূলে মলিয়ের। অথচ শৈলীতে গম্ভীর।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা পূর্বেই নিবেদন করেছি। যদিও তাঁর আপন ভাষাতে ফরাসী প্রভাব নেই তবু তিনি অনুবাদের মারফতে যে শৈলী এবং বিষয়-বস্তুর অবতারণা করে গেলেন তার প্রভাব বাঙলা সাহিত্যের দূর-দূরান্ত কোণে পৌঁছে গিয়েছে এবং আরো বহুদিন ধরে পৌঁছবে।

তেয়োফিল গতিয়ে, এমন কি বাল্‌জাক্ ও মপাসাঁরা পূর্বে কয়েকটি সার্থক ছোট গল্প লিখেছেন কিন্তু আজ শুধু ফরাসিস না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্বীকার করে, মপাসাঁই ছোট-গল্পের আবিষ্কর্তা। তিনিই প্রথম দেখিয়ে দিলেন, দীর্ঘ উপন্যাস না লিখেও পাঠককে কি প্রকারে কাহিনী-রসে আপ্লুত করা যায় ('কণ্ঠহার' গল্প নিয়ে সাত-ভলুমী 'জাঁ ক্রিস্তফ' লেখা যায়)। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের জন্য

১ বরঞ্চ গৌর বসাককে লেখা চিঠিগুলোতে প্রচুর ফরাসী ফ্রিভলিটি পাবেন।

ডস্তেয়ফ্‌স্‌কির মতো ভলুম ভলুম না লিখেও 'সূত্ররূপে' সেই রস পাঠকের মনে সঞ্চারিত করা যায়।

আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, ছোট-গল্প লেখক রবীন্দ্রনাথ যবে থেকে জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুরের মারফতে মপাসাঁকে চিনতে শিখলেন তবে থেকেই তাঁর গল্প ঋজু কাঠামো নিয়ে সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে আত্মপ্রকাশ পেল (অবশ্য প্রথম থেকেই তাঁর গল্পে থাকতো প্রচুর গীতরস এবং পরবর্তী যুগে তিনি অন্য এক মিস্‌টিক নবরসে ছোট-গল্পকে অপূর্ব এক নবরূপ দান করেন)।

* *

দান্তে, শেক্‌স্‌পিয়র, গ্যোটে, কালিদাস কেউই পৃথিবীর সুদূরতম সাহিত্যকে এতখানি প্রভাবান্বিত করতে পারেন নি মপাসাঁ যতখানি করেছেন। এটম্ বম্ হয়ত পৃথিবীর সব চেয়ে বড় আবিষ্কার কিন্তু বাইসিক্‌ল ওসেলাইয়ের কল যে রকম গ্রামে গ্রামে পৌচেছে এটম্ বম্ শেক্‌স্‌পিয়র সে রকম সাহিত্যে সাহিত্যে নব নব সৃষ্টির অনুপ্রেরণা দিতে পারেন নি।[২]

অথচ আজো যখন কোনো মানুষের জীবনে কোনো এক অদ্ভুত বিচিত্র অভিজ্ঞতা আসে সে তখন তার প্রকাশ দেবার চেষ্টা করে ছোট-গল্পের মাধ্যমে, অর্থাৎ মপাসাঁর কাঠামো নিয়ে। ইংরেজ, জর্মন, রুশ, বাঙলা এ-সব অর্বাচীন সাহিত্যের কথা বাদ দিন, অতিশয় প্রাচীন চীন আরবীর মতো ক্লাসিকাল সাহিত্যেও আজকের দিনে মপাসাঁ ছোট-গল্পে আদি গল্পগুরু বাল্মীকি। সবাই তাঁরই 'রাজেন্দ্র সঙ্গমে, দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে।'

* *

বাঙলা সাহিত্যে মপাসাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য প্রভাত মুখোপাধ্যায়। তিনি ফরাসী জানতেন কি না শৈলী-আলোচনায় সে প্রসঙ্গ অবান্তর। তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তস্য শিষ্য রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন এবং এঁদের মাধ্যমে মপাসাঁর শরণ নিয়েছিলেন। বাঙলা দেশের কোনো গল্পলেখকই প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের মতো মপাসাঁর এত কাছে আসতে পারেন নি। মপাসাঁর মতো প্রভাতের ছিল সমাজের নানা শ্রেণী, নানা চরিত্র, নানা পরিস্থিতি নিয়ে নিয়ে নবীন নবীন গল্প গড়ে তোলার অসীম ক্ষমতা। মপাসাঁর মতো তিনিও কয়েকখানি উপন্যাস লিখেছিলেন। সেখানেও দু'জনের আশ্চর্য মিল। ঔপন্যাসিক রূপে মপাসাঁ ফ্রান্সে

---

২ হেমচন্দ্র বিস্তর শেক্‌স্‌পিয়র অনুবাদ করেছিলেন, কিন্তু বাঙলাতে আজ পর্যন্ত কেউ শেক্‌স্‌পিয়রের অনুকরণ করেন নি।

বিশেষ কোনো সম্মান পান নি; বাঙলা দেশে প্রভাত মুখোপাধ্যায়েরও সেই অবস্থা।

এ প্রসঙ্গে সর্বশেষ নিবেদন, প্রভাত-পরবর্তী যুগের প্রায় সব বাঙালী গল্প-লেখকই মপাসাঁর অনুকরণ করেছেন প্রভাতের মাধ্যমে।

* *

এই সময়ে 'ভারতী'কে কেন্দ্র করে শক্তিশালী এক নূতন কথাসাহিত্যিক গোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়। এ গোষ্ঠী অহরহ অনুপ্রেরণা পেত জ্যোতিরিন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। এঁদের ভিতর সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য সত্যেন্দ্র দত্ত, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, মণি গাঙ্গুলী ও সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এঁরা প্রধানত ফরাসী সাহিত্য থেকে অনুপ্রেরণা সঞ্চয় করে বাঙলা দেশে এক নূতন ফরাসিস 'গুলস্তান' বানাতে আরম্ভ করলেন। এঁদের একটা মস্ত সুবিধে ছিল এই যে, এঁরা রবীন্দ্র-নাথের গড়া আধুনিকতম বাঙলার সম্পূর্ণ ব্যবহার করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সে সুযোগ পান নি বলে তাঁর ভাষা ছিল বিদ্যাসাগরী। এঁরা রবীন্দ্রনাথের সাবলীল ভাষা ব্যবহার করাতে তখনকার দিনের বাঙালী পাঠকের মর্মদ্বারে দরদী আঘাত হানতে পেরেছিলেন।

সব চেয়ে 'তাজ্জব ভেল্কি বাজি' দেখালেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। তাও আবার কাব্যে! এক ভাষার কবিতা যে অন্য ভাষাতে তার আপন রূপরসগন্ধস্পর্শ নিয়ে এরকম ভাবে প্রকাশ পেতে পারে এর কল্পনাও বাঙালী পাঠক এর পূর্বে কখনো করতে পারে নি। সত্যেন্দ্রনাথের পূর্বে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, হেম বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, এমন কি রবীন্দ্রনাথও বিদেশী কবিতার অনুবাদ করেছিলেন কিন্তু এক 'সদ্ভাবশতক' ছাড়া অন্য কোনো বই জনপ্রিয় হতে পারে নি। স্বামী বিবেকানন্দ নাকি বলেছেন, অনুবাদ মাত্রই কাশ্মীরী শালের উল্টো দিকের মতো; মূল নকশার সন্ধান তাতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আর-সব সৌন্দর্য উল্টো পিঠে ওতরায় না। সত্যেন্দ্রনাথ দেখিয়ে দিলেন, ওতরায়, এবং মাঝে মাঝে উল্টো দিকটাও মূলের চেয়ে বেশী মূল্য ধরতে জানে।

যাঁরা সত্যেন্দ্র দত্তের অনুবাদ মূলের সঙ্গে মিলিয়ে পড়েছেন তাঁরাই আমার কথায় সায় দেবেন। অন্যতম বিখ্যাত অনুবাদক কান্তি ঘোষ বহুবার একথা বলেছেন। তিনি নেই। তাই আজকের দিনের সবে-ধন নীলমণি নরেন্দ্র দেবকে আমি সাক্ষী মানছি।

তোয়েফিল গতিয়ে, রঁসার ল্যকঁৎ দ্য লিল্, ভেরলেন্, বদলের, য়্যুগো (Hugo), শেনিয়ে, মিস্ত্রাল, ভেরেরেন্, ভালমোর, বেরাজেঁ—কত বলবো?—

কত না জানা-অজানা কবির কত না কবিতা দিয়ে তিনি তাঁর কুম্ভ 'তীর্থ-সলিল' পূর্ণ করলেন, কত দেশের কত 'তীর্থরেণু' বাঙালীর কপালে ছুঁইয়ে দিলেন।

ঋগ্বেদে আছে, হে অগ্নি, তুমি আমাদের পুরোহিত, কারণ তুমি আমাদের সর্ব আহুতি দেবতাদের কাছে নিয়ে যাও। সত্যেন্দ্রনাথ বহু দেশের বহু কবির পুরোহিত।

* *

কথাসাহিত্যেও ঐ সময়ে প্রচুর ফসল ফললো। গতিয়ে, য়্যুগো, মেরিমে, দোদে, মপাসাঁ, দ্যুমা, বাল্‌জাক্ ইত্যাদি বহু লেখকের বহু ছোট-গল্প এবং উপন্যাসও বাঙলায় অনূদিত হল। এ গোষ্ঠীর কার্যকলাপ বাঙলা সাহিত্যে কতখানি স্থায়ী মূল্য ধরে তার বিচার একদিন হবে; উপস্থিত বলতে পারি এঁরা বাঙলা সাহিত্যে যে ফরাসী উদারতার আমন্ত্রণ জানালেন তার ফলে পরবর্তী যুগের অনেক বাঙালী লেখক গোড়ার থেকেই সঙ্কীর্ণতামুক্ত হয়ে সাহিত্যের আরাধনা করতে পেরেছিলেন। হঠাৎ একদিন বাঙলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের ফলে এঁদের লোকপ্রিয়তা ক্রমে ক্রমে কমে গিয়ে একদিন সম্পূর্ণ লোপ পায়। কিন্তু শরতের মোহ কেটে যাওয়ার পর আজ পর্যন্ত কেন যে কেউ এঁদের হেমন্তের সফলতা সন্ধান করে না সে এক আশ্চর্যের বস্তু।

* *

বাঙলায় ফরাসী সাহিত্য প্রসঙ্গে শুধু প্রমথ চৌধুরী সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ একটি প্রবন্ধ লিখতে হয়। ইনিই একমাত্র বাঙালী সাহিত্যিক যাঁকে সর্বার্থে ফরাসিস আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। একমাত্র এঁরই ভাষাটিতে 'ঈভনিং ইন্ প্যারিসে'র খুশবাই পাওয়া যায়। এঁর শৈলী ফরাসী শ্যাম্পেনের মতো বুদ্বুদিত, ফেনায়িত। এমন কি এঁর বিষয়বস্তুও মাঝে মাঝে ফরেসডাঙার ধুতি পরে মজলিসে এসে বসে। বাঙলা সাহিত্যে বহু পণ্ডিত, বহু দার্শনিক, বহু কলাবিদ এসেছেন, কিন্তু একমাত্র এঁকেই সত্য বিদগ্ধ জন বলা যেতে পারে। এবং সে বৈদগ্ধ্য ফরাসী বৈদগ্ধ্য।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ফরাসিসের সঙ্গে বাঙালীর চারি চক্ষের মিলন ঘটিয়েছিলেন; প্রমথনাথে দুই সাহিত্যে গভীরতম প্রণয়ালিঙ্গন।

এঁর সাহিত্যসৃষ্টি হয়ত বাঙলাদেশ একদিন ভুলে যাবে কিন্তু এই বাঙালী ফরাসিস্ চরিত্রকে বাঙালী কখনো ভুলবে না।

প্রমথনাথের শেষ বয়সে ভারতী গোষ্ঠীর মুমূর্ষু অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে ফরাসী পণ্ডিত সিলভাঁ লেভি এদেশে আসেন। তাঁর চতুর্দিকে তখন এক ফরাসী

পণ্ডিতমণ্ডলীর সৃষ্টি হয়। এঁদের প্রধান ফণী বোস [৩], প্রবোধ বাগচী, মণি গুপ্ত, শশধর সিংহ, বিধুশেখর ভট্টাচার্য, ক্ষিতিমোহন সেন। এঁদের কেউই প্রচলিতার্থে সাহিত্যে নামেন নি কিন্তু এঁদের মাধ্যমে আমরা এদেশে সর্বপ্রথম ফরাসী পাণ্ডিত্যের সন্ধান পাই। এতদিন আমরা জানতুম, ইয়োরোপীয় 'প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব' বলতে বোঝায় ইংরেজ। এঁরাই প্রথম দেখিয়ে দিলেন, ফরাসিস্ ভারতবর্ষে ব্যাপকভাবে রাজত্ব না করেও ভারতীয় শাস্ত্রের চর্চা করেছে প্রচুর [৪]। বিশেষ করে আমাদের চিত্রকলা সঙ্গীতাদি। প্রবন্ধের গোড়ার দিকেই বলেছি সাহিত্য ছাড়া অন্য রসে ইংরেজ বঞ্চিত। ফরাসীরা সেখানে যথার্থ গুণী। মণি গুপ্তের অনুবাদে বাঙালী তার সন্ধান পাবে। শান্তা দেবীএই সময়েই বিশ্বভারতীতে ফরাসী শেখেন।

এই গোষ্ঠীর বাইরে আর দু'জন পণ্ডিতের নাম করতে হয়। মহম্মদ শহীদুল্লা এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। দিলীপ রায় আর কালিদাস নাগও এই যুগের লোক।

*   *

কিন্তু আমাদের জোড়া কুতুব-মিনার? বঙ্কিম এবং রবীন্দ্রনাথ? তা হলে দীর্ঘতর প্রবন্ধ লিখতে হয়। এ যুগের ঋষি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, imitation-এর বাঙলা অনুকরণ; aping-এর বাঙলা কি? 'হনুকরণ'। যাঁরা ফরাসীর 'হনুকরণ' করেন তাঁদের উল্লেখ আমি এ প্রবন্ধে করি নি। পদস্খলন সকলেরই হয়। পূর্বোল্লিখিত লেখকদের কেউ কেউ হয়ত অজানাতে মাত্রাধিক্য করেছেন কিন্তু এ-দুটি লোক সম্বন্ধে অধম নিঃসংশয়।

বঙ্কিম কিঞ্চিৎ ফরাসিস্ জানতেন। কিন্তু তিনি ইংরিজীর মাধ্যমে কঁৎ-কে চিবিয়ে খেয়েছিলেন। পূর্বসুরীগণের প্রসাদাৎ কঁৎ ফরাসী তর্কালোচনায় যে শুদ্ধবুদ্ধির (rationality-র) চরমে পৌঁছেন; বঙ্কিম সেই শাণিত অস্ত্র নিয়ে হিন্দুধর্ম রণাঙ্গনে প্রবেশ করেন। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তার সবিস্তর আলোচনা অসম্ভব। তাই এই আক্ষেপ দিয়েই বঙ্কিমালোচনা শেষ করি, হায়, তাঁর এই

৩ ইনি যৌবনেই দেহত্যাগ করেন, কিন্তু এঁর রচনা তখনই বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

৪ পরবর্তী যুগে ভিন্টারনিৎস জর্মন পাণ্ডিত্যের সঙ্গে এবং তুচ্চি ইতালীয় পাণ্ডিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটান। এঁদের সবাই এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে, বিশ্বভারতীতে।

শুদ্ধবুদ্ধির অনুসরণ আর কেউ করলে না কেন? যে লোক ইস্তেক দয়াসাগরের খেলাফে তলোয়ার খাড়া করেছিল তার অনুকরণ অনুসরণ, এমন কি 'হনুকরণ'ও কেউ করলো না কেন?

রবীন্দ্রনাথের উপর মপার্সাঁর ছায়া পড়েছিল সে-কথা পূর্বেই বলেছি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহকর্মীরূপে তিনি ফরাসী কবিতানাট্য এমন কি 'শারাদ'ও পড়েছিলেন। তারই ফলে

Celui qui me lira, dans les
siecle, un soir,
Troublant mes vers—

ইত্যাদি ইংরিজীতে শব্দে শব্দে অনুবাদ:

One who will read me, after centuries, one evening, turning over my verses—

'আজি হতে শতবর্ষ পরে' হয়ে বেরল। কিন্তু প্রথম কয়েক ছত্রের পরেই রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে চলে গিয়েছেন।

ঠিক সেই রকম মেটারলিঙ্কের 'নীলপাখি' যে কাঠামোতে[৫] লেখা রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর', 'অরূপ রতন' সেই কাঠামো নিয়ে, কিন্তু উভয় নাটকের বিষয়বস্তু নির্বাচনে এবং রসনির্মাণে রবীন্দ্রনাথ মেটারলিঙ্ককে অনেক পিছনে ফেলে গিয়েছেন। এবং সর্বশেষ নাটকদ্বয় 'মুক্তধারা' এবং 'রক্তকরবী'-র কাঠামোও রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ নিজস্ব—ভাষা, শৈলী, রসনির্মাণ পদ্ধতি রাবীন্দ্রিক তো বটেই।

আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম, অরবিন্দ ঘোষ (ইনি উত্তম ফরাসী জানতেন)—এঁদের মতো প্রতিভাবান লেখকের রচনাতে এঁর প্রভাব, ওঁর ছায়াপাতের অনুসন্ধান করে কোনো লাভ নেই। হীনপ্রাণ লেখক সর্বক্ষণ ভয়ে মরে, ঐ বুঝি লোকে ধরে ফেললে, সে অমুকের কাছ থেকে ধার নিয়েছে; তাই সে মহাজনদের বাড়ির ছায়া মাড়ায় না। বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ নিজেরাই এত বড় মহাজন যে, তাঁরা যত্রতত্র অনায়াসে বিচরণ করেন। ক্ষুদ্রতম লেখকের বাড়িতেও পাত ফেলতে তাঁদের কণামাত্র ভয় নেই। তাঁদের ঘানিতে যাই ফেল না কেন, স্নেহঘন হয়ে বেরিয়ে আসবে।

এইবারে শেষ প্রশ্ন: ফরাসীর উপর বাঙলা কোনো প্রভাব ফেলতে পেরেছে কি?

[৫] 'লোয়াজো ব্লু' জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বাঙলায় অনুবাদ করেন

রলাঁ যেরকম বহু বাঙালী লেখককে প্রভাবান্বিত করেছেন, ঠিক তেমনি তিনিও বাঙালী গুণী-জ্ঞানীদের সন্ধান রাখতেন। ব্রাহ্ম আন্দোলন, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান এবং এঁদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল অকৃত্রিম। বহু ফরাসী এঁরই মারফতে বাঙলাদেশের অনেক কিছু চিনতে শিখেছে।

পূর্বেই বলেছি, লেভির সঙ্গ পেয়ে বাঙালী গুণী ফরাসী পাণ্ডিত্যের চর্চা করেছিল। লেভি নিজে করলেন উল্টোটা। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গ পেয়ে তাঁরই সাহায্যে করলেন 'বলাকা'র ফরাসী অনুবাদ। আজ যদি শুনি, পাণিনি কোনো এক চীনা কবির রচনা সংস্কৃতে অনুবাদ করেছিলেন তা হলে যে-রকম আশ্চর্য হব।

শ্রীমতী আঁদ্রে কার্পেলেজ ফরাসীতে একখানা সঞ্চয়িতা বের করেন। তার নাম 'ফ্যাই দ্য ল্যাঁদ'—'লীভ্জ্ অব্ ইণ্ডিয়া'। এই চয়নিকায় বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য নিয়েই আলোচনা ছিল প্রধানত। দুর্ভাগ্যক্রমে বইখানা আমার হাতের কাছে নেই।

এবং নেই, শান্তিনিকেতনে ফরাসী ভাষার প্রাক্তন অধ্যাপক ফের্না বেনওয়ার রচনাবলী। অমিয় চক্রবর্তীর সহযোগিতায় তিনি 'মুক্তধারা'র ফরাসী অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন 'লা মাশিন' (দি মেশীন) নাম দিয়ে। এর পরবর্তী যুগে বাঙলা সম্বন্ধে আরো বিস্তর লেখা ফরাসীতে প্রকাশ ও প্রচার করেছিলেন।

এবং মারাত্মক নেই, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ফরাসী প্রেসের অভিমত, অভ্যর্থনা, অকুণ্ঠ প্রশংসা। রবীন্দ্রনাথ যতবার ফ্রান্সে গিয়েছেন, যখনই তাঁর চিত্রকলার প্রদর্শনী হয়েছে, ফ্রান্স তখনই বাঙলাদেশ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে তাকে স্বীকার করেছে। প্যারিসে স্বীকৃতি পাওয়া সহজ কর্ম নয়। এ-সব প্রেস্-কাটিংস্ অনুসন্ধিৎসু পাঠক শান্তিনিকেতন লাইব্রেরীতে পাবেন। সে এক বিরাট ব্যাপার।

অর্থাৎ হাতের কাছে কিছুই নেই—'ঢাল নেই তলোয়ার নেই'—

তাই আর কেউ বলার পূর্বেই স্বীকার করে নিই, এ লেখা সম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ।

চার্লি চ্যাপলিন

আমার ছেলেবেলায় বায়স্কোপও ছেলেমানুষ ছিল। হরেক রকম ফিলিম তখন আসতো; ছোট, বড়, মাঝারি—এখনকার মতো স্টাণ্ডার্ডাইজ্ড নয়। সেনসর বোর্ড-ফোর্ডও তখন শিশু, এখনকার মতো 'জ্যাঠা' হয়ে ওঠে নি—'এটা অশ্লীল',

'ওটা কদর্য', 'সেটা বড় কর্তাদের নিয়ে মস্করা করেছে' বলে দেশের দশের রুচি মেরামত করার মতো হরিশ মুখুজ্যে দি সেকেণ্ড হয়ে ওঠে নি। কাজেই হরেক রুচির ফিলিম তখন এদেশে অক্লেশে আসতো এবং আমরা সেগুলো গোগ্রাসে গিলতুম। তার ফলে আমাদের চরিত্র সর্বনাশ হয়েছে, এ কথা কেউ বলে নি। এবং আজ যে সেনসর বোর্ডের এত কড়াক্কড়ি, তার ফলে এযুগের চ্যাংড়া-চিংড়িরা যীশুখৃষ্ট কিংবা রামকেষ্ট হয়ে গিয়েছে এ মস্করাও কেউ করে নি। তবু শুনেছি সেনসর বোর্ডের বিশ্বাস, বিস্তর ছবি ব্যান্ করলে শেষটায় ভালো ছবি বেরবে। তাই যদি হয়, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও একটা সেনসর বোর্ড লাগাও না কেন? কাকা-মামা-শালাদের চাকরি তো হবেই এবং সুবো-শাম হুদোহুদো বই ব্যান্ করার ফলে একদিন ইয়া দাড়িগোঁফ সমেত আরেকটি সমুচা রবিঠাকুর বেহেশৎ থেকে টুকুস্ করে টস্‌কে পড়বেন—এই যেরকম হাওড়া ইষ্টিশানের কল থেকে প্ল্যাটফর্ম টিকিট মিন্-ফর্সে্প্সে বেরিয়ে আসে।

আমি মাঝে মাঝে ভাবি, এরা কার রুচি রিফর্ম করতে চায়? আমার? সাবধান! পাড়ার ছোঁড়ারা আমায় মানে (ওরাই আমাকে মাঝে-মধ্যে বায়স্কোপে নিয়ে যায়), শুনলে ক্ষেপে উঠবে। বোর্ডেরও প্রাণের ভয় আছে। তবে কি টাঙাওলা বিড়িওলাদের? ওঃ! কী দম্ভ! ওদের রুচিতে ভণ্ডামি নেই। ঐটে পেলে আমি বর্তে যেতুম।

কিন্তু সে কথা থাক্। এই সেনসরিং ব্যাপারটা দেশে-বিদেশে কি প্রকারে সমাধান হয় সে সম্বন্ধে আরেকদিন সবিস্তর আলোচনা করবো। ইতিমধ্যে ছোটা হিটলারদের স্মরণ করিয়ে রাখি বড়া হিটলাররা জর্মানিতে 'অল কোয়ায়েট' ফিলিম ব্যান্ করেছিল!

সেই যুগে হঠাৎ দেখা দিলেন মহাকবি চার্লি চ্যাপলিন—ভগবান তাঁকে দীর্ঘায়ু করুন।

সাহিত্য বলুন, সঙ্গীত বলুন, চিত্রকলা বলুন, ভাস্কর্য বলুন, এ রকম একটি তাজমহলের-সামনে-দাঁড়িয়ে-নটরাজ পৃথিবীতে আর কখনো উদয় হয় নি। এঁর প্রতিভা অতুলনীয়। বাগেদবী এঁর কণ্ঠে, উর্বশী পদযুগে, এঁর দক্ষিণ হস্তে বিষ্ণুর চক্র (গ্রেট ডিক্‌টেটর), বাম হস্তে দাক্ষিণ্যের বরাভয় (সিটি লাইট)! ইনি বিশ্বকর্মা (মডার্ন টাইমস), ইনি নীলকণ্ঠ (মসিয়ো ভেরদু)। 'অতি বড় বৃদ্ধ' বলেই ইনি 'সিদ্ধিতে নিপুণ' এবং লগ্ন এলে শঙ্করের মতো নবীন বেশে সজ্জিত হতে জানেন (লাইম লাইট)।

রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ করে শরৎচন্দ্র একদা বলেছিলেন, 'তোমার দিকে চাহিয়া

আমাদের বিস্ময়ের অন্ত নাই।' সেই রবীন্দ্রনাথ সিন্ধুপারের হিস্পানী বিদেশিনীকে দেখে মুগ্ধকণ্ঠে বলেছিলেন,

'সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে
দেখেছি পথে যেতে তুলনাহীনারে।'

চার্লির দিকে তাকিয়ে সর্বক্ষণ এই দোহাটি মনে পড়ে।

সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হিসেবে জগদ্বিখ্যাত হওয়ার পর টলস্টয় একখানি প্রামাণিক অলঙ্কার-শাস্ত্রের গ্রন্থ লেখেন। পুস্তকের প্রথম এবং শেষ প্রশ্ন, 'হোয়াট ইজ্ আর্ট?' অর্থাৎ 'রস কি?' মধুর সঙ্গীত শুনে, উত্তম কাব্য পাঠ করে, দেবীর মূর্তি দেখে আমরা যে আনন্দরসে নিমজ্জিত হই সে বস্তুটি কি?

তার সংজ্ঞা দেওয়ার পর টলস্টয় বলেন, গুটিকয়েক উন্নাসিককে যে রস আনন্দ দান করে সে রস হীন রস। আচণ্ডাল, (আ-সেনসর বোর্ড?)[১] জনসাধারণকে যে কাব্য আনন্দ দেয় সেই কাব্যই প্রকৃত কাব্য, উত্তম কাব্য। যথা, মহাভারত। পণ্ডিত-মূর্খ, বৃদ্ধ-বালক, পাপী-পুণ্যবান সকলেই এ কাব্য শুনে আনন্দ পায়।

অবশ্য সব পাঠক যে একই কাব্যে একই বস্তুতে আনন্দ পাবে এমনটা নাও হতে পারে। বালক হয়ত কাব্যের কাহিনী বা প্লট শুনে মুগ্ধ, বলদৃপ্ত যুবা হয়ত কর্ণার্জুনের যুদ্ধবর্ণনা শুনে বীর রসে লুপ্ত, বৃদ্ধ হয়ত শ্রীকৃষ্ণে অর্জুনের আত্মসমর্পণ দেখে ভক্তিরসে আপ্লুত, এবং উদারচরিত সর্বরসে রসিকজন হয়ত প্রতি ঝঙ্কারে প্রতি মোড়ে প্রকৃত কাব্যরসে নিমজ্জিত।

তা হলে প্রশ্ন, মানুষের বর্বর রুচিকে কি মার্জিত করা যায় না? হয়ত যায়, কিংবা হয়ত যায় না, কিন্তু চেষ্টা আলবৎ করা যায়। সে চেষ্টা ভরত, দণ্ডিন, মম্মট, অ্যারিস্টটল, রবীন্দ্রনাথ, ক্রোচে করেছেন, কিন্তু এঁদের গলা কেটে ফেললেও এঁরা কোনো বোর্ডের মেম্বর হতে রাজী হতেন না। মানুষের রুচিপরিবর্তন এঁরাই করিয়েছেন—কোনো বোর্ড কখনোই কিছু পারে নি।

বর্তমান যুগে চার্লি সেই রসই সর্বজনকে উপহার দিয়েছেন। এ যুগের সাহিত্যে, কাব্যে, ভাস্কর্যে, রঙ্গমঞ্চেও কুত্রাপি কেউই চার্লির বৈচিত্র্য, বিস্তার, গভীরতা, সর্বজনমর্মস্পর্শদক্ষতা দেখাতে পারেন নি। এ যুগে শার্লক হোমস

১। পাঠক ভাববেন না, আমি কলকাতা বা দিল্লীর বোর্ডের কথা ভাবছি। আমি সর্বাবিশ্বের জীবিত ও মৃত সর্ব বোর্ডের কথা ভাবছি। শ' যে রকম 'কুইন্‌জ্ রীডার অব্ প্লেজ'-এর স্মরণে আপন মন্তব্য বিশ্ব-বোর্ডের উদ্দেশে লিখেছিলেন।

পৃথিবীর সর্বত্রই সম্মান পেয়েছেন, কিন্তু মানুষের কোমলতম স্পর্শকাতরতাকে তিনি তার চরম মূল্য দিতে পারেন নি; ওমর খৈয়ামও প্রকৃত ধর্মভীরুকে বিচলিত করতে পারেন নি।

চার্লিকে বিশ্লেষণ করি কি প্রকারে?

তার সৃষ্টি, কিংবা তিনি নিজে, এই যে 'লিট্‌ল্ ম্যান', সামান্য জন, যেন পাড়ার জগা, টম্, ডিক্, হ্যারি; 'কেউ-কেটা' তো নয়ই একেবারে, 'কেউ-না' কি করে সকলকে ছাড়িয়ে এক অসাধারণ জন হয়ে সকলের হৃদয়ে এমন একটি আসন গ্রহণ করলো, যে আসন পূর্বে শূন্য ছিল এবং যেখানে আর কেউ কখনো আসতে পারবে না?

কোনটা ছেড়ে কোনটা বলি?

ভ্যাগাবণ্ড চার্লি একটি শুকনো ফুল দেখতে পেয়ে সেটি তুলে নিয়ে শুঁকতে লাগল। ঝাঁট-দিয়ে-ফেলে-দেওয়া ফুল—তার ফুল্ল যৌবন গেছে, সে পথপ্রান্তে অবহেলিত, পদদলিত। সামান্য যেটুকু গন্ধ তখনো তার অঙ্গে সুষুপ্ত ছিল চার্লি তাই যেন তার 'সহৃদয়' নিশ্বাস দিয়ে জাগিয়ে তুলে বুক ভরে নিচ্ছে। এ ফুল কি কখনো বিশ্বাস করতে পেরেছিল যে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে—রবীন্দ্রনাথের কবি যে রকম আত্মহত্যার পূর্বমুহূর্তে রাজকন্যার বরমাল্য পেল—সে তার চরম সম্মান পাবে?

এমন সময় রাস্তার দুষ্ট ছোঁড়ারা মোকা পেয়ে পিছন থেকে চার্লির ছেঁড়া পাতলুনের ভিতর হাত ঢুকিয়ে শার্টে দিল টান। চচ্চড় করে ছিঁড়ে গেল পাতলুনের অনেকখানি—এই তার শেষ পাতলুন, এটাও গেল—আর বেরিয়ে এল ছেঁড়া শার্টের শেষ টুকরো।

আস্তে আস্তে ঘাড় ফিরিয়ে ভ্যাগাবণ্ড চার্লি ছোঁড়াদের দিকে তাকালে। তারা তখন 'শুভকর্ম' সমাধান করে ছুটে পালাচ্ছে।

তখন ভ্যাগাবণ্ডের চোখে কী বেদনাতুর করুণ ভাব!

ভিয়েনা, বার্লিন, প্যারিস-প্রাগে আমি বিস্তর থিয়েটার প্রচুর অপেরা দেখেছি, কাব্যে সাহিত্যে টন মণ করুণ রসের বর্ণনা পড়েছি, কিন্তু ভ্যাগাবণ্ডের সে করুণ চাউনি এদের সবাইকে কোথায় ফেলে কহাঁ কহাঁ মুল্লুকে চলে যায়।

আর সেই নীরব চাউনিতে বলছে, 'কেন, ভাই, তোরা আমাকে জ্বালাস? আমি তো তোদের সমাজের উজীর নাজির হতে চাই নে। কুকুর বেড়ালটাকে পর্যন্ত আমি পথ ছেড়ে দিয়ে কোনো গতিকে দিন গুজরান করছি। আমায় শান্তিতে ছেড়ে দে না, বাবারা!' তারপরে যেন দীর্ঘনিশ্বাস—'হে ভগবান!'

এখানেই কি শেষ? তা হলে চার্লি দস্তয়েফ্‌স্কির মতো শুদ্ধ মাত্র করুণ রসের রাজা হয়ে থাকতেন।

অন্ধ ফুলওয়ালী মিষ্টি হেসে চার্লিকে একটি তাজা ফুল দিতে যাচ্ছে। তাকে? চার্লিকে? অবিশ্বাস্য!

আইনস্টাইন একবার কোনো শহরের বড় স্টেশনে নেমে দেখেন বিস্তর লোক তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে—যেন তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে চায়। বিনয়ী আইনস্টাইন শুধু পিছনের দিকে তাকান আর ডাইনে বাঁয়ে সরে যান। নিশ্চয়ই তাঁর পিছনে কোনো ডাকসাইটে কেষ্টবিষ্টু আসছেন, সবাই এসেছে তাঁকেই বরণ করতে, আইনস্টাইন শুধু আনাড়ির মতো মধ্যিখানে বাধার সৃষ্টি করছেন।

কই? কেউ তো নেই? রাস্তা একদম ভোঁ ভোঁ—কলকাতার রেশনশপের গুদামের মতো। এরা এসেছে আইনস্টাইনের জন্যই।

আমাদের ভ্যাগাবণ্ডটিও পিছনে তাকালে। এক্‌স্ট্রিমস মীট্‌। আইনস্টাইন খ্যাতির সর্বোচ্চ ধাপে, চার্লি নিম্নতম মাপে।

ফুল পেয়ে চার্লির মুখের ভাব! স্মিত হাস্যে মুখের দুই প্রান্ত দুই কানে ঠেকে গিয়েছে, শুকনো গাল দুটো ফুলে গিয়ে উপরের দিকে উঠে চোখ দুটো চেপে ধরেছে, চোখের কোণ থেকে রগ পর্যন্ত চামড়া কুঁচকে গিয়ে কাকের পায়ের নকশা ধরেছে, সে চোখ দুটো কিন্তু বন্ধ—আমার যেন মনে হল ভেজা-ভেজা, ঠিক বলতে পারবো না, কারণ আমার চোখও তখন ঝাপসা হয়ে গিয়েছে।

সবক্ষণ ভয় হচ্ছিল, এইবার না চার্লি ভ্যাক্‌ করে কেঁদে ফেলে!

কে বলে সংসারে শুধু অকারণ বেদনা, নিদারুণ লাঞ্ছনা! পকড়্‌কে লে আও উস্কো। এলিসের রানীর হুকুম, 'অফ্‌ ফ্‌ফ্‌ উইদ্‌ হিজ্‌ হেড্‌।'

মানুষের কলিজায় চার্লি পুকুর খোঁড়েন কি করে? দুঃখ, সুখ, করুণা, কৃতজ্ঞতা এসব রস আমাদের কলিজার গভীরতম প্রদেশে চার্লি সঞ্চারিত করেন কোন্‌ পদ্ধতিতে?

এক ইরানী কবি বলছেন, 'সব জিনিসের হদ্দ—অর্থাৎ সীমা জানাটাই প্রকৃত সৃষ্টিকর্তার লক্ষণ।'

অর্থাৎ তাঁর বর্ণনায়, তাঁর অভিনয়ে চার্লি বাড়াবাড়ি করেন না। কারণ কে না জানে, একঘেয়েমির চূড়ান্তে পৌঁছয় মানুষ যখন ভ্যাচর-ভ্যাচর করে সব কিছু বলতে চায়, সামান্যতম জিনিস বাদ দিতে চায় না।

তাই অভিনব গুপ্ত, আনন্দবর্ধন বলেছেন, 'ধ্বনি দিয়ে প্রকাশ করবে ধ্বনি বলতে তাঁরা ব্যঞ্জনা, ইঙ্গিত, সাজেস্‌টিভ্‌নেস অনেক কিছুই বুঝেছেন।

যথা :

কুলটা রমণী পথিককে বলছে, 'হে পথিক, এই ঘরে রাত্রিকালে আমার বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ী শয়ন করেন, ঐ ছোট ঘরে আমি একা থাকি, আমার স্বামী বিদেশে। তুমি এখন যাও।'

ইঙ্গিত সুস্পষ্ট।

অর্থাৎ চার্লি যেটুকু অভিনয় করেন, সে তো করেনই ; সঙ্গে সঙ্গে আমরা সকলেই অনেকখানি অভিনয় করে নিই।

হালে চার্লি সুখবর দিয়েছেন, তিনি আবার সেই 'লিটল ম্যান', সেই ভ্যাগাবণ্ডকে পুনর্জন্ম দেবেন। তাঁর যা বলবার তিনি তারই মারফতে শোনাবেন। শুনে আমরা উল্লসিত হয়েছি। 'মঁসিয়ো ভের্দু', 'লাইম-লাইট' উৎকৃষ্ট অতুলনীয় রসসৃষ্টি কিন্তু আমরা সেই ভ্যাগাবণ্ডকে বড্ড মিস্ করছি।

চার্লি ভ্যাগাবণ্ডকে বর্জন করেছিলেন কেন ?

হয়ত ভেবেছিলেন সব কথা ঐ একই জনের মারফতে বলা চলে না। আমাদের ভ্যাগাবণ্ডের পক্ষে সবাইকে তো বিষ খাইয়ে খাইয়ে—'বিজনেস ইস্ বিজনেস্' বলে এলোপাতাড়ি বিধবাহনন করা যায় না—তাই ভের্দুর সৃষ্টি।

ঠিক এই কারণেই কোনান ডয়েল শার্লক হোমস্‌কে মেরে ফেলে প্রোফেসর চ্যালেঞ্জার সৃষ্টি করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথও তাই গদ্য কবিতা ধরেছিলেন। এই উদাহরণটাই ভালো।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পদে পদে দেখলেন তাঁর কবিতায় পদে পদে মিল এসে যাচ্ছে, ছন্দ এসে যাচ্ছে। যাবেন কোথায় ? পঞ্চাশ বছরের অভ্যাস। নাচার হয়ে মিলগুলো লাইনের শেষে না এনে মাঝখানে ঢুকিয়ে দিতে লাগলেন—শাক ঢাকা দিয়ে মাংস খাওয়ার মতো।

শেষটায় বললেন, 'তুত্তোচ্ছাই ! যাই ফিরে ফের মিল ছন্দে।' রবীন্দ্রনাথের গবিতা নিকৃষ্ট নয়, রবীন্দ্রনাথের উত্তম কবিতা, এই বাঙলা দেশে একমাত্র তিনিই সার্থক 'গবি', কিন্তু সোজা কথা—তিনি বুঝে গেলেন যে কবিতার মিল ছন্দ বজায় রেখেও তাঁর যা বক্তব্য তা তিনি বলতে পারবেন। ফিরে গেলেন কবিতায়।

চার্লি যখন ভের্দু করছেন, তখন আমরা পদে পদে দেখতে পাচ্ছি তাঁর পিছনে ভ্যাগাবণ্ডকে। তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করছেন তাকে লুকোবার জন্যে—রবীন্দ্রনাথ যে রকম মিল লুকোবার চেষ্টা করেছিলেন গবিতায়—কিন্তু আমরা তাকে বার বার

দেখতে পাচ্ছি। বার বার মনে হয়েছে, 'আহা এ জায়গায় যদি আমাদের ভ্যাগাবণ্ডটি থাকতো তবে সে সিচুয়েশনটা কি চমৎকারই না এক্‌স্‌প্লয়েট করতে পারতো!'

চার্লিও সেটা বুঝেছেন। যে ভ্যাগাবণ্ডকে এতদিন একটুখানি জিরিয়ে নিলেন, তাকে চার্লি আবার ঘরের ভিতর থেকে টেনে আমাদের চোখের সামনে তাকে দিয়ে বাউণ্ডুলীপনা করাবেন।

সুসংবাদ!!

ফিল্মের ভাষা

থিয়েটারের কপাল মন্দ, পাঠান-মোগলের আপন দেশে ওটার রেওয়াজ নেই। তাই পাঠান রাজারা এদেশে জমে বসার পর গাইয়ে-বাজিয়েদের ডেকে পাঠালেন, পটুয়াদেরও ডাক পড়লো, নাচিয়েরাও বাদ গেল না আর এমারৎ বানানেওলাদের তো কথাই নেই। সংস্কৃত যদি তখন এ-দেশের চালু এবং সহজ ভাষা হত তাহলে সংস্কৃত নাট্যও যে বাদশার দরবারে কদর পেত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কারণ হিন্দী কদর পেয়েছিল এবং এ-দেশে বাঙলা কদর পাওয়ার ফলে পরাগল খান, ছুটি খানের মহাভারত লেখা হয়েছিল।

সংস্কৃতে লেখা আমাদের নাট্য ঠিক মুসলিম আগমনের শুরুতে এদেশে কতখানি চালু ছিল বলা কঠিন। ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা বলেন, সংস্কৃত তখন মৃত ভাষা, ওসব নাট্য তখন প্রায় উঠে গিয়েছে। আমি কিন্তু কিঞ্চিৎ ভিন্ন মত পোষণ করি।

পূর্বেই স্বীকার করেছি, পাঠান আমলে সংস্কৃত মৃত ভাষা, কিন্তু সংস্কৃত নাটক তো সম্পূর্ণ সংস্কৃতে লেখা হয়। তুলনা দিয়ে কথাটা পরিষ্কার করি।

শেক্‌স্‌পিয়র জানতেন, তিনি রাজা-রাজড়া এবং শিক্ষিতজনদের জন্যই আপন নাটক লিখছেন। কিন্তু অন্য একটি তত্ত্বও বিলক্ষণ জানতেন যে তাঁদের সংখ্যা কম, এবং বেঞ্চি গ্যালারি ভরভরাট ক'রে নাটকটাকে জম-জমাট করে তোলে টাঙাওলা-বিড়িওলার দল। কাজেই তাঁর নাটকে ওদেরই মতো চরিত্র ওদেরই ভাষায় কথা কয়, বিশেষ করে ভাঁড়টি সব সময়ই রাজা-প্রজা দু'দলকেই খুশী করতে জানে।

ঠিক সেই রকম গুপ্ত যুগের কালিদাসও জানতেন যে, তাঁর যুগের 'টাঙাওলা'

'বিড়িওলা' সংস্কৃত বোঝে না, অথচ রাজা-রাজড়ারা নাটক চান সংস্কৃতে। ওদিকে তিনি শেক্‌স্‌পিয়রের মতো বুঝতেন যে, জনসাধারণকে খুশী না করে কোনো নাটকই বক্‌স্‌-আপিস ভরতে পারে না। গোলাপফুল খাপসুরৎ জিনিস। কিন্তু পাতা-কাঁটা ওটাকে খাড়া করে না ধরলে ওটা শুধু শূন্যে শূন্যে ঝুলতে পারে না। তাই তিনি তাঁর নাটকে ব্রাহ্মণ আর রাজা ছাড়া আর সবাইকে দিয়ে কথা কওয়াতেন তখনকার দিনের চালু ভাষা প্রাকৃতে। আর শুধু কি তাই? রাজার সংস্কৃতে শোধানো প্রশ্নের উত্তর দাসী যখন প্রাকৃতে দিত তখন কালিদাস তার উত্তরের ভিতর রাজার প্রশ্নটি এমনভাবে জড়িয়ে দিতেন যে সংস্কৃত না-জাননেওলা শ্রোতাও দুই পক্ষের কথাই পরিষ্কার বুঝে যেত। দাসীর তুলনা দিয়েই যদি জিনিসটা বোঝাতে হয় তবে বলতে হবে, এ-যেন 'বাঁদীকে ঠেঙিয়ে বিবিকে সোজা রাখার' মতো রাজা এবং প্রজা উভয় দর্শককে সোজা রাখা।

তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কালিদাসের নাটক সর্বজনপ্রিয় ছিল।

তার পর প্রশ্ন উঠতে পারে, ঠিক মুসলমান আগমনের প্রাক্কালে জনসাধারণ কি কালিদাসের আমলের প্রাকৃত বুঝতো? এ প্রশ্নের উত্তর দেবার মতো এলেম আমার পেটে নেই। তবে তার একশ' বছর পেরবার পূর্বেই আমীর খুসরৌ যে-হিন্দী ব্যবহার করেছেন সে-হিন্দী অনেকটা ঐ প্রাকৃতের মতোই। এবং এখানে আরো একটি কথা আছে। জনসাধারণ ততদিনে কালিদাসের নাটক দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে, এবং নিরক্ষর দর্শক একটা ফিলিম তিন বার দেখবার পর যে কতখানি মনে রাখতে পারে সে-কথা শিক্ষিত জন জানেন না। আমার এক চাকর (বস্তুত এই গণতন্ত্রের ইন্‌কিলাবী যুগে 'মনিব' বলাই ভালো) পাড়াতে নয়া ছবি এলেই একটানা সাত দিন ধরে সেই ছবি দেখতে যেত। আমি অবাক হয়ে ভাবতুম, নাগাড়ে সাতদিন ধরে একই ছবি দেখে কি করে? পরে তার গুনগুনোনি থেকে বুঝলুম, ছবির চৌদ্দখানা গানই সে রপ্ত করতে চায় এবং করে ফেলেছেও। অনেক হিন্দী গানের বিস্তর কথা না বুঝতে পেরেও। অবশ্য আমার এ-মন্তব্যে ভুল থাকতেও পারে। কারণ আমি এ-জীবনে তিনখানা হিন্দী ছবিও দেখি নি এবং অন্য কোনো পুণ্য করি নি বলে এই পুণ্যের জোরেই স্বর্গে যাবো বলে আশা রাখি। তবে বলা যায় না, সেখানে হয়ত হিন্দী ছবি দেখতে হবে! কারণ এক ইরানী কবি মহাপ্রলয়ের পরে যে শেষ বিচার হবে তারই স্মরণে অনেকটা এই ভয়ই করেন,—

"শেষ-বিচারেতে খুদার সমুখে দাঁড়াবো তো নিশ্চয়,
মানুষের মুখ আবার দেখিব! এইটুকু মোর ভয়।"

"মরা ব্‌ রুজ-ই কিয়ামৎ গামী কি হস্ত্‌ ঈন্‌ অস্ত
কি রু-ই মরদুমে আলম্‌ দু বারা বায়দ দীদ"১

যদি প্রশ্ন শোধান সে কি করে হয়?—তুমি হিন্দী ফিল্‌ম্‌ বর্জন করার পুণ্যে স্বর্গে গেলে; সেখানে আবার তোমাকে ঐ 'মাল'ই দেখতে হবে কেন? তবে উত্তরে নিবেদন, কামিনীকাঞ্চনসুরা বর্জন করার ফলে আপনি যখন স্বর্গে যাবেন তখন কি ইন্দ্রসভায় ঐগুলোরই ছড়াছড়ি দেখতে পাবেন না?

তখন যদি আপনি এক কোণে মুখ গুমড়ো করে বসে থাকেন তবে কি সেটা খুব ভালো দেখাবে?

থাক্‌। কোথা থেকে কোথা এসে পড়লুম! মূর্খকে চটালে এই তো বিপদ। আবোল-তাবোল বকে।

মোদ্দা কথা এই, পাঠান-মোগল যুগে নাট্যাভিনয় রাজানুকম্পা পেল না বলে আমরা এখনো তার খেসারতি ঢালছি। এবং দ্বিতীয় কথা—নাট্যে, ফিলিমে ভাষা জিনিসটাকে অবহেলা করলে ক্ষতি হয়। এমন কি যদিও বহু গুণী বলে থাকেন 'সাইলেন্‌স্‌ ইজ গোল্ডেন' তবু সাইলেণ্ট ফিলিম চললো না। বাঙলা ফিলিম যখন সে সাইলেন্‌স্‌ ভাঙলো তখন থেকে আজ পর্যন্ত যে ভাষা সে বললে তারই দিকে এ-প্রবন্ধের নল চালনা।

সাতশ' বছর পরে ইংরেজ আমলে হল ঠিক তার উল্টো। কলাজগতে ইংরেজের প্রধান সম্পদ তার থিয়েটার। শেক্‌স্‌পিয়রের মতো নাট্যকার নাকি পৃথিবীতে নেই। ইংরেজ বললে, 'চালাও থিয়েটার।' কিন্তু প্রশ্ন, কে করবে থিয়েটার?

ইতিমধ্যে বাঙালী বিলেত যেতে আরম্ভ করেছে। সেখানে একাধিক নেশার সঙ্গে সে থিয়েটারের নেশাটাও রপ্ত করে এল।

বাঙলা গদ্য এবং পদ্য তখন দুইই বড় কাঁচা।

আর জনসাধারণের ভাষা? তারও মা-বাপ নেই। একদিকে শেষ-মোগলের ফার্সী উর্দুর শেষ রেশ, অন্যদিকে সুতোনুটি-গোবিন্দপুরের ঐতিহ্যহীন স্ল্যাঙ—দুয়ে

১ The only thing which troubles me about the Resurrection day is this,
That one will have to look once again on the faces of mankind.

মিলে তার যা চেহারা সেটা কিছুদিন পরে পাওয়া যায় হুতোমের নকশায়। অন্যদিকে বিদ্যাসাগরের অতি ভদ্র অতি মার্জিত ভাষা।

এ-যুগের নাটকের ভাগ্য তাই শব্দতত্ত্বের স্বর্গভূমি। কিন্তু নাটকে যে স্বচ্ছন্দ ভাষার প্রয়োজন তার বড়ই অভাব। সব নাট্যকারই যেন ঠিক মানানসই ভাষাটির জন্য চতুর্দিকে হাতড়ে বেড়াচ্ছেন।[২]

মাইকেলের পৌরাণিক নাট্য বিদ্যাসাগরী ভাষা; তাঁর 'একেই কি বলে সভ্যতা'তে কলকাতার স্ল্যাঙ, 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'তে গ্রামাঞ্চলের একাধিক ভাষা; এবং দীনবন্ধু মিত্রের ভাষাতে বিদ্যাসাগরী ও গ্রাম্য দুইই।

নীলদর্পণ সে যুগের বাঙলার বেদনা প্রকাশ করেই যে বিখ্যাত হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার মনে হয়, বিদ্যাসাগরী ভাষা ও মুসলমান চাষার ভাষা এ-দুয়ের সম্মেলনও তার জন্য অনেকখানি দায়ী। অবশ্য শুধুমাত্র ভাষার বাহার যদি শুনতে চান তবে 'বুড়ো শালিকের' মতো নাটক হয় না। হিন্দু গৃহস্থ, হিন্দু চাকর, মুসলমান চাষা, চাষার বউ, হিন্দু দাসী এদের সকলের আপন আপন ভাষার সূক্ষ্মতম পার্থক্য মাইকেল যে কী কৃতিত্বের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন তার তুলনা বাঙলা সাহিত্যে কোথাও নেই। নাটক হিসেবে এ-বই উত্তম—সাহিত্য হিসেবে ভাষার বাজারে এ-বই কোহিনুর।

অবাঙালীর জন্য পার্শী থিয়েটার কবে প্রতিষ্ঠিত হয় আমি ঠিক জানি নে, কিন্তু বিস্তর বাঙালীও সেখানে যেত ও উর্দু-গুজরাতীতে মেশানো নাটক বুঝতে যে তাদের বিশেষ অসুবিধে হত না সে তথ্য কিছু অজানা নয়। 'ছি ছি এত্তা জঞ্জাল' জাতীয় জনপ্রিয়, বাঙলা-উর্দুতে মেশানো খিচুড়ি ঠাট্টা ব্যঙ্গের ভাষা কিছুটা হুতোম আর কিছুটা পার্শী থিয়েটারের কল্যাণে।

ইতিমধ্যে ভাষাসমস্যার অনেকখানি সমাধান হয়ে যায় বঙ্কিমের কল্যাণে। বঙ্কিমের ভাষানির্মাণে কোন্ কোন্ উপাদান আছে সে-কথা আজ ইস্কুলের ছেলে পর্যন্ত জানে। ডি এল. রায় শ্রেণী এর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন।

এইখানে এসে আমাদের সবাইকে—বিশেষ করে রবীন্দ্র-শিষ্যদের একটু বিপদে পড়তে হয়। রবীন্দ্রনাথের চলতি ভাষা যে তাঁর ছোটগল্প উপন্যাসের মাধ্যমে

২ শুনেছি সর্বপ্রথম নাকি এক রাশান এদেশে থিয়েটার করেন। তিনি তখন ইংরেজের পৃষ্ঠপোষকতা কতখানি পেয়েছিলেন, তার প্রভাব পরবর্তী যুগের বাঙলা থিয়েটারে কতখানি পড়েছিল, এ-সব প্রশ্ন ভাষার বিচারে অবান্তর।

আমাদের দৈনন্দিন কথ্য ভাষাকে প্রভাবান্বিত করেছে সে-কথা আমরা সবাই জানি, এবং তার প্রভাব যে আমাদের রঙ্গমঞ্চেও পড়েছে সে'ও প্রতি মুহূর্তে কানে বাজে। কিন্তু আমার মনে হয় তাঁর নাটকের ভাষা এত বেশী মার্জিত, এত বেশী সূক্ষ্ম যে নাট্যশালার আটপৌরে কাজ তা দিয়ে চালানো যায় না। তাই বোধহয় তাঁর নাটকের মূল্য সাহিত্য হিসাবে যত না সম্মান পেয়েছে এবং পাবে, নাট্য হিসাবে ততখানি পায় নি, পাবে কি না সন্দেহ।

* *

গোড়ার দিকে ফিলিমের কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না। কারণ সে তখন ভাষণ না করে শোভা বর্ধন করতো। টকি আসার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাশীল চিত্রচালককেই মনস্থির করতে হল টকির ভাষা ও উচ্চারণ হবে কি? এ-মুশকিলের একটা অতি সহজ সমাধান আছে। শরৎবাবুর 'নিষ্কৃতি' করতে হলে তাঁর ডায়ালগের ভাষা দিলেই হল। এর আর ভাবনা কি?

মুশকিল আসান অত সহজ হয় না। প্রথমত কোনো কোনো বর্ণনা ডায়ালগে প্রকাশ করতে হয়; তখন উপায়? সেটা তৈরি করে দেবে কে? সে-কলম আছে কার? রবীন্দ্রনাথের বারোটি গান নিয়ে যখন দম্ভী লেখকেরা মাঝখানে মাঝখানে 'আপন' গদ্য জুড়ে দিয়ে কিমপিয়ার (কঁপের) করেন, এবং দুই পাকা গানের মাঝখানে সেই কাঁচা বাঙলা শুনতে হয় তখন মনে হয় না, থাক্, বাবা, বাড়ি যাই?

কিন্তু সেইটেই প্রধান শিরঃপীড়া নয়। আসল বেদনা অন্যখানে। বইয়ের লেখা ডায়ালগ আর সিনেমায় উচ্চারিত কথাবার্তা এক জিনিস নয়। বই বন্ধুজনের সঙ্গে পড়ে শোনানো যায়—তার পাল্লা অদূর অবধি। নাট্যে, পর্দায় সেটা অত্যধিক 'সাহিত্যিক'। অবশ্য নিছক ফিলিমের জন্য লেখা রাবিশের কথা এখানে হচ্ছে না।

অন্যদিকে সিনেমার ভাষাতে যদি কোনো সাহিত্যিক মূল্যই না থাকে তবে সে ইস্থেটিক পর্যায়ে উঠতে পারবে না। এই হল আমাদের দু-মুখো সাপ, ডিলেমা, প্যারাডক্স্—যা খুশি বলতে চান বলুন।

প্রথম যখন মানুষ পাথরের বাড়ি তৈরি করতে শিখল তখন পূর্বতর যুগের কাঠের বাড়ির অনুকরণে পাথরের বাড়ি তৈরি করতো; বাঙলা দেশে ইট চালু হওয়ার পর প্রথমটায় সে খড়ের চাল অনুকরণ করেছে; বেতারের বয়স হয়েছে—এখনো সে নাটক করার সময় 'থিয়েডারে'র (থিয়েটারের নয়) অনুকরণ করে—ফিলিম কেন অনুকরণ করতে যাবে?

- "শ্যামার নামের মন্ত্রগুণে
উতলা নগররক্ষী আমন্ত্রণ শুনে
রোমাঞ্চিত; সত্বর পশিল গৃহ মাঝে
পিছে বন্দী বজ্রসেন নতশির লাজে
আরক্ত কপোল। কহে রক্ষী হাস্য ভরে,
'অতিশয় অসময়ে অভাজন 'পরে
অযাচিত অনুগ্রহ'।"

ওঃ ভাষার কী জেল্লায়! 'অতিশয় অসময়ে অভাজনে অযাচিত অনুগ্রহ—' 'অ'-য়ে 'অ'-য়ে ছয়লাপ! তাও ইন্‌স্‌পেক্‌টর জেন্‌রেল্ অব্ পুলিসের মুখে!

গল্পটি সকলেরই জানা। রবীন্দ্রনাথ এটি কণেবর জাতক থেকে নিয়েছেন। আজকের দিনের ভাষায় বলতে গেলে রাজ্যপালের মেয়ের আঙটি হারিয়েছে। তুমুল কাণ্ড। স্বয়ং আই জি যখন চোর ধরে গবর্নমেন্ট হৌসের দিকে যাচ্ছেন তখন মনে করুন মাতাহারি তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তিনি কি তখন 'উতলা' এবং 'রোমাঞ্চিত' হবেন না? তাঁর মুখে কি তখন খৈ ফুটবে না, চোখ দুটো পলকা নাচ নাচবে না! অবশ্য সামান্য 'অ' দিয়ে কবিত্বের প্রকাশ—রবীন্দ্রনাথ অতি মোলায়েম ইঙ্গিত দিয়েছেন যে পুলিস এর বেশি আর কি কবিত্ব করবে? তবে কিনা রবীন্দ্রনাথ যখন কবিতাটি লিখেছিলেন সেদিনের তুলনায় আজকের পুলিস বড্ড বেশী লেখা-পড়া করে আপন সবনাশ টেনে আনছে!

আমার অবস্থা হয়েছিল বজ্রসেনের। সে চোর।

আমি তখন বোম্বায়ে। আমার এক বন্ধু ব্যাঙ্কার। নাম জভেরী—অর্থাৎ জহুরীর গুজরাটী সংস্করণ। এক বাঙালী 'ফিলিম-এস্টারে'র শাদী। তিনি তাঁর ব্যাঙ্কার জভেরীকে নেমতন্ন করেছেন। জভেরী ব্যাচেলর; আমার সঙ্গে চম্ করে। স্টার সেটি জানতেন। লক্ষ্ণৌয়ে প্রতিপালিত বঙ্গরমণী এটিকেট-দুরুস্ত হয়, যত না প্রয়োজন তার চেয়েও বেশী। বিবেচনা করি আমারও নিমন্ত্রণ ছিল—কিন্তু কসম খেতে পারবো না।

রোশনাই বাত্তি বাজনা যা ছিল তা এমন কিছু মারাত্মক খুনিয়া ধরনের নয়। কন্যা কুরূপা হলে এসবের প্রয়োজন। ইংরিজীতে বলে লিলি ফুলকে তুলি দিয়ে রঙ মাখাতে হয় না,—আজকের দিনের ভাষায় লিপিষ্টিক্-রুজ্ মাখাতে হয় না। যাঁরা আছেন এবং যাঁরা আসছেন তাঁদের এক এক জনই এক ধামা লিলি—না, দুই ধামা।

দরিদ্র আবুহোসেন ঘুম ভাঙতে দেখে, সে, সুন্দরীদের হাটে। কূজনে গুঞ্জনে গন্ধে অনুমান করলে সে খলীফা হরূন-অর্-রশীদের হারেমের ভিতর। সাক্ষাৎ পরীস্তান।

আর আমি? অধুনা মৃত ভাস্কর এপ্স্টাইন আমাকে 'বৃদ্ধ নিগ্রো'র মডেল করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সুন্দরীরা আমাকে অবহেলা করেন নি। তাঁরা ভেবেছিলেন, আমিও বুঝি ফিলিম স্টার—'স্যুটিঙে'র ('শুটিঙ্' সাদামাটা সিনেমা বাবদে অজ্ঞজনের শুদ্ধ উচ্চারণ!) ড্রেস না ছেড়েই দাওয়াতে এসেছি।

আমি ভাল করেই জানি, আপনারা সব স্টারদেরই চেনেন, কিন্তু সবাইকে একসঙ্গে দেখেছেন কি না সে বিষয়ে সন্দেহ। তদুপরি আরেকটি ছোট কথা আছে। তারকার তুলনা দিয়েই নিবেদন করি। অরুন্ধতী আকাশের ক্ষুদ্রতম তারকা। কিন্তু তিনি বশিষ্ঠের পাশে বসে যখন সপ্তর্ষির সাতটি তারকার একজন হয়ে দেখা দেন তখন মনে হয় ইনি না থাকলে সপ্তর্ষির সাতটি তারকাই মিথ্যা হতেন।

শাদী মজলিসে তাই ক্ষুদ্রতম তারকাটিও চিত্তহারিণী হয়ে দেখা দিয়েছিলেন।

এলেন, মনে করুন,—নামগুলো একটু উল্টেপাল্টে দিচ্ছি—শমশাদ বানু লায়লা। পরনে সাটিনের পাজামা। পায়ের এক একটি ঘের অন্তত দু'হাত। স্বচ্ছন্দে যে-কোনো বঙ্গসন্তানের তিনটি পাজামা বা পাঁচটি পাতলুন হতে পারে। শমশাদ বানুর কোমরটি বঙ্গরমণীর কাঁকনের সাইজ। তাই কোমর থেকে পর্দার মতো ফোল্ডে ফোল্ডে সে পাজামা নেমে আসাতে বোঝা গেল না তিনি মাডাম পম্পাডুরের ফ্রক পরেছেন, না ভাওয়ালের জমিদারবাড়ির লুঙ্গী পরেছেন, না ইরানী বেদেনীদের তাম্বু-পানা ঘাঘরা পরেছেন। আসলে নাকি একে লক্ষ্ণৌঈ বড়ী মুরী পাজামা বলে। তা সে যে নামই হোক আমার মনে হল আমি যেন খাসিয়া পাহাড়ে মুশমই জলপ্রপাতের সামনে দাঁড়িয়ে। বিজলির আলো প্রতি ফোল্ড বেয়ে যেন গলা রূপোর মতো ঝরনাধারায় পায়ের কাছে নেমে এসে শততরঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে। সহজ ভাষায় বলতে গেলে শমশাদ বানু লয়লা যেন আস্বচ্ছ দুগ্ধকুণ্ডে কটিতটটি ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

এর সঙ্গে সে-যুগে লম্বা কুর্তা পরা হত। ইনি পরেছেন কঞ্চুলিকা বা চোলী। আমি মাত্র একবার সেদিকে তাকিয়েছিলুম।

মোগল বাদশা মারা গেলে যে ছেলে রাজা হত সে অন্যদের চোখ চোখেরই সুরমা পরার শলা দিয়ে কানা করিয়ে দিত। আমার দুটি চোখই যেন কানা হয়ে গেল। ও রকম কিংখাব আমি দেশ-বিদেশের কোনো জাদুঘরেও দেখি নি।

সোনা রুপোর জরি দিয়ে সে কিংখাবে এমনই কারুকার্য করা হয়েছে যে কিংখাবের একটি টানা-পোড়েনের রেশমী সুতোও দেখা যাচ্ছে না।

ঘাঘরাটি ছিল যেন শীতল ঝরণা ; এ যেন সাক্ষাৎ অগ্নিকুণ্ড।

চোলির হেথাহোথা দু-একটি মুক্তো গাথা। যেন বহ্নি নির্বাপিত করার জন্য ক্ষুদ্র হিমিকার নিষ্ফল প্রয়াস।

দু' কাঁধ বেয়ে নেমে এসেছে বুল্‌বুল্‌-চশ্‌ম্‌ ওড়না।

সেই ছেলেবেলায় দাদীমাকে বুল্‌বুল্‌-চশ্‌ম্‌ শাড়ি পরতে দেখেছি। আর আজ তার-ই ওড়না। অতি সুক্ষ্ম মসলিনের এখানে ওখানে দুটি দুটি করে বুলবুলের চোখের (চশ্‌ম্‌) মতো ফুটো করে সে দুটি অতি ফাইন মুগা সিল্ক দিয়ে বোতামের ফুটোর মতো কাজ করা হয়। এ রমণীর রুচি আছে। ক্ল্যাসিক্‌স্‌ পড়ে। বুল্‌বুল্‌ চশ্‌ম্‌ কালিদাসের যুগের, তার মূল্য ইনি জানেন।

আশ্চর্য ! এলো খোঁপা। গান্‌মেটল রঙের কৃষ্ণনীল চুলের খোঁপাটি কাঁধে শুয়ে আছে যেন কৃষ্ণকরবীর স্তবক শুভ্র ফুলদানিতে ঘুমিয়ে আছে।

* *

হঠাৎ দেখি এক চোখ-ঝলসানো সুন্দরী, বিধবার থান পরে! ইনি বিয়ের পরবে কেন? আমাদের দেশে তো কড়া বারণ। তখন আবার দেখি তাঁর হাতে ফেনা-ভর্তি শ্যাম্পেনের গেলাস। নাঃ, ইনি সদ্য স্টুডিয়ো থেকে শুটিঙ অর্ধসমাপ্ত রেখে এসেছেন।

* *

আরো অনেকেই ছিলেন। বেবাক বর্ণনা দিতে হলে তামাম পুজো সংখ্যাটা আমাকেই লিখতে হয়। খর্চায় পুষাবে না—সম্পাদক জানেন।

ইতিমধ্যে কৃষ্ণলাল জভেরী এসে আমাকে নিয়ে চললেন সেই তারকা যজ্ঞশালার প্রান্তদেশে অনাদৃতা ঊর্মিলার অবস্থা থেকে টেনেহিঁচড়ে অন্য প্রান্তে। কি ব্যাপার? জভেরী উত্তেজনার মধ্যিখানে ইংরিজী ভুলে গিয়ে গুজরাটীতে কি যেন 'স্বঁস্বঁ' করলে। কে যেন আমাকে ইন্টারভ্যু দেবে। আমি বেকার। বিধি তবে দক্ষিণ। অদ্য প্রভাতের সবিতা প্রসন্নোদয় হয়েছেন। আম্মো ইস্টার হব।

শমশাদ বানু লায়লা মৃদু হাস্য করলেন। ফিল্‌ম্‌-স্টারের ধবধবে সাদা দাঁত নয়। গোলাপীর চেয়েও গোলাপী রঙের অতি ক্ষীণ একটি ফিল্‌ম্‌—ফিল্‌ম্‌-স্টারের দাঁতের উপর। কি সুন্দর! তাই বুঝি কালিদাস তাঁর নায়িকার দাঁতের সঙ্গে রাঙা অশোকের তুলনা দিয়েছেন—শুভ্র বন-মল্লিকার সঙ্গে দেন নি। আগেই

বলেছি, ইনি ক্ল্যাসিক্‌ল্। পানের রস গ্রহণ করতে জানেন। অন্য পান কিন্তু জানেন না। হাতে লেমন-স্কোয়াশ।

শুধালেন, 'আপনি দার্শনিক ?'

আমি জভেরীকে ধমক দিয়ে বললুম, 'জভেরী !'

জভেরী ভীরু। বললে, 'আমি কিচ্ছু বলি নি।'

আমি বীবী সাহেবাকে চালাকি করে শুধালুম, 'আমাকে কি এতই বিজ্ঞ মনে হয় ?'

'বুদ্ধু মনে হয়। বিজ্ঞ মনে হয় প্রিস্টারকে, ব্যাঙ্কারকে, পোকার খেলাড়ীকে।'

বাধ্য হয়ে বললুম, 'না। আমি দার্শনিক নই। আমি দর্শনের শত্রু ধর্ম নিয়ে নাড়াচাড়া করি।'

শমশাদ বানুর মুখে তৃপ্তির চিহ্ন ফুটলো।

এত দিনে আমার নীরস শাস্ত্রচর্চা ধন্য হল।

বললেন, 'সে তো আরো ভালো। আমি তাই খুঁজছিলুম। আচ্ছা বলুন তো—' বলে তিনি যেই একটু থেমেছেন, আমি তাড়াতাড়ি বললুম, 'বীবী সাহেবা, এই জায়গা কি ধর্ম-চর্চার পক্ষে প্রশস্ত ?'

অবহেলার সঙ্গে বললেন, 'নয় কেন ? পাপীরাই তো ধর্মচর্চা করবে। ধার্মিকদের তো ওসব হয়ে গিয়েছে। তেলো মাথায় ব্রিলেন্টাইন ? সে-কথা থাক্। আমি শুধোতে চাই, কেউ যদি মরে যায় (আমার মনে হল শমশাদ কেমন যেন একটু শিউরে উঠলেন) তবে আমি মরে গেলে তাঁকে দেখতে পাবো কি ?'

আমি শুধালুম, 'কোন্ ধর্মমতে ?'

'সে আবার কি ?'

'আমি "তুলনাত্মক ধর্মশাস্ত্র" চর্চা করি।'

'তার মানে ?'

'এই মানে ধরুন, পৃথিবীতে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান মেলা ধর্ম আছে। আমি প্রত্যেক ধর্মের জন্ম, যৌবন, বর্তমান অবস্থা,—কে কি বলে তাই পড়ি। যেমন প্রত্যেক দেশের ইতিহাস হয়, তেমনি প্রত্যেক ধর্মেরও ইতিহাস হয়।'

একটু অসহিষ্ণু হয়ে বললেন, 'আমি অতশত বুঝি না। আমি ফিল্মে কাজ করি, আমি পণ্ডিত নই। আমি জানতে চাই, এত সব ধর্ম পড়ার পর এ-বিষয়ে আপনার ব্যক্তিগত, পার্সনাল মতটা কি ?'

মহা ফাঁপরে পড়লুম। বললুম, 'আমি কখনো ভেবে দেখি নি। মুসলমান ধর্ম বলে—'

বাধা দিয়ে বললেন, 'থাক। আপনি তাহলে একটি আস্ত চিনির বলদ। ধর্ম বয়ে বেড়াচ্ছেন—কখনো কাজে লাগান নি।'

আমি বললুম, 'ধর্ম কি মশলা বাটার জিনিস! নামাজের কার্পেট দিয়ে কি মানুষ বিছানা বাঁধে?'

অতি শান্তকণ্ঠে বললেন, 'না। কিন্তু নামাজের কার্পেটে মানুষ নামাজ পড়ে; ওটা শিকেয় তুলে রাখে না।'

আমি বললুম, 'আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়াতে ফিল্‌ম্-স্টারদের সম্বন্ধে আমার ধারণা বদলে গেল। আপনি নিশ্চয়ই বিস্তর লেখাপড়া করেছেন।'

'কী আশ্চর্য! এ তো কমন্-সেন্সের কথা। এটা না থাকলে প্রডুসার, ডিরেক্টর, এডমায়ারার, লাভারের দল আমাকে কুটিকুটি করে ফেলতো না! ওসব কথা থাক্। আপনি আমার কথার উত্তর বেশ চিন্তা করে দিন।' তারপর জভেরীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওহে জভেরী, ওঁকে একটা শ্যাম্পেন দাও না?'

আমি মাথা নেড়ে বললুম, 'থাক্। আপনার পাল্লায় পড়ে আমার বিশ বছরের নেশা কপ্পুর হয়ে গেছে। আড়াই ফোঁটাতে আর কি হবে, লায়লীবানু!'

একটু হেসে বললেন 'আপনার মুখে "লায়লী" বেশ মিষ্টি শোনায়।'

সব্বোনাশ! সব্বোনাশ!! এ যে ডবল এটাক। পিনসার মুভমেণ্ট।

ওড়নাটি ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে চেয়ারে যে ভাবে চেপে বসলেন তাতে বুঝলুম যে এঁর গায়ে কাবুলী রক্ত আছে। উত্তর না নিয়ে উঠবেন না।

মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি, চোখ দুটি বন্ধ—বড় শান্ত প্রশান্ত নিস্তব্ধ ভাব। ঐ বেশ পরা না থাকলে মনে হত তপস্বিনী, কঠোর ব্রতচারিণী সুফী রমণী।

আমি আস্তে আস্তে বললুম, 'আমার মনে হয়,—' থামলুম। কোনো উত্তর নেই।

কিছুক্ষণ পর ফের বললুম, 'আমার মনে হয়—'

অল্প একটু 'উঁ' শুনতে পেলুম।

'—যে পুণ্যবান লোকের কোনো কামনা আল্লাতালা অপূর্ণ রাখেন না।'

* *

আমি জানি, চতুর্দিকে তখন হৈ-হুল্লোড়। কিন্তু আমার মনে হল যেন আমি মরুভূমির মাঝখানে দুপুর রাত্রে জেগে উঠেছি। দিবাভাগের আতপতাপে দগ্ধ

সর্ব কাফেলার মানুষ উট গাধা ঘোড়া সবাই অকাতরে ঘুমুচ্ছে। আকাশের নৈস্তব্ধ্যকেও যেন মরুভূমির নৈঃশব্দ্য হার মানিয়েছে। কোথা থেকে এল এ শান্তি, এ বিধান? তাকিয়ে দেখি, লায়লার মুখ থেকে।

ততক্ষণে জভেরী শ্যাম্পেন নিয়ে ফিরেছে।

লায়লা উঠে বললেন, 'আপনার কথা ঠিক।'

তারপর জভেরীকে রাজেশ্বরীর কণ্ঠে বললেন, 'তুমি থাকো। আমি এঁকে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি।'

গাড়িতে একটি কথাও হয় নি।

আমি নামবার সময় তাঁকে 'আদাব আরজ, খুদা হাফিজ' বললুম। তিনি সযত্নে আমার ডান হাত আপন দু'হাতে ধরে মৃদু চাপ দিলেন। সে চাপে ছিল বন্ধুত্ব, সহৃদয়তা। ফিল্‌ম্-স্টারের হাতের চাপ আমি এর আগে, এখন এবং এর পরেও কখনো পাই নি।

মধ্যরাত্রি অবধি খাটে শুয়ে শুধু শান্তি অনুভব করেছিলুম।

রাত তিনটেয়, বোধহয়, একবার ধড়মড় করে জেগে উঠে ফের শুয়ে পড়েছিলুম।

* *

সকালে উঠে দেখি, জভেরী ব্যাঙ্কে চলে গিয়েছে।

তারপর দেখি, পূর্ব রাত্রির প্রসন্নতা মন থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।

কী যেন এক অজানা অস্বস্তির ভাব সর্ব দেহমন অসাড় বিকল করে দিয়েছে।

ফোন বাজল। জভেরী চিৎকার করে কি বলছে।

'শোনো, কাল রাত তিনটেয় শমশাদ আত্মহত্যা করেছে। দুটো চিঠি রেখে গিয়েছে। একটা পুলিসকে, একটা তোমাকে। তোমার চিঠিটার নকল যোগাড় করেছি। লিখেছে, 'মাই ডিয়ার এম, তোমার কথাই ঠিক। আমি চললুম। দেখা যখন তাঁর সঙ্গে হবেই তখন আর দেরি করে লাভ কি? আমি জানি আত্মহত্যা পাপ। আমার সব পুণ্যের বদলে এটা মাফ হয়ে যাবে।'

এখন মনে পড়ছে সন্ধ্যার সময় জভেরী বাড়ি এসে আমার হাত থেকে ফোন নামিয়েছিল।

এ-জীবনে এই প্রথম ধর্মোপদেশ দিয়েছিলুম। আর এই শেষ॥

ছুছুন্দর কা সির্‌পর্‌ চামেলি কা তেল

লিঙ্গোয়াফোন রেকর্ডের কথা অনেকেই শুনেছেন। এ-রেকর্ডগুলোর সাহায্যে দিশী-বিদেশী যে-কোনো ভাষা অতি চমৎকার রূপে শেখা যায়। রেকর্ডগুলোতে বড় বড় ভাষা এবং উচ্চারণবিদরা গোড়ার দিকে খুব সহজ ভাষায় কথাবার্তা বলেছেন, ক্রমে কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে শেষের রেকর্ডগুলোতে এমন বেগে বলেছেন যে, সেটা আয়ত্ত করতে পারলে আপনি সে ভাষায় নিজেকে ওকীবহাল বলে পরিচয় দিতে পারবেন। প্রথম একখানা রেকর্ড নিয়ে বার বার সেটা শুনতে হয়। তারপর প্রশ্নকর্তা ও উত্তরদাতার সঙ্গে সঙ্গে গলা মিলিয়ে, সামনে পাঠ্যপুস্তকের দিকে চোখ রেখে উচ্চারণ করে যেতে হয়। পাঠ্যপুস্তকে আবার 'অনুশীলন'ও থাকে। সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোও করতে হয়। 'কী' দেওয়া আছে। তাই দিয়ে ভুলগুলো মেরামত করে নিতে হয়।

বুদ্ধি-শুদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন নেই। শুধু গাধার খাটুনি আর সহিষ্ণুতা বা নিষ্ঠা কিংবা বলতে পারেন 'লেগে থাকা'র প্রয়োজন।

আমার অভিজ্ঞতাপ্রসূত ব্যক্তিগত সুদৃঢ় বিশ্বাস, পৃথিবীর বেশীর ভাগ জিনিস শেখার জন্য আক্কেল-বুদ্ধির প্রয়োজন অতি সামান্য। আসলে প্রয়োজন গাধার খাটুনি। বাঙলায় বা অন্য যে-কোনো ভাষাতে শব্দ-ভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধি করতে হলে বুদ্ধির প্রয়োজন কোথায়? 'পদ্ম' শব্দের প্রতিশব্দ 'কমল', 'সরোজ', 'পঙ্কজ' শিখতে হলে কাউকে মাইকেলের মতো মেধাবী হতে হয় না, প্রয়োজন হয় ঐ কর্মে রোজ লেগে থাকার। কারো মুখস্থ হয় এক দিনে, কারো লাগে তিন দিন। তফাৎ ঐটুকু মাত্র। স্বয়ং মাইকেলই নাকি বলেছেন, জিনিয়াসের ৯৯% পার্সপিরেশন, অর্থাৎ মাথার ঘাম পায়ে ফেলা, আর মাত্র এক পার্সেন্ট ইন্‌সপিরেশন, অর্থাৎ বিধিদত্ত প্রতিভা।

শুধু মাত্র মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মাইকেলের মতো কাব্য রচনা করা যায় না। কিন্তু নিছক খাটুনির জোরে যে কোনো ভাষার অন্ততঃ এতখানি আয়ত্ত করা যায় যে, দেশের ৯৯% লোক তাকে ঐ ভাষায় পাণ্ডিত বলে মেনে নেয়।

এবং এই সোনার বাঙলার ৯৯% লোক খাটতে রাজী নয়। রেওয়াজ না করেই সে গাওয়াইয়া হয়ে যায়, নিত্য নবীন নাচ 'কম্পোজ' করতে থাকে।

কিন্তু সে-কথা থাক। পরনিন্দা বা আপন নিন্দা—আমিও তো বাঙালী বটি — করে আমি পুজোর বাজারে রসভঙ্গ করতে চাই নে। তাই মূল কথা আরম্ভ করি।

এই লিঙ্গোয়াফোন রেকর্ড পত্তনের প্রথম যুগে বার্নার্ড শ'[১] চারটি বক্তৃতা দেন। সেগুলো কিনতে পাওয়া যায়। অতি সুস্পষ্ট উচ্চারণে সুমধুর ভাষণ। ব্যঙ্গ-কৌতুক, রস-সৃষ্টি, আর তথ্য-পরিবেশ তো আছেই।

কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলছেন,

"...হয়ত তুমি চালাক ছেলে। আমাকে শুধালে, তা হলে কি আমি সব সময় একই ধরনে কথা বলি?

"আমি সঙ্গে সঙ্গেই স্বীকার করে নিচ্ছি, আমি কবি নে। কেউই করে না। এই তো এই মুহূর্তে আমি হাজার হাজার গ্রামোফোনওলাদের সামনে কথা বলছি, এদের অনেকেই আমার প্রত্যেকটি শব্দ, প্রত্যেকটি কথা প্রাণপণ বোঝবার চেষ্টা করছে। বাড়িতে আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে যে রকম বেখেয়ালে কথা কই, এখন যদি তোমাদের সঙ্গে সেরকমধারা কথা কইতে যাই, তা হলে এ রেকর্ডখানা কারো এক কড়ির কাজে লাগবে না; আর এখন তোমাদের সঙ্গে যে রকম সাবধানে কথা বলছি, সেরকম যদি স্ত্রীর সঙ্গে বাড়িতে বলি তা হলে তিনি ভাববেন আমার বদ্ধ পাগল হতে আর বেশী বিলম্ব নেই।

"জনসাধারণের সামনে আমাকে বক্তৃতা দিতে হয় বলে আমাকে সাবধান থাকতে হয় যে, বিরাট হলের হাজার হাজার লোকের শেষ সারির শ্রোতাও যেন আমার প্রত্যেকটি কথা পরিষ্কার শুনতে পায়। কিন্তু বাড়িতে ব্রেকফাস্টের সময় আমার স্ত্রী আমার থেকে মাত্র দু'ফুট খানেক দূরে বসে আছেন। তাই বেখেয়ালে এমন ভাবে কথা বলি যে, তিনি আমার কথার উত্তর না দিয়ে প্রায়ই বলেন, 'ও রকম বিড়বিড় করো না; আর দেখো, কথা বলার সময় অন্য দিকে ঘাড় ফিরিয়ো না। তুমি যে কি বলছো আমি তার কিছু শুনতে পাচ্ছি নে।' এবং তিনিও যে সব সময় সাবধানে কথা বলেন তা-ও নয়। আমাকেও মাঝে মাঝে বলতে হয়, 'কি বললে?'[১] আর তিনি সন্দেহ করেন যে, আমি ক্রমেই কালা হয়ে যাচ্ছি, অবশ্য তিনি সেটা আমাকে বলেন না। আমি সত্তর পেরিয়ে গিয়েছি—কথাটা হয়ত সত্যি।

"কিন্তু এ-বিষয়ে কণামাত্র সন্দেহ নেই যে, রাজরাণীর সঙ্গে কথা বলার মতো আমি যেন আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা কই এবং তাঁরও বলা উচিত যেন তিনি রাজার

১ এখানে শ' ইচ্ছে করেই 'আই বেগ ইয়োর পাডন' কিংবা 'এক্সকিউজ মি' বলেন নি। ইঙ্গিত রয়েছে যে, বাড়িতে স্ত্রীকে আমরা পোশাকী আদবকায়দা দেখাই নে।

সঙ্গে কথা বলছেন। তাই উচিত ; কিন্তু আমরা তা করি নে।

"আমাদের আদব-কায়দা দু'রকমের—একটা পোশাকী, অন্যটা ঘরোয়া। কোনো অপরিচিতের বাড়িতে গিয়ে যদি দরজার ফাঁক দিয়ে ওদের কথাবার্তা শোনো—অবশ্য আমি আদপেই বলতে চাই নে যে এরকম অভদ্র আচরণ তোমার পক্ষে আদৌ সম্ভব—কিন্তু তবু, ভাষা শেখার অত্যধিক উৎসাহে তুমি যদি কয়েক মুহূর্তের তরে এরকম অপকর্ম করে শোনো, পরিবারের লোক বাইরের কেউ না থাকলে আপোসে কি ধরনে কথা বলে এবং পরে যদি ঘরে ঢুকে ওদের কথা শোনো তাহলে তোমার সামনে ওদের কথা বলার ধরন দেখে রীতিমত অবাক হয়ে যাবে। এমন কি, আমাদের ঘরোয়া কায়দা-কেতা পোশাকী কায়দার মতো উত্তম হলেও—আসলে আরো ভালো হওয়া উচিত—তাদের মধ্যে সব সময়ই পার্থক্য থাকে এবং সে পার্থক্য অন্য সব কায়দা-কেতার চেয়ে কথাবার্তাতেই বেশী।

"মনে কর ঘড়িটাতে দম দিতে ভুলে গিয়েছি ; ওটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে! কাউকে তা হলে জিজ্ঞেস করতে হয়, ক'টা বেজেছে? অপরিচিত কাউকে জিজ্ঞেস করলে বলবো, 'কটা বেজেছে, বলতে পারেন?' সে তখন প্রত্যেকটি কথা পরিষ্কার শুনতে পায়, কিন্তু যদি স্ত্রীকে ঐ কথাই শুধাই তবে তিনি সর্বসাকুল্যে শুনতে পান 'কটা বেচে?' তাই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট ; কিন্তু তোমাকে জিজ্ঞেস করলে ওরকম বললে চলবে না। তাই এখন তোমাদের সামনে কথা বলছি স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার চেয়ে অনেক বেশী সাবধানে। কিন্তু লক্ষ্মীটি, ওকে সেটি বলো না।"

* *

শ' কথাগুলি বলেছেন প্রধানত উচ্চারণ সম্বন্ধে। কারণ, তিনি রেকর্ডের মারফতে বিদেশীকে ভালো ইংরিজী উচ্চারণ শেখাতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁর এই নীতি যে 'আমরা সর্বত্রই একই উচ্চারণে কথা বলি নে', ভাষা সম্বন্ধে আরো বেশী প্রযোজ্য। শব্দ, ইডিয়ম, প্রবাদ ইত্যাদি আমরা সকলের সামনে একই ভাবে বাছাই করে প্রয়োগ করি নে।

শ্বশুর মশায়ের সামনে ঘাড় নিচু করে, হাত-পা দিয়ে বায়ু সমুদ্র মন্থন করা কিছুক্ষণের মত স্থগিত রেখে বলি,

'আজ্ঞে, রামবাবু বললেন, ঐ ব্যাপার নিয়ে আমি যেন দুশ্চিন্তা না করি।'

পিতাকে বলি, 'রামবাবু বললে, যাও, ও-কথা তোমাকে ভাবতে হবে না।'

য়ারের ইয়ারকে বলি, 'শ্লা রেমোটা কি বললে জানিস্? বললে, "যা যা

ছোঁড়া, মেলা ভেঁপোমি কত্তি হবে না , আপন চরকায় তেল দে গে যা ।" '

শ' সর্বোচ্চ উদাহরণ দিয়েছেন তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে। সেটা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। তিনি যে তাঁর স্ত্রীকে সমঝে চলতেন, এমন কি ডরাতেনও, সে-কথা কারো অজানা নেই। আর ডরায় না কে ? 'পঞ্চতন্ত্র' পড়ে দেখুন—বিষ্ণুশর্মার লেখাটা নয়, অন্য একজনের। লাইব্রেরী থেকে ধার করে নয়, কিনে। লোকটা অন্নাভাবে আছে।

তাই প্রশ্ন উঠবে, উপরের যে রিপোর্টটি পাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করছে, সেটি যদি বউয়ের কাছে নিবেদন করি, তবে সেটা কি রূপ নেবে ?

সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করবে, বউ কি শুনতে চান। তিনি যদি শুনতে চান, 'রামবাবু ঐ কাজের ভারটা আপন কাঁধে তুলে নিয়েছেন, আপনাকে তাই নিয়ে আর মাথা ঘামাতে হবে না, তাহলে তো আপনি নিস্পরোয়া হয়ে গিয়ে তেরিয়া মেরে চড়াকসে বলবেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ গিন্নী, যা কয়েছো।" আমি যতই বলি, "রামবাবু, আপনাকে কিচ্ছুটি চিন্তা করতে হবে না। আমি সব বোঝা কাঁধে নিচ্ছি", তিনি ততই আমার পিঠে হাত বুলিয়ে বলেন, "না ভায়া, ও কাজ আমার—তোমাকে দেখতে হবে না।" কি আর করি ? ওঁর হাতেই সব ছেড়ে দিয়ে এলুম।'

আর যদি গিন্নী উল্টোটা আশা করে থাকেন ? অর্থাৎ আপনি যদি মিশনে ফেল মেরে এসে থাকেন ? তাহলে ? তাহলে 'ঈশ্বর রক্ষতু' ।

গলা সাফ করে ইদিক-উদিক তাকিয়ে কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, "—"

আবার বলছি তখন ঈশ্বর রক্ষতু। আমি আর কি বলবো। চল্লিশ বছর হল বিয়ে করেছি। এখনো সে ভাষা শিখতে পারি নি।

মূল কথায় ফিরে যাই।

এ তো হল কথাবার্তায়। সাহিত্যে এ জিনিসটি আরো প্রকট।

সেখানে কাকে উদ্দেশ করে লিখছেন সেটা তো আছেই, তার উপরে আছে বিষয়বস্তু।

কালীপ্রসন্ন সিংহ যখন মহাভারতের অনুবাদ করেছেন তখন ব্যবহার করেছেন সংস্কৃতশব্দবহুল ভাষা, কারণ বিষয়বস্তু এপিক, গুরুগম্ভীর। 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'য় তিনি ব্যবহার করেছেন 'রকে'র ভাষা। কারণ সেখানে বিষয়বস্তু 'বেলেল্লাপনা', অতএব চটুল এবং সেই কারণেই 'মেঘনাদবধে'র ভাষা এক, 'একেই কি বলে সভ্যতা'র ভাষা অন্য। 'কৃষ্ণচরিত্রে'র ভাষা এক, 'কমলাকান্তে'র ভাষা অন্য।

এমন কি ধরুন, বিষয়বস্তুও এক, কিন্তু সেখানে পরিবেশ এবং পাত্র ভিন্ন বলে ভাষাও ভিন্ন হল। 'পারস্য ভ্রমণে' রবীন্দ্রনাথ কথা বলছেন ঐ দেশের অভিজাত সম্প্রদায়, গুণীজ্ঞানীদের সঙ্গে—তাই তার ভাষা এক এবং 'মরুতীর্থ-হিংলাজে'র পাত্রপাত্রী অতি সাধারণ জন—এমন কি রিফ্‌র‍্যাফ্‌—তাই তার ভাষা অন্য; 'মরুতীর্থ' 'পারস্যে'র চেয়ে ভালো না মন্দ সে-কথা উঠছে না। দুটোই রসসৃষ্টি, কিন্তু দুটো আলাদা জিনিস।

অর্থাৎ বিষয়বস্তু—কন্‌টেনট্‌—তার শৈলী এবং ভাষা—স্টাইল—নির্বাচন করে। সেখানে উল্টোপাল্টা করলে রসসৃষ্টি হয় না।

'বঙ্কিমের ভাষার অনুকরণ করবে'—ছেলেবেলা থেকেই সে উপদেশ শুনেছি এবং ধরে নিয়েছি সে ভাষা 'রাজসিংহ', 'দুর্গেশনন্দিনী'র ভাষা।

ঐ ভাষা দিয়ে পাড়ার কানাই-বলাইয়ের কাহিনী লিখতে গেলে ফর্ম ও কণ্টেণ্টের যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, তার ফলে বারে বারে তাল কাটে। শরৎ চাটুজ্জের প্রথম যৌবনের লেখাতে তার নিদর্শন প্রচুর পাওয়া যায়। প্রৌঢ় বয়সে তিনি তার আপন ভাষা পেয়ে বিষয়বস্তুর সঙ্গে তাল রেখে অদ্ভুত তবলা শোনালেন।

এমন কি 'গোরা', 'যোগাযোগ', 'শেষের কবিতা'র ভাষা দিয়ে 'কচিসংসদ' লেখা যায় না।

তাই রবীন্দ্রনাথ বা বঙ্কিমের অনুকরণ (ইমিটেশন) সহজেই হনুকরণ (এপিং) হয়ে যেতে পারে॥

আর্ট না অ্যাক্‌সিডেণ্ট

আর্ট বলতে আমরা আজকাল মোটামুটি রস ই বুঝি। তা সে কাব্যে, চিত্রে, ভাস্কর্যে, সঙ্গীতে যে কোনো কলার মাধ্যমেই প্রকাশিত হোক না কেন।

এখন প্রশ্ন আর্ট বা রসের সংজ্ঞা কি? সে জিনিস কি? তার সঙ্গে দেখা হলে তাকে চিনব কি করে? অন্যান্য বস থেকে তাকে আলাদা করব কি করে? সরেস আর্ট কোন্‌টা আর নিরেসই বা কোন্‌টা?

প্রাচীন ভারত, গ্রীস এবং চীন—এই তিন দেশেই এ নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে এবং অধুনা পৃথিবীর বিদগ্ধ দেশ মাত্রেই এ নিয়ে কলহ-বিসংবাদের অন্ত নেই। বিশেষ করে যবে থেকে 'মডার্ন আর্ট' নামক বস্তুটি এমন সব 'রস' পরিবেশন করতে আরম্ভ করলে যার সঙ্গে আমাদের কণামাত্র পরিচয় নেই।

এলোপাতাড়ি রঙের পোঁছকে বলা হল ছবি, অর্থহীন কতকগুলো দুর্বোধ শব্দ একজোট করে বলা হল কবিতা, বেসুরো বেতালা কতকগুলো বিদঘুটে ধ্বনির অসমন্বয় করে বলা হল সঙ্গীত। বলছে যখন তখন হতেও পারে, কিন্তু না পেলাম রস, না বুঝলাম অর্থ, না দিয়ে গেল মনে অন্য কোনো রসের ব্যঞ্জনা বা ইঙ্গিত। তাই বোধহয় হালের এক আলঙ্কারিক মডার্ন ভাস্কর্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, যখন ভাস্কর এক বিরাট কাঠের গুঁড়ি নিয়ে তার উপর ছ'মাস ধরে প্রাণপণ বাটালি চালানোর পর সেটাকে কাঠের গুঁড়ির আকার দিতে পারেন, এবং নিচে লিখে দেন "কাঠের গুঁড়ি" – তখন সেটা 'মডার্ন ভাস্কর্য'।

ইতিমধ্যে এই মডার্ন আর্টের বাজারে একটি নূতন জীব ঢুকেছেন এবং সেখানে হুলস্থুল বাধিয়ে তুলেছেন—এর নাম অ্যাক্সিডেন্ট, বাঙলায় দুর্ঘটনা, দৈবযোগ, আকস্মিকতা যা খুশী বলতে পারেন।

এঁর আবির্ভাব হয়েছে সুইডেনের মতো ঠাণ্ডা দেশে—যেখানে মানুষ ঠাণ্ডাভাবে ধীরে-সুস্থে কথা কয়, চট করে যা-তা নিয়ে খামখা মেতে ওঠে না।

* *

সুইডেনের মহাসম্মানিত ললিত কলা আকাদেমির বিজ্ঞ বিজ্ঞ প্রফেসর, কলা-রসিক গুণীজ্ঞানীরা অকস্মাৎ কিংকতর্ব্যবিমূঢ় হয়ে কর্ণমূলের পশ্চাদ্দেশ কণ্ডূয়ন করতে লাগলেন। তাঁদের মহামান্যবর প্রেসিডেণ্ট তো খুদাতাল্লার হাতে সব-কিছু ছেড়ে দিয়ে সোজাসুজি বলেই ফেললেন, 'কি কবি, মশাইরা, বলুন। কে জানত শেষটায় এ-রকমধারা হবে? আজকাল নিত্য নিত্যি এত সব নয়া নয়া এক্সপেরিমেণ্ট হচ্ছে যে, কোন্‌টা যে এক্সপেরিমেণ্ট আর কোন্‌টা যে অ্যাক্সিডেণ্ট কি করে ঠাওরাই? আমরা ভেবেছি, চিত্রকর ফাল্‌স্ট্র্যোম্‌ আর্টের ক্ষেত্রে একটা অভিনব নবীন পন্থা আবিষ্কার করতে পেরেছেন এবং তাই ভেবে ঐ ছবিটাও একজিবিশনের অন্যান্য ছবির পাশে টাঙিয়ে দিয়েছি—'

ওদিকে আর্টিস্ট ফাল্‌স্ট্র্যোম্‌ বেগে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সর্বত্র চেঁচামেচি করে বলতে লাগলেন, তাঁকে লোকচক্ষে হীন করাব মানসে দুষ্ট লোক কুমতলব নিয়ে এই অপকর্মটি করেছে।

অপকর্মটি কি?

ফাল্‌স্ট্র্যোম্‌ ছবি আঁকার সময় একখানা ম্যাসনাইটের টুকরোয় মাঝে মাঝে তুলি পুঁছে নিতেন। কাজেই সেটাতে হরেক রকম রঙ লেগে থাকার কথা। ঐ সময়ে সুইডিশ ললিত-কলা আকাদেমি এক বিরাট মহতী একজিবিশনের ব্যবস্থা করেন—'স্বতঃস্ফূর্ত কলা (স্পণ্টানিস্‌মুস বা Spontaneous art) ও

তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ' এই নাম দিয়ে সে চিত্রপ্রদর্শনীতে সুইডেন তথা অন্যান্য দেশের স্পণ্টানিস্‌মুস কলার উত্তম উত্তম নিদর্শন তাতে থাকবে। (ক্যুবিজম,, দাদাইজমেব মতো স্পণ্টানিয়েজম-ও এক নবীন কলাসৃষ্টি পদ্ধতি—আমি অবশ্য এখানে সে প্রশ্ন তুলছি নে যে সার্থক কলাসৃষ্টি মাত্রই স্পণ্টেনিয়াস বা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে থাকে,—বিশেষ পদ্ধতিকে এ নাম দিলে তাকে চেনবার কি যে সুবিধে হয় বোঝা কঠিন।)

এখন হয়েছে কি, আর্টিস্ট ফাল্‌স্ট্র্যোম্‌ তাঁর অন্য ছবি যাতে কবে ডাকে যাবার সময় জখম না হয় সেই উদ্দেশ্যে ঐ বঙবেবঙেব ম্যাসনাইটের টুকরোখানা তাঁর ছবির উপরে বেখে চিত্রপ্রদর্শনীতে পাঠিয়েছিলেন। আকাদেমিব বড় কর্তারা ভাবলেন, এটাও মহৎ আর্টিস্টের এক নবীন মহান কলানিদর্শন এবং পরম শ্রদ্ধাভবে সেই ম্যাসনাইটের টুকরোটির নিচে আর্টিস্টেব স্বনামখ্যাত নামটি লিখে ঝুলিয়ে দিলেন আর্টিস্টেব অন্য ছবিব পাশে।

ব্যাপাবটা যখন ধবা পড়ল তখন আর্ট সমালোচকবা কি যে কববেন ঠিক করতে না পেবে চুপ কবে গেলেন আর সুইডেনবাসী আপনাব আমার মতো সাধাবণজন মুখ টিপে হাসলে যে বাঘা বাঘা পণ্ডিতেবা ঐ 'স্বতঃস্ফূর্ত' বসিকতাটা ধরতে না পেরে ফাঁদে পা ফেলেছেন বলে।

কিন্তু এইখানে ব্যাপারটাব গোড়াপত্তন মাত্র।

সুইডেনেব কাগজে কাগজে তখন আলোচনা আরম্ভ হল এই নিয়ে : একখানা উটকো কাঠ জাতীয় জিনিসেব উপর এলোপাতাড়ি রঙেব ছোপকে যদি পণ্ডিতেবা আর্ট বলে মেনে নিতে পাবেন তবে তাঁদেব ঢাক ঢোল পেটানো এই মহাসাধনার 'মডার্ণ আর্টে'ব মূল্যটা কি ?

* *

ওইভিন্দ ফাল্‌স্ট্র্যোম্‌ সুইডেনেব নাম কবা তরুণ চিত্রকব। তিনি সম্প্রতি এই 'স্বতঃস্ফূর্ত কলা মার্গে' প্রবেশ কবেছেন এবং কলা নির্মাণের ক্রমবিকাশে তিনি ইতিমধ্যেই তাঁর ঢং একাধিকবাব আগাপাস্তলা বদলিয়েছেন। সুইডেনে এখন এই 'কনক্রীট', 'স্থূল', বা 'বাস্তব' মার্গেব খুবই নামডাক, এঁবা নিজেদেব অনুভূতি স্বতঃস্ফূর্ত অনব্যবহিত ভাবে বঙেব মাবফতে প্রকাশ করেন—সে প্রকাশে কোনো বস্তু বা কোনো কিছুব প্রতিকৃতি থাকে না, কোনো কিছু রূপায়িত করে না, ছবিব নাম পর্যন্ত থাকে না—এবং দর্শক তাই দেখে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে, সরাসবি আর্টিস্টের অনুভূতি বুঝে গিয়ে তার অর্থ করে নেয়,—কিংবা ঐ আশা করা হয়।

এই হল মোটামুটি তার অর্থ—অর্থাৎ অর্থহীন জিনিসকে যদি অর্থ দিয়ে বোঝাতে হয় তবে যে 'অর্থ' দাঁড়ায়।

ফাল্স্ট্র্যোম্ চিত্রপ্রদর্শনীতে দু'খানি ছবি পাঠাতে চেয়েছিলেন, এবং পূর্বেই বলেছি, সে দুখানি ছবি যাতে করে পোস্টাপিসের চোট না খায় তাই সঙ্গে সেই ম্যাসনাইটের টুকরো দিয়ে সেগুলোকে প্যাক্ করে তিনি চলে যান গ্রামাঞ্চলে ছুটি কাটাতে। এদিকে আকাদেমির বাঘ-সিঙ্গিরা ছবি তিনখানা (আসলে অবশ্য দুখানা) ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার নিরীক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে বাছাই করে নিলেন দু'খানা,—এবং তার মধ্যে মনোনীত হয়ে গেল তুলি পোঁছার সেই ম্যাসনাইটের পট্টি! ক্রিটিকদের কারোরই কাছে ঐ ম্যাসনাইটের 'অঙ্কিত' তুলিপোঁছা রঙ-বেরঙ করা জিনিসটির স্টাইল বা বিষয়বস্তু অদ্ভুত বা মূল্যহীন ঠেকে নি। তার অর্থ, একদিকে চিত্রকরের 'ন্যায়ত' 'ধর্মসঙ্গত' আঁকা ছবি ও অন্যদিকে তাঁর তুলি পোঁছার এলোপাথাড়ি রঙের চোপ—এ দুয়ে কোনো পার্থক্য নেই।

তাই লেগেছে হুলস্থূল তর্কবিতর্ক, 'সে আর্ট তবে কি আর্ট যেখানে "ভুল" জিনিস অক্লেশে খাটি আর্ট বলে পাচার হয়ে যায়?'

এটা ধরা পড়ল কি করে? ফাল্স্ট্র্যোম্ ছুটি থেকে ফিরে একদিন স্বয়ং গিয়েছেন চিত্রপ্রদর্শনী দেখতে। সেখানে ঐ 'ম্যাসনাইট ছবি'র কাণ্ড দেখে যখন ভুলটা ধরা পড়ল তখন কোথায় না তিনি বিচক্ষণ জনের মতো চুপ করে থাকবেন—তিনি উল্টে আরম্ভ করলেন তুলকালাম কাণ্ড!

ফলে জ্ঞানগর্ভ পণ্ডিতমণ্ডলী, তীক্ষ্ণচক্ষু কলাসমালোচকদের দল, ঝানু ঝানু আর্টসংগ্রহকারিগণ, সরলচিত্ত সাধারণ দর্শক এবং সবশেষে নিজেকে আর তামাম ঐ 'স্বতঃস্ফূর্ত-কলা-পন্থী'কে বিশ্বজনের সম্মুখে তিনি হাস্যাস্পদ করে ছাড়লেন।

এর কয়েক বছর পূর্বে এক বিদগ্ধ বিদূষক চিড়িয়াখানার শিম্পাঞ্জীর 'আঁকা' একখানি 'ছবি' ঐ রকম এক চিত্রপ্রদর্শনীতে পাঠিয়ে শহরের লোককে বোকা বানিয়েছিল—তখনও কেউ ধরতে পারেন নি, ওটা বাঁদরের মস্করা।

কিন্তু প্রশ্ন, এই ধরনের তামাশা চলবে কতদিন ধরে? এই যে স্পন্টানিস্টের দল, কিংবা অন্য যে-কোনো নামই এদের হোক—এরা আর কতদিন ধরে আপন ব্যবহার দিয়ে ইচ্ছা-অনিচ্ছায় প্রকাশ করবেন যে এদের আর্ট কোনো কিছু সৃজন করার দুরূহ শক্তিসাধনায় আয়ত্ত নয়, আকস্মিক দৈবদুর্বিপাক বা অ্যাক্সিডেন্ট বা ঘটনাচক্র এদেরই মতো উত্তম উত্তম ছবি আঁকতে পারে, শ্রেষ্ঠ গান গাইতে পারে, সার্থক কবিতা রচনা করতে পারে—এতদিন যা শুধু সরস্বতীর

বরপুত্রেরাই বহু সাধনার পর করতে পারতেন ?

এই প্রশ্নটি শুধিয়েছেন এক সরলচিত্ত, দিশেহারা সাধারণ লোক—সুইডেনের কাগজে।

উত্তরে আমরা বলি, কেন হবে না ? এক কোটি বাঁদরকে যদি এক কোটি পিয়ানোর পাশে বসিয়ে দেওয়া হয়, এবং তারা যদি এক কোটি বংশপরম্পরা ওগুলোর উপর পিড়িং পাড়াং করে তবে কি একদিন একবারের তরেও একটি মনোমোহন রাগিণী বাজানো হয়ে যাবে না ? সেও তো অ্যাক্‌সিডেণ্ট !

আমার ব্যক্তিগত কোনো টীকা বা টিপ্পনী নেই। মডার্ণ কবিতা পড়ে আমি বুঝি না, আমি রস পাই না। সে নিয়ে আমার কোনো খেদ নেই। পৃথিবীতে যে অতশত ভালো জিনিস রয়েছে যার রসাস্বাদন আমি এখনো করে উঠতে পারি নি, ওগুলো আমার না হলেও চলবে।

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন

আমরা যারা বাল্য বয়স থেকে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের স্নেহচ্ছায়ায় বড় হয়েছি এবং আশ্রমবাসী সকলেই যাঁকে সেদিনও পর্যন্ত এখানকার সর্বজনপূজ্য আচার্যশ্রেষ্ঠ রূপে পেয়ে সঙ্কটের সর্বশ্রেষ্ঠ কাণ্ডারী ও আনন্দের সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকারী জেনে মনে মনে গভীর পরিতৃপ্তি অনুভব করতাম, আজ তাদের শোক সব চেয়ে বেশী।

ভারতবর্ষের সর্বত্র এবং ভারতের বাইরে তাঁকে অসংখ্য লোক কত না ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। হয়ত তাঁদের অনেকেই আমাদের চেয়ে তাঁকে পূর্ণতররূপে দেখেছেন, কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের এবং সমগ্রভাবে আশ্রমের সত্তাতে যে আঘাত লেগেছে তার কঠোরতা আজ এই প্রথম আমরা বুঝতে আরম্ভ করলুম। এতদিন আমাদের এমন একজন ছিলেন যিনি বিশ্বভারতীর কর্ম থেকে বিশ্রাম গ্রহণ করেছিলেন সত্য, কিন্তু তারপরেও সেদিন পর্যন্ত তিনি আশ্রমবাসীদের সবাগ্রণীরূপে আমাদের মধ্যে ছিলেন। আশ্রমের দৈনন্দিন সমস্যাতে তাঁকে জড়িত করা হত না, কিন্তু তিনিই ছিলেন গুরুতর সমস্যাতে আমাদের সর্বোত্তম পথপ্রদর্শক।

এখানকার শিক্ষাভবনের (অর্থাৎ ইস্কুলের) শিক্ষকরূপে তিনি কর্মজীবন আরম্ভ করেন—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যে স্কুলের প্রধান শিক্ষক সেখানে তাঁর এই কর্মভার গ্রহণ যে উভয়ের পক্ষেই পরম শ্লাঘার বিষয়, সে-কথা দুজনেই জানতেন।

পরবর্তীকালে উত্তর বিভাগ বা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে তিনি অধ্যাপক হলেন ও সর্বশেষে বিশ্বভারতী রাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার পর তিনি উপাচার্যরূপে আশ্রম পরিচালনা করেন। 'উপাচার্য' শব্দ এখানে প্রয়োগ করাতে কেউ যেন ভুল না বোঝেন। এটি একটি রাষ্ট্রীয় অভিধা—বস্তুত তিনি আচার্যোত্তম ছিলেন। আমি বলতে পারি, পৃথিবীর যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে প্রধান আচার্য রূপে পেলে ধন্য হত।

এবং এই তাঁর একমাত্র কিংবা সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় নয়।

বস্তুত এরকম বহুমুখী প্রতিভাবান ব্যক্তি সর্বদেশেই বিরল। কেউ তাঁকে জানেন সংস্কৃত শাস্ত্রের পণ্ডিত রূপে, কেউ মধ্যযুগীয় সন্তদের প্রচারক রূপে, কেউ রবীন্দ্রপ্রতিভার সম্যক রসজ্ঞ ও টীকাকাররূপে, কেউ চৈনিক-ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের লুপ্ত গৌরব উদ্ধারাগী গবেষকরূপে, কেউ বাউল-ফকীরের গূঢ় রহস্যাবৃত তত্ত্বজ্ঞানের উন্মোচকরূপে, কেউ শব্দতত্ত্বের অপার বারিধি অতিক্রমণরত সন্তরণকারীরূপে কেউ সুখ-দুঃখের বৈদিকার্থে পুরোহিতরূপে, কেউ এই আশ্রমের অনুষ্ঠানাদিকে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যানুযায়ী রূপ দিবার জন্য উপযুক্ত মন্ত্র আহরণে রত ঋষি রূপে.—আমরা তাঁকে চিনেছি গুরুরূপে।

বিনয়বশত প্রকৃত গুণীজন তাঁর গুণ আচ্ছাদিত রাখেন, কিন্তু শিষ্যের কাছে তাঁর সর্বগুণ উন্মোচন করে দেন। তিনি সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন, অলঙ্কারশাস্ত্র তাঁর নখাগ্রদর্পণে ছিল এবং ভরতমম্মটসম্মত প্রাচীনতম আলঙ্কারিক সূত্র তিনি অতি সাধারণ, অতিশয় গ্রাম্য গীতিকাতে আরোপণ করে সে যে রসোত্তীর্ণ হয়েছে সে-কথা বার বার সপ্রমাণ করতে জানতেন। বৈদ্যসন্তান বৈদ্যরাজও ছিলেন। রন্ধনশাস্ত্রে তাঁর অনুরাগ ছিল। অভিনয়ে তিনি সুদক্ষ নট। ভারতের ঐক্যানুসন্ধানের পর্যটকরূপে চৈতন্য ও বিবেকানন্দের পরেই তাঁর নাম করতে হয়।

তাঁর আরো বহু গুণ ছিল। তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া আমার শক্তির বাইরে। আজ সেদিন নিশ্চয়ই নয়। এই এখন আমার কানে ভেসে আসছে ক্ষিতিমোহনের বিহারক্ষিতি শালবীথিকায় তাঁর স্মরণে শোকতপ্ত আশ্রমবাসিগণের সশ্রদ্ধ 'আগুনের পরশমণি' বৈতালিক গীতি।

* *

চিত্রে নন্দলাল। সঙ্গীতে দিনেন্দ্রনাথ। শাস্ত্রে বিধুশেখর। শব্দতত্ত্বে হরিচরণ। শিক্ষকতায় জগদানন্দ। রসে ক্ষিতিমোহন।

শুনেছি বিশ্বভারতী এঁদের সম্বন্ধে প্রামাণিক পুস্তক প্রকাশ করবেন। তার ভিতরই পাওয়া যাবে বিশ্বভারতীর নাতিসম্পূর্ণ ইতিহাস। এ কর্মে সংখ্যাতীত

শিষ্যের সহযোগিতার প্রয়োজন। আমি শুধু সেটুকু বলতে পারি যা স্বচক্ষে দেখেছি।

শাস্ত্র এবং রসালোচনায় রবীন্দ্রনাথের দুই বাহু ছিলেন বিধুশেখর এবং ক্ষিতিমোহন।

সকলেই আশা করেছিলেন কাশীর শাস্ত্রী ক্ষিতিমোহন সংস্কৃত চর্চায় যশস্বী হবেন। কিন্তু তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করে দিলেন বাঙলার জনবৈদগ্ধ্য চর্চায়। আজ আর মধ্যযুগের সন্তরা যে পৃথিবীর সর্বসন্তদের সমকক্ষ এ কথা নিয়ে কেউ তর্কাতর্কি করে না, এ দেশের আউল-বাউলরা যে সাধনার গভীরতম অতলে পৌঁছে প্রাচীন যুগের মুনি ঋষিদেরই ব্রহ্মানন্দ আস্বাদন করেছিলেন সে-কথাও কেউ অস্বীকার করে না, এমন কি কোনো কোনো অর্বাচীন ঐ বিষয়ে বিরাট গ্রন্থ লিখে এখন সপ্রমাণ করতে চায় যে, সে ক্ষিতিমোহনকেও ছাড়িয়ে গেছে, তাঁর 'অসম্পূর্ণ' জ্ঞান 'সম্পূর্ণতর' করে দিয়েছে। বিরাটকায় ক্ষিতিমোহনের স্কন্ধে দাঁড়িয়ে বামনও হয়ত একটু বেশী দূর অবধি দেখতে পায় অস্বীকার করি নে, কিন্তু সে বামন ক্ষিতি-অতিকায়ের বিরাট মস্তিষ্ক আর বিরাটতর হৃদয় পাবে কোথায়! তবে আজ এই বিতর্কমূলক প্রস্তাব (অবশ্য আমার কাছে নয়) উত্থাপন করব না—আজ শোকের দিন।

এবং সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, ক্ষিতিমোহন আউল-বাউল গান নিয়ে আলোচনা করার সময় যে পদ্ধতি অবলম্বন করলেন সেটি সম্পূর্ণ শাস্ত্রচর্চা পদ্ধতি। অর্থাৎ উপনিষদ বা গীতার টীকা লেখার সময় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত যে রকম অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পাঠোদ্ধার করেন, অন্যান্য শাস্ত্রের সঙ্গে তুলনা করেন, ঐ সব শাস্ত্রের মূল উৎসের অনুসন্ধান করেন, ঠিক সেই পদ্ধতিতে তিনি আউল-বাউলের 'শাস্ত্র' অধ্যয়ন করে, টীকা লিখে তাদের জীবনদর্শন অধ্যাত্মদর্শন লোকচক্ষের সামনে তুলে ধরলেন।

এই কর্মে লিপ্ত হয়ে ক্ষিতিমোহন দেখতে পেলেন, আউল-বাউলের মূল উৎস যে শুধু বেদ উপনিষদ গীতা ভক্তিবাদে রয়েছে তা নয়, তার সঙ্গে মিলে গিয়েছে মুসলিম সুফীবাদ। তিনি তারই অনুসন্ধানে সুফীবাদের এমনই গভীরে পৌঁছলেন যে, বহু সুপণ্ডিত সুফী পর্যন্ত আশ্চর্য হলেন যে, সুফী আবহাওয়ার এত দূরে থেকে এই লোকটি একে আপন প্রাণ-নিশ্বাসে ভরে নিল কি করে? রামমোহনকে যদি বলা হয় জবরদস্ত মৌলবী, এঁকে তাহলে বলতে হয় 'খবরদস্ত'—বা 'খবর্-দার-সুফী'। পূর্ব বাঙলার অনাদৃত মুসলিম চাষীকে ক্ষিতিমোহন ছেলেবেলা থেকেই অন্তরঙ্গভাবে চিনতেন—তিনি প্রমাণ করলেন তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনা কুরান ও

সুফীবাদের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত এবং আশ্চর্য প্রাণশক্তিবলে সে তার চতুর্দিকের ভিন্ন সাধনাও আপন করে নিতে পেরেছে। শুধু তাই নয়, হিন্দু সাধকের কাছে সে ঋণীও বটে, উত্তমর্ণও বটে। এবং সর্বশেষে সপ্রমাণ করলেন, হিন্দু মুসলমান সাধনার মিলন হয়েছে এই 'চাষাভূষো'দের কল্যাণেই—মৌলভী ভশ্চাযে যে ভাবনা-সাধনার আদান-প্রদান অতি অল্পই হয়েছে সেটা পরিস্ফুট হয়ে উঠল।

গণসাধনার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা গভীরতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি হিন্দু ক্রিয়া-কর্মের দিকে আকৃষ্ট হলেন। 'মেয়েলী' বলে আমরা যে সব পালপার্বণ ব্রত-পূজা অবহেলা করে আসছিলুম সেগুলো একটি একটি করে বিশ্লেষণ করে তিনি দেখাতে লাগলেন যে, এগুলোর ভিতরও অতি প্রাচীন ঐতিহ্য লুকোনো রয়েছে, এব অনেকগুলোই চলে যায় আমাদের ধর্মানুসন্ধানের প্রাচীনতম যুগে। সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ করলেন যে, আমাদের অনেকগুলোই আবার আমাদের প্রতিবেশী 'অনার্য'দের কাছ থেকে নেওয়া।

সে এক বিপরীত দর্পণ! আমরা যে সব পালপার্বণকে ভেবেছিলুম অতিশয় খানদানী 'আর্য', ক্ষিতিমোহন প্রমাণ করলেন তার অনেকেই 'অনার্য' এবং তথাকথিত 'অনার্য' ক্রিয়াকর্মের মূল রয়েছে নৈকষ্য আর্যসাধনার গভীরে।

এর সব-কিছুই প্রেমী গবেষককে নিয়ে যায় ভারতবর্ষের ধর্মানুপ্রাণিত দর্শন-চর্চায়—কারণ একমাত্র দর্শনশাস্ত্রই বহুর বাহ্যরূপ উন্মোচন করে অন্তরের ঐক্য দর্শন করাতে পারে। সেখানে তিনি পেলেন জ্ঞানী দ্বিজেন্দ্রনাথের[১] উপদেশ এবং সহযোগিতা—গুণী রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য যে তিনি অহরহ পেতেন সে জানা-কথা

১ এই ঋষি সম্বন্ধে বাঙলা সাহিত্যে প্রায় কোনো আলোচনাই হয় নি। এ যুগে এঁর ভগবৎ-উপলব্ধি তুলনাহীন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি অদ্বিতীয় দার্শনিক ছিলেন। ক্ষিতিমোহনের সঙ্গে এঁর যোগ হওয়াতে উভয়েই প্রচুর লাভবান হয়েছিলেন। নিম্নে ক্ষিতিমোহনকে লিখিত দ্বিজেন্দ্রনাথের একখানি চিঠি ক্ষিতিমোহনের পুত্র শ্রীমান ক্ষেমেন্দ্রের অনুমতি নিয়ে উদ্ধৃত করছি :

"হিরাক্লিটসের প্রকল্পিত অগ্নিব্রহ্মবাদের গোড়ার বৃত্তান্ত সম্বন্ধে আপনার বিচারে যাহা সত্য বলিয়া মনে হয়, তাহা আমাকে ব্যক্ত করিয়া বলুন, এইটে আমি লিখিতে ইচ্ছা করি।

প্রবর্তিত না বলিয়া প্রকল্পিত বলিলাম এইজন্য যেহেতু হিরাক্লিটসের মত জনসাধারণের মধ্যে প্রচারযোগ্য নহে—তাহা একটা তত্ত্বজ্ঞানের সিদ্ধান্ত মাত্র।

পূর্বেই নিবেদন করেছি। এরই ফলে তিনি আবিষ্কার করলেন যে, আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন ক্রিয়াকাণ্ড, যোগ ও তন্ত্রের রহস্যবাদ ও দর্শনের মূল তত্ত্বে রয়েছে একই নির্দ্বন্দ্ব সত্য।

এই সত্যের ভানুমতী-দণ্ড হাতে নিয়ে ক্ষিতিমোহন প্রবেশ করলেন হীনযান, মহাযান এবং তারই ভিন্ন ভিন্ন তান্ত্রিক যান, নেপাল-তিব্বত-চীনের ভিন্ন ভিন্ন বৌদ্ধ ধর্মজগতের ভিতর। সেই এক সত্য কখনো বৌদ্ধদর্শনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চিন্তাধারায়, তন্ত্রের বিকৃত কর্মকাণ্ডের পিছনেও সেই সত্য ভস্মাচ্ছাদিত, সেই সত্যই চর্যাপদে, সেই সত্যই পূর্ববঙ্গের লোকসঙ্গীতে, পশ্চিমবঙ্গের আউল-বাউলের গানে কখনো স্বপ্রকাশ, কখনো শাস্ত্রানধিকারীর উৎপাতে লুক্কায়িত—কখনো সরলতম ভাষায় স্বচ্ছ, কখনো রহস্যাবৃত রূপকে আস্বচ্ছ কুহেলিকাঘন।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, এতে আর এমন নূতন কথা কি? আমরা তো চিরকালই স্বীকার করে এসেছি, সর্বধর্মেই সত্য সমাহিত।

সত্যই কি আমরা তা জীবনে স্বীকার করেছি? ধর্মের বাহ্যরূপে যে বিকট বিকট প্রভেদ অহরহ দেখতে পাচ্ছি, সে কি যুগ যুগ ধরে আমাদের ভিতর দ্বন্দ্ব-কলহের সৃষ্টি করে নি? না হলে চৈতন্য, রামমোহন, রামকৃষ্ণের কি প্রয়োজন ছিল?

দ্বিজেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ এবং ক্ষিতিমোহন এঁদের মতো ধর্মসংস্কারক ছিলেন না। এঁদের প্রধান কর্ম ছিল, যুগ যুগ সঞ্চিত আমাদের ঐতিহ্যের ধন যার প্রায় সব-কিছুই আমরা দৈনন্দিন জড় অভ্যাসের ফলে সম্পূর্ণ অবহেলা করে বসে আছি, সাধনাবিহীন মন্ত্রতন্ত্রই সর্বপাপহর বলে বিশ্বাস করে বসে আছি, মুখে 'সর্বভূতে নারায়ণ', কর্মে সে 'নারায়ণ'কে ডোম-চণ্ডালের কলুষতাব ভয়ে সমাজ থেকে দূরে ঠেলে রেখেছি, স্বর্ণে-পর্ণে, ধর্মে-অধর্মে প্রভেদ কবার শক্তি প্রায়

'প্রকল্পিত' অপেক্ষা আরো বেশী সঙ্গতমাফিক বিশেষণ আমাকে দিতে পারেন তো ভালো হয়।

'অগ্নিব্রহ্ম-বাদ' হয় কি না? এরূপ একটি কথা চলিতে পারে কি না—তাহাতে কি বুঝায়?

'প্রকল্পিত' ইহার পরিবর্তে মনোভিমত, প্রস্তাবিত, উপন্যস্ত—এ তিনটির কোনোটি খাটে না। যেহেতু তাহা শুধু মনোভিমত বা প্রস্তাবিত বা উপন্যস্ত নহে। কাশীর পণ্ডিতেরা এরূপ স্থলে কিরূপ তান্ত্রিক ভাষা ব্যবহার করেন?

এই বিষয় উচিতানুচিত আমাকে লিখিয়া পাঠান।"

হারিয়ে ফেলেছি—এই নিদারুণ অবস্থায় আমাদের দৃষ্টি সেই সত্যের দিকে আকৃষ্ট করা যে-সত্য আমাদের হাতের কাছেই আছে,—লালন ফকীরের ভাষায়—

"হাতের কাছে—পাইনে খবর
খুঁজতে গেলেম দিল্লী শহর—!"

যাকে চাইলেই পাওয়া যায়।

ক্ষিতিমোহনের প্রধান কর্ম ছিল, সমাজের তথাকথিত নিম্নতম সম্প্রদায়েও যে সে সত্য যুগপৎ লুক্কায়িত ও উদ্ভাসিত আছে, তারই দিকে তথাকথিত শিক্ষিত জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। মধ্যযুগের সন্তদের নিয়ে তিনি তাঁর সাধনা আরম্ভ করে নিচের দিকে নেমে এলেন আউল-বাউলে এবং সেখানে যে সব মণিমুক্তা পেলেন, তাদের প্রাচীনত্বের সন্ধানে উপরের দিকে গেলেন বেদ-উপনিষদে। এই অবিচ্ছিন্ন তিন লোকে তাঁর গমনাগমন গতিধারা ছিল অতিশয় স্বতঃস্ফূর্ত আয়াসহীন। এটা পণ্ডিতজন-দুর্লভ—ধর্মলোকে বিধিদত্ত স্পর্শকাতরতা না থাকলে এ জিনিস সম্ভবে না।

ক্ষিতিমোহন পথ প্রদর্শন করার পর আরো অনেকেই আউল-বাউল নিয়ে চর্চা করেছেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও ক্ষিতিমোহন একক।

তার কারণ ক্ষিতিমোহনের এমন একটি গুণ ছিল যা এ যুগে আর কারও ছিল না—আমার অভিজ্ঞতায় পৃথিবীর কুত্রাপি আমি এ গুণটি দ্বিতীয় জনে দেখি নি।

কঠিনতম জিনিস সরল ভাষায় মধুর রূপে প্রকাশ করার অলৌকিক 'খুদা-দাদ্'-বিধিদত্ত ইন্দ্রজাল-শক্তি।

ক্ষিতিমোহন লিখেছেন যতখানি, বলেছেন তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী। কারণ তিনি জানতেন পুস্তক সর্বগামী নয়, লিখিত অক্ষরের শক্তি সীমাবদ্ধ।

বিদ্যালয়ের অজাতশ্মশ্রু বালক থেকে আরম্ভ করে শুভ্রকেশ বৃদ্ধ, অভ্যাগত-রবাহূত সকলকে, সভাস্থলে, বন্ধুসমাগমে, ট্রেনে-জাহাজে, হিমালয়ের চটিতে, নর্মদার পারে পারে, দেশে-বিদেশে তিনি যেখানেই থেকেছেন, যেখানেই গিয়েছেন, সেখানেই তিনি এই অভূতপূর্ব বাচনভঙ্গী দ্বারা তাঁর বক্তব্য নিবেদন করে সকলকেই মুগ্ধ করেছেন। শত শত লেখক হাজার হাজার গম্ভীর পুস্তক লিখেও যা করতে সক্ষম হবেন না, কথকসম্রাট ক্ষিতিমোহন একাই তা করে গেছেন তাঁর খুদা-দাদ্ এই সওগাতের দৌলতে।

সবিনয় নিবেদন করছি, আচার্য ক্ষিতিমোহনের বহুমুখী কর্ম এবং চিন্তাধারার সম্যক বিশ্লেষণ আমার সীমাবদ্ধ শক্তির বাইরে। যে-টুকু আছে তাও শোকাচ্ছন্ন।

তবু আশ্রমবাসী, তাঁর শিষ্যরূপে তাঁরই স্মরণে তাঁর অসংখ্য অনুরাগী পাঠক ও শ্রোতাদের উদ্দেশে এই কথা কয়টি নিবেদন করি।

আমার অক্ষমতম রচনাও তাঁর স্নেহাশীর্বাদ লাভ করত। পুণ্যলোক থেকে আগত তাঁর সে আশীর্বাদ থেকে আমার এ দান শ্রদ্ধাঞ্জলি অকিঞ্চন গুরুদক্ষিণা বঞ্চিত হবে না—এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

॥ শেষ ॥